শরৎ-চেতনা

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং. প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৮

মূল্য—১৬.০০ (ষোল টাকা) মাত্র।

মুদ্রাকর :

শ্রীঅজিত কুমার সাউ

রূপলেখা প্রেস

৬০, পটুয়াটোলা লেন,

কলিকাতা-৯।

উত্তরপাড়া কলেজের সহকর্মী বন্ধুদের

করকমলে—

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের চিত্তলোকের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মনোজগতের রূপ এবং বিভিন্ন সমস্যায় তাঁহার মনোভাবের উৎস-সন্ধান ও স্বরূপ বিশ্লেষণ 'শরৎ চেতনা' গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে সাহিত্য-চিন্তায় অথবা নানা সমস্যার মোকাবিলায় শরৎচন্দ্রের অধিকার বা ক্ষমতা কিরূপ ছিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এইভাবেই মোটামুটি শরৎ-সাহিত্যের মূল্যবিচারেরও চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের সভা-সমিতিতে ভাষণ ও চিঠিপত্র সহ শরৎ-সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতির উপরই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, তবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য সাহিত্যিক সম্পর্কে তথ্যও ইহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে।

'শরৎ-চেতনা' বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য 'সমাজ-চেতনা', 'অর্থ নৈতিক-চেতনা', 'ধর্ম-চেতনা', 'রাজনৈতিক চেতনা' এবং 'শিল্প-চেতনা',—মূলতঃ এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটিকে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিষয়গুলির মধ্যে স্বাভাবিক পারস্পরিক যোগ থাকায় আলোচনার সময় সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু কিছু পুনরুক্তি ঘটিয়া গিয়াছে। তবে পরবর্তী প্রাসঙ্গিক উল্লেখে চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে পূর্বোল্লিখিত তথ্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে সমাজ-কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কলাকৈবল্যবাদ নয়, সমগ্রভাবে শরৎ সাহিত্যের মূলে কল্যাণবোধ প্রবাহিত ছিল বলিয়া তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখারই অর্থ বা উদ্দেশ্য ছিল। শরৎচন্দ্রের রচনা শুধুমাত্র পাঠকের রসতৃষ্ণাই চরিতার্থ করে না, মূল্যবোধ পুনর্নির্ধারণের দ্বারা নূতন জীবনানুভূতির দিকেও পাঠক-মন সঞ্চালিত করে। শরৎচন্দ্র প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, জীবনরসে রসিক ছিলেন, মানবদরদী ছিলেন, সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতি আর একটু উন্নতধরণের হইলে এবং তিনি আর একটু বেশী চিন্তাশীল হইলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবশ্যই অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনায় উদ্দেশ্যগত তত্ত্বের চাপ থাকিলেও শিল্পের মর্যাদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে,—ইহা জীবনশিল্পী

শরৎচন্দ্রের শক্তির পরিচায়ক। বর্তমান গ্রন্থে এ বৈশিষ্ট্যের দিকটিও ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক সমরসেট মম তাঁহার 'টেন নভেলস অ্যাণ্ড দেয়ার অথরস' গ্রন্থে (১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫) কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের রচনার আল্‌গাভাব স্বীকার করিয়াও ডিকেন্সের বিরাট সৃজনী-শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও অনুরূপ অভিনন্দনযোগ্য। শরৎচন্দ্রের ক্রটিগুলি বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইলেও ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্রের গুণাবলী তাঁহার ক্রটির গ্লানি ঢাকিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

শরৎ-চেতনা রচনা কালে আমি নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থখানি যখন রচিত হইতেছিল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ইহার সত্যকার উন্নতিবিধায়ক একটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রীতি-ভাজন সাহিত্য-কর্মী শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই গ্রন্থ রচনায় আমি বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি।

দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। যে ভুলগুলি চোখে পড়িয়াছে সেগুলি 'শুদ্ধিপত্র'-এ সংশোধিত হইল। পাঠক গ্রন্থপাঠের পূর্বে এগুলি মিলাইয়া লইবেন, এই অনুরোধ।

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ-চেতনা

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' যত্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন।* দুইখানি উপন্যাসেই অসীম রহস্যময় মানবমনের, বিশেষ করিয়া নারীমনের ছবি আঁকা হইয়াছে। নারী-হৃদয়ের যে বাসনা-কামনায় সমাজের অনুমোদন আছে, যে আকাঙ্ক্ষা সামাজিক নীতি-বিগর্হিত নয়, 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর অথবা 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতার মনে তাহার অতিরিক্ত ভাব-তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল। মনের বিচিত্র ক্ষুধায় এই দুই নায়িকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ শিল্পিসুলভ নিষ্ঠায় সমাজের অসম্মতি উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের সেই তথ্য-সম্মত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রও এই কবি-সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত নৈর্ব্যক্তিকভাবে তিনি সেই সত্যকে তথ্য-সম্মত বিশদ রূপ দিতে পারেন নাই। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই আপন অভিমতের আলোকে কাহিনীকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন; এমনকি মানব মনের সহিত সমাজবিধির সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিবোধকে 'সুমতি' এবং সমাজ-বিরোধী হৃদয়ভাবকে 'কুমতি' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-কথাসাহিত্যের প্রথম যুগের সূর্যস্বরূপ, কারণ তিনিই প্রথম মানবহৃদয়ের অপার রহস্যের ইঙ্গিত দিয়া জটিল মানব মনের তরঙ্গিত রূপকে বাংলা-কথাসাহিত্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয়ের যে ক্ষুধায় বঙ্কিমচন্দ্রের

*কবিশেখর কালিদাস রায় শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র প্রসঙ্গ উঠিলে কবিশেখর শরৎচন্দ্রের উপর এই গ্রন্থের প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন। শরৎচন্দ্র বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলেন, "তুমি ঠিক ধরেছ ভায়া। আমি ওই 'চোখের বালি'খানা পড়েছি ২৪ বার, আর রীতিমত ওর ওপর দাগা বুলিয়েছি। তবে আর একখানা বইয়ের নাম করলে না কেন? আমি 'নষ্টনীড়ে'র কথা বলছি। ওখানাও অন্ততঃ বিশবার পড়েছি। আমার সাহিত্যরচনার দীক্ষা ওই বই দুইখানা হ'তে।—"(কালিদাস রায়—শরৎ-সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী কুলত্যাগ করিয়াছে, সেকালের বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে তাহার মত সাধারণ বিধবা মেয়ের পক্ষে সে-ক্ষুধায় কাতর হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল এবং এই ক্ষুধার কথা কম লেখকই সাহস করিয়া নায়িকার হৃদয়-রহস্যরূপে গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত করিতে পারিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মনের ক্ষুধার স্বীকৃতি দিয়া সেই ক্ষুধাপূরণে রোহিণীর সক্রিয়তা খোলাখুলিভাবেই আঁকিয়াছেন। রোহিণী নিজেকে আগে নারী, তারপর বিধবা মনে করে; বঙ্কিমের রোহিণীর এই চিত্রায়ণ তৎকালীন সমাজে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। তবু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বঙ্কিম রোহিণীর আকাঙ্ক্ষার সাহিত্যিক মূল্য দিতে যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব পরিস্ফুটনে ততটা যত্ন লন নাই। রোহিণী কি চায় তাহা বঙ্কিম উদারভাবেই বলিয়াছেন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ভয় তিনি করেন নাই, কিন্তু সেই চাওয়া পাওয়ায় রূপান্তরিত করিতে রোহিণীর প্রয়াস বঙ্কিম খুবই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর হরিদ্রাগ্রাম হইতে পলায়নের পর তাহাদের অসামাজিক জীবনায়ন বঙ্কিম একরূপ এড়াইয়া গিয়াছেন, চিত্রানদীর শীর্ণতার সংকেত দ্বারা তাহাদের উদ্দাম প্রেমে ভাটা পড়িবার ইঙ্গিত করিয়া নিশাকরকে আনিয়া রোহিণীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়াছেন। এইভাবে রোহিণীকে অভাবিত দ্রুতগতিতে হত্যা করানো এবং হত্যার পর রোহিণীর মৃতদেহ বেওয়ারিশ লাশরূপে গরুর গাড়ীতে বাঁধিয়া চালান দেওয়া যেন রোহিণীর অসামাজিক প্রেম-চাপল্যের শাস্তিবিধান। মনে হয়, এখানে সামাজিক বঙ্কিমের দ্বারা শিল্পী বঙ্কিম আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছেন। কাহিনীর পরিণতিতে সামাজিক বিধিবিধানের মোটামুটি স্বীকৃতি বা অনুস্মৃতি রবীন্দ্রনাথেও আছে, বিধবা রোহিণীর গুলি খাইয়া মৃত্যুর সহিত 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনীর বিহারীর কাছ হইতে পলাইয়া কাশীযাত্রার তফাৎ খুব বেশি নয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেহমনের ক্ষুধার তাড়নায় চঞ্চলা বিনোদিনীকে যখন আঁকিয়াছেন, তখন কোন সামাজিক পূর্ব-সংস্কারই তাঁহাকে আড়ষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি হৃদয়ের হিসাবে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, সমাজের অনুমোদন না থাকিলেও শিল্পীর সততা ও তৃপ্তি লইয়া তাহা তিনি বিস্তারিতভাবেই আঁকিয়াছেন। চরিত্র উপন্যাসের বড় উপাদান, চরিত্র [illegible]ভাবে রূপায়িত করিতে হইলে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাববৈচিত্র্যের

সংঘাতে উদ্ভূত মনের আলোড়ন ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এই হৃদয়-রহস্যের বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট প্রকাশ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে খুবই আগাইয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিধি-বন্ধন-নিরপেক্ষভাবে মনের দাবী আঁকিবার সাহস না থাকিলে এই বিস্তারিত হৃদয়বর্ণনা সম্ভব নয়। সমাজরক্ষার কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত না হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা এদিক হইতে কাহিনীর গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা উন্নততর চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিত, ফলে বাংলা উপন্যাস আরও সমৃদ্ধ হইত। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চেয়ে কম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রবীন্দ্রনাথ এই হৃদয়রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে পূর্বসূরী বঙ্কিমকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং বাংলা উপন্যাসকে তথা বাংলা সাহিত্যকে বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে এই পথ প্রশস্ততর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে উপন্যাসধর্মে শরৎচন্দ্রের আর এক ধাপ অগ্রগতির নিদর্শন হইল, তাঁহার সাধারণ মানুষদের ভিতর হইতে লওয়া চরিত্রগুলি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্জিত, সংস্কৃতির একটা ছাপ তাহাদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত ও সমাজের তলার শ্রেণীর মানুষদের চরিত্রগুলি সমাজের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। (বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত শ্রেণীর উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন মার্জিত মানুষের উপর, শরৎচন্দ্র কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে সমাজের নীচের স্তরের সাধারণ মানসিকতা সম্পন্ন সাধারণ মানুষদেরই প্রধানতঃ বাছিয়া লইয়াছেন) যাহা হউক, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভালমন্দ ভাবের দ্বারা চিহ্নিত চরিত্রগুলির মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে, তাহাদের বাহিরের পরিচয় ও অন্তরের পরিচয় এক নাও হইতে পারে, এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জটিল অখণ্ডিত চরিত্রসৃষ্টির যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে একরূপ আবিষ্কার করিলেন, রবীন্দ্রনাথের কর্ষণে তাহা শুধু সমৃদ্ধ হইল না, রসিকসমাজে রীতিগত স্বীকৃতি লাভ করিল। শরৎচন্দ্র নিবিড়তর অনুশীলনে কলাশিল্পের হিসাবে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ২৩তম পরিচ্ছেদে জীবানন্দ প্রফুল্লকে বলিয়াছে, "আশ্চর্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এই মানুষের মন।" প্রধানত এই বিচিত্র মানবমন লইয়াই শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য।

উপন্যাস জীবনের ছবি, জীবনের কথাই উপন্যাসে বলিতে হইবে। জীবনের বাস্তব পটভূমিকে অস্বীকার করিয়া যে উপন্যাসে কল্পনার ফানুষ উড়ানো হয়, খেয়াল-খুশির আবেগে সত্যকার জীবনের সম্পর্কহীন চিত্র যে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়, তাহা উপন্যাস-পদবাচ্য নয়। ঔপন্যাসিক জীবনকে যদি স্বীকার না করেন তাহা হইলে তিনি আর ঔপন্যাসিক থাকেন না। সাহিত্য-সমালোচক হাডসন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ঔপন্যাসিক যে বিষয়বস্তু লইয়া লিখিবেন, তাহার সহিত তাঁহার নিজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই। যে বিষয়বস্তুর সহিত তাঁহার নিজের পরিচয় নাই তাহা তাঁহার বাদ দেওয়াই উচিত।* শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনধর্মী ঔপন্যাসিক, চরিত্র ফুটাইতে পারিপার্শ্বিকের সহিত মানবমনের সংঘাত এবং মনের বিভিন্ন বৃত্তির সংঘর্ষ তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে। তিনি যে সমাজচিত্র রূপায়িত করিয়াছেন, তাহার বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে সচেতন থাকিতে হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালী সমাজ, বিশেষ করিয়া বাংলার পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতা লইয়া এই সমাজের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাকে চিন্তা করিতে ও লিখিতে হইয়াছে। কখনও কখনও চরিত্রকে কিছুটা অবহেলা করিয়াও তিনি সমস্যার উপর জোর দিয়াছেন। এই বাস্তব সমস্যা লইয়া লেখনী চালনার আবেগে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র রচনার দিকেও তাঁহাকে মন দিতে দেখা গিয়াছে। সমস্যা রূপায়ণের প্রবণতায় শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে কোথাও কোথাও প্রাবন্ধিক তথ্যমুখিতার ছাপও পড়িয়াছে। কিন্তু তবু, মোটের উপর, শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যিক হিসাবেই মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নানারূপ সমস্যা লইয়া লিখিলেও মানব মনের বৈচিত্র্য ও জটিলতার বহুবর্ণ চিত্র আঁকিয়া ও তদ্দ্বারা বিচিত্র মানব চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়া এবং সেই সঙ্গে রচনা-কুশলতা-সমৃদ্ধ

*"Whatever aspect of life the novelist may choose to write about, he should write of them with grasp and thoroughness which can be secured only by familiarity with his material. What he is not familiar with he should leave alone."—(W. H. Hudson : An Introduction to the Study of Literature, [illegible] Edition, page 173.)

চমৎকার গল্প বলিয়া তিনি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দিক্‌পালরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।)

(জগৎ ও জীবন অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর সর্বত্র গল্প উপন্যাস লিখিত হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের বিচিত্র রূপ ও রঙ আমাদের বিস্মিত করে। সেখানে মানুষের জীবন নানা পথে, নানা তালে প্রবাহিত; তাই সেখানে গল্প-উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া উপন্যাসে জীবনরূপের এই বহুবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত হয়। দুর্গমকে আয়ত্ত করিবার, দূরকে কাছে পাইবার, জীবনকে জানিবার বুঝিবার ও উপভোগ করিবার জন্য ছড়াইয়া লুটাইয়া দিবার, এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে সামান্য সাফল্য বা লাভের আশায় অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল পথে যাত্রা করিবার দুরন্ত সাহস পাশ্চাত্য মানুষের মনে বর্তমান। বাঙালীর জীবন এত স্বল্পায়তন, তাহাতে বৈচিত্র্য এত কম এবং গতানুগতিকতা এত বেশি, জীবনের কল্পনা-রঙীন ব্যাপ্তি বা গভীরতা সেখানে এত অল্পমাত্রায় বিদ্যমান, যে তাহার উপর ভরসা করিয়া উল্লিখিত ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও গতি বাংলাসাহিত্যে সঞ্চার করা প্রায় অসম্ভব কাজ। এই ধরণের বৈচিত্র্যের জন্য বাংলাসাহিত্যে কেহ যে চেষ্টা করেন নাই এমন নয়, কিন্তু যাঁহারাই করিয়াছেন, পরিচিত জীবনের অতিরিক্ত কল্পনা-নির্ভর ছবি আঁকিবার জন্য তাঁহারা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।) দৃষ্টান্তস্বরূপ কল্লোল ও কালিকলম মাসিক পত্রিকার নিয়মিত কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করা যায়। ইহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত আবেগপ্রবণ তরুণ সাহিত্যিক, সাহিত্য-জগতে আধুনিকতা ও গতি সৃষ্টির সংকল্প ইহারা করিয়াছিলেন। (বাংলা-সাহিত্যে ইহারা কল্লোলগোষ্ঠী নামে পরিচিত। সাহিত্য-জগতে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মোহে এই তরুণ সাহিত্যিকের দল স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর জীবনের অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেহবাদী সাহিত্যচর্চার অনুভূতির এবং রুশ-বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক গোঁড়ামি-প্রসূত দারিদ্র্যের রিক্ত ও শোষিত রূপের উপর অত্যধিক জোর দিয়া লিখিতে শুরু করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এজন্য ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা বিচিত্রায় 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁহাদের প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের সৃজনী-প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আপন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত যে 'দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম' তাঁহাদের সাহিত্যকর্মকে আবিল করিয়া তুলিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ব্যথাবোধ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া ১৩৩৪ সালের

মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তেও এই তরুণ সাহিত্যিকদের চাঞ্চল্যের প্রতিবাদ করিয়া অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র (২৩ শে পৌষ, ১৩৩৪ তারিখে লেখা) প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা রোগের মত হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াশুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টনটনে তরুণ,...তারা বলচে, আমরা তরুণ বয়স্ক বলেই আমাদের সমন্বয়ে বাহবা দাও, আমরা যুদ্ধ করেচি বলে না, প্রাণ দিয়েচি বলে না, তরুণ বয়সে আমরা যা ইচ্ছে তাই লিখেচি বলে। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে হয় ভালো নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এতো আজ পর্যন্ত শুনিনি।"

মোটের উপর, বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্য বা প্রসার খুবই কম হওয়ায় এবং অধিকাংশ বাঙালীর কাছেই ঘরোয়া জীবনে স্নেহ-প্রীতি-মমতার পরিমণ্ডলে শান্তিতে কালযাপনের সুযোগ পার্থিব পরম তৃপ্তির পরিচায়ক হওয়ায় এই সংকীর্ণ জীবনের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, শান্তি-অশান্তি লইয়াই বাংলা গল্প-উপন্যাসের বেশির ভাগ লিখিত হইয়া থাকে।* এই জীবনে বৈচিত্র্য যেমন কম, উত্তাপেরও তেমনি অভাব। প্রেম, স্নেহ, দয়া, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি মানবমনের সাধারণ যেসব বৃত্তি সেগুলিই প্রধানত এই ঘরোয়া জীবনে লীলায়িত হয়, কিন্তু সেগুলির গতিতে প্লাবনী শক্তি সীমাবদ্ধ, উদ্দাম

*অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী জীবনের সংকীর্ণতার জন্য বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "আমাদের জীবন যতদিন পর্যন্ত বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ, রসসমৃদ্ধ ও প্রকৃত জাতীয়তাভাবপুষ্ট না হইয়া উঠিবে, ততদিন উপন্যাস তাহার অস্বাভাবিক পিঙ্গলতা পরিহার করিয়া স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে না।"—(বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৩৫০, পৃষ্ঠা-২৯৮)

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'প্রবন্ধ' গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) 'মনে মনে' প্রবন্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তিও প্রণিধানযোগ্য: "জীবনকে নিয়ে এদের হাজারো experiment। কোনটাতে আসক্ত থাকতে কেউ চায় না। আজ কলেজে

তরঙ্গোচ্ছ্বাস সেগুলিতে কদাচিৎ দেখা যায়। শান্ত জীবনের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ায় বাংলা কথাসাহিত্য প্রায়ই শান্তভাবাশ্রয়ী হয়। উপরি-উক্ত হৃদয়বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রেমের একটা সার্বজনীনতা আছে; প্রেম সব দেশের কথাসাহিত্যের, বিশেষতঃ উপন্যাসের প্রধান উপাদান। বাংলা সাহিত্যেও প্রেম অতি-জনপ্রিয় ও বহু-ব্যবহৃত বিষয়বস্তু। পূর্বোল্লিখিত ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রেমের বিচিত্র গতি বা আবেগ-মথিত তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলাসাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় না, তবু নরনারীর ভালবাসার কথা লইয়াই বাংলা সাহিত্যেও অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উপন্যাসের বিশেষত্ব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উন্মোচন, এই সাধারণ ধর্ম স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও বাংলা উপন্যাসেও ইহা স্বীকৃত। উপরি-উক্ত বৈচিত্র্য বা তীব্রতার অভাব সত্ত্বেও প্রেম-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে কম নয়। প্রেম রসসঞ্চারী, আনন্দ-বিবর্ধক; রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে 'পথের আলো' বলিয়াছেন। নরনারীর হৃদয় প্রেমস্পর্শে সজীব হয়, ইহাতে জীবনের জড়তা কাটিয়া যায়। এই বিষয়বস্তু বিস্তারিত জীবনভূমিতে রচিত উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে। কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বা সাড়াই প্রেমচিত্রের শেষ কথা নয়, নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে জড়াইয়া আছে তাহার সমাজ। প্রেম মিলনে সার্থক হইতে চায়, সমাজ এই মিলনের ফলে সামাজিক সুবিধা অসুবিধা কিরূপ হইবে তাহা না ভাবিয়া পারে না। ফলে যদি ব্যক্তিগত ভালবাসা সামাজিক অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে ভালবাসার জন্য ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে লড়াইয়ে নামিতে হয়। সমাজের ব্যবহারিক শক্তি স্বভাবতঃই বেশি, এই সংঘর্ষের ফলে ব্যক্তি-চরিত্রের উজ্জ্বলতা স্ফুরিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমিক-প্রেমিকাকে নামিয়া আসিতে হয় দুঃখের কঠিন পথে। সমাজ-সংস্কার সুদৃঢ় বলিয়া বাঙালীর জীবনে এই লড়াই আশানুরূপ জোর পায় না। তাছাড়া, আগেই যে কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের আবেগোচ্ছ্বাস বাঙালীর স্তিমিত জীবনে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে না বলিয়াও সমাজের অনুমোদনহীন প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি অধিকাংশস্থলেই নিরুৎসাহ হইয়া

পড়ছে, কাল Air forceএ কাজ নিয়ে দূরদেশে উড়ে যাচ্ছে পরশু ক্যানাডায় জমি লীজ নিয়ে চাষ করছে। তার পরদিন নভেল লিখছে। চারদিন চাররকম নারীর সঙ্গে পরিচয়। তারা জলজ্যান্ত নারীই।"

পড়ে। এ অবস্থায় অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তির পরাজয় ঘটিলেও তাহাতে ট্র্যাজেডির মহিমা কদাচিৎ থাকে।

তবু এই দুর্বল বাঙালী জীবন এবং সেই বাঙালী জীবনের শান্তগতি প্রেম লইয়া শরৎচন্দ্র আপন প্রতিভা-বলেই স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাঙালী, বাঙালী সমাজের মানুষ, বাঙালী জীবনই তাঁহার সাহিত্যের উপজীব্য। তাই বাঙালী জীবনে মহিমা দুর্বলতা যাই থাক, তাহা হইতেই উপাদান গ্রহণ করিয়া শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়াই এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবন-নির্ভরতা ব্যতীত তাঁহার পথ ছিল না।

সমগ্রভাবে প্রীতিই শরৎ-সাহিত্যের মূল উপকরণ। নরনারীর ভালবাসা অথবা জৈব-প্রেম ছাড়া স্নেহ, মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অবলম্বন করিয়াও শরৎচন্দ্র অনেক চমৎকার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্তিতে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে প্রেমে সৌরভও আছে, কাঁটাও আছে। ইহা বিশ্ব-সাহিত্যেরও প্রধান অবলম্বন, শরৎ-সাহিত্যেরও ইহা প্রধান উপাদান। কিন্তু হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তিগুলির, বিশেষ করিয়া কোমল বৃত্তিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শরৎচন্দ্র অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন। যে নারী মাতৃত্বের স্বাদ পাইয়াছে সে নিজের ছেলেকে অথবা পরের ছেলেকে একান্ত ভালবাসে; যে নারী মা হয় নাই বা হইতে পারে নাই, প্রবল অপত্যস্নেহে অন্যের ছেলের জন্য সে ব্যাকুল হয়; ভাই ভাইয়ের প্রতি, বন্ধু বন্ধুর প্রতি ভালবাসায় উদ্বেল; নিপীড়িত মানুষের জন্য বা সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সমাজ-সেবী, পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য দেশপ্রেমিক দুঃসহ দুঃখভার ও কঠিন কর্তব্যের বোঝা হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লয়;—এসব ছবি শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ নয়।

ঔপন্যাসিক বাস্তব-ধর্মী এবং বাস্তব-ধর্মী হইলেই প্রচলিত হীনতা-দীনতার গ্লানি ও সমস্যার অভিজ্ঞতায় তাঁহার মানবতাবাদী হওয়া স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিক সমাজ-সচেতন। উপন্যাস আধুনিক কালের সাহিত্য। সমাজ ও সামাজিক মানুষের কথাই উপন্যাসে প্রধানতঃ বলা হইয়া থাকে। মধ্যযুগের ধর্ম-আকুতি, দৈব-নির্ভরতা, কল্পনাবৃত্তি অতিক্রম করিয়া আধুনিক পৃথিবীর বিচিত্র ও জটিল বাস্তবরূপ এবং সেই বাস্তব পৃথিবীর সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের ব্যক্তিত্ব উপন্যাসে রূপায়িত হয়। এই সমস্যাক্লিষ্ট মানুষ সামাজিক মানুষ, সমাজকে

সে ভালোবাসে, সমাজের উপর সে নির্ভর করে, সমাজের অবহেলায় সে ব্যথা বোধ করে, সমাজের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সমাজের সঙ্গে সে লড়াইও করে। তাছাড়া তাহার নিজের ভিতরকার বিভিন্ন বৃত্তির দ্বন্দ্বেও তাহার চরিত্রের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত হয়। কাজেই উপন্যাসে বাস্তব সমস্যাই বড় কথা। সামাজিক মানুষ হিসাবে উপন্যাসের চরিত্র জগৎ ও জীবনের যে সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ায়, তাহাদের পরিচয় দান, এবং সম্ভব হইলে সেই সমস্যাগুলির মীমাংসার ইঙ্গিতদানও ঔপন্যাসিকের কাজ। অবশ্য কোন কোন ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি বহুসংখ্যক সমস্যার উপর নিবদ্ধ হয়, নানা বিচিত্র সমস্যার প্রতিফলন এবং সমাধানের প্রয়াস তাঁহাদের সাহিত্য-কৃতিতে দেখা যায়, আবার কেহ কেহ বিশেষ কোন কোন সমস্যা বাছিয়া লন। এই সমস্যা স্বভাবতই ঔপন্যাসিকের সমকালীন বা একান্ত ভাবে উপলব্ধি করা সমস্যা ; কারণ তিনি যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা করেন, তাহা অপরিচয়ের বস্তু হইতে পারে না। যাহা তিনি নিজে দেখিয়াছেন বা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই তাঁহার অভিজ্ঞতা। রোমান্সের কল্পনা-রঙীন দূরচারী রূপ আনন্দ দিতে পারে, উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ইহা লেখকের সমাজচেতনার সার্থক আশ্রয় নয়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা-উপন্যাসজগতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কল্পনার উপর অধিক নির্ভর করিয়া দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা রচনা করেন, কিন্তু ক্রমেই সমাজের নানা সমস্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসে এবং জীবনের বাস্তব রূপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এইসব সমস্যার প্রতিফলনের দিকে তিনি মন দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানস পরিবর্তনের ফল তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলি এবং প্রবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যক্তিগত রচনাগুলি। অবশ্য অধিকতর কল্পনা-নির্ভর হইলেও বঙ্কিম যে উপরোক্ত রোমান্স দুইখানিতে মানবমনের সমস্যা কিছুই আনেন নাই তাহা নহে। দুর্গেশনন্দিনীতে প্রেমের অবাধ অধিকারের প্রশ্নের এবং কপালকুণ্ডলায় মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত প্রশ্নের সামাজিক দিকও অবশ্যই আছে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলিকে সমাজ-সংশ্লেষের জটিলতা-কণ্টকিত না করিয়া বলিতে গেলে ভাব-তত্ত্বের দিক দিয়াই উজ্জ্বল করিয়া রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে কপালকুণ্ডলার মত ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া চন্দ্রশেখরের কাহিনী রচনা করিলেও এই উপন্যাসখানিতে বাংলাদেশের সমকালীন

রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, নারীপ্রেমের গভীরতা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছবি, সর্বোপরি ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতার যে চিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, তাহাদের বাস্তব মূল্য অনবধানী পাঠকও অনুভব না করিয়া পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুইখানি উন্নত ধরণের সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ব্যক্তিগত রূপমোহ ও প্রেমের সহিত সামাজিক বিধানের সংঘর্ষের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে সমকালীন সমাজের সমস্যার অভিজ্ঞতায় লেখা। শেষদিকে অবশ্য এই মহান্ ঔপন্যাসিক অধিকতর নীতিপ্রবণ ও জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিয়া ইতিহাসের আশ্রয়ে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পটভূমিকায় কল্পনার সাহায্যে লেখা কাহিনীর দ্বারা আদর্শ প্রচারের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তবু এই দূরচারিতা সত্ত্বেও রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিম এমন কোন কোন সমস্যার অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যেগুলি তাঁহার আপন কালের স্বদেশ ও স্বসমাজের গুরুতর সমস্যা। উপন্যাস বহু পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, উপন্যাসের মাধ্যমে তাই সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক আপন বক্তব্য রাখিতে পারেন।

সমাজ ও সমাজের মানুষের কথা লইয়া সামাজিক উপন্যাস লিখিত হয়; কাজেই সামাজিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁহার সমাজকে জানিবার ও চিনিবার এবং সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্কের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন আলোচনা না করিলেও চলিবে। উপন্যাসে ব্যক্তির বা চরিত্রের উপর খুবই জোর পড়ে। এই ব্যক্তির সমাজবোধ, সমাজের সহিত তাহার হৃদয়ের সংযোগ, তাঁহার মনের ও জীবনের উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া,—সামাজিক উপন্যাসকারকে এইসব অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হয় এবং এজন্য তাঁহাকে সামাজিক মানুষের প্রকৃতি ছাড়াও সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সামাজিক মানুষের সম্পর্কে সমাজের ভূমিকা সাবধানতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। এই সূত্রে বর্তমানের সমস্যা অনুধাবনে সমস্যার মূল অনুসন্ধানের অথবা অতীত-ইতিহাস বিশ্লেষণের আবশ্যকতাও কম নয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণের ফলে লেখকের বিশেষ ভাবদৃষ্টি গড়িয়া উঠে। উপন্যাসে গল্প, চরিত্র, কাহিনী বা প্লট, ভাষা ও রচনারীতির গুরুত্ব যেরূপ, লেখকের এই ভাবদৃষ্টির গুরুত্ব তদপেক্ষা কম নয়। এই ভাবদৃষ্টিই অনেক সময় ঔপন্যাসিককে সাময়িক উত্তেজনার হাত হইতে বাঁচায়, তাঁহাকে

ঝড়ের মুখে সামাল দিয়া অপেক্ষাকৃত সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ দেয়। বস্তুতঃ যদি সাময়িক এক বহিরঙ্গ ভাবোচ্ছ্বাসের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং লেখক তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়া উপলব্ধি করেন যে, এই বাহিরের উচ্ছ্বাস কালের প্রবাহে অবশ্যই ভাসিয়া যাইবে, তাহা হইলে তাঁহার ভাবদৃষ্টির সায় না থাকিলে তিনি ব্যক্তিমনের কাছে সমাজের দাবীর প্রশ্নে অথবা সমাজের কাছে ব্যক্তিমনের দাবীর প্রশ্নে অনেক সময় সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রের উত্তেজনা হইতে সংযমের সহিত নিজেকে সরাইয়া রাখিয়া আপন ভাবদৃষ্টির মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান্ হন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক-রচয়িতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সংসারে অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি তোষামদী কথায় সংসারকে তুষ্ট করিতে পারিবেন না।" (সমালোচনা সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তম সংস্করণ, 'নাট্যকার' প্রবন্ধ।) উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরও ইহাই বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা আনন্দের জন্য আনন্দ বা 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতের গোঁড়া সমর্থক তাঁহাদের কাছে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের এই জীবনবোধ সমালোচিত হইতে পারে, কিন্তু ধ্রুবতার সঙ্গে কল্যাণের সমন্বয়ে বা সত্য ও শিবের সমন্বয়ে সাহিত্যের সুন্দর-রূপের সংজ্ঞা এই ভাবদৃষ্টি বা জীবনবোধের অবশ্যই অপেক্ষা রাখে। এই হিসাবে মহান রুশ কথাসাহিত্যিক ডস্টয়ভ্স্কির কথা উল্লেখ করা যায়। সমালোচক ই. এম. ফর্স্টার এক জায়গায় বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়টের সহিত ডস্টয়ভ্স্কির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, জর্জ এলিয়ট বর্ণনাকারী, কিন্তু ডস্টয়ভ্স্কি ভবিষ্যদ্বক্তা।* ইহার অর্থ ডস্টয়ভ্স্কির মহান্ ভাবদৃষ্টি বা জীবনবোধ ছিল, তিনি বর্ণনীয় বর্তমানের সীমান্তেই আত্মহারা হইতেন না। বাংলা কথাসাহিত্যে ডস্টয়ভ্স্কির মত মহৎ ঔপন্যাসিকের

*জর্জ এলিয়টের উপন্যাস Adam Bedeর Hetty এবং ডস্টয়ভ্স্কির The Brothers Karamazov-এর Mitya দুজনেই হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। তাহাদের মনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উভয় লেখকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফর্স্টার মন্তব্য করিয়াছেন: "Now the difference between these passages is that the first writer is a preacher, and the second a prophet."—(E. M. Forster, *Aspects of the Novel*, Penguin Edition, 1962; page 136.)

আবির্ভাব হয় নাই; বিষয়বস্তু ও শিল্পকলার দিক হইতেও বাংলা কথাসাহিত্য এখনও দুর্বল, তবু সৌভাগ্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—বাংলা কথাসাহিত্যের তিনজন প্রধানের মধ্যেই উল্লিখিত নিজস্ব ভাবদৃষ্টি থাকায় তাঁহাদের সাহিত্যকৃতির গৌরব উপস্থাপিত সাহিত্য-রূপকে ছাপাইয়া গিয়াছে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বিদগ্ধ সাহিত্যিক, শরৎচন্দ্রের মত সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্পন্ন লেখকের মধ্যেও যে এই ভাবদৃষ্টির সমাবেশ ঘটিয়াছে ইহা সত্যই আনন্দের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ইংরেজদের অনুকরণ করিবার অত্যুৎসাহ বাঙালীর সমাজজীবনে বড় রকম ফাটল ধরাইতেছিল। ইংরেজ-জীবনের বহিরঙ্গের চাকচিক্য মুগ্ধ করিয়াছিল অনেক বঙ্গসন্তানকে। 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ, সত্যানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি যে সব মহৎ গুণ ইংরেজদের নিকট হইতে ভারতীয়রা লাভ করিয়াছে বলিয়াছেন, এই বহিরঙ্গ চাকচিক্যের সহিত সে সব গুণের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা শুধু জীবনযাপনে বিলাসিতার ও নৈতিকতার শ্লথতার দিক। শৃঙ্খলা ও নীতিশিক্ষার আগড় দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমাজদেহকে এদিক হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এইভাবে সমাজের ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা বঙ্কিম-সাহিত্যে সমাজের অনুমোদিত প্রেম বা জৈবিক কামনার চিত্রগুলিতেই সর্বাধিক দেখা যায়। সে সময় ভারতে প্রবাসী ইংরেজদের জীবনে অর্থোপার্জনের উগ্র আকাঙ্ক্ষার সহিত বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল, মেলামেশার ফলে এই ইংরেজদের প্রভাব বাঙালী সমাজে অল্পবিস্তর পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলায় যে সামান্য সংখ্যক নাটক-গল্প-উপন্যাস লেখা হইয়াছিল, সেইগুলিতে সমাজের অনুমোদিত নরনারীর প্রেম সম্পর্কে সীমাবদ্ধ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিমান্ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই পছন্দ হয় নাই, হইলে বোধহয় তিনি বিধবা রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর মনের ক্ষুধাকে অতখানি তীক্ষ্ণতার সহিত চিত্রিত করিতেন না। কিন্তু ইহাদের অসামাজিক প্রেমকে বিস্তারিত ভাবে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করিলে সমকালীন ইংরেজিয়ানার দাপটে চঞ্চল বাংলার সামাজিক মানুষের মনে ইহা উত্তেজক প্রভাব বিস্তার করিয়া সমগ্রভাবে সমাজের শৃঙ্খলা ও মান বিনষ্ট করিবে, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় বঙ্কিম এইরূপ সমাজনীতি-বিগর্হিত প্রেমের পরিবেশ সংযত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন এবং ইহার পরিণতি অঙ্কনে আবেগের চেয়ে বিচক্ষণতার উপর

অধিক নির্ভর করিয়াছেন। শিল্পকলার তুলনায় সমাজরক্ষার দায়িত্বকে বঙ্কিম এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। অসামাজিক প্রেমের ব্যাপারেই তিনি এই সংযম দেখান নাই, বঙ্কিম মানবধর্মী সুস্থ সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জৈবিক কামনার আতিশয্যকেও ধিক্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এই মহান্ সাহিত্যিক নারীকে পরাধীন রাখার, সতীত্বরক্ষার নামে নারীকে অসহায়ভাবে অন্তঃপুরচারিণী রাখিয়া পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল করার, সামাজিক বিধি-বিধানের নিগড়ে মেয়েদের সমগ্র সত্তাকে নিষ্পেষিত করার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এছাড়া দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অভাব, ক্ষুদ্রতা-হীনতার দৈন্য, দরিদ্র ও অসহায়দের অন্যায় শোষণ, সমগ্রভাবে জাতীয় জীবনে জড়তা তাঁহার দ্বারা বারবার নিন্দিত হইয়াছে। বাস্তবিক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বিধবা রোহিণীর হৃদয়াকাঙ্ক্ষা বর্ণনায়, 'বিষবৃক্ষ'-এ বিধবা কুন্দনন্দিনীর সস্নিগ্ধ চিত্রণে, 'ইন্দিরা'য়-দস্যু-অপহৃতা ইন্দিরাকে বহুকাল অজ্ঞাতবাসের পরও স্বামীর সহিত মর্যাদার সঙ্গে মিলিত করায়, দেবী চৌধুরাণীকে বাহিরের কর্মচঞ্চল জীবনে শৌর্য ও সাফল্যের স্বর্ণমুকুট পরাইয়া আবার তাহাকে সংসারের শান্তিনীড়ে বধূরূপে ফিরাইয়া আনায়, 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনীকে প্রতাপের সহিত মিলিত হইবার কঠিন সংকল্পে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত করাইয়াও প্রতাপের মরণান্তে পুনরায় ব্রাহ্মণ স্বামী চন্দ্রশেখরের গৃহে স্থান দেওয়ায়, বীরেন্দ্রসিংহের অসামাজিক বিবাহের স্ত্রী বিমলাকে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মর্যাদা দেওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধান পুনর্মূল্যায়নের একটা আগ্রহ নিঃসন্দেহে সূচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র অসামাজিক প্রেমচিত্র তুলনায় অনেক বিস্তারিত এবং জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন, অনেকস্থলে অঙ্কনের নিষ্ঠায় ও লালিত্যে এই প্রেমের হৃদয়-সঙ্গতির ক্ষেত্রে তাঁহার সহানুভূতির ছাপও যেন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এইরূপ প্রেমের পরিণতি অঙ্কনে তিনিও ইহার সাফল্য আঁকিয়াছেন কমক্ষেত্রেই, বরং বলিতে পারা যায় অধিকাংশক্ষেত্রে দুঃখময় পরিণতি আঁকিয়া সমাজ-চেতনার এই দিক হইতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সগোত্র হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখিয়াছেন তাঁহার সমকালে সমাজের শক্তি ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি এবং সমাজ অভ্যস্ত প্রচলিত পথে চলিতে চাহে বলিয়া ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজের অনমুমোদন বা অপ্রসন্নতায় নিষ্পেষিত হইয়া যায়। যে প্রেমে সমাজের অনুমোদন নাই, সেই প্রেমের সাফল্য

শরৎচন্দ্রের চোখে বড় একটা পড়ে নাই। জীবনের অভিজ্ঞতাহীন সাহিত্য-সৃষ্টিতে আগ্রহ না থাকায় এইরূপ প্রেমের ব্যর্থতার ছবিই তিনি আঁকিয়াছেন। তবু এই শোচনীয় পরিণতি অঙ্কনের প্রবণতা সত্ত্বেও অসামাজিক প্রেম-চিত্রগুলিতে হৃদয়ভাবের মাধুর্যময় বিশদ বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এবং তাঁহার শিল্পিমনের স্পর্শেই চিত্রগুলি ইংরেজি পরিভাষায় বলিতে গেলে 'প্যাথেটিক' না হইয়া 'ট্র্যাজিক' হইয়াছে। ফলে বেদনার্ত-পরিণতি সত্ত্বেও শরৎ-সাহিত্যের নায়িকাদের বর্তমান করুণ জীবনচিত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই স্পন্দিত হইয়াছে। এছাড়া শরৎচন্দ্র সমাজের বহুবিধ সমস্যা সততা ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার লেখায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং দুর্নীতি ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। দেশাত্মবোধের প্রকাশে, সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদে, দরিদ্র ও শোষিতদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবীতে, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, সমাজে অবহেলিতা ও নিগৃহীতা মেয়েদের বাঁচাইবার আগ্রহে, মানুষকে তাহার আংশিক হীনতা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবার এবং তাহার মধ্যে নিহিত মহৎ সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করিবার সাধনায় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সাহস, নিষ্ঠা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই ভূমিকায় তাঁহার সচেতনতা ও সক্রিয়তা প্রায়ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপরি-উল্লিখিত সচেতনতা ও সক্রিয়তার চেয়ে বেশী।

শরৎচন্দ্র একটু বেশীবয়সে প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার উপন্যাস 'বড়দিদি' ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল ; ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সময়কার বাংলার সমাজ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তৎপরবর্তী স্বদেশী আন্দোলন এবং তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই আলোড়ন বাংলার সমাজদেহে গুরুতর পরিবর্তন আনিতে পারে নাই, তবে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বাংলার সমাজ-মানসে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই পরিবর্তন-আবেগ অধিক দানা বাঁধে। এই আলোড়নের ফলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাংলার মুসলমান সমাজেও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। চিরকাল চলিতেছে বলিয়াই প্রচলিত সবকিছু কল্যাণপ্রদ নয় ; মানুষের জন্য

সমাজ, তাই মানুষের প্রয়োজনে সমাজের বিধান পালটাইতে হইবে, এই ধরণের দাবী সূক্ষ্মভাবে তৎকালীন বাঙালীর মনে জাগিয়াছিল। গ্রামীণ বাংলা সমাজে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল এবং তাহাদের উপর অতীত-সংস্কারের প্রভাব ছিল খুবই বেশী। এই গ্রাম্যসমাজে যুগোপযোগী পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান না হইলেও শিক্ষিত সমাজ-সচেতন বাঙালী সে সম্পর্কে মনে মনে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের মত সমাজ-চেতনাসম্পন্ন লেখকের এই আগ্রহ স্বাভাবিক। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড ঘোষণার ফলে ভারতে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যুদ্ধের পর স্বাধীনতালাভের আশাভঙ্গের বেদনায় তথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তা সম্পর্কে মোহভঙ্গের হতাশায় সংগ্রামী উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠে। ইহার পরিণতি আসমুদ্র-হিমাচল সারা ভারতে জন-জাগরণ এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত বিরাট অসহযোগ আন্দোলন। বলা বাহুল্য,এই বিপুল ভাবপ্রবাহ বাঙালীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করিয়া এই শুভ উদ্দেশ্যে তাহাদের সর্বস্ব ত্যাগে অনুপ্রাণিত করা ছাড়াও তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ও সামাজিক বোধে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই পটভূমিতে শরৎচন্দ্র যেভাবে সমাজকে দেখিবার ও দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাহা পান নাই।

শরৎচন্দ্র সমাজনীতি-বিরুদ্ধ প্রেমের চিত্রায়ণে ব্যক্তি-মানুষের হৃদয়-ধর্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। দৈহিক কামনার জন্য নয়, মনের একান্ত অনুরাগে যে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালবাসে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সে ভালবাসার গৌরব নিত্যনিয়ত অনুভব করে, তাহার প্রতি শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এই প্রেমের হয়তো মিলনাত্মক পরিণতি ঘটে নাই, হয়তো ভালবাসার দাম দিতে প্রেমিক-প্রেমিকাকে বহু দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু লেখকের দরদী হৃদয়ের স্পর্শে এই প্রেমচিত্র উজ্জ্বল। সমকালীন সামাজিক অবস্থায় এক্ষেত্রে সমাজ জিতিয়া যায়, শরৎসাহিত্যেও ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে সমাজই প্রায়ক্ষেত্রে জিতিয়াছে। কিন্তু তবু মানুষের

ভালবাসা যদি আন্তরিক হয়, সেক্ষেত্রে তাহার অমলিন মনোধর্ম অবহেলা করিয়া যে সমাজনীতি প্রচলিত আছে বলিয়াই পরিবর্তনের প্রয়োজন উপেক্ষা করে এবং আপন মর্যাদা ও অধিকারের চিরস্থায়িত্ব দাবী করে, শরৎসাহিত্যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে বিস্তর।) তাছাড়া আগেই যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, নারীর প্রেম ব্যতীত অন্যান্য নানা সমস্যার ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের চোখে সমাজের অনেক ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য এইসঙ্গে একথাও ঠিক যে, বহু-শতাব্দীব্যাপী যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত হইয়াছে, য়াহা তাহাদের সামাজিক জীবনের গতি-প্রকৃতির সহিত দীর্ঘকাল মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি শরৎচন্দ্রের একধরণের মমতাও ছিল। কতকগুলি সামাজিক বিধান মানবতা-বিরোধী মনে হওয়ায় শরৎচন্দ্র সেগুলির পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 'পরিবর্তন মাত্রেই কল্যাণবাহী'—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যাহারা সমাজকে সবদিক হইতে ভাঙিয়া চুরিয়া পালটাইয়া দিবার কথা ভাবে, শরৎচন্দ্র সেই ধরণের ভাঙনশিল্পী (Iconoclast) ছিলেন না। সর্বাত্মক ভাঙনের এই আগ্রহের পরিবর্তে, বরং এক হিসাবে বলা যায়, শরৎচন্দ্র সমাজের সুসংস্কৃত যুগোপযোগী রূপই চাহিয়াছিলেন। নৈষ্টিক কথাশিল্পী হিসাবে মানুষের স্বাভাবিক সমাজবিরুদ্ধ মনের ছবি আঁকিলেও এবং মানবতাবোধে ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগে দরদের সহিত সেই ছবি রূপায়িত করিলেও এইজন্যই তিনি কাহিনীর পরিণতিতে কোন কোন সময় দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই; এমনও হইয়াছে যে, কাহিনীর পরিণতির স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিয়া তিনি একরূপ জোড়াতালি দিয়াই লেখা শেষ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুজনে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও এবং দুজনে দুজনকে ভালবাসা সত্ত্বেও কুলমর্যাদার সামান্য তফাৎ থাকায় 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর এবং 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশ ও রমার বিবাহ হয় নাই, উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর বেদনাময় জীবনের ছবি দরদের সহিত আঁকিয়া শরৎচন্দ্র এই সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ভালবাসার পাথেয় সম্বল করিয়া তাঁহার দেবদাস-পার্বতী বা রমেশ-রমা সংসারসমুদ্রে ভাসিয়া পড়িতে পারে নাই, শরৎচন্দ্র ভাঙনধর্মী হইলে কলমের খোঁচায় যাহা অনায়াসেই হইতে পারিত। (শরৎচন্দ্রের সমাজবোধের জন্যই দেবদাস পার্বতীর শ্বশুরালয়ের বাহিরে রাস্তায় অজ্ঞাত পথিকরূপে শোচনীয় ভাবে মরিতে বাধ্য হইয়াছে, শেষসময়ে পার্বতীর হাতের সেবা লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্বে

পার্বতীকে দেওয়া কথা রাখিতে সে পার্বতীর শ্বশুরালয়ে গিয়া পৌঁছাইলেও অন্তিমকালে পার্বতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎটুকুও হইল না।) 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রমাকে রমেশের সহিত এক গ্রামে কাছাকাছি রাখিতেও পারেন নাই, তাহাদের ভালবাসার উত্তাপ নৈকট্যের সুযোগ পাইলে হয়তো সংস্কারের অর্গল গলাইয়া দিবে, এই ছিল বাস্তববোধী শরৎচন্দ্রের ভয়। এইজন্যই তিনি গ্রন্থশেষে রমাকে রমেশের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' বিধবা কুন্দনন্দিনীকে দ্বিতীয় স্বামী নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে সরাইবার আর কোন পথ না পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বিষপান করাইয়া আত্মহত্যা করাইয়াছেন, চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ বিধবা প্রেমিকা বিনোদিনীকে বেহারীর নিকট হইতে সরাইবার জন্য তাহার মধ্যে শেষ মুহূর্তে প্রবল নীতিবোধ জাগ্রত করিয়া তাহার কাশী যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্রও একইভাবে রমাকে রমেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘটনা তিনটিতে তত্ত্বের ব্যবধান বিশেষ নাই, যদিও কালের ব্যবধান যথেষ্ট। অর্থাৎ, এক কথায় বলিতে গেলে বিধবার প্রেম সম্পর্কে বঙ্কিমের সময় হইতে শরৎচন্দ্রের সময় পর্যন্ত বাঙালীর সমাজসংস্কারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এই উপন্যাসটির পরিণতিতেও সুরেশের মৃত্যু ঘটাইয়া শরৎচন্দ্র যেভাবে অচলাকে স্বামী মহিমের মুখোমুখি আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতেও শরৎচন্দ্রের উপর-উল্লিখিত বিশেষ ধরণের সমাজ-চেতনার কার্যকরিতা লক্ষ্য করা যায়, যদিও শিল্পকলা বা আর্টের দিক হইতে ইহাতে এক অতি জটিল ত্রিকোণ প্রেম-সমস্যার অপেক্ষাকৃত সুলভ সমাধান হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

নরনারীর হৃদয়ের ছবি আঁকিতে গিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই জৈব প্রেমকে রূপায়িত করিয়াছেন। প্রেমের অস্তিত্ব অধিকাংশ মানুষের জীবনে সত্য হওয়ায় জীবনের ছবিতে প্রেমের ছবি স্বাভাবিকভাবেই স্থানলাভ করে। এই প্রেম হৃদয়ের গোপন প্রদেশে বাসনা ও ভাব-কল্পনার নিজস্ব লোকে লালিত হইয়া স্পর্শনক্ষম রূপ পায় বলিয়া তাহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বা অস্তিত্বের সঙ্গে বহিরঙ্গ শৃঙ্খলাভিত্তিক সামাজিক নীতিবাদের সামঞ্জস্য অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক জীবনশিল্পী, কাহিনী রচনা করিতে বসিয়া মনের এই অন্তরঙ্গ দিকটি তিনি যত্ন করিয়া আঁকেন। এই

অধনে তাঁহার নিষ্ঠাই বড কথা, জীবনে ঘটে বলিয়া এবং জীবনপথে ইহার গুরুত্ব আছে বলিয়া ঔপন্যাসিক এই প্রেমচিত্র সুন্দর করিয়া ফোটান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ প্রেম সমর্থন না করিতে পারেন, কিন্তু সে কথা স্পষ্টভাবে তিনি বলেন না, অঙ্কিত প্রেমচিত্রের ফলশ্রুতিতে তাঁহার ভাবদৃষ্টি অনুভূত হয়। এইভাবে সুন্দর করিয়া ছবি ফোটানো অথচ সূক্ষ্মভাবে বক্তব্য রাখা,—এই দ্বিবিধ কর্তব্য শিল্পকলায় নিষ্পন্ন হয়।* মোটের উপর প্রেমের মত জটিল বিচিত্রগতি ভাবের বিন্যাস এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বৃত্তি, সংস্কার ও ঘটনার সহিত তাহার সংঘাত মানুষের সমগ্র মনটি বা সমগ্র মানুষটি ফুটিয়া উঠিলে তবেই ভালভাবে ফুটিতে পারে। এইরূপ গোটা চরিত্রই, ইংরাজীতে যাহাকে Round character বলে, উপন্যাসের চরিত্র। এইরূপ চরিত্র এবং তাহার সঙ্গে সুসংবদ্ধ কাহিনী উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসে থাকে। বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান উপরোক্ত গোটা চরিত্রের উপর গুরুত্ব দেন। বঙ্কিমচন্দ্র নানা অসুবিধায় এই উপাদানটি ভাল ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলেও তাঁহার পর রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের হাতে এই উপাদান ক্রমেই বাংলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙালী জীবনের সীমাবদ্ধ চলমানতা এবং বৈচিত্র্য স্মরণে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির সাফল্য স্বীকার করিতেই হইবে।

---

* বার্নাড শ'র শিল্পকলা আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত শিল্পকলা বা আর্ট সম্পর্কে বলিয়াছেন: "Art has a twofold significance, it creates pictures, and it teaches moral lessons about life. It not only images characters but also gives a philosophy. This, however, is a most unorthodox view of art, because the most widely accepted opinion of modern times is that it is immoral, and that it is only revolutionaries like Shaw and Chesterton who hold that a work of art must not only have a fable but that the fable must also have a meaning. When Tolstoy first enunciated the doctrine of morality of art, he was not taken seriously by the so-called art critics."—(The Art of Bernard Shaw, 1936, page—67.)

শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা প্রবল মানবতাবোধের সহিত জড়িত। মানুষকে শরৎচন্দ্র মানুষ হিসাবেই দেখিতেন এবং মানুষ হিসাবেই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষ আসলে ভাল, সমগ্রভাবে ভাল। পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায়, শিক্ষা বা পরিবেশের সুযোগের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু একেবারে সব দিক দিয়া মানুষ কখনই নষ্ট হয় না। তবে আপাত দৃষ্টিতে মানুষের যে হীনতা পরিলক্ষিত হয়, সমগ্র জীবন বা চরিত্রের হিসাবে তাহা যত আংশিকই হউক, সেই দৈন্যকে অনেকে বড় করিয়া দেখে, সমাজের প্রচলিত বিধিবিধানে অভ্যস্ত অনেকেই এই বিশেষ মানুষের বিশেষ দুর্বলতাকে ক্ষমা করিতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে বিচার করিবার উদারতা সমাজে অনেকেরই নাই, তাহারা বিশেষ দুর্বলতা বা হীনতার দ্বারাই সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে চিহ্নিত করিয়া তাহাকে সমালোচনায়, ঘৃণায়, আঘাতে জর্জরিত করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ চরিত্রের হিসাবে দোষত্রুটি একাংশমাত্র হইলেও তাহার জন্যই কোণঠাসা হইয়া হতভাগ্য মানুষটি ক্রমে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাঁচিবার তাগিদে, জিদের বশে, বা হীনতাবোধের জন্য,—যে কারণেই হউক, সুবিধা থাকিলে এই ব্যক্তি আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী আপন পথ ঠিক করিয়া লয়, আর সে সুবিধা না থাকিলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়। মোটের উপর, সমাজ তাহাকে না চাহিলে অধিকতর অন্ধকারের দিকে নামিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিতে চান এই ব্যক্তি যত ছোট হউক, ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি-সম্ভাবনা তাহার আছেই, আর যদিই বা মুক্তি-সম্ভাবনা পরিবেশের প্রতিকূলতায় সুকঠিন হয়, তাহার সামগ্রিক ঐশ্বর্য হইতে যে কোন অবস্থাতেই সে একেবারে রিক্ত হইয়া পড়িতে পারে না। মানবতামূলক এই প্রত্যয়ের জন্যই শরৎচন্দ্র মানুষের হীনতা হইতে আত্মোদ্ধারের, অথবা হীনতার মধ্যেই তাহার অপ্রকাশিত হৃদয়-মহিমা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। 'মানুষকে জানার আগ্রহই এক উদার শিক্ষা'—এই নীতি-বাক্য শরৎ-মানসে সব সময় সক্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবেশে শৈশব হইতে মধ্য যৌবন পর্যন্ত কাটাইবার ফলে এবং স্বদেশে ও বিদেশে অপেক্ষাকৃত তলার শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে বাধ্য হইয়া বসবাস করিবার ও জীবন-সংগ্রাম চালাইবার জন্য তাঁহার সংবেদনশীল মন সমাজে অসাম্যের গ্লানি ও ইহার বিপরীতে

৮-৮৮০

আপাতহীনতার অভ্যন্তরে মহিমারশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিল। এইভাবে সমাজে যাহারা অপাংক্তেয়, বঞ্চনাক্লিষ্ট, ভ্রষ্ট যাহাদের জীবন, তাহারা শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, শরৎচন্দ্র হীনতাকে হীনতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না; বরং হীনতাকে হীনতারূপেই তিনি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ এইরূপ হীন হয় বিরুদ্ধ পরিবেশের জন্য, পরিবেশ অনুকূল হইলে তাহার মুক্তির সমূহ সম্ভাবনা থাকে। 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস মাতাল হইয়াছে, পতিতা পল্লীতে তাহাকে দেখা যায়, দেবদাসের মত ভদ্রসন্তানের এ অধঃপতন যে কিরূপ গ্লানিময় তাহা শরৎচন্দ্র খোলাখুলিই দেখাইয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসের এই মাতাল হওয়ার পিছনে যে দুঃখের ইতিহাস আছে তাহা দরদের সহিত বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র, পরিবেশের আনুকূল্য পাইলে সে যে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারিত, তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রথম দিকে জীবানন্দকে মাতাল, চরিত্রহীন ও নিষ্ঠুর করিয়া আঁকা হইয়াছে। প্রথম সাক্ষাতে জীবানন্দ পাঠকমনে ঘৃণাই জাগায়; কিন্তু উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, অবলম্বনহীন নিঃসঙ্গ জীবানন্দের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুস্থ ভদ্র জীবন যাপনের অনুকূল ছিল না, ষোড়শী অলকা-রূপে যখন তাহার হৃদয়ে ভালবাসার স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল, জীবানন্দের জীবন হইতে গ্লানিময় অন্ধকার আপনি ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়া গেল।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন "পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড।"* এই মনুষ্যত্বপ্রীতি মানবতাবোধ-সঞ্জাত সন্দেহ নাই,

* শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীকান্তর নিরুদিদি মানবিক-গুণসমৃদ্ধা কিন্তু চরিত্র-স্খলনের অপরাধে সে সমাজে নিষ্করুণ ভাবে লাঞ্ছিতা হইয়াছে। শ্রীকান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরুদিদির জন্য গভীর বেদনা বোধ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৪১) উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও শরৎচন্দ্রের এই মানবিক বেদনাবোধ লক্ষ্য করা যায়। তখন শরৎচন্দ্র ছেলে-মানুষ, পাড়ায় এক বালবিধবা একা থাকেন, তাঁহাকে তিনি দিদি বলেন, অত্যন্ত পরোপকারী ভালো মেয়ে। ছেলেমানুষীর ঝোঁকে তিনি একদিন সন্ধ্যার পর

ইহার পিছনে রহিয়াছে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। এই মনুষ্যপ্রীতির প্রেরণায় শরৎচন্দ্র সমাজের অনুমোদন-নিরপেক্ষভাবে অনেক উজ্জ্বল নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নারীর স্বামী-সংস্কার সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনে একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি প্রচলিত মূল্যবোধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিবার মত বিদ্রোহী লেখক ছিলেন না, সেইজন্য তাহার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বকে সতীত্বের চেয়ে বড় করিয়া দেখিবার ভাবদৃষ্টি সত্ত্বেও স্বামীর সহিত স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন অথচ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব-গৌরবে উজ্জ্বল স্ত্রী-চরিত্র তিনি বেশি আঁকেন নাই। অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়ে' 'সবিতা' চরিত্রটি অসতীত্ব সত্ত্বেও কিছুটা মনুষ্যত্বসমৃদ্ধ। কিন্তু স্বামী ব্রজবাবুকে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল উপপতি রমণী বাবুর সহিত বসবাস করিয়াও সবিতার স্বামী-সংস্কার লোপ পায় নাই এবং ব্রজবাবুর কাছে ফিরিবার জন্য সে কাঙ্গালপনা করিয়াছে। অবশ্য শরৎসাহিত্যে মনুষ্যত্বের সহিত সতীত্বের সংঘর্ষের মুখোমুখি যে মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহাকে জিতাইয়া দিতে না পারিলেও তাহার সংগ্রামী সত্তাকে বিশেষ সহানুভূতির সহিতই ফুটাইয়াছেন। 'শেষপ্রশ্নে'র কমল ইহার একটি দৃষ্টান্ত। কমল স্বামী শিবনাথকে ছাড়িয়াছে শিবনাথকেই সুখী করিতে, সতীত্ব আঁকড়াইয়া শিবনাথের স্ত্রী থাকিবার অধিকার লইয়া সে যদি লড়াই করিত তাহা হইলে তাহাতে শিবনাথের ভালবাসা শেষ হইবার পর কমলের নারী হিসাবে কিছুই লাভ হইত

দিদিকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বাড়ীর সামনের জামগাছে উঠিয়া নাকি সুরে দি-দি বলিয়া যেই ডাকিয়াছেন, অমনি দেখিলেন একটি পুরুষ তাড়াতাড়ি দিদির খাটের তলায় লুকাইয়া পড়িল। এই ঘটনা লইয়া শরৎচন্দ্র পরে মেদিনীপুরে এক সভায় বলিয়াছিলেন: "এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয় তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্বও থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন দুঃখীকে দান করে, যে মহত্ত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না-ই পেরে থাকে, তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?

এই জন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।"

না, অথচ শিল্পী শিবনাথের পথে এই 'স্ত্রী'-অস্তিত্বটুকু প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইত। কমল এই ভাবে প্রেমহীন, বলিতে গেলে প্রয়োজনহীন, দাম্পত্য জীবনকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহে নাই। যে শরৎচন্দ্র স্বামী-সংস্কারকে ষোড়শী, সৌদামিনী, বিরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন নায়িকার ক্ষেত্রে খুবই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই এখানে কমলের মানস গঠন অনুযায়ী তাহার সতীত্বের ভার হইতে মুক্তি কামনা মঞ্জুর করিয়া তাহাকে আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ দিলেন।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়া এই ভাবসত্যের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত। অভয়া শেষ পর্যন্ত স্বামীর প্রতি বিদ্রোহিণী হইয়া রোহিণীবাবুকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রথম দিকে তাহার স্বামী-সংস্কার প্রবল ছিল। যে স্বামী তাহাকে ফেলিয়া দেশান্তরী হইয়াছে, তাহার অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব লয় নাই, খোঁজ খবর করে নাই, নিজের ঠিকানা পর্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রী অভয়াকে জানায় নাই, স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার কাছে আশ্রয় লাভ করিতে অভয়া বাংলার গ্রাম হইতে সুদূর ব্রহ্ম দেশে প্রাণের আবেগে পাড়ি দিয়াছিল। কিন্তু বহু কষ্ট স্বীকারের পর যখন সে স্বামীর সান্নিধ্যে আসিয়া স্বামীর অমানুষিকতার পরিচয় পাইল, তখন সেই ভ্রষ্ট অত্যাচারী বর্বর পুরুষকে চিরকালের মত ত্যাগ করিয়া অভয়া প্রেমিক রোহিণীবাবুর হাতে হাত রাখিয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল। এই কঠিন নবজীবনের যাত্রাপথে অভয়া মানুষ হিসাবে তাহার বাঁচিবার অধিকার-বোধকেই একমাত্র মূলধন ধরিয়া লইয়াছে। অভয়া শ্রীকান্তকে স্পষ্ট বলিয়াছে ক্রীতদাসীর মত অত্যাচারী স্বামীর লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সতী নাম কিনিবার মোহ সে ত্যাগ করিল, রোহিণীবাবুর সহিত ভালবাসার বন্ধনে ঘর করিয়া যদি তাহার সন্তান জন্মায়, সে সন্তান পবিত্রতার মধ্যেই জন্মাইবে এই তাহার দৃঢ় প্রত্যয়। অতঃপর জীবনের সার্থকতা সন্ধানের দুশ্চর সাধনায়, অসতী বলিয়া সমাজের কাছ হইতে সব গ্লানিই আসুক, মনুষ্যত্বের আশ্রয়ে অভয়া অকম্পিত হৃদয়ে সে সব উপেক্ষা করিবে বলিয়া স্থির করিল।

মানবতামূলক ঔদার্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে সংস্কার একসঙ্গে ক্রিয়াশীল হইয়াছে বলিয়া শরৎ-সাহিত্যে অনেক চরিত্র, বিশেষ করিয়া অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র সংগ্রামের জটিলতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই সংগ্রামী রূপের পরিণতির পশ্চাতে প্রায়ই কেমন যেন একটি রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যায়। ব্যক্তিগত হৃদয়াকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধার আবেগকে শরৎচন্দ্র বহুস্থানে

যত্নের সহিত আঁকিয়াছেন, প্রেম অসামাজিক হইতেছে বলিয়া তাহার চিত্রণে তিনি কার্পণ্য করেন নাই, সেই প্রেমের সৌন্দর্য-মাধুর্য ফুটাইতে তিনি যথেষ্ট যত্নও লইয়াছেন, কিন্তু তবু এইরূপ প্রেমের ক্ষেত্রে গৃহস্থঘরের বিবাহিতা নায়িকাদের মধ্যে স্বামী-সংস্কার প্রায়ই প্রবল। সামাজিক নীতি এবং সমাজের প্রভাব এই সংস্কারের মূল তাহা না বলিলেও চলিবে। ভালবাসার ব্যাপারে স্বামী অথবা স্বামী নয় এমন কেউ মেয়েদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু বিবাহিতা মেয়ে ভাল বাসিলেও এবং স্বামীর লোকান্তর হওয়ায় কিম্বা স্বামী-হীনা হইয়া যাইবার জন্য স্বামীর প্রতি উন্মুখতার ততটা সরাসরি আকর্ষণ না থাকিলেও শরৎচন্দ্রের এইরূপ নায়িকাদের অনেকেরই অন্তরে যেন স্বামী-সংস্কার বদ্ধমূল থাকে।* স্বামী ব্যতীত অপরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে এই স্বামী-সংস্কারের সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কার থাকিলেও তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চাহিতেন বলিয়া এরূপ ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রেমকে জিতাইয়া দিতে না পারিলেও সেই প্রেমের বিস্তারিত সাহিত্যিক বর্ণনায় তিনি কাতর হন নাই। তাঁহার বিধবা নায়িকা যখন এইরূপ প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিকতা ও এই প্রেমে আন্তরিকতা থাকিলে শরৎচন্দ্র সে প্রেমকে অবহেলা করেন নাই। প্রেমের বেদনার্ত পরিণতির জন্য দায়ী সমাজের শক্তি ও প্রয়োজন, ব্যক্তি চরিত্রকে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। বিধবার প্রেম বাঙালী-সমাজের সংগঠনের হিসাবে হয় তো মঙ্গলজনক নয়, কিন্তু সে প্রেম যদি হৃদয়ের আবেদনে জাগে, তাহার নির্মলতা ও সৌরভ শরৎচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। সমকালীন সমাজ-নীতি ও

*'পথনির্দেশ' গল্পে হেম কুমারী অবস্থাতেই গুণীনকে ভালবাসিয়াছিল, বিবাহের পরও সেই ভালবাসা নিঃশেষ হয় নাই। বিধবা হইবার পর সেই ভালবাসার তরঙ্গ বহিঃপ্রকাশের পথও পাইয়াছে, গুণীন যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি?" হেম বলিয়াছে, "একটুও না।" কিন্তু গুণীন শেষ পর্যন্ত যখন হেমকে গ্রহণে সম্মতি জানাইয়াছে, তখন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে বেহারীর সম্মতি জানাইবার পর বিনোদিনীর সংস্কার বশে পিছাইয়া যাইবার চেয়েও কঠিনভাবে পিছাইয়া গিয়া আতঙ্কে অস্থির হইয়া হেম বলিয়া উঠিয়াছে "যে রক্ষক সেই ভক্ষক! শেষ কালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও?"

সমাজ-ব্যবস্থার জন্য সামাজিক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র পরিণতিতে কিছুটা সমাজরক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও বিধবার পরপুরুষের সহিত প্রেম করিতে নাই বলিয়াই তাহারা প্রেম করিবে না, অন্তত সমাজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য সাহিত্যে তাহাদের প্রেম দেখানো চলিবে না, একথা মানেন নাই।) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাসমাজে নারীর এই হৃদয়-ধর্মের সমাজ-নিরপেক্ষ বিস্তারিত রূপায়ণও শরৎচন্দ্রের কম আধুনিকতার পরিচায়ক নয়। শরৎচন্দ্র বিধবার কামনা-বাসনার যৌক্তিকতা কি ভাবে স্বীকার করিতেন, বাজে শিবপুর হইতে কানপুরের শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৯।৭।১৯.৯ তারিখে লেখা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে ; "যে (বিধবা) একবার (স্বামীকে) জানিয়াছে, চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারই গোপন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।"

—অবশ্য ইহার পরই এই প্রেমের সমাজ-অস্বীকৃতির তথা সমাজের অকল্যাণের প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের মনে জাগিয়াছে এবং সে হিসাবে তাঁহার বক্তব্যকে অন্য দিকে লইয়া গিয়া তাহা আলোচনা না করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন ; "অথচ আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তবু উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য দ্রব্য আছে এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭০-৭১।)*

'দেবদাস'-এ পার্বতী বিবাহের পরও দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। 'পল্লী-সমাজ'-এ বিধবা রমা রমেশকে ভালবাসিয়া নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। 'বড়দিদি'তে বিধবা মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছে। 'শেষের পরিচয়'-এ সবিতা স্বামীকে ছাড়িয়া পরপুরুষ রমণীবাবুর সহিত দীর্ঘ

* "স্বরাজ সাধনায় নারী" প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন: "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃজ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।"

তের বৎসর ঘর করিয়াছে। শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে অভয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ রোহিণীবাবুর সহিত রেঙ্গুণে ঘর বাঁধিয়াছে। এসকল নারীমনের বিচিত্র গতির নিদর্শন এবং শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন ভাবে নিষ্ঠার সহিতই এই কাহিনী-গুলি লিখিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই চরিত্রগুলির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় তাহাদের মনে স্বামী-সংস্কার তথা সমাজসংস্কার কিরূপ কার্যকরী ছিল। পার্বতী স্বামীগৃহে গৃহিণীপনায় নিজেকে নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছে, স্বামীর সেবা করিয়া সপত্নী পুত্রকন্যাদের স্নেহ পরিচর্যা করিয়া পার্বতী নূতন জীবনে মানাইয়া লইতে প্রাণপণ করিয়াছে। রমেশের কাছাকাছি থাকিলে পাছে রমেশের প্রতি তাহার দুর্বলতা ধরা পড়িয়া যায়, পাছে বৈধব্যের বা স্বর্গত স্বামীর স্মৃতির অসম্মান হয়, রমা সেইজন্যই জন্মভূমি কুঁয়াপুর, এমন কি প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইটিকে ত্যাগ করিয়া জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর কাশীযাত্রার সঙ্গিনী হইয়াছে। মাধবীর স্বামী-সংস্কারের জন্যই সুরেন্দ্রনাথকে বিদায় লইতে হইয়াছে। তাছাড়া মাধবীর সখী মনোরমার স্বামী আনুগত্যের কাহিনী পাশাপাশি আঁকিয়াও শরৎচন্দ্র যেন মাধবীর স্বামী-সংস্কারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল রমণীবাবুর শয্যাসঙ্গিনী থাকিয়াও সবিতার ভিতর স্বামী-সংস্কার এত প্রবল ছিল যে, একদিন সে স্বামী ব্রজবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্নানঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে বলিয়াছে, "আমি এ বাড়ী থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমার ?" ব্রজবাবু অবাক হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না ?" সবিতা সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়াছে, "না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম আর সেখানে যাবো না।"* 'শ্রীকান্ত'-এ অভয়া বিদ্রোহ করিয়াছে সত্য, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীবাবুর সহিত সে ভালোবাসার ঘর বাঁধিয়াছে, কিন্তু রেঙ্গুণে উপস্থিত হইবার সময় তাহার স্বামী-সংস্কার এমনই তীব্র ছিল যে, বলিতে গেলে

* অবশ্য সবিতা শেষ পর্যন্ত স্বামীর ঘরে থাকিতে পারে নাই, কারণ স্বামী ব্রজবাবু তাহার হৃদয়ের আবেদনে হৃদয়ের সাড়া দিয়া তাহাকে গ্রহণে রাজী হন নাই। তিনি বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্মানুশাসনে পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করিয়া দিয়া কুলটা স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়া তৃণের চেয়ে হীন হইয়া তিনি সংসার হইতে বিদায় লইতে চাহিয়াছেন। ইহাতে সবিতার মন ভরে নাই।

শুধু তাহারই জন্য দেশ-মান-স্বজনত্যাগী রোহিণীবাবুকে অপরিচিত রেঙ্গুনে একরূপ ভাসাইয়া দিয়া অভয়া বহু দূরে প্রোমে স্বামীর ঘরে স্থান লাভের আশায় সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছে। শরৎ-চেতনায় নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বামী-সংস্কারের আবেগ উভয়েই কিভাবে একসঙ্গে স্বীকৃতি পাইয়াছিল শ্রীমতী লীলা রাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা উপরি-উক্ত ২৯।৭।১৯১৯ তারিখের চিঠির নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে; "এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়ে রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।...

যখনই বই লিখিবে এই কথাটিই সকলের বেশি মনে রাখিতে হইবে। স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া ফেলা হয়।"

বাঙালী মেয়ের কাছে স্বামী কত আপন, স্বামীর স্মৃতি কত প্রিয় ও পবিত্র, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া শরৎচন্দ্র নায়িকাদের হৃদয়ে স্বামী সংস্কারের এই প্রাবল্য আঁকিয়াছেন। তাঁহার মাত্র ২২ বৎসর বয়সে লেখা শুভদা উপন্যাসটিতে অপরিণত প্রতিভার ছাপ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীর স্বামীভক্তির নিদর্শন হিসাবে এই উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। ইহার নায়িকা শুভদা পাষণ্ড মিথ্যুক, স্বার্থপর, নেশাখোর, বেশ্যাসক্ত স্বামী হারাণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। হারাণ মনিবের টাকা ভাঙে, শুভদা নিজে মনিবের কাছে গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাকে ক্ষমা করায়। মুখে চুনকালি মাখিয়া চোর সাজিয়া হারাণ তাহার ঘরে পয়সা চুরি করিতে ঢোকে, শুভদা চিনিতে পারিয়াও শান্তভাবে তাহার দিকে বাক্সর চাবি ছুঁড়িয়া দেয়।

অবশ্য শরৎচন্দ্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী কালের রচনায় এই উচ্ছ্বাস একটু কমিয়াছে, কিন্তু স্বামী-সংস্কারের যে আবেগ শরৎ-মানসে প্রথম হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা মোটামুটি বজায় থাকিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে লেখার মুন্সিয়ানা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সংস্কারের রূপ স্থূলতার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইয়াছে এবং সংঘাত-সংঘর্ষের ক্ষেত্রে উত্তেজনা-বশতঃ সাময়িক বিপরীতাত্মক আচরণ করিলেও প্রায়ই নায়িকাদের স্বামী-সংস্কার তথা সমাজ-সংস্কারের দিকে কাহিনীর গতি ঝুঁকিয়াছে। 'বিরাজ

বৌ' উপন্যাসে বিরাজ ঝোঁকের মাথায় রাজেন্দ্রের সহিত কুলত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী-সংস্কারই তাহাকে অতলে তলাইয়া যাওয়া হইতে বাঁচাইয়াছে এবং বহু দুঃখভোগের পর বিরাজ অসুস্থ হইয়াও স্বামীর ঘরে ফিরিয়াছে। 'স্বামী' গল্পেও অনুরূপ স্বামী-সংস্কারই সৌদামিনীকে উত্তেজনা-জনিত অধঃপতন হইতে বাঁচাইয়াছে, অবশ্য স্বামী ঘনশ্যাম বৈষ্ণবের সন্দেহমুক্ত হৃদয় লইয়া তাহাকে দ্বিধাহীন প্রশান্তিতে ফিরাইয়া লইয়াছে।* 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের উচ্চশ্রেণীর মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, সেখানে নায়িকা অচলার মন খুবই জটিল। মহিমের স্ত্রী অচলার মনে স্বামীর বন্ধু সুরেশের প্রতি আকর্ষণ দুর্বার হইয়াছে। সুরেশের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া অচলা অসুস্থ মহিমকে একা ট্রেনে ফেলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সব কিছু বুঝিয়াও সেই সুরেশের সহিত অচলা স্থায়ীভাবে ঘর করিতে অস্বীকার করিতে পারে নাই। এমন কি, এক দুর্যোগের রাত্রে বর্ষণমুখর অস্থির প্রকৃতি অচলার অস্থির মনকে ভাসাইয়া দিয়াছে, সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে সুরেশের কামনার যূপকাষ্ঠে। কিন্তু এত বিপর্যয় সত্ত্বেও অচলার হৃদয়ে স্বামী মহিমের অবিনশ্বর আসন ছিল, সেই আসনের জোর এত

* 'স্বামী' গল্পের সৌমাদিনীর অন্তরে স্বামী ঘনশ্যামের কতখানি স্থান ছিল স্বামী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর তাহার আপন মনোবেদনার নিম্নোক্ত বিবৃতি হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। শুধু একা সৌদামিনীর নয়, বাঙালী মেয়ের স্বামী-সংস্কারের সাধারণ রূপটিও ইহাতে বিধৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় এবং এই আবেগ-সমৃদ্ধ বর্ণনার পিছনে লেখক শরৎচন্দ্রের অনুরক্তির স্পর্শও যেন উপলব্ধি করা যায়: "সব মেয়ের মত আমিও আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের মধ্য দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে কেন তাতে আমার মন উঠল না? তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যেও কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতেই হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে এক বিন্দু রেহাই দিলেন না, কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন—লজ্জা সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ওই শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে।"

বেশি যে, একরাত্রি অচলাকে অঙ্কশায়িনী করিবার সুযোগ পাইয়াও সুরেশ অচলাকে সত্যসত্যই পাইল না। সেই দুর্যোগের রাত্রের পরদিন প্রভাতে শুধু বৃদ্ধ রামবাবুই অচলার মড়ার মত রক্তহীন বিবর্ণ মুখখানি প্রত্যক্ষ করিলেন না, সুরেশও করিল। তাই ইহার পর নিরুত্তাপ অচলার কাছে থাকিবার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুরেশ যেন হাঁফাইয়া উঠিল। ইহাই একরূপ তাহার মাঝুলিতে মহামারীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পটভূমি।

'দেনাপাওনা'র ষোড়শী চরিত্রেও এই স্বামী-সংস্কারের প্রবল প্রভাব দেখানো হইয়াছে। দেবী চণ্ডীর ভৈরবীরূপে এবং চণ্ডীগড়ের দরিদ্র প্রজা-সাধারণের অভিভাবিকারূপে ষোড়শী যে কর্মজীবনে অভ্যস্ত, অত্যাচারী, লম্পট জমিদার জীবানন্দ আসিয়া সে জীবনের সম্মুখে কঠিন চ্যালেঞ্জ রাখিল। ষোড়শী এই পাপিষ্ঠ জমিদারের সহিত মুখোমুখি বোঝাপড়ার জন্য জমিদার কুঠী শান্তিকুঞ্জে গিয়া আবিষ্কার করিল যে, জীবানন্দ তাহার একান্ত আপন জন, তাহার স্বামী, তাহার বালিকা বয়সে একদিন অভাবের তাড়নায় টাকার লোভে ব্রাহ্মণসন্তান জীবানন্দ তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার হতভাগিনী মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিল। যে মুহূর্তে সে প্রদীপের ম্লান আলোকে এই আবিষ্কার করিল, সেই মুহূর্তেই ষোড়শীর পায়ের তলার মাটি সরিয়া গেল। এতদিন যে জীবন তাহার মনোহরণ করিয়াছিল, নিজেকে একজনের স্ত্রী-রূপে আপন নারীসত্তার পুনর্মূল্যায়ন করিয়া ষোড়শীর কাছে সেই জীবনের রঙ ফিকে হইয়া গিয়াছে। জীবানন্দের লোভী অত্যাচারী স্বরূপ ক্রমপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শীর সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পটভূমিকা যত প্রসারিত হইতে লাগিল, জীবানন্দের প্রতি স্বামী-সংস্কারের একটা দুর্বলতা ততই ষোড়শীর গতি পদে পদে প্রতিরুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে শুধু যেন তাহার স্বামীকে সেই ঠিক চিনিয়াছে এই ধরনের তৃপ্তিতে ভৈরবী ষোড়শী চণ্ডীর অলঙ্কারাদি সমেত সুবিপুল সম্পদপূর্ণ সিন্দুকের চাবী বহুনিন্দিত জীবানন্দের হাতে তুলিয়া দিয়া চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘি চলিয়া গেল তাহার গুরু ফকির সাহেবের প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে নূতন কর্মমণ্ডলে। এইভাবে গ্রামে জীবানন্দ উপস্থিত থাকিতে দেবী চণ্ডী ও দরিদ্র অসহায় প্রজাবৃন্দকে ফেলিয়া ষোড়শীর গ্রামত্যাগ যতখানি তাহার স্বামী-সংস্কারের জন্য, তাহার ভালবাসার জন্য, তাহার নিজের মনের পরিতৃপ্তির জন্য, কর্তব্যের জন্য অবশ্যই ততটা নয়। ষোড়শী কলঙ্কিনী মায়ের কন্যা, স্বামী জীবানন্দকে কাছে পাইতে

যত আগ্রহই সে বোধ করুক, ভালবাসার ধনকে, নিজের স্বামীকে, ব্রাহ্মণ-সন্তান, জমিদার, সম্ভ্রান্ত জীবানন্দকে মর্যাদাভ্রষ্ট না করিবার জন্যই ষোড়শী কর্তব্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছে। তাছাড়া সে দেবীর নিবেদিতা ভৈরবী, দেবতাকে ছাড়িয়া স্বামীকে লইয়া ঘর বাঁধিলে দেবীর অপ্রসন্নতায় স্বামীর যদি ক্ষতি হয়, সে দায়িত্বও ষোড়শী গ্রহণ করিতে চাহিল না। ষোড়শীর স্বামী-সংস্কারকে প্রবহমান রাখিবার জন্যই যেন শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে হৈম-নির্মলের দাম্পত্য-জীবনের ছবিটি ষোড়শীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শরৎ-সাহিত্যে স্বামী-সংস্কারের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি। এই অন্নদাদিদি চরিত্রটি শরৎচন্দ্র অত্যন্ত যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারি পর্ব জুড়িয়া কিয়দংশে শরৎচন্দ্রের আপন ভাবছায়ায় রচিত শ্রীকান্ত বারবার পরম শ্রদ্ধায় এই অন্নদাদিদির কথা উল্লেখ করিয়াছে। বন্ধু ইন্দ্রনাথের সহিত কৌতূহলবশতঃ গিয়া অবাক বিস্ময়ে বালক শ্রীকান্ত প্রথম দর্শন করিয়াছে অন্নদাদিদিকে: "যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তর-ব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।" স্বামী পিত্রালয়ে তাহার বিধবা বোনের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে, অপরিমেয় দুর্বহ লজ্জার বোঝা চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে অন্নদার মাথায়। সেই স্বামী যখন মুসলমান সাপুড়িয়া হইয়া তাহার সন্ধান করিয়াছে, অন্নদা শুধু স্বামী-সংস্কারের জন্যই কোন কিছু না ভাবিয়া সেই দুশ্চরিত্র স্বামীর সহিত পথে বাহির হইল। তারপর স্বধর্মত্যাগী, সাপুড়ে, গাঁজাখোর, অত্যাচারী, প্রবঞ্চক, অতি দরিদ্র, বিধর্মী স্বামী, আর সেবারতা, সর্বংসহা, কল্যাণী বধূ। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার মত স্বামীর হীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, বিবাহের বন্ধনকে সারা জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন রূপে গ্রহণ করিয়া দুর্ভাগ্যকে সহজভাবে বরণ করিয়া লইয়াছে। অন্নদা স্বামীর হীনতা সম্বন্ধে যে সচেতন, তাহা তাহার ইন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এই হীন স্বামীকে সব দিক হইতে সামলাইয়া সেবা করিতে অন্নদার ক্লান্তি নাই। অভয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, স্বামী অমানুষ হইলেও অন্নদা তাহাকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মদীপ্তিতে উজ্জ্বল; এই দুইজন বিবাহিতা নারীকে দুইদিক হইতে দেখাইয়া শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যক্তি-মনের বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য বিপরীত প্রান্তে ফুটাইয়াছেন। ইহা ঔপন্যাসিক

হিসাবে তাঁহার শক্তির পরিচায়ক। অন্নদা এবং অভয়া উভয়েই শরৎচন্দ্র তাহাদের নিজের দিক হইতে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,* দুজনের সৃষ্টিতেই

* 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব হইতে দুইটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল। প্রথমটি অন্নদাদিদি ও দ্বিতীয়টি অভয়া সম্পর্কে। উভয়ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত তাহাদের দেখিয়া বিচার করিয়াছে। উদ্ধৃতি দুইটি হইতে শরৎ-মানসের পরিচয় মিলিবে :

(১) "জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা দাগ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি ইন্দ্রের দিদি (অন্নদা), তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ; যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে।"

(২) রোহিণীবাবুর সহিত অভয়া রেঙ্গুনে ঘর বাঁধার পর একদিন শ্রীকান্ত তাহাদের বাড়ী গেল। হঠাৎ শ্রীকান্তকে দেখিয়া সামাজিক সংস্কারের সাময়িক আঘাতে অভয়া ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিল। এইখানে বইয়ে আছে: "অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দুরকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল।……চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এ সব অভ্যাসমত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বিধাতারও নাই।"

তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। নিহিত মূল্যে, আপন মনের সম্পদেই মানুষের সত্যকার মর্যাদা,—সমাজের বিধিবিধান-নিরপেক্ষভাবে শরৎচন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছেন। সমাজের বিধিবিধান যাহা আছে, তাহাতে গঠনমূলক কিছু সংযোজন না করিয়া শুধু আঘাতের প্রবণতা ফলপ্রসূ বা কল্যাণকর নয়, এই মনোভাব শরৎচন্দ্রের থাকিলেও তিনি সমাজের দোষত্রুটি দেখাইয়া পাঠককে সে সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন এবং যেক্ষেত্রে সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার চরিত্র বিদ্রোহ করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে সেই চরিত্রের সম্পদের পরিচায়ক গঠনমূলক কিছু দিবার চেষ্টা তিনি অবশ্যই করিয়াছেন। হয়তো এ চেষ্টার পুঁথিগত মূল্য অপেক্ষা হৃদয়গত মূল্য বেশি, এরূপ গুরুতর সমস্যা সন্নিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা হয়তো তিনি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, যাহার জন্য তিনি সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করিতে পারেন নাই অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু মনুষ্যত্বের অমোঘ দাবী স্বীকারে শরৎচন্দ্র সর্বদাই উৎসুক ছিলেন বলিয়া সমাজের সমর্থনেই হউক বা সমাজের বিরুদ্ধতায় হউক, তিনি মনুষ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ-সন্ধানী ছিলেন। সামাজিক উপন্যাসে সমকালীন সমাজের ছাপ থাকে বলিয়া তিনি আপন কালের বাঙালী মেয়েদের মানস-গঠন লক্ষ্য করিয়া তদনুসারেই নারী-চরিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহার সময়কার বাঙালী মেয়েদের স্বাভাবিক গভীর স্বামী-সংস্কার শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি নারী-চরিত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এই সংস্কার বাস্তব বলিয়া তিনি ইহা অস্বীকার না করিয়াই মনের বিচিত্র রূপ ও রঙ সন্ধান করিয়াছেন, তবে তিনি সব কিছুর মূলে রাখিয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে উদার শ্রদ্ধাবোধ। এই কারণেই অন্নদার প্রতি আপেক্ষিক অনুরাগ থাকিলেও অভয়ার প্রতিও শরৎচন্দ্র আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিম্নোক্ত মন্তব্য হইতে কথাটার মোটামুটি সমর্থন মিলিবে: "ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, তাঁহার মনটি ছিল সংস্কারমুক্ত,—জীবনকে তিনি দেখিয়াছিলেন শুধু সমাজ, জাতি, ধর্ম ও নীতির সংস্কারের রঙীন চশমার ভিতর দিয়া নহে—জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন সংস্কারের বাহিরে তাহার স্বাধীন স্বাভাবিক রূপে।" (বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫।)

স্বামী-সংস্কারের মত সমাজ-সংস্কারে যে লেখকের অনুরক্তি, বিবাহের পবিত্রতায় তাঁহার আস্থা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র কমল বিবাহের মন্ত্রকে বলিয়াছে মহাজন, তাহার যুক্তিবাদী মন স্বামী

শিবনাথের সহিত তাহার মনের মিল ভাঙিয়া যাইবার পর আসল ডুবিল বলিয়া শিবনাথের স্ত্রী হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে বা বিবাহরূপ মহাজনের সুদ গণিতে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমল শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্রের প্রতিভূ নয়, ব্যতিক্রম। বস্তুত শরৎচন্দ্র বিবাহের গুরুত্ব সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন।'* তিনি মনে করিতেন, বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজে নর-নারীর বিবাহ শুধুমাত্র একটা সামাজিক-সুবিধাসৃষ্টিকারী

---

* শরৎচন্দ্র মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেবেলার খেলার বিবাহ, এমন কি পুত্র-কন্যা সম্পর্কে পিতামাতার বিবাহ প্রস্তাবের উপরও অভাবনীয় গুরুত্ব দিয়া কয়েকটি সুন্দর কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এই কাহিনীগুলির নায়ক-নায়িকা হয়তো বয়স্ক, কিন্তু উল্লিখিত খেলার বিবাহ বা বিবাহ-প্রস্তাবের প্রভাব তাহাদের উপর খুবই ক্রিয়াশীল হইয়াছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর বাল্য-জীবনে বঁইচির মালা বদলে যে বিবাহের খেলা হইয়াছে, শ্রীকান্তকে পুনরায় দেখিবার পর হইতে রাজলক্ষ্মী সে খেলার দাম দিয়াছে শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র জীবনস্বপ্ন রচনায়। 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ ষোড়শীর (অলকার) বাল্য-বিবাহও বহুলাংশে বিবাহের খেলা, কিন্তু জীবানন্দকে দেখিবার পর সেই বিবাহের স্মৃতিসুরভিত ষোড়শী সমস্ত পৃথিবী এমন কি দেবী চণ্ডীর প্রতি ভৈরবীর আনুগত্য ভুলিয়াছে। 'পরিণীতা'য় এক মধুর সন্ধ্যায় শেখরনাথের সহিত মালাবদলের স্মৃতি সম্বল করিয়া ললিতা সারা জীবন রিক্ততার কঠিন পথে বিচরণের সংকল্প করিয়াছিল, হৃদয়বান লেখকের অনুগ্রহেই বলিতে গেলে শেষ পর্যন্ত তাহার দুঃখবরণ সার্থক হইয়াছে, সে শেখরনাথকে স্বামীরূপে পাইয়াছে। বাল্যে বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত নরনারীর জীবনে কত প্রভাব বিস্তার করে 'পল্লীসমাজ'-এর রমা-রমেশের কাহিনী, 'ছবি' গল্পে মা-শোয়ে বা-থিনের কাহিনী, 'দত্তা' উপন্যাসে বিজয়া-নরেনের কাহিনীতে তাহার পরিচয় মিলিবে। রাসবিহারীর ধূর্ততা ও বিলাসবিহারীর অস্তিত্ব এড়াইয়া বলিতে গেলে নরেনের সহিত তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছাজ্ঞাপক পিতার পত্রখানিই ব্রাহ্ম বিজয়াকে হিন্দু নরেনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহের এক নিষ্ফল প্রস্তাবের স্মৃতি মহেন্দ্রের গৃহে বিনোদিনীর নিঃস্বতা ও বঞ্চিত যৌবনের জ্বালা তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথা নয়, ইহা সমাজ-বন্ধনের মূল সূত্র, ইহার ধর্মীয় ভিত্তি অবহেলার বস্তু নয়। শরৎচন্দ্র জানিতেন, বিবাহকে হিন্দু সমাজ স্মরণাতীত কাল হইতে মানিয়া আসিয়াছে, বিবাহ অস্বীকার করিয়া বা বিবাহ এড়াইয়া যে ভালবাসা তাহার মাধুর্য, উজ্জ্বলতা, এমনকি নিহিত গৌরব যাহাই হউক, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমে কল্যাণ নাই, একথাই হিন্দু সমাজ বরাবর বলিয়া আসিয়াছে। এই বিশ্বাসের উপরই নর-নারীর প্রেমের সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র মানুষের মন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সে মন অঙ্ক কষিয়া হিসাব করিয়া পথ চলে না। কাজেই সেই মনের দাবীতে প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানের বিপরীতে কিছু ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই ঘটনার চিত্র শরৎ-সাহিত্যে মানবিক দরদের সহিত উজ্জ্বল করিয়াই অঙ্কিত। কিন্তু সামাজিক প্রেম যেখানে প্রসৃত, যেখানে তাহা আপন মহিমায় দেদীপ্যমান, সে প্রেমে দুঃখই থাক আর সুখই যাক, তাহার প্রতি সামাজিক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রভূত মমতা। এই জন্যই যদিও অভয়ার বিদ্রোহী মনকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতির সহিত সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন, অনুরূপ অবস্থায় অসহায় নিপীড়ন সহ্য করার চেয়ে যে মেয়ে আত্মদীপ হইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকে শরৎচন্দ্র সংকীর্ণ সমাজ-সংরক্ষণের চিন্তায় শুধু ধিক্কার জানাইতে পারেন নাই, অভিনন্দন না জানাইলেও সমবেদনা জানাইয়া তাহার কৃত-কর্মের যৌক্তিকতা মানবিক দিক হইতে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া অন্নদার স্বামী-প্রেমকে তিনি যে সমর্থন দিয়াছেন, অভয়াকে তাহা দিতে পারেন নাই। তবু অন্নদার স্বামী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল এবং অন্নদা হিন্দু থাকিয়াও এই বিধর্মী দুর্বৃত্তকে বিবাহ-সংস্কারের গৌরবে নিজে সহস্র দুঃসহ দুঃখ সহিয়া জীবনের চরম ও পরম অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। অভয়া ও অন্নদা দুজনেই শ্রীকান্তের কাছে নারী সমাজের দুইটি বড় ভাবরূপ হইয়া আসিয়াছে, দুজনকেই সে মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার তথা লেখক শরৎচন্দ্রের মন ব্যথার প্রতিমূর্তি অন্নদার প্রতিই অধিক অনুরক্ত। এই আপেক্ষিক অনুরক্তি শ্রীকান্তের তুলনামূলক দৃষ্টিতে নিম্নরূপে ফুটিয়াছে "তাহার (অভয়ার) চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের অন্তরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সে দিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই

মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি একাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়া বরঞ্চ তাঁহার বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম তিনি ভগবানে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলে খেলা?")

বাংলা দেশে, বিশেষতঃ গ্রাম-বাংলার হিন্দু-সমাজে বিবাহ সম্পর্কিত এই ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত। বাংলা সাহিত্যে এই ধারণার প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় সমভাবেই প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের মহিমা লইয়া হৃদয়গ্রাহী অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু সমাজের প্রচলিত ধারার অস্বীকৃতিতে তাঁহার উৎসাহ না থাকায় প্রায়ই তিনি এই সব কাহিনীকে প্রেমের পরিমণ্ডলেই রাখিয়াছেন, সমর্থন অসমর্থনের প্রশ্ন আনেন নাই। বরং যেখানে এইরূপ প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি নাই, সেখানে তিনি প্রেমের পরিণতি বিষাদান্ত করিয়াছেন, কিন্তু জোর করিয়া এই প্রেম সফল করিয়া অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ সম্পাদন করিয়া সমাজের বিরোধিতা করেন নাই। 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনী-প্রতাপের চিরকালীন বিচ্ছেদ শৈবলিনীর দুর্দম প্রেমের বিপরীতে ঘটান খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাইয়া সমস্যার কাঠিন্য একরূপ এড়াইয়া গিয়াছেন এবং শৈবলিনীকে অন্তত দেহের দিক হইতে পবিত্র প্রমাণ করাইয়া স্বামী চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের বিবাহ-দায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নবাবকন্যা মুসলমান আয়েষা হিন্দু রাজপুত্র জগৎ সিংহকে প্রাণেশ্বর বলিয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত জগৎসিংহের বিবাহ তিলোত্তমার সহিত দিয়াছেন, আয়েষাকে সরাইয়া রাখিয়াছেন আত্মত্যাগের গৌরবকিরীট মাথায় চাপাইয়া। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে জমিদার নগেন্দ্রনাথ রূপমোহে বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিবাহের পরিণতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে, কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত উদার ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ, তথাপি সমাজ-সম্মত বিবাহের প্রতিই তিনি

পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। সামাজিক বিবাহ-সম্ভাবনাহীন প্রেমে যত গভীরতাই থাক, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহা বড় একটা স্বীকৃত হয় নাই। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'ঘরে বাইরে', 'দুই বোন' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থে এই বিবাহ-সংস্কার দেখা যায়। 'চোখের বালি'তে বিধবা বিনোদিনীর বিহারীর জন্য কামনার সীমা ছিল না, কিন্তু সেই বিহারীই যখন শেষ পর্যন্ত সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে রাজী হইল, বিনোদিনীই তখন পিছাইয়া গেল।* 'নৌকাডুবি'তে রমেশ এবং কমলা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য বিবাহ ব্যতিরেকেই হয়তো তাহাদের সুখী ও সম্মিলিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের ঘনিষ্ঠতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে হইয়াছে, সত্যসত্যই তাহারা বিবাহিত স্বামী স্ত্রী নয়, তাই বহুদিন কাছাকাছি থাকিয়াও এবং মন কাছাকাছি আনিয়াও লেখকের লেখনীর আঘাতে তাহাদের মিলন ভাঙিয়া গেল। এখানে বিবাহ-সংস্কারেরই জয় হইল, রবীন্দ্রনাথ বহুকষ্টে একরূপ কাহিনীতে জোড়াতালি দিয়াই অপরিচিত স্বামী নলিনাক্ষের সহিত কমলাকে মিলাইয়া দিলেন। 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপ উদ্দাম, বিমলা সন্দীপের দিকে ঝুঁকিয়াছে, সন্দীপের তুলনায় বিমলার স্বামী নিখিলেশ শান্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিমলা বিবাহেরই মর্যাদা দিয়াছে, সন্দীপের মোহ কাটাইয়া প্রশান্ত স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। 'দুই বোন'-এ শশাঙ্কর জীবনে ঊর্মিমালার আবেদন বা প্রয়োজন যাহাই থাক, শেষ অবধি যে শশাঙ্ককে তাহার দিদি শর্মিলা বিবাহ করিয়াছে তাহার সান্নিধ্য হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া ঊর্মিমালা সুদূর ইউরোপের পথে পাড়ি দিয়াছে।**

* আপন দুর্ভাগ্যের দোহাই দিয়া এই সময় বিনোদিনী নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বিহারীকে বলিয়াছে: "পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। ভুল করিও না—বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"

**রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' এবং 'শেষের কবিতা'র এই মনোভাবের ব্যতিক্রম

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, অসামাজিক প্রেমের রূপায়ণে শরৎচন্দ্র যত্নের কার্পণ্য করেন নাই বটে, কিন্তু এই প্রেমের জন্য তাঁহার নায়ক-নায়িকারা দুঃখভোগই করিয়াছে, প্রেম কদাচিৎ মিলনে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তবে অসামাজিক প্রেমের উদ্ভব ও স্থিতির খুঁটিনাটির দরদী বর্ণনায় শরৎসাহিত্য অনুপম, এদিক হইতে তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক শিল্পীও বটে, কিন্তু সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্র ঐরূপ অসামাজিক প্রেমকে খুব কম ক্ষেত্রেই বিবাহের পথে লইয়া গিয়াছেন।* তাঁহার লেখাগুলি বেশির ভাগই নায়িকা-প্রধান হওয়ায় নায়িকাদের ব্যথাই বলিতে গেলে তাঁহার সাহিত্যিক সাফল্যের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎসাহিত্যে প্রেমের বিষয়বস্তুতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক অনুমোদনের অভাব থাকায় প্রেমের অঙ্গাঙ্গী মধুর রসের আনন্দদায়ক অনুভূতির সঙ্গে পাঠককে সংঘর্ষের উত্তেজনা এবং ব্যর্থতার বেদনাও ভোগ করিতে হয়। বরং শেষের দিকেই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের ফলশ্রুতি। সমকালীন সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বাস্তববোধ এত জাগ্রত না হইলে তাঁহার মিষ্ট হাতে 'চন্দ্রনাথ',

দেখা যায়। অবশ্য 'মালঞ্চ'-এ স্ত্রী নীরজাকে ছোট করিয়া দিয়া আদিত্য-সরলার ভালবাসাকে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু বড় করিয়াছেন ততটুকুই এই ব্যতিক্রম, নহিলে আদিত্য-সরলার অসামাজিক প্রেমকে আদিত্যের স্ত্রী নীরজা বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ জিতাইয়া দেন নাই। 'শেষের কবিতা'য় অবশ্যই বিবাহের উর্ধ্বে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কেটি অমিতকে এবং লাবণ্য শোভনলালকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু লাবণ্য অমিতের প্রেম অব্যাহত থাকার একটা ব্যঞ্জনা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে সঞ্চারিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় কাব্যভাব যতটা, উপন্যাসের কঠিন বাস্তব জীবনানুশীলন বা জীবনের ছবি ততটা নাই, এবং শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' যেমন সাময়িক আবেগে আপন রচনা-পরিমণ্ডলের বাহিরে গিয়া লেখা, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে।

* ব্যতিক্রম যেমন, বিলাসী গল্পে হিন্দু কায়স্থ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয় ও মুসলমান সাপুড়ে কন্যা বিলাসীর গভীর ভালবাসা বিবাহ বন্ধনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই অসামাজিক ভিন্ন ধর্মে বিবাহ ঘটানো শরৎচন্দ্রের আধুনিক উদার, প্রেমের প্রতি মর্যাদাশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়।

'দত্তা', 'পরিণীতা','নববিধান' বা 'দর্পচূর্ণ'র মত 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'বামুনের মেয়ে,' 'পথনির্দেশ,' 'শ্রীকান্ত'র পরিণতিও হইতে পারিত। প্রেম হৃদয়ের সাড়া হইতেই জন্মায়, বাহিরের নির্দেশে নয়। বিবাহ সামাজিক বন্ধন, ইহার পিছনে সামাজিক সংস্কার আছে এবং ইহা সমাজের স্বীকৃতির উপর অপেক্ষমান। এই জন্যই শরৎচন্দ্র প্রেমকে সামাজিক গণ্ডীর বাহিরেও বিকাশের যতখানি সুযোগ দিয়াছেন, প্রেমের পরিণতিতে বিবাহের বেলা সমাজের অনুমোদনের সম্ভাবনার দিকেও তেমনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইজন্যই চন্দ্রনাথ, দত্তা, গৃহদাহ, পরিণীতার ক্ষেত্রে বিবাহের যে পটভূমিকা রচিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের দিকে তাকাইয়া শরৎচন্দ্রকে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। 'চন্দ্রনাথ'-এ সরযূ ভ্রষ্টা মায়ের কন্যা কিন্তু চন্দ্রনাথের পিতৃব্য মণিশঙ্কর কিছুটা সরযূর প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ও কিছুটা পৌত্র বিশুর ও ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহবশত বুদ্ধি খাটাইয়া রাখালকে জেলে পাঠাইয়া সরযূর মায়ের সব কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাই সরযূ সম্পর্কে কানাকানির অবসান ঘটিয়াছে এবং সরযূ ও চন্দ্রনাথের পুনর্মিলন বাধাহীন হইয়াছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চন্দ্রনাথের নিকট সরযূর বিবৃতি অনুযায়ী সরযূর যখন জন্ম হয় তখনও তাহার মায়ের পদস্খলন ঘটে নাই। তাহার পিতার মৃত্যু হয় যখন সে তিন বৎসরের, তাহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কুলত্যাগ করে। এইভাবে পরবর্তী কালে নষ্ট হইয়া যাওয়া মায়ের জন্য জন্ম-কলঙ্কমুক্ত সরযূকে সমাজের প্রতিহিংসার বলি না দেওয়া শরৎচন্দ্রের মানবতা বোধের দৃষ্টান্ত

'গৃহদাহে' হিন্দু মহিম ব্রাহ্ম কুমারী অচলাকে বিবাহ করিয়াছে। শরৎ-চন্দ্র এই বিবাহে সমাজের অনুমোদনের উপর খুব জোর না দিয়া সুরেশকে অচলার জীবনে আনিয়া ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতা সৃষ্টির দিকেই আপেক্ষিক ভাবে ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু গ্রামের গোঁড়া হিন্দু পরিবেশের মধ্যেও অচলা-মহিমের দাম্পত্য জীবনকে মোটামুটি অসমালোচিত রাখিয়াও এবং রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারভুক্ত মৃণাল ও তাহার স্বামীকে ইহাদের সহিত মিলাইয়াও অতিক্রান্ত শরৎচন্দ্র ইহাদের বিবাহিত জীবন ভাঙিয়া দিয়াছেন এবং মহিমকে পৃথক করিয়া অচলা-সুরেশের মিলনকে আনিয়া কাহিনীতে অন্য গুরুতর সমস্যার অবতারণা করিয়া বিবাহ সমস্যাকে অনেকখানি এড়াইয়া গিয়াছেন। তবু

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার গভীর স্বামী-সংস্কারের ভিতর দিয়া বিবাহের সমস্যার কিছুটা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

'পরিণীতা'য় শরৎচন্দ্র এই সমস্যাটিকে অনেক সহজ বৃত্তে আঁকিয়াছেন। ললিতার শেখরনাথের সহিত গোপনে মালাবদল যে শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিবাহে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার সামাজিকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই শরৎচন্দ্র তাহাকে মাতুল গুরুচরণের ব্রাহ্ম পরিবারে বাস করাইয়াও মাতুল-পরিবার-নিরপেক্ষভাবে হিন্দু রাখিয়াছেন। 'দত্তা'য় ব্রাহ্ম বিজয়া ও হিন্দু নরেনের ভালবাসা বিবাহের পথে গিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ মধ্যেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রেমের দাবী হয় তো পারিপার্শ্বিকের চাপে বিলাসবিহারীর দাবীর কাছে পরাজিত হইত, কিন্তু বিজয়ার পিতা বনমালীর যে চিঠিখানি নরেনের কাছে ছিল এবং যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বনমালী বিজয়ার সহিত নরেনের বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই চিঠিটি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছে। নরেনের প্রতি পূর্বেই তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই চিঠি পাইবার পর বিজয়ার কাছে বিলাসবিহারীর চেয়ে নরেনের দাবী অনেক বড হইয়া উঠিল। দত্তায় নরেন ও বিজয়ার এই বিবাহ ঘটিয়াছে হিন্দু প্রথায়। নরেন বিলাতফেরৎ হিসাবে হিন্দু সমাজের অস্বীকৃতির লাঞ্ছনাভোগী, সে চিকিৎসক, বিজ্ঞানের ছাত্র, তাহার হৃদয়-বাসনার পূর্ণতার পথে হিন্দু সামাজিকতার প্রশ্ন খুব বড় কিছু নয়, কিন্তু তবু শরৎচন্দ্র বিজয়াকে কিছুটা ঘটনা-পরম্পরায় অভিভূত করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী পাত্র নরেনের হিন্দু ধর্ম অনুসারে নরেনদের ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের সাহায্যে এই বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "দত্তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সবাই একমত। ইহা আনন্দ দিয়াছে প্রায় সর্বশ্রেণীর পাঠককে।" (শরৎচন্দ্র, ১৩৪২, পৃষ্ঠা ৭৪।) কিন্তু সকলের আনন্দবিধান করিলেও লেখকের সমাজ-চেতনাজাত কাহিনীর জোড়াতালিটুকু অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়িবে। *

*'শুভদা' উপন্যাসে শুভদার বিধবা কন্যা ললনার সহিত জমিদার সুরেন্দ্র চৌধুরীর মালাবদলে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু এ অসামাজিক বিবাহকে শরৎচন্দ্র একরূপ অসামাজিক স্তরেই রাখিয়াছেন। ললনা প্রকৃতপক্ষে গঙ্গায় নিমজ্জমানা অবস্থা হইতে তাহার উদ্ধারকারী সুরেন্দ্র চৌধুরীর প্রতি

'বিলাসী' গল্পে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কারের উপর শরৎচন্দ্রের মানবিক ঔদার্য নিঃসন্দেহে কিছুটা আঘাত হানিয়াছে। এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র হিন্দু কায়স্থ সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত মুসলমান কন্যা বিলাসীর বিবাহ ঘটাইয়া যতটা পল্লীসমাজের দৈন্য এবং প্রেম ও কৃতজ্ঞতার জয় দেখাইয়াছেন, নিছক বিবাহের উপর ততটা গুরুত্ব দেন নাই। তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিবাহ করিয়া হিন্দু সমাজের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়াছে বলিয়াও হিন্দু বিবাহ-সংস্কারের দিক হইতে 'বিলাসী'র কাহিনীবৃত্ত দূরে সরিয়া গিয়াছে।

শেষ প্রশ্নের কমলও ঠিক আলোচ্য বিবাহ-সংস্কারের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে। কমল বিবাহের অনুষ্ঠানকে সংস্কারের দিক হইতে মানিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু কমলকে শরৎচন্দ্র হিন্দু সামাজিক পরিমণ্ডল উদ্ভূতা না করিয়া আসামের চা-বাগানের বড সাহেবের বাঙ্গালী বিধবা রক্ষিতার কন্যা করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্বামী ছিল একজন অসমীয়া ক্রীশ্চান, কাজেই কমলের উপর হিন্দু বিবাহ সংস্কারের প্রভাব না পড়িলে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার কথাও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। গোড়ার দিকে অভয়ার স্বামী-সংস্কার আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। রেঙ্গুনে পৌছিয়া অভয়া তাহার প্রতি রোহিণীবাবুর অনুরাগের কথা বড করিয়া ভাবে নাই, তাহাকে দীর্ঘকাল অবহেলা করা স্বামীর কাছে একটু আশ্রয় পাইবার জন্যই সে আকুল হইয়াছে। কিন্তু পরে স্বামীর অমানুষিকতায়

কৃতজ্ঞ, সে সুরেন্দ্রবাবুর রক্ষিতা হইয়াই থাকিতেছে ধরিয়া লইয়াছে, এ মালাবদলের অনুষ্ঠান সুরেন্দ্রবাবুর বড়মানুষীর যেন একটা খেয়াল। তবুও বিবাহ অনুষ্ঠানের পবিত্রতা স্মরণ করিয়া ললনা প্রথমটা সুরেন্দ্র চৌধুরীর বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। বাস্তব দৃষ্টিতে সে নিজেকে রক্ষিতা মনে করিয়াছে। অবশেষে সুরেন্দ্রবাবু যখন বিধবা ললনার নিরাভরণা মূর্তিতে অলঙ্কার পরাইয়া তাহার জ্যোতির্ময়ী রূপ ম্লান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার মত অবস্থার সৃষ্টির জন্য বারবার অনুরোধ জানাইলেন, তখন কিছুটা কৃতজ্ঞতায়, কিছুটা সনিষ্ঠতাজনিত ভালবাসায় এবং কিছুটা নিজের অসহায় অবস্থায় পরিস্থিতির সহিত মানাইয়া লইয়া রক্ষক সুরেন্দ্রবাবুর খেয়াল পূর্তির জন্য ললনা মালাবদলে সম্মত হইল।

হতাশ হইয়া সে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং রেঙ্গুন শহরে রোহিণীকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে। এইভাবে মিলিত হউক বা বিবাহ করুক, মোটের উপর বাংলা দেশের হিন্দু সমাজের, এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরে সুদূর ব্রহ্মদেশে তাহাদের অসামাজিক মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শরৎচন্দ্র হৃদয়ের সহিত সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধে হৃদয়ের পরাজয় সম্ভাবনাকে পাশ কাটাইয়াছেন বলা চলে। 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস, ইহার পটভূমি পৃথক, কিন্তু তবু ইহাতে খ্রীষ্টান ভারতী ও হিন্দু অপূর্বর যে মিলনের ইঙ্গিত আছে তাহার ক্ষেত্রও বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সম্মুখে নয়, ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন শহরে। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনের পথে জাহাজে নন্দ মিস্ত্রি ও টগর বাড়ীওয়ালীর যে প্রচণ্ড প্রেম দেখাইয়াছেন, তাহাতে আর কিছু গভীর বক্তব্য থাক বা না থাক অন্ততঃ এ ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, ব্রহ্মদেশ জায়গাটা তখনকার দিনে হিন্দু বাঙালীদের সমাজবিগর্হিত প্রেমের হিসাবে ভাঙা নৌকার বন্দর। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে হরিশ ও কামিনী বাড়ীওয়ালীর আরাকানও ব্রহ্মদেশের সহর এবং তাহা কিরণময়ী-দিবাকরের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল।

'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'পথনির্দেশ' প্রভৃতিতে শরৎচন্দ্র সমাজের অনুমোদনহীন প্রেমকে বিবাহে পরিণতি লাভ না করাইয়া প্রেমের বেদনাতেই সীমায়িত রাখিয়াছেন। 'পল্লীসমাজ' ও 'দেবদাস'-এ কুলের উঁচু নীচু লইয়া যে সমস্যার কথা বলা হইয়াছে, বর্তমানে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও শরৎচন্দ্রের সময়ে বাংলার পল্লীগ্রামে নীচু ঘরে বিবাহ একটা অত্যন্ত অমর্যাদাকর ব্যাপার ছিল। কৌলীন্য প্রথার দৈন্যসূচক এই মনোভাব সমাজ জীবনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত ছিল বলিয়া সমাজ-সচেতন শিল্পী তাহা কলমের জোরে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। এই বাল্যপ্রেম যৌবনে বিবাহের ভিতর দিয়া স্থায়ী মিলনে সার্থকতা লাভ করিল না, কিন্তু জীবনে সেই প্রেম-সুরভি রহিয়া গেল। ইহার ফল নিরুপায় বেদনা বহন। দুখানি উপন্যাসেই সমাজের অননুমোদিত প্রেম ব্যক্তিকে বিপুল দুঃখ দিয়াছে, কিন্তু সেই দুঃখের বিপরীতে ব্যক্তি সমাজকে আঘাত হানিবার চেষ্টা সামান্যই করিয়াছে। 'বামুনের মেয়ে'তে সন্ধ্যার পিতা প্রিয় বাবুর বংশগত দোষের কথা প্রকাশ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার কুলীন পুত্রের সহিত বিবাহই যে শুধু ভাঙিয়া গেল

তাহা নয়, বিলাত-ফেরৎ অরুণের অভিমান-রুদ্ধ পথ প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণে আপাতদৃষ্টিতে খুলিয়া গেলেও সন্ধ্যা সমাজে আরও অনেক বেশী অপাংক্তেয় হইয়া পড়ায় বস্তুত সামাজিক ভাবে সেই পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল। তাই শিক্ষিত যুবক অরুণ সন্ধ্যাকে ভালবাসিলেও এবং বিলাত যাওয়ার জন্য স্বগ্রামে সে একঘরে হইয়া থাকিলেও সন্ধ্যা তাহার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া গিয়া পিতার হাত ধরিয়া দেশত্যাগ করিয়াছে। 'পথনির্দেশ'-এ ব্রাহ্ম গুণেন্দ্রনাথের পাতের উচ্ছিষ্ট ইচ্ছা করিয়া খাইয়াও হেমনলিনী তাহার সহিত বিবাহের পথ-রচনা করিতে পারে নাই, তাহার বয়োধর্মের চেয়ে, দারিদ্র্য-জনিত তাহার কঠিন বিবাহ-সমস্যার চেয়ে জননী সুলোচনার সমাজ-সংস্কারের ওজন অনেক বেশি এবং সুলোচনা কন্যার এই অসামাজিক বিবাহের কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারে নাই। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের দুর্গামণি ঠিক একই সামাজিক সংস্কার বশে সমাজ-সম্মত ভাবে বৃদ্ধের সহিত আপন একমাত্র কন্যা জ্ঞানদার বিবাহ দিতে রাজী হইয়াছেন। এই বিবাহের ফলে কন্যার বৈধব্য সম্ভাবনা আছে, সেই দুর্ভাগ্য প্রায় নিশ্চিত জানিয়াও দুর্গামণি সমাজকে মানিয়া চলায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। সমাজকে মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই হৃদয়বান জমিদার সুরেন্দ্রনাথের সহিত 'শুভদা' উপন্যাসের বিধবা ললনার মালাবদল করাইয়াও তাহাকে শরৎচন্দ্র গ্রামে পিত্রালয়ে ফিরিবার সুযোগ দেন নাই।

* * * *

পতিতা সমস্যা একটি জটিল সামাজিক সমস্যা। পতিতারা কদর্য জীবন যাপন করে, পুরুষকে পঙ্ককুণ্ডে টানিয়া নামায়, সমাজ যেন নিরুপায় হইয়া তাহাদের যথাসম্ভব দূরে একপ্রান্তে সরাইয়া রাখিয়া দুরারোগ্য ক্ষতের মত তাহাদের অস্তিত্ব সহ্য করে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত মানবতামূলক দৃষ্টি যে সব সাহিত্যিকের, তাঁহারা পতিতাকেও মানুষ বলিয়া ধরিয়া লন এবং জঘন্য জীবন যাপনের মধ্যেও সেই পতিতার ভিতরকার মানবিক সত্তা আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহাদের কাছে পতিতারাও নারী, নারীর স্বভাবধর্ম প্রতিকূল পরিবেশে অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও তাহাদের মন হইতে নারীধর্ম লুপ্ত হয় না।

শরৎচন্দ্র জানিতেন পতিতা চরিত্র সুন্দর করিয়া ফুটাইলে সমাজের

শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তাহা কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাছাড়া পতিতা চরিত্রের উজ্জ্বল ও মনোরম রূপায়ণে সামাজিক মানুষ হিসাবে বাহাদুরির কিছুই নাই, বরং সমাজের কল্যাণ চাহিলে এ বিষয়ে সংযত হওয়াই ভাল।) এই জন্য 'দেবদাস' উপন্যাসখানির প্রকাশে শরৎচন্দ্রের প্রথমে কুণ্ঠা ছিল, কারণ এই গ্রন্থে পতিতা চন্দ্রমুখীর চরিত্র প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে সমুন্নীত হইয়াছে।*

কিন্তু এই সমাজবোধ সত্ত্বেও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র আপন কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়া শেষ পর্যন্ত তদনুসারেই চলিয়াছেন; পতিতাদের জীবন, এমন কি প্রেম চিত্রিত করিবার ব্যাপারে তিনি সুন্দর করিয়া ছবি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহার সৃষ্ট পতিতারা যাহাতে উজ্জ্বল ভাবে রূপায়িত হইবার সুযোগে সমাজের প্রতিকূলতা না করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া পরিণতি আঁকিবার সময় তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র যৌবনে একটু শৃঙ্খলাহীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন, পতিতাদের জীবনের বাস্তব পরিচয়ও তিনি কিছুটা পাইয়াছিলেন। অবশ্য ঠিক উচ্ছৃঙ্খল দুশ্চরিত্র বলিতে যাহা বোঝায়, তিনি বোধ হয় ততটা নামেন নাই, তবে যেটুকু নামিয়াছেন তাহাতে অন্ততঃ পতিতাদের বাঁচিবার ধরণ এবং তাহাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার মোটামুটি ধারণা জন্মিয়াছিল।** তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, পতিতারাও

---

* বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল এক পত্রে লেখেন; "দেবদাস ভাল নয় প্রমথ ভাল নয়।...ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী, ১৩৭০, পৃষ্ঠা ৪৯ হইতে উদ্ধৃত।)

** এই সময়কার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয়কে লিখিত একখানি চিঠিতে বলিয়াছিলেন: "নারী জাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোন কালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সেসব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর কেউ বা বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থাতেও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয়নি। তার কারণ এই নয় যে আমি অত্যন্ত সাধু, সংযত,

মানুষ, পতিতা হিসাবে হীনতা তো তাহাদের আছেই, মানুষ হিসাবে বিবিধ সদ্‌গুণ হইতেও তাহারা একেবারে বঞ্চিত নয়। বিশেষতঃ নারী-মনের সাধারণ যে ধর্ম, নিজস্ব একটি শান্তি-নীড় রচনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও পতিতা নারীর অন্তরে লুকানো থাকে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয় বলিয়া সে আকাঙ্ক্ষার হয়তো স্ফূর্তি ঘটে কম, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মনে তাহাদের থাকেই। পতিতাদের মন আছে, বাসনা কামনা আছে, মনের ভুলে বা পারিপার্শ্বিকের চাপে পতিতা জীবন যাপনের জন্য গ্লানিবোধ আছে, সমাজের পুরস্ত্রীদের মত মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে না পারার বেদনা আছে। আর সেইসঙ্গে আছে জাল পাতিবার শক্তি, ছলনা-বিলাস, উগ্র আসক্তির আত্মঘাতী উন্মাদনা, উদ্দাম জীবনযাত্রার ফেনিল রূপ। উল্লিখিত সমস্তই শরৎচন্দ্রের জানা ছিল, তবে এ হিসাবে বড় কথা হইল তাঁহার সাহিত্যকৃতিতে তিনি সুবিধা পাইলেই পতিতাদের মানবিক সহানুভূতির স্পর্শে তাহাদের নিজস্ব বদ্ধ পঙ্কিল পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে মানবিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে, শরৎচন্দ্রের পতিতা পতিতার বাস্তবরূপ নয়, তাঁহার পতিতালয় বা পতিতা-পল্লীতে কলঙ্কিত পরিবেশের স্পর্শ নাই।* তাছাড়া তাহাদের আচার আচরণ ও ভাব সত্যকার পতিতাদের মত নয়। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা তাহা নহে। সত্যই শরৎচন্দ্র পতিতালয়ের বহুশ্রুত পঙ্কিল আকৃতি-প্রকৃতি বেশি ফুটান নাই। এই বস্তুগত চিত্র অঙ্কনে একালের বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে অধিকতর স্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', 'আঁধারে আলো'র

নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারিনে তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎপরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮০ হইতে উদ্ধৃত।)

* সাহিত্যিক 'বনফুল' মাখনলাল রায় চৌধুরীর 'শরৎসাহিত্যে পতিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন: "শরৎবাবুর 'পতিতা'গুলিতে 'পতিতা' চরিত্র ততটা পরিস্ফুট হয় নাই, যতটা হইয়াছে নারী-চরিত্র।"

পতিতালয় বাস্তবতার হিসাবে সমরেশ বসুর 'ছিন্নবাধা'র পতিতালয়ের সমান নয়। কিন্তু পতিতা চরিত্রের মানবিক রূপ বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য এই কারণেই ম্লান হইয়া যায় না। পতিতা প্রেমের অভিনয় করিয়া খরিদ্দার ভুলায়, বাস্তবে প্রেম করা তাহার বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয় এবং ইহাতে তাহার প্রতারিত হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু তবু মানুষ বলিয়া, নারী বলিয়া মাঝে মাঝে সে বৃত্তি বা পরিবেশের ঊর্ধ্বেও উঠিয়া যায়। এ অবস্থায় যদি সামাজিক মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জোরে সামাজিক অধিকার সে দাবী করে, তখন সমাজ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, লড়াইয়ের শক্তি তাহার সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাকেই এক্ষেত্রে পরাজয়ের বেদনা লইয়া সরিয়া যাইতে হয়। অবশ্য এই সংঘর্ষের প্রশ্ন না আসিলে পতিতাও মানবিক গুণে উজ্জ্বলতা লাভ করে। 'শুভদা' উপন্যাসে পতিতা কাত্যায়নী তাহাতে আসক্ত কপর্দকহীন হারাণকে তাহার সাংঘাতিক সাংসারিক অর্থসংকটের সময় টাকা দিয়া সাহায্য করিল, ইহা মানবিক বদান্যতা, ইহাতে সমাজসংঘর্ষ নাই। কিন্তু পতিতা যদি সামাজিক পুরুষকে ভালবাসিয়া বসে, সাধারণতঃ সমাজের সহিত তখনই সংঘর্ষ দেখা যায় এবং ফলে এই নারীর কপালে দুঃসহ দুঃখ জুটে। শরৎসাহিত্যে অধিকাংশ পতিতার অদৃষ্টে এই দুঃখ জুটিয়াছে। এইজন্যই 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাসের দাসী হইয়া সঙ্গে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও চন্দ্রমুখীর পূর্ণ হয় নাই, 'আঁধারে আলো' গল্পে বিজলী সত্যেন্দ্রের স্ত্রীপুত্র-সমন্বিত সাজানো সংসার সন্দর্শন করিয়া সত্যেন্দ্রের ছবিখানি মাত্র সম্বল করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে শূন্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দীর্ঘ চার খণ্ডেও শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে তাহার দেবতার চেয়ে আপন শ্রীকান্তকে লইয়া নারী-জীবনের সার্থকতামণ্ডিত একটি শান্তিময় গৃহনীড় রচনা করিয়া দিতে পারেন নাই। 'চরিত্রহীন'-এ সতীশকে ঘিরিয়াই সাবিত্রীর জীবন, সেই সতীশকে নিরুপায় হইয়া সে সরোজিনীর হাতে তুলিয়া দিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রী উপেন্দ্রের সেবা করিতে গেল, উপেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার জন্য যে জীবন পড়িয়া থাকিবে তাহা নিরাশ্বাস বেদনায় ধূসর। তবে এইরূপ গভীর দুঃখ সত্ত্বেও সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, শরৎসাহিত্যে পদস্খলিতা বা পতিতাদের মানবিক মূল্য সুযোগ মাত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতি শরৎচন্দ্র শুধু সহানুভূতি নয়, মানুষ হিসাবে

এক ধরণের শ্রদ্ধাও দেখাইয়াছেন। * এই সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার পরিণাম তাহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া নয়, সমাজের উপর আবেগজনিত আঘাত শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে অবশ্যই করিতে চান নাই। এই সব পতিতা বা পদস্খলিতা নারীকে মানুষ হিসাবে আঁকিয়া দোষ-ত্রুটি-হীনতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তাহাদের মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাইয়া পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইভাবে হৃদয়গ্রাহী রূপে পতিতা চরিত্রের রূপায়ণ করিয়া শরৎচন্দ্র সামাজিক মানুষকে তাহাদের উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং ফলে সমাজ-শৃঙ্খলায় আঘাত পড়িয়াছে,—শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার প্রমাণ কাহিনীর পরিণতিতে রাখিয়া শরৎচন্দ্র এরূপ অভিযোগ আপন সাহিত্যিক নিষ্ঠার জোরে উপেক্ষা করিয়াছেন।**

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য: "শরৎচন্দ্রের মহত্ত্ব এই যে, তিনি পতিত নারীর সঙ্গে পতিতা নারীর ভুল করেন নাই। তাঁহার বাস্তবসম্মত লেখনী পতিত নারীকে সামাজিক মর্যাদায় ফিরাইয়া লইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের মানবিক মহত্ত্বের উপরেও প্রতিষ্ঠিত করিতে ভোলে নাই। সামাজিক মর্যাদাই একমাত্র মর্যাদা নয়, মানবিক মর্যাদা বলিয়াও একটা বস্তু আছে। তাহার মূল্য অপরটির চেয়ে অল্প নয়। সেই অত্যুচ্চ পীঠস্থানে তিনি পতিত নারীদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এখানেই তাঁহার করুণা মানবিক মহত্ত্বের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর উন্নত ললাট পৌরাণিক সাবিত্রীর প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। খুব সম্ভব লেখকের জ্ঞাতসারেই সাবিত্রী নামের মধ্যে এই রকম একটা ইঙ্গিত বর্তমান।"—('বাংলা সাহিত্যে নরনারী'—'সাবিত্রী' প্রবন্ধ।)

** প্রেসিডেন্সী কলেজের এক সাহিত্যসভায় (১৯২৩) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন: 'আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তাঁরা করেছেন, তাই বলে খুনী আসামীর মতো তাঁদের ফাঁসি দিতে হবে নাকি? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোনো মানুষকে নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারিনে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই। ভাল মন্দ

হীন পরিবেশে যাহারা বাস করে অথবা যাহাদের শোষিত, বঞ্চিত, বর্ণহীন জীবন, তাহাদের মানবতামূলক দৃষ্টিপাতে ফুটাইবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মর্যাদা দিতে পারে এমন গুণ বা প্রকৃতি তাহাদের ভিতর আছে কিনা শরৎচন্দ্র তাহা সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পঙ্কিল পরিবেশে হীন জীবন যাপনকারীর মধ্যেও কিছু মানবিক মূল্য আছেই এবং সামগ্রিক রূপায়ণে সে মূল্য ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। যখন এই মূল্য প্রকাশিত হয়, তখন হীনতা ও দৈন্য হইতে সে যে মুক্তি পাইয়া যায় এমন নয়, হীনতার দাম তাহাকে দিতেই হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া অখণ্ড মানুষ হিসাবে সে যেমন উজ্জ্বল হয়, ক্লেদাক্ত জীবনায়নের বিষণ্ণ পরিবেশে তেমনি কিছুটা স্বস্তির আশ্বাস মিলে। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যে ধরণের চরিত্র সমাজে অসহায়ভাবে শোষিত বা লাঞ্ছিত হয়, তাহাদের রূপায়ণে শরৎচন্দ্র উৎসাহী ছিলেন। এইরূপ চরিত্রের অঙ্কনে অনেক সময় ইহার হীনতা যে শুধুমাত্র ইহাদেরই ত্রুটিজাত নয়, চরিত্রের সহজাত নয়, স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশের বা জীবনাপনের অভাবেও ইহা উদ্ভূত হইতে পারে, পরিবেশের বা সমাজের দায়িত্বও এজন্য থাকিতে পারে, এমনকি এই হীনতার পিছনে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণ থাকাও বিচিত্র নয়, এরূপ চিন্তা ঔপ-ন্যাসিকের হওয়া স্বাভাবিক। মানবিক মূল্যবিচারে, বলা বাহুল্য, এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব যথেষ্ট। এইভাবেই শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রতিকূল পরিবেশের বা সমাজের অন্যায় বিধিবিধানের চাপে অথবা

দুই সবার মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করবো? অবশ্য আমি কখনও বলি না যে পাপ ভালো। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না। আমি বলি তাদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদের কোন অধিকার নেই।

আমি এমন অনেক জিনিষ অনেক সময় তাদের মধ্যে পেয়েছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই।...আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভালো দেখাতে চেয়েছি; কারণ তাকে discard করবার আমাদের right নেই। যেখানে বড় জিনিষ আছে, তাকে সম্মান করতে হবে।"—(শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ, ১৩শ সম্ভার, 'অপ্রকাশিত রচনাবলী'।)

স্বার্থপর ক্ষমতাবানদের শোষণে যাহারা অসহায়ভাবে দুঃখবরণে বাধ্য হয় তাহাদের বেদনার্দ্র ছবিগুলি। আপন আয়ত্তের অতীত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এইসব চরিত্র যে গ্লানি সহ্য করে, তাহার করুণ রস শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের শিল্প-সুষমামণ্ডিত হইয়া পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। দুঃখীর দুঃখ অবিলম্বে কমিবার সম্ভাবনা হয়তো নাই, কিন্তু সেই দুঃখ সাহিত্য-পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া হীনতার মূলে যে দুর্নীতি বা অভাব তৎপ্রতি জনমত গড়িয়া তোলে। এইজন্য সাহিত্যিকের কলমকে ন্যায়যুদ্ধের সৈনিকের তরবারি বলা হয়। বহু-প্রচারিত 'শিল্পের জন্য শিল্প' (Art for Art's sake) মতবাদের সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সাহিত্যিক অবদানের মূল্য অপরিমেয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রসসৃষ্টির দিক হইতে উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু সামাজিক কথা-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার এই সমাজচেতনার ঐশ্বর্যও কম নয়। সরযূ, জ্ঞানদা, গফুর, মৃত্যুঞ্জয়, বিলাসী, হরিচরণ, কাঙালী, সাগর সর্দার, ষোড়শী, কমললতা, অনুপমা, রমা, মাধবী,—ইহারা সকলেই সমাজের অথবা সামাজিক শক্তিতে শক্তিমান ব্যক্তির দ্বারা নিপীড়িত, সকলের দীর্ঘশ্বাসেই প্রচণ্ড বহিরঙ্গ-পেষণ-ক্লিষ্ট মনের বেদনা স্পন্দিত হইয়াছে। অথচ ইহাদের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহারা নিজেরা ততটা দায়ী নয়। এই ধরণের সমস্ত চরিত্রই শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পাইয়াছে, কোন কোন সময় তাঁহার অন্তর-উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি বুদ্ধি বা যুক্তিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।* মোটের উপর চরিত্রগুলির নিজস্ব মূল্য ছাড়াও লেখকের এই সহানুভূতি পাঠকের মন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করে।

*'অনুপমার প্রেম' শরৎচন্দ্রের অপরিণত গল্প, কিন্তু লেখকের হৃদয়বোধের দিক হইতে গল্পটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। বেচারী অনুপমা বিধবা, তাহার দাদা চন্দ্রবাবু নিজস্বার্থে তাহার প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে, তাহার ভালবাসার পাত্র সুরেশের সঙ্গে বিবাহ না দিয়া বিবাহ দিয়াছে অতিবৃদ্ধ রাম-দুলাল দত্তের সঙ্গে, তারপর বিধবা বোনের মিথ্যা চরিত্র-কলঙ্ক প্রচার করিয়াছে। ললিত গ্রামের ছেলে, আগে সে ভাল ছিল না, নেশাভাঙ করিত, অনুপমার দিকে তাহার নজর ছিল। সে জেলে গেল, কিন্তু জেল হইতে ফিরিয়া তাহার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। সে মানুষ হইল। এদিকে দাদার অত্যাচারে অস্থির হইয়া অনুপমা একদিন জলে ডুবিয়া মরিতে গেল, তাহাকে বাধা দিল ললিত। বিধবা অনুপমা চোখ মেলিয়া দেখিল সে ললিতের ঘরে শুইয়া, ললিত তাহাকে

শরৎসাহিত্যে যে সব পতিতা বা পদস্থলিতা নারীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেগুলিতে নিরুপায় অসহায়তার জন্য, আগেই বলা হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি তাহাদের দিকে। চরিত্র প্রধানতঃ পারিপার্শ্বিকের জন্যই হীনতায় নিমজ্জিত হয়, তখন সমাজ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, ইচ্ছা থাকিলেও মুক্তির পথ সে খুঁজিয়া পায় না। তখন তাহার বর্তমান ক্লেদাক্ত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবু পতিতা-জীবনের গ্লানি বহিলেও তাহার ভিতর দেবতার অস্তিত্ব বর্তমান,—ইহাই শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়, কিন্তু তাহারই মধ্যে জগৎ ও জীবনকে মানুষের মন লইয়া স্পর্শ করিবার আকুতি এবং সঙ্গতি সে একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। তবে হারাইয়া ফেলিলেই বুঝি ভাল হইত, তাহা হইলে অসম্ভবের দিকে হাত বাড়াইয়া ব্যর্থকাম হইবার ট্র্যাজেডির বেদনা তাহাকে ভোগ করিতে হইত না এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় আপন অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতি বিমুখতা সৃষ্টিতে তাহাকে অতিরিক্ত দুঃখ পাইতে হইত না। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, বিজলীর মত শরৎসাহিত্যের পতিতা-পদস্থলিতারা প্রেমের তীর্থযাত্রায় সঙ্গতিহীনা নয়, কিন্তু প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানে তাহাদের অতীত মুছিয়া ফেলা যায় না বলিয়া তাহারা এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অনধিকারিণী। সমাজের বাহিরে ব্যক্তি-মনের যে ঐশ্বর্যই থাক, সমাজের ভিতরে তাহার চলার পথ সামাজিক বিধিবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'শুভদা' উপন্যাসে হারাণ মিথ্যুক, গুলিখোর, দুর্বৃত্ত। রুগ্ন বুভুক্ষু পুত্রের নাম করিয়া এই হারাণ বেশ্যা কাত্যায়নীর কাছে কিছু টাকা চাহিল, কাত্যায়নী করুণায় আর্দ্র হইয়া তাহার সামান্য সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া হারাণকে দশটি টাকা দিল। হারাণকে কাত্যায়নী বলিল; "ঠাকুর করুন, তোমার যেন চোখ ফোটে।... তোমার অহিত আমি চাইনে, ভালর জন্যই বলি এখানে আর এসো না, গুলির দোকানে আর ঢুকোনা—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রীপুত্র দেখোগে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে

বাঁচাইয়াছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে 'শুভদা' উপন্যাসে শুভদার বিধবা কন্যা ললনার মন যেমন জীবনদাতা সুরেন্দ্র চৌধুরীর দিকে ঝুঁকিয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। 'অনুপমার প্রেম' গল্পটি ততটা বুদ্ধির বা যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, যতটা হৃদয়ের উপর। বিশেষতঃ ইহার পরিণতিতে শরৎচন্দ্রের মানবিক বোধের বিশেষ পরিচয় মিলে।

এসো।" এখানে পতিতা কাত্যায়নী ভদ্রসন্তান হারাণের চেয়ে মনুষ্যত্বে অনেক বড়। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, দুর্বৃত্ত হারাণের বিপরীতে কাত্যায়নীর এই মহৎ ভাব প্রকাশিত হইলেও সমাজে তাহার কোনই মর্যাদা নাই। শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধানের বিপরীতে বেশ্যা কাত্যায়নীকে সামাজিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করেন নাই বা সে কথা ভাবেন নাই। তিনি শুধু বেশ্যাও যে মানুষ এবং তাহার হীনবৃত্তির জন্য সে সর্বাংশে হীন হইয়া যায় নাই, তাহার মধ্যে মানবিক কোন কোন গুণ আছে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় সেই গুণ প্রকাশ পাইতে পারে,—ইহাই দেখাইয়াছেন। কাত্যায়নীর মত সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বাংশে অবহেলিত চরিত্রের এই সম্ভাব্য মনুষ্যত্বের পরিপ্রকাশেই শরৎচন্দ্রের তৃপ্তি। 'শুভদা' উপন্যাসের আর একটি ক্ষুদ্র পতিতা চরিত্র সুরেন্দ্র চৌধুরীর রক্ষিতা জয়াবতীর দরদী মনের ছবিটিও শরৎচন্দ্র এই তৃপ্তির জন্যই আঁকিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র মানবতাবাদী ছিলেন বলিয়াই মানুষের জীবনের সমগ্র মূল্যে মানুষকে বিচার করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন এবং সে হিসাবে নারীর পতিতাবৃত্তি গ্রহণ বা পদস্খলনের মত গুরুতর ব্যাপারকেও তিনি তাহার সমগ্র পরিচিতির মাপকাঠি বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্যই তাঁহার সাহিত্যে তিনি মাতাল, চরিত্রহীন, ভ্রষ্টা বা পতিতা চরিত্রকে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের অসামাজিক তথা হীন দিকটির সহিত ভিতরকার মানবিক বৃত্তিসংস্থানও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এইভাবে চরিত্রে পূর্ণতার আমেজ আনিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রে ভাল মন্দ সব কিছু বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক কুপ্রিণের 'ইয়ামা' উপন্যাসে পতিতা চরিত্রগুলির এবং পতিতালয়ের ভালমন্দ সব দিক খুঁটাইয়া দেখাইবার যে চেষ্টা আছে, বাঙ্গালী সামাজিক লেখক শরৎচন্দ্র ঠিক অনুরূপ চেষ্টা করেন নাই; পক্ষান্তরে ইহাদের মনুষ্যত্ব বা মানবিক যে দিক তিনি ফুটাইতে চাহিয়াছেন, হীনতার চেয়ে সেই দিকটি বা দিকগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এছাড়া এই দুর্ভাগিনীদের দৈনন্দিন জীবনে বা তাহাদের বাসভূমিতে যে পঙ্কিলতা ও গ্লানি পুঞ্জীভূত, শরৎচন্দ্র বাস্তব চিত্রায়ণের উৎসাহে সে ছবি শুধু শুধু পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চাহেন নাই দেহগত ভোগলালসার ছবি আঁকায় তো তাঁহার কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এই অর্থে শরৎচন্দ্রকে বরং একধরণের সম্ভোগ-বিরোধী নীতিবাদী বা পিউরিটান (puritan) বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাহিনীর বিষয়বস্তুর ভিন্নধর্মিতার

জন্য এইরকম হীন বা কলঙ্কিত জীবনরূপ আঁকিবার প্রয়োজনই কম বোধ করিয়াছেন, যেটুকু প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও তিনি অতিসংক্ষেপে সারিয়াছেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য ততটা নীতিবাদী নন, কিন্তু তিনি পারতপক্ষে বাস্তবতার নামে ভোগলালসার অশ্লীলতার চিত্রায়নে নিরুৎসাহ।* যাহা হউক, এইরূপ ভ্রষ্ট বা কদাচারী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের মত কোন ভাব যদি লুকাইয়া থাকে, সেই হৃদয়-ভাবের উজ্জ্বল প্রকাশে শরৎচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স যে দরদ ও আবেগ লইয়া 'এ টেল অফ টু সিটিস্' (A Tale of Two Cities) উপন্যাসে মাতাল অথচ মহৎ সিডনি কার্টনের অনুপম চরিত্রটি আঁকিয়াছেন, ঐরূপ দরদে ও আবেগে হীন পরিবেশের চরিত্র-অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আগেকার লেখকদের মত চিন্তা বা কর্মের রূপ ও রীতি সোজাসুজি দুইভাগে ভাগ করিয়া পাপপুণ্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মূল্যবোধ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া পাপ এবং পাপী এই দুইটি পৃথক শব্দ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পার্থক্য তাঁহার ছিল। প্রত্যেক সাধুর যেমন অতীত আছে, প্রত্যেক পাপীরও তেমনি ভবিষ্যৎ আছে এই শাস্ত্রীয় আশ্বাসবাক্যে শরৎচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের চরিত্র জন্মগতভাবে পাপ করে না, ইচ্ছা করিয়া পাপ করার জন্য পাপ করে না, না বুঝিয়া বা ভুল করিয়া, বড় জোর পরিবেশের চাপে আচ্ছন্ন হইয়া অথবা বাধ্য হইয়া পাপ করে। পাপের জন্য দুঃখ সে যাহা পাইবার পায়, কিন্তু শরৎচেতনা স্বীকার করে না যে, পাপের পঙ্কশয্যাই এইরূপ পাপীর একমাত্র আশ্রয়। এজন্যও যখন সামাজিক চাপে পঙ্কিল পরিবেশের মানুষ মুক্তির মানস-সঙ্গতি সত্ত্বেও পাপপঙ্কে ডুবিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তখন তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত শরৎচন্দ্রের দীর্ঘনিঃশ্বাস এক হইয়া যায়, এই ধরণের লেখায় শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারের

---

* ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে লেখা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে শরৎচন্দ্রের সামাজিক মনের পরিচয় মিলিবে: "তার ('চোখের বালির') নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটার বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির উমা। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই: পরে কি করিব কি জানি!'—(শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—২৯)

যে আকুলতা আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল মনে হয়, তাহা পাঠকমনে সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যতে নূতন মুক্তিপথের সন্ধান দিবে, এই আশ্বাসও যেন ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের লেখায় যাহা মন্দ তাহা অল্প আলোচিত হইলেও মন্দই, তাহা ভালো হইয়া যায় না, যদিও যে মনে এই মন্দ আশ্রিত সেই মন ইহার চেয়ে অনেক বড় বলিয়া ইহাতে ভালোর জায়গারও অভাব হয় না। অবশ্য যখন চরিত্র সমগ্রভাবে ফুটিয়া উঠে, তখন মন্দকে ফুটাইবার চেয়ে ইহার অন্তর্লীন ভালোকে ফুটাইতে শরৎচন্দ্র বেশী পছন্দ করিতেন বলিয়া মন্দত্বের গ্লানিময় রূপ অনেকস্থানে কিছুটা ফিকে হইয়া গিয়াছে। তবে শরৎচন্দ্রের এই 'ভালো' মানবহৃদয়ের প্রেমে বা অপর কোন মহান্ বৃত্তিতে যেখানে কেন্দ্রায়িত, সেখানেও তাহার স্বরূপ সত্যকার ভালো বলিয়া সমকালীন সমাজে অনেক সময় স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য বাঙ্গালী সমাজের তৎকালীন বাস্তব সংগঠনই দায়ী। সমকালীন সমাজ-দৃষ্টির সহিত শরৎচন্দ্রের নিজের দৃষ্টির এই সংঘাত বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের নিম্নোক্ত কথা কয়টি হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে: "মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে তাহ অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। শরৎচন্দ্রের রচনায় অশ্লীলতার মূল হইতেছে এইখানে এবং এইজন্য কঠোর নীতিপরায়ণ Puritanগণ তাঁহার রচনায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন, যদিও তিনি নিজেই একজন Puritan। মানুষের ভ্রান্তি দুর্বলতার জন্য তাঁহার অফুরন্ত দরদ।"—(শরৎচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪৮।)*

*একালের বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিকরাও এই ভালমন্দ-জটিল-মনযুক্ত সমগ্র মানুষকে আঁকিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সমগ্র চরিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহারা মূলতঃ যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণে চরিত্রটি হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার উপর বেশী জোর দেন, আর সেইসঙ্গে হীনতার ছবি বিস্তারিত ভাবে ফুটাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে বাস্তবতার অনুপূরক এই বিস্তারিত রূপায়ণ। লেখকের যদি রাজনৈতিক প্রবণতা থাকে তাহা হইলে এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সমকালীন রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট সাহিত্যকৃতিতে উপলক্ষ্য অনেকসময় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

স্বভাবতঃই এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র ফুটাইতে গিয়া পটভূমিকার বিস্তৃত বর্ণনা ও চরিত্রের অভাবাত্মক দিকগুলির উপর বেশী জোর পড়ে, সদর্থক দিক-

'শরৎচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর লেখক, প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইতেই তাঁহার লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে সুরু হইয়াছে। কাজেই তাঁহাকেও এ যুগের লেখক বলা চলে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ যুগে যে সব ঔপন্যাসিক আধুনিক বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য আছে। তিনি বস্তুবাদী বিশ্লেষণ-ধর্মী না হওয়ায় তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর ছবি মোটামুটি চরিত্রের সমগ্রতায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পটভূমিকার সাধারণ প্রভাব সেগুলির উপর পড়িলেও চরিত্রগুলিতে মানবিক ভাবস্পর্শের একটা প্রবণতা আছে। লেখকের ভাবদৃষ্টিও এগুলির রূপায়ণে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাছাড়া আধুনিক বস্তুবাদী কথাসাহিত্যিকরা চরিত্রের বস্তুগত রূপদানের চেষ্টায় তাহাদের সংস্কারের মূল কারণ বিবৃত করিয়া বা সংস্কারের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবেই সংস্কারকে চরিত্র বিবর্তনে ব্যবহার করেন, শরৎচন্দ্র কিন্তু এই মূল নিরূপণের দিকে না গিয়া সংস্কারকে অধিকাংশস্থলেই চরিত্রের সহজাতরূপে অঙ্গাঙ্গী করিয়া দেখিয়াছেন। এইজন্য শরৎসাহিত্যে হীন, পদস্খলিত বা পতিতাদের জীবনপথ, যে পরিবেশে তাহারা থাকিতে বাধ্য হয় বা যে নূতন পরিবেশে তাহারা ঘটনা-প্রবাহে গিয়া পড়ে, তাহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা ততটা নির্ধারিত হয় না যতটা হয় তাহাদের সহজাত সংস্কার বা হৃদয়ধর্ম অনুযায়ী। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমের পরীক্ষাতেই প্রধানতঃ তাহারা সুখ বা দুঃখ পায়, সেই সুখ দুঃখ দিয়াই তাহারা যেন আত্মপরিচয় দেয়, তাহাদের পরিবেশ, বৃত্তি, আচার-আচরণ, অন্য সব কিছু যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।'

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসে নায়িকা 'বসন্ত'র ছবি আঁকিয়াছেন। বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, 'আঁধারে আলো'র বিজলীর মতই সে নাচ গান করে, আবার দেহও বেচে। বসন্তও ভালবাসিয়াছে, ভালবাসা দ্বারা দূরের প্রেমাস্পদ নিতাই কবিয়ালকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার একধরণের জয়ও হইয়াছে, কিন্তু যে পরিবেশকে বসন্ত চেনে, যাহার বাহিরের জগৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেই পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া আপন বৃত্তি আঁকড়াইয়া থাকিয়াই সে প্রেমিকার

গুলিতে তেমন দৃষ্টি পড়ে না। তাছাড়া শাশ্বত সৌন্দর্য ও আনন্দের আবেগ এই বিশ্লেষণমুখিতায় উপেক্ষিত হয় বলিয়া জীবনের কল্যাণবোধের দিকেও আসক্তি কমিয়া যায়।

অত্যন্ত গতিশীল ভূমিকা লইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র বিজলী বা দেবদাসের চন্দ্রমুখী প্রেমিকা হিসাবে একটু ভিন্নশ্রেণীর। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে তাহাদের পরিচিত জীবনের সব কিছু ওলট পালট হইয়া গেল। তাহাদের আপন পরিবেশ সম্পর্কে সংস্কার আগে তীব্রই ছিল, কিন্তু এই পরিবেশকে ভাল তাহারা ততক্ষণই বসিয়াছে যতক্ষণ তাহাদের মনে প্রেমের আলো না জলিয়াছে। প্রেম জাগিবার পরই তাহারা যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রমুখীর তবু কিছুদিন সময় লাগিয়াছে, বিজলীর পরিবর্তন একরূপ সঙ্গে সঙ্গে। বিজলী সত্যেন্দ্রকে লইয়া খেলা করিতেছিল, আত্মসম্বিৎ ফিরিবার আবেগে সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে আঘাত দিয়া চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই বিজলী পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিল, তাহার অনুরাগী পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়া দিল সে আর এ পথে থাকিবে না।* শরৎচন্দ্রের এই মেয়েরা প্রেমের মিলনাত্মক প্রতিদান পায় নাই, ন্যায্যতঃ প্রতিদানই পায় নাই, তবু প্রেমের মহিমায় তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত পতিতা জীবন চিরকালের জন্যই যেন অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য বিজলী ও চন্দ্রমুখী উভয়েই উত্তরকালে একবার পুরাতন পরিবেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দুজনেরই সে অবস্থায়

* 'আঁধারে আলো'তে এইখানে আছে, "বিজলী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবনের সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবু যে এটা নারীদেহ! ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।...হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু'পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পারব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেচে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্যে মরে গেল বন্ধু।"

পুরাতন জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। অভাবের তাড়নায় কোন পথ না পাইয়া বিজলী সত্যেন্দ্রের বাড়ী তাহার ছেলের অন্নপ্রাশনে নাচগান করিতে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে সত্যেন্দ্রের স্মৃতি বুকে লইয়াও সৎজীবন যাপন করিতে পারিল না, পেটের দায়ে আবার বাইজী জীবনের পঙ্কিলতায় ফিরিয়া আসিল, এই অনুশোচনাতেই সে যেন আর মাথা তুলিতে পারে নাই, নাচগান তো দূরের কথা। উপন্যাসের এই জায়গাটির করুণ বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতেই বিজলীর ভাঙ্গা মনের অবস্থা বুঝা যাইবে: "অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজলী মাথা হেঁট করিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা যে এমন দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তা সে ঘণ্টা দুই পূর্বে কল্পনা করিতে পারে নাই।" 'দেবদাস'-এ চন্দ্রমুখী দেবদাসকে একদিন না একদিন এই পতিতাপল্লীতে ফিরিয়া পাইবে, শুধু এই আশাতেই গিল্টির গহনায় গা সাজাইয়া পুরাতন পাড়ায় দেহ-বেচা ব্যবসার অভিনয় করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিজলী বা চন্দ্রমুখীর প্রেমের জীবনে অভ্যস্ত পূর্বজীবনের কোন সংস্কার প্রভাব বিস্তার করিল না বা সেই জীবনের জন্য কোন আকর্ষণ তাহাদের ভিতর দেখা গেল না। সত্যেন্দ্র বা দেবদাস চলিয়া যাইবার পরই বিজলী ও চন্দ্রমুখীর প্রকৃতিগত বিশেষ রূপান্তর ঘটিল। অত্যন্ত অনিশ্চিত, শূন্য, আশাহীন জীবন বরণ করিয়া লইয়া নিজেদের তিল তিল করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াই যেন তাহারা শান্তি পাইবে। তাহাদের কাছে প্রেমাস্পদের স্মৃতিই সব, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, একথা তাহারা ভাল করিয়াই জানে। লেখকের সমাজচেতনা তাহাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে, পতিতা এই নারীরা নিজেদের হীনবৃত্তির অভিশাপে আপনাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদের প্রেমিক গৃহস্থ সন্তানদের সহিত প্রকৃত মিলনের কোন আশাই তাহারা অন্তরে পোষণ করে না। এ অবস্থায় ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মত দুঃখের কঠিন পথ না বাছিয়া লইয়া তাহারা তাহাদের বৃত্তিগত চিত্তবিলাসে উত্তেজনাকর পতিতা জীবনের আবেগে গা

ভাসাইয়া দিতে পারিত, যে প্রেমাস্পদের কাছে তাহারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাদের আয়ত্ত করিবার জন্ত বৃত্তিগত ছলাকলা চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে পারিত, চরম ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ক্ষেপিয়া গিয়া প্রেমাস্পদের প্রতি, এমনকি সমগ্রভাবে পুরুষজাতির প্রতি প্রতিশোধকামিনী হইতে পারিত, কিন্তু সে সব কিছুই না করিয়া অবহেলিতা পরিত্যক্তা পুরস্ত্রীদের মতই তাহারা যেন চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু-পিচ্ছিল পথ আশ্রয় করিল। প্রেমাস্পদের স্মৃতি সম্বল করিয়া পতিতা নারীর এই দুশ্চর তপস্যা তাহাদের বৃত্তি, শিক্ষা বা অভ্যস্ত জীবনের হিসাবে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি, কিন্তু বস্তুবাদী সম্ভাব্যতা যদিই বা একটু সন্দেহজনক হয়, এ ছবি শরৎচন্দ্রের বিশেষ ভাবদৃষ্টির পরিচায়ক। আসলে শরৎচন্দ্র পতিতা বিজলী-চন্দ্রমুখীকে নারী বলিয়াই মনে করেন এবং নারীর অন্তর-লাবণ্য উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ আসায় আপন বিশিষ্ট জীবনবোধ অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে অনুরূপ প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী-চরিত্রের মতই আবেগবতী ও নিষ্ঠাবতী করিয়া আঁকিয়াছেন। নৈষ্ঠিক প্রেম যখন প্রেমের ব্যবসাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের অন্তর উদ্ভাসিত করিয়াছে, সত্যকার প্রেমের জন্য দুঃখবরণ করিতে তাহারা ভদ্রকন্যাদের চেয়ে পিছাইয়া থাকিবে না। একজন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের পুলকে বহুবল্লভার উদ্দাম জীবনের জন্য তাহাদের আর আকর্ষণ থাকে না। যদি এই মেয়েরা সমাজের অভ্যন্তরে প্রেম-পরিশুদ্ধ আশ্রয় পাইত, তাহা হইলে জাগতিক কোন দুঃখই তাহারা গ্রাহ্য করিত না, পতিতালয়ের কলঙ্কিত পরিবেশে তাহারা আর কখনই ফিরিত না।

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র এই যে চন্দ্রমুখী-বিজলীর মত পতিতা চরিত্রের প্রকৃতি পরিণতি দেখাইয়াছেন, ইহা যতখানি তাঁহার স্ত্রীজাতির তথা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রসূত, ততটা বাস্তবসম্মত নয়। পতিতাকে পতিতা রাখিয়াও তাহার মধ্যে মানবিক স্পর্শ তিনি যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পতিতা চরিত্র 'শুভদার' কাত্যায়নীতে আঁকিয়াছেন, সেইরূপ পতিতার ছবি বিশ্বসাহিত্যে প্রচুর, বাংলা সাহিত্যেও কিছু আছে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কিন্তু এরূপ নয়। 'চরিত্রহীন'-এ আরাকানের কামিনী বাড়ীওলির মধ্যে বাস্তব পতিতারূপের স্পর্শ আছে, কিন্তু কামিনী নগণ্য পার্শ্ব চরিত্র মাত্র। শরৎচন্দ্রের পতিতা বা পদস্খলিত নায়িকাদের সমাজের বাহিরেই স্থান, তবু শরৎচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি প্রসন্ন হৃদয়ভাবের স্পর্শে তাহারা কদর্য জীবনের রূঢ়তা হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ

করিয়াছে। এইরূপ চরিত্র কতটা বাস্তবধর্মী হইতে পারিয়াছে তাহা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু একথা ঠিক যে পতিতা নারীকে মানুষরূপে দেখিবার এবং মানুষের মর্যাদায় তাহাকে প্রতিকূল পরিবেশেও আঁকিবার চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে।

'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী বা 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী কমনীয় নারীচরিত্র হিসাবে শরৎসাহিত্যে উপস্থিত হইলেও আসলে তাহারা সমাজে অস্বীকৃতা ভ্রষ্টা নারী, যদিও অন্ততঃ উপন্যাসের পরিমণ্ডলে তাহারা চন্দ্রমুখী বিজলীর মত খোলাখুলি রূপোপজীবিনীর ব্যবসা চালায় নাই। তাহাদের রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের উপরোল্লিখিত মনোভাবই দেখা যায়। পতিতা জীবনের কদর্যতা হইতে তাহারা বহুলাংশে মুক্ত। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের 'কমললতা' ও 'শেষের পরিচয়'-এর সবিতাও কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা চরিত্র। ইহারাও তাহাদের বিকৃত জীবনের বাস্তবরূপ অতিক্রম করিয়াই যেন শুধুমাত্র অতীত-পাপানুষ্ঠানের অনুশোচনা-ম্লান হৃদয়েই উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রীর মতই তাহাদের রূপও পতিতার রূপ নয়, সামাজিক নায়িকার। 'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস, ইহার মাত্র ১৫টি পরিচ্ছেদ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এইটুকুর মধ্যে ইহার নায়িকা সবিতার রূপ মোটামুটি ঘরণী গৃহিণীর রূপ। সবিতা স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া পরপুরুষ রমণীবাবুর সঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া আছে স্বামী ব্রজবাবু ও কন্যা রেণুর উপর। তাহার মধ্যে স্বামী-সংস্কার প্রবল হইলেও তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা তীক্ষ্ণ, কাজেই কুলত্যাগের পর স্বামী-কন্যার কাছে ফেরা আর তাহার সামাজিকভাবে সম্ভব নয় একথা সে উপলব্ধি করিয়াছে। ইহার পর শরৎচন্দ্র কাহিনী শেষ করিতে পারিলে হয়তো সবিতার হৃদয়ভাবের আলোড়ন তাহাকে আরও উপন্যাসের নায়িকা-সুলভ গতি দিতে পারিত।

রাজলক্ষ্মী ও সাবিতা শরৎসাহিত্যে তাহাদের বিকৃত জীবন একরূপ আড়াল করিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। এখানে তাহারা সমাজভ্রষ্টা নারীর আত্মকেন্দ্রিকতা লইয়া নয়, কমনীয়া প্রেমিকার আত্মত্যাগের গৌরব লইয়াই আসিয়াছে। উপন্যাসের নায়িকা হিসাবেই তাহাদের উজ্জ্বলতা উপভোগ করা যায়। তাহাদের পরিণতি হয়তো লেখকের সমাজ-অনুস্মৃতির ফল, জীবনে তাহাদের দুঃখবেদনাই ভালবাসার পুরস্কার, কিন্তু প্রেমের পরিমণ্ডলে তাহারা উজ্জ্বল-নায়িকা সন্দেহ নাই। তাহাদের বিস্তারিত চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্র যেরূপ

কলানৈপুণ্য এবং দরদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের ট্র্যাজিক জীবন সমাজ সম্পর্কে পাঠকের সংস্কারের আনুকূল্য করে না, তাহার উপর কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবই বিস্তার করে। বরং মনে হয়, ভাল ট্র্যাজেডির যে বেদনা-বিষণ্ণতা পাঠকের সহানুভূতির আলোকে নায়িকা চরিত্রের রূপচর্যায় অঙ্গ-রাগস্বরূপ হয়, তাহাই এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী উপন্যাসের জীবনে বিগত-জীবনের গ্লানি বিস্মৃত হইতে পারে না, তাই তাহাদের মনের চাঞ্চল্য; নহিলে বর্তমান জীবনে তাহারা অতীতের ভ্রষ্টজীবনের সহিত সম্পর্ক শেষ করিয়া দিতে প্রস্তুত। বিদেশী উপন্যাসে তো আছেই, বাংলায় কোন কোন গল্প-উপন্যাসেও আজকাল পতিতাকে সুস্থ দাম্পত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাহস কোন কোন লেখক দেখাইতেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র মনে করিতেন যে, বাংলার সমাজ-কাঠামো যেরূপ তাহাতে এ দুঃসাহস রোমান্সসুলভ, জীবনের বাস্তব রূপ নহে। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও মার্জিতরূপে অঙ্কিত, তাহার বিগত বাইজী-জীবন শ্রীকান্তর সহিত কুমার বাহাদুরের তাঁবুতে দেখা হইবার পর ভালবাসার প্রবাহে একরূপ ভাসিয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নিজের পুরাতন পতিত জীবনের লজ্জা ও সংস্কার ছাড়া রাজলক্ষ্মীর আপেক্ষিক পরিচয় অনুপমা প্রেমিকারূপে। রাজলক্ষ্মীর বাইজী জীবনের প্রতি পতিতাসুলভ-যৌন-উদ্দামতা-বিহীন যেটুকু অনুরাগ উপন্যাসে দেখা যায়, তাহা তাহার সঙ্গীত-কুশলতার জন্য। সে গান ভালবাসিত এবং বাইজী জীবনে এই গানের একটা রসিক পরিবেশে আনন্দ পাওয়ার এবং সমাদৃত হওয়ার সুযোগ বর্তমান। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর গায়িকা বাইজী রাজলক্ষ্মীও শ্রীকান্তর সংস্পর্শে আসিয়া বাইজী জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গী বলিয়াই যেন সঙ্গীতচর্চার মোহ হইতে আপনাকে নিঃশব্দে অনেকটা সরাইয়া আনিয়াছে, এই আকর্ষণযোগ্য বিদ্যার অনুরাগও যেন পরিবেশের গ্লানির সহিত এক হইয়া প্রেমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া বহুলাংশে আত্মগোপন করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বে কাশীতে শ্রীকান্তর চোখের উপরে সুসজ্জিতা রাজলক্ষ্মী একদিন মুজরো করিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু সে ঘটনায় যতটা শ্রীকান্তর প্রতি তাহার প্রেমের অভিমান ফুটিয়াছে, বাইজী-বৃত্তির প্রতি অনুরাগের পরিচয় সে তুলনায় কিছুই নয়। 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর মনের অবস্থাও অনুরূপ। সাবিত্রী আর যাহার সহিত যাহাই করিয়া থাকুক, সতীশকে

ভালবাসিবার পর হইতে সেই ভালবাসার পাথেয় সম্বল করিয়াই সে যেন সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চায়। সতীশকে আয়ত্ত করিয়া নষ্ট করিবার ইচ্ছা তাহার নাই, নিজের ভ্রষ্ট-জীবন সম্পর্কে সে সচেতন, ভালবাসার ধনকে অক্ষত রাখার সাধনা করিয়াই যেন সাবিত্রী প্রেমের সুরভিটুকু বুক ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশ যখন সাবিত্রীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, সাবিত্রীও যখন সতীশের প্রতি ভালবাসায় উদ্বেল, তখন সতীশ হইতে সাবিত্রীকে বাহিরের কোন শক্তি বা সমাজের প্রতিবন্ধকতা বিচ্ছিন্ন করে নাই, বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সাবিত্রীর নিজের সমাজবোধ, তাহার নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীও একই কারণে 'শ্রীকান্ত'কে বারবার কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ পর্যন্ত দূরে সরাইয়া দিয়াছে। সতীশ সাবিত্রীর এবং শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর অপবিত্র কামনার পাত্র নয়, সত্যকার ভালবাসার ধন; তাহাদের কলুষিত অতীতের স্মৃতি তাহাদিগকে এই প্রেমপাত্রদের বাঁচাইবার প্রেরণা দিয়াছে, তাহারা নিজেদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে টানিয়া আনিয়া ইহাদিগকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে নাই। সতীশ যখন সাবিত্রীকে তাহার ভালবাসার দোহাই দিয়াছে, সাবিত্রী ভালবাসিয়াও ভদ্রবংশজাত সতীশকে এড়াইয়া গিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই কঠোর হইয়া বলিয়াছে,"একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গালে আর কালি মাখিয়ো না।" 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের কমললতার কাহিনীতে যেন লিরিক কবিতার স্বাদ। কিন্তু কমললতা শ্রীকান্তের সহিত প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই বিনা আড়ম্বরে নিজেকে সরাইয়া লইয়াছে। কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু কমললতার অতীত জীবন কলঙ্কময়, পদস্খলিতা নারী সে। অতীতের এই অভিশপ্ত স্মৃতি কমললতার মর্মে মর্মে গাঁথা আছে। তাই শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াও কমললতা আপনাকে শ্রীকান্তর উপর চাপাইয়া দেয় নাই, বরং মুরারিপুরের আখড়া হইতে বিতাড়িতা সহায়-সম্বলহীনা কমললতা ভদ্রসন্তান ভালবাসার ধন শ্রীকান্ত হইতে আপনাকে দূরে লইয়া গিয়াছে। চতুর্থ পর্বের শেষে কমললতা বিদায় লইতেছে চিরকালের জন্য, শ্রীকান্ত কমললতার মনে থাকার মত প্রীতির পরিচায়ক একটা কাজ হিসাবে ট্রেনের কামরায় কমললতার সামান্য বিছানাটি পাতিয়া দিল। বৈষ্ণবী কমললতা রাধামাধবের আশ্রয়ে চলিল, পার্থিব দয়িতের নিকট হইতে সে বিদায় লইল অন্তরটিকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া। শ্রীকান্তকে কমললতা বলিল,

"আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করোনা গোঁসাই, তোমার কাছে এই আমার প্রার্থনা।"

(কাজেই দেখা যাইতেছে, শরৎসাহিত্যে পদস্খলিতা বা পতিতা নায়িকারা হীন পরিবেশ হইতে সহজাত পবিত্রতাবোধবশে আপনাদিগকে মোটামুটি সরাইয়া আনিয়াছে, কিন্তু সামাজিক অধিকার তাহাদের নাই বলিয়াই সহজ সুন্দর প্রেমধন্য সংসারজীবনের প্রতি আকর্ষণ তাহাদের ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের ট্র্যাজেডি আরও ঘনীভূত হইয়াছে এইজন্য যে, তাহারা হৃদয়াকাঙ্ক্ষা-বশে মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক সংসারজীবনে স্থান পাইবার দাবী জানাইয়া ব্যর্থকাম হইয়া দুঃখ পায় নাই, সংস্কারবশেই এই সংসারজীবনে স্থানলাভের অধিকার-হীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ভালবাসার অমৃততীর্থ হইতে তৃষ্ণার্ত থাকিয়াই তাহারা নিজেদের সরাইয়া আনিয়াছে। তারপর জীবনজোড়া গভীর বেদনার ইতিহাস।)

(শরৎসাহিত্যে এই সমাজবোধ শুধু যে ভ্রষ্টা ও পতিতা চরিত্রেই দেখা যায় তাহা নহে; ভ্রষ্টা বা পতিতা নয় এবং অতীতের গ্লানিময় জীবনের স্মৃতি নাই, এমন নারীচরিত্রেও এই সমাজ-সংস্কার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।) 'পল্লীসমাজে' রমার মত বিধবা এই সংস্কারবশেই প্রাণপ্রিয় রমেশকে প্রকাশ্য আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জেলে পাঠায় ও পরে নিজে কাশী পালায়, 'বড়দিদি'র মাধবী অসহায় সুরেন্দ্রনাথকে তাহাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার মত ব্যবহার করিয়া বসে, 'দেনাপাওনা'র ষোড়শী স্বামী জানিয়াও অসহায় অসুস্থ জীবানন্দকে চণ্ডীগড়ে ফেলিয়া রাখিয়া শৈবালদীঘির কুষ্ঠাশ্রমে চলিয়া যায়, 'আলো ও ছায়া' গল্পের বালবিধবা সুরমা একান্ত ভালবাসিলেও নিজেই যজ্ঞদত্তের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করে, 'মন্দির' গল্পে বিধবা অপর্ণা নিরীহ পূজারী শক্তিনাথকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া ও চিরকালের মত হারাইয়া বেদনায় ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া ভাসায়। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে এই সমাজসংস্কারের জন্যই সরযূ কাশীতে দুপুরবেলা অভুক্ত স্বামী চন্দ্রনাথকে নিজহাতে রাঁধা ভাত খাওয়াইতে সঙ্কোচবোধ করিয়া লুচির থালা আগাইয়া দেয়। 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ী একেবারে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নয়, কিন্তু সমাজসংস্কারের চাপেই আরাকানে একান্ত অপরিচিত পরিবেশে এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়ও

বাড়ীওয়ালীর আনা মাড়োয়ারীবাবু তাহার ঘরে খাটে বসিতে গেলে জ্ঞান হারাইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।* রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিনোদিনী বেহারীকে দীর্ঘকাল পাইবার সাধনার পর যখন সত্যই বেহারী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল, তখন সে এই সমাজসংস্কারের জন্যই পিছাইয়া গিয়াছে।

'ডন জুয়ান' কাব্যে কবি বায়রণ বলিয়াছেন, পুরুষের জীবনে ভালবাসা জীবনের একটা অংশমাত্র, কিন্তু ভালবাসা নারীর সম্পূর্ণ জীবন। অর্থাৎ পুরুষ বহুবিচিত্র কর্ম ও কর্মচিন্তার মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দেয়, তাহার জীবনে প্রেমের প্রয়োজন থাকিলেও প্রেম সমস্ত জীবন জুড়িয়া অন্য সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন করিয়া দেয় খুব কম ক্ষেত্রেই। নারীর বাহিরের কাজকর্ম কম, মন তাহার ভাবপ্রবণ, ভালবাসার সুরে তাহার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন শুধু গভীরতাই সে ভালবাসার পরিচয় নয়, প্রকৃতপক্ষে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সে প্রেমের অঞ্জলিরূপে তুলিয়া ধরে। এই ভালবাসার রোমান্টিক আবেগ মনকে বিলসিত করে অনেকখানি, কিন্তু তাহা হইতে বস্তুগত প্রাপ্তির পরিমাণ সামান্যই হয়। ভালবাসার ব্যর্থতা, পাইয়া হারাইবার দুঃখ প্রায়ই প্রেমের পরিণাম। পুরুষ পৌরুষ-শক্তিতে অথবা

---

* কিরণময়ী উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় উপেন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় দিবাকরকে ভুলাইয়া আনিয়াছে, কিন্তু সে উপলক্ষ্য মাত্র বলিয়া কিরণময়ী উপেন্দ্রের এই ভাইটিকে নিজের ভাইয়ের মতই স্নেহ করে। কিন্তু তাহার রূপমুগ্ধ দিবাকর ব্যর্থ-কামনার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া একদিন তাহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই নিরুপায় অবস্থায় কিরণময়ীর বাড়ীউলি নিজের বুদ্ধিমত এক মাড়োয়ারীকে তাহার রূপের খরিদ্দাররূপে তাহার ঘরে লইয়া আসিল। বাড়ীউলি তাহাকে অভয় দিল: "ভয়টা কাকে শুনি? তুই হলি বেবুশ্যে।"

কিরণময়ী চীৎকার করিয়া উঠে: "কি আমি? আমি বেশ্যা?" তাহার মনে হইল, বজ্রাগ্নি রেখা তাহার পদ হইতে উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া বুঝি বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর মাড়োয়ারী খাটে বসিতে গেলে "তাহার রূপযৌবনের এই অপরিচিত হিন্দুস্থানী খরিদ্দারের গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্য হারাইয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।"

সহস্র কর্মের মধ্যে ডুবিয়া সে দুঃখ যদিই বা কিছুটা এড়াইতে পারে, মেয়েদের নরম ভাবপ্রবণ মনে তাহা স্থায়ী ব্যথা-ভাব সঞ্চারিত করে।) মেয়েরা যে সংকীর্ণ জগৎকে ভালবাসার রঙে অসামান্য করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, তাহার অপ্রাপ্তিতে, হারাইবার বেদনায় এবং কোন কোন সময় তুচ্ছতার পরিচিতিজনিত মোহ-অবসানে তাহাদের মনে বিষাদসিন্ধু উথলিয়া উঠে। এইজন্য মেয়েদের জীবনে দুঃখের পরিমাণ বেশি। এইজন্যই বোধহয় দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, মেয়েরা বিধাতার ঋণ কাজ করিয়া নয়, দুঃখ সহিয়া শোধ করে।* (শরৎচন্দ্র প্রধানত নারী-চরিত্রের উপর জোর দিয়া উপন্যাসগুলি রচনা করায় তাঁহার অধিকাংশ নারী-চরিত্রে গভীর বেদনা রূপায়িত হইয়াছে। অবশ্য দেবদাসের মত দুঃখের মূর্তি পুরুষ-চরিত্রও শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু এই ধরণের দুঃখভোগী পুরুষ-চরিত্র শরৎসাহিত্যে কম। (অন্য বৃহৎ বা মহৎ পরিচয়ে, ব্যক্তিত্বের জোরে, এমন কি দার্শনিক উপেক্ষায় দুঃখের ঘনরূপ অনেক পুরুষচরিত্রে যথেষ্ট তরল হইয়া গিয়াছে।) দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিপ্রদাস'-এর বিপ্রদাস, 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ, 'পথনির্দেশ'-এর গুণেন্দ্র, 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ, 'শেষের পরিচয়'-এর ব্রজবাবু, 'শ্রীকান্ত'র শ্রীকান্ত, এমনকি ভালবাসার জন্য সর্বস্বত্যাগী সুরেশের কথাও উল্লেখ করা যায়। পক্ষান্তরে পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থায় অসহায় নারীর দল দুঃখের বিবর্ণতায় আপন জীবন সমগ্রভাবে রঞ্জিত করিয়া শরৎসাহিত্যে ভিড় করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী, 'পল্লীসমাজ'-এর রমা, 'বড়দিদি'র মাধবী, 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী ও কিরণময়ী, 'আঁধারে আলো'র বিজলী, 'বোঝা' গল্পের নলিনী, 'আলো ও ছায়া' গল্পের সুরমা, 'মন্দির' গল্পের অপর্ণা, 'গৃহদাহ'-এর অচলা, 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী ও পার্বতী, 'পণ্ডিতমশাই'-এর কুসুম, 'পথনির্দেশ'-এর হেম, 'দেনাপাওনা'র ষোড়শী,—এই শ্রেণীর নারী-চরিত্র। 'গৃহদাহ'-এর মৃণাল হিন্দুসংস্কার ও সেবাধর্মের আশ্রয়ে অবলম্বন কিছুটা পাইয়াছে সত্য, সে প্রেমিকা-নায়িকা নয়, তবু এই নারীজীবনেও বেদনার স্থান কম নহে। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের বৈষ্ণবী কমললতা সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়।

*"She pays the debt of life not by what she does but by what she suffers."—Schopenhauer (মোহিতলাল মজুমদারের 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৩ হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎসাহিত্যে প্রধান নারী-চরিত্রগুলির সবই প্রায় এইরূপ। কমল, অভয়া, কিরণময়ীর মত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-দৃপ্ত চরিত্রেও এই সুগভীর দুঃখের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহারা সমাজের মুখের উপর নিজেদের অস্তিত্বের ধ্বজা তুলিয়া ধরিবার জন্য সাহস করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। দুঃখকে ইহারা দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই, বিপদের আশঙ্কায়, অসহায়তার আতঙ্কে ইহারা ভাঙিয়া পড়ে নাই, সমাজশক্তির চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নাই। ইহাদের দুঃখ ইহাদের অন্তরে আশ্রয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে, বাহিরের সংগ্রামী রূপ সে দুঃখের আঘাতে বিবর্ণ হইতে পারে নাই। কমল দুঃখকে অনেকটা দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে দেখিয়াছে, এই তত্ত্বের ছাপ মারিয়া আপন হৃদয়কে স্বাভাবিক অতীত-চিন্তা হইতে জোর করিয়া সরাইয়া আনিয়া বর্তমানমুখী করিয়া তুলিয়াছে। কমনীয় নারীমনে দুঃখের সর্বাত্মক প্রভাবের বিচারে শরৎচন্দ্রের এই একক সৃষ্টি তাত্ত্বিক মেয়েটির কথা বাদ দেওয়া ভাল।* আর দুটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল তাহারা দুঃখ পাইয়াছে গভীরভাবে, দুঃখ তাহাদের আলোড়িত

* খ্যাতিম্যান রুশ লেখক টুর্গেনিভের রুদিন (Rudin) উপন্যাসের রুদিন চরিত্রের সঙ্গে কমলের একদিক হইতে মিল আছে। অবশ্য রুদিন কমলের তুলনায় অনেক বেশি মহৎ, সরল ও আদর্শপ্রবণ, কিন্তু উভয় চরিত্রই তর্ক-প্রতিভায় ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল। অন্যের মনে দুজনের কথাই দাগ্ কাটে। আপন বক্তব্যের স্থিতিমান রূপ দুজনেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, দুজনেই যেন চিন্তার তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রাশিয়ার আবেগপ্রবণ বুদ্ধিজীবি মনের ব্যর্থতা রুদিনের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সমালোচকেরা মনে করেন। কমলও ঠিক যেন শরৎচন্দ্রের নায়িকা নারী নয়, সেও যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তর্কপ্রিয়, সংগঠনহীন, চঞ্চল, বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানসের প্রতীক। রুদিনের আত্মপ্রকাশের উদ্যমকে মেরুজ্যোতির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ণসুষমা আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই, তাই মেরুদেশ সবসময় হিমশীতল। কমলের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও মনকে নাড়ায় কিন্তু সাড়া জাগায় না, কথার মারপ্যাচ তাহার চারিদিকে যে ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে, তাহার দীপ্তি কমলকেও বিকশিত হইতে সাহায্য করে নাই, অন্যের কথা দূরে থাক।

করিয়াছে, কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে তাহারা এই দুঃখকে যেন যুদ্ধে আহ্বান জানাইয়া আপন চেষ্টায় ভবিষ্যতের পথ রচনা করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহারা অচলার মত স্বামী-সংস্কার বনাম ভালবাসার প্রশ্নে নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় নাই, তাহার অবহেলায় অপমানিত অন্তরাত্মার তাগিদে বিদ্রোহ করিয়াছে। একজন অবহেলিত হইয়াছে স্বামীর কাছে, আর একজন পরপুরুষ প্রেমাস্পদের কাছে। স্বামীর কাছে অবহেলিতা অভয়া বিদ্রোহ করিয়া প্রেমিককে গ্রহণ করিয়াছে, প্রেমাস্পদের কাছে অবহেলিতা কিরণময়ী অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উপেন্দ্রের উঁচু মাথা ধূলায় লুটাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার স্নেহের ভাইটিকে প্রলুব্ধ করিয়া অজানার পথে পাড়ি দিয়াছে। অভয়া রোহিণীবাবুর মত শান্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যেন নিজের, সমাজের, সমস্ত পৃথিবীর উপর ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় প্রেমপত্রে আচ্ছাদিত পর্ণকুটির রচনা করিল, দুঃখে সে কিন্তু ভাঙিয়া পড়ে নাই। তাহার প্রথম দিকের ভূমিকার সামাজিক স্নিগ্ধতা যেন শেষদিকে সংকল্পের ইস্পাত-দৃঢ়তায় রূপান্তরিত হইল। কিরণময়ীর প্রেমের তীব্রতা প্রচুর, প্রেমের অপমানে প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছা তাহার যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি বিস্ময়কর। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীকে যখন আনা হইয়াছে, তখনই তাহার অন্তর সংসারের হীনতায় ও উদাসীনতার চাপে আহত, মন তাহার অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে। অভয়ার প্রথম দিকের স্নিগ্ধতাটুকুও কিরণময়ীতে নাই, প্রথম হইতে তাহার আচার আচরণ বেপরোয়া, কথাবার্তা তির্যক তীক্ষ্ণ। দেশের সমাজের বাহিরে রেঙ্গুনে যেমন অভয়ার অসামাজিক ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুটা অবাধ সুযোগ পাইয়াছে, কিরণময়ীর আরাকান হইতে বাংলার সমাজজীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসার পর সেই পরিবেশের আনুকূল্য সে পায় নাই। তাছাড়া রোহিণীবাবুকে লইয়া অভয়ার প্রেমের সমস্যা নাই বলিলেই চলে, কিরণময়ী কঠিন মাটিতে ভিত্ গাঁথিতে চাহিয়াছিল, উপেন্দ্রকে তাহার আদর্শগত জীবনবোধ হইতে আপন আয়ত্তে নামাইয়া আনা কিরণময়ীর পক্ষে একরূপ সম্ভব ছিল না। 'চরিত্রহীন'-এর পরিণতিতে লড়াইয়ে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত কিরণময়ীর মন ভারসাম্য হারাইয়াছে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই কাহিনী 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীকে পাগল করিয়া দেওয়া সম্ভোগ-বিরোধী বঙ্কিম-মানসের অনুসরণ নয়। হয়তো দুজনেই পাগল হইয়াছে পরপুরুষকে ভালবাসার মত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে,

কিন্তু শৈবলিনীর ক্ষেত্রে লেখকের পবিত্রতাবাদী সামাজিক মনটি যেমন প্রত্যক্ষভাবে আগাইয়া আসিয়াছে, কিরণময়ীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহা হয় নাই। কিরণময়ী-চরিত্রের জটিলতার সঙ্গে তাহার প্রেমের উগ্রতার সঙ্গে এবং প্রেমের আশ্রয়ের কাঠিন্যের সঙ্গে তাহার উন্মাদ হইয়া যাওয়ার উপন্যাসের উপযোগী কার্যকারণ সামঞ্জস্য অনেক বেশি রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিরণময়ীর সমগ্র চরিত্রে শরৎচন্দ্র এমন বিস্ময়কর একটি স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বলতা রাখিয়াছেন, যাহা শুধু শরৎসাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে কিরণময়ী যে পর্যায়ে উঠিয়াছে, তাহা সাধারণ নারীচরিত্রের পক্ষে কল্পনাতীত। এই অভিনব রসসৃষ্টির দৃষ্টান্তটি শরৎচন্দ্রকে আধুনিক কালের লেখকরূপে চিহ্নিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। চন্দননগরে এক সভায় শরৎচন্দ্র নিজেই কিরণময়ীকে চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* এই সভায় উপস্থিত জনৈক ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রকে বলেন, —"আপনি মুখে যাই বলুন, আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয় আপনি সনাতন ধর্মের মর্যাদাহানি করতে চাননি। যখন দেখি 'চরিত্রহীন' বইখানার সেই মেয়েটি ষ্টীমারের উপর সেই বালকের (দিবাকরের) সহিত এক বিছানায় থেকেও নিজের দেহকে নষ্ট হতে দিলে না, তখনও কি আমরা বলব আপনি সনাতন ধর্মটা মানেন নি? আপনার অন্তরের অলৌকিক ধর্ম-বিশ্বাসটাই কি ঐ মেয়েটির চরিত্র-রক্ষার কারণ নয়?" প্রশ্নটি সহজ নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, কিরণময়ীর একাজ তাঁহার ধর্ম বিশ্বাসজাত নয়, মানবতাবোধজাত। কিরণময়ী কাজটা ভাল করে নাই, সমাজের ক্ষতিকর এ কাজে শরৎচন্দ্রের সমর্থন নাই। কিন্তু সে অন্য কথা। কিরণময়ীকে মানুষ, তথা নারীরূপে উপস্থিত করিয়া শরৎচন্দ্র এখানে সেই মানবসত্তাকে আপন নিহিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজের অন্যায় বিরোধিতা করিবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরণময়ী হয়তো শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হইয়াই করিয়াছে, কিন্তু অসামাজিক হইলেও তাহার ভালবাসার ঐকান্তিকতা ও বলিষ্ঠতাই শরৎচন্দ্র এখানে দেখাইয়াছেন। এইসঙ্গে এইভাবে কিরণময়ীকে আঁকিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার

* 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রিকার ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'চন্দননগরে আলোচনা সভায়' শিরোনামায় এই সভার বিবরণী প্রকাশিত হয়।

নারীর তথা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিশেষ হইতে নির্বিশেষে সঞ্চারিত করিয়াছেন। উপরোক্ত চন্দননগরের সভায় শরৎচন্দ্র প্রশ্নকর্তাকে বলিয়াছেন, "আপনি আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারেন নি। আপনি যা বলেছেন ওভাবে আমি কিছুই করিনি। মেয়েটি যদি দেহ নষ্টই করত তাতেও আমার কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ওই চরিত্রটা একেবারে অসত্য হয়ে যেত। অমন লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিতা মেয়ে, আর যে বালকের সঙ্গে সে কেবল একটা জিদের বশে পালিয়ে এলো, সে একটা অপোগণ্ড শিশু বললেই হয়, যাকে সে কোনদিক দিয়েই নিজের সমকক্ষ মনে করে না, তাকে দিয়েই যদি সে নিজের দেহটা নষ্ট হতে দিত তা হলে ও চরিত্রটা মাটি হয়ে যেত।"

মোটের উপর শরৎ সাহিত্যের একটা খুব বড় দিক নারীহৃদয়ের প্রেম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত মিলনহীন এই প্রেমের জন্য দীর্ঘ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ও দুঃখবরণ। এই দুঃখ শরৎচন্দ্র নারীদের দিয়াছেন, শুধুমাত্র ভদ্রঘরের মেয়েদের নয়, ভ্রষ্টা বা পতিতাদেরও মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের মনে এই দুঃখের প্রবাহ বহাইয়াছেন। এই দুঃখের উৎপত্তি মূলত সমাজের সহিত ব্যক্তির, সংস্কারের সহিত বুদ্ধির, দেহের সহিত আত্মার সংঘর্ষে। ফলে সংশ্লিষ্ট নারীমনে এক ধরণের গতিশীলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভদ্রসমাজে প্রেমের সহিত স্বামী-সংস্কারের একটা সংঘাত গল্প-উপন্যাসের কাহিনী সৃষ্টিতে অবশ্যই সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু স্বামী-সংস্কারের দিকটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক পর্যায়ের, এবং শরৎচন্দ্রের সামাজিক মন এই সংস্কারের ক্ষেত্রে যত উৎসাহিতই হোক, তাঁহার শিল্পী-চেতনায় প্রেমই প্রধান বিষয়। হিন্দু নারী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে নিজের সব কিছু নিবেদন করে, এই সংস্কার হইতে তিনি আপনাকে পুরোপুরি সরাইয়া আনিতে পারেন নাই বলিয়া স্বামী-সংস্কারের প্রভাব তাঁহার প্রেম-চিত্রগুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামী-সংস্কার হইতেই শরৎচন্দ্রের স্বামী-নিরপেক্ষ প্রেমে নারীর আত্মনিমজ্জনের করুণ-মধুর চিত্রগুলির বিকাশ। শরৎচন্দ্র মানবিক দৃষ্টিতে নারীর প্রতি তাকাইয়াছেন সত্য, তাহাদের মধ্যে মহৎ বৃত্তি বা গুণের সন্ধান করিয়া সেগুলি যত্ন করিয়া ফুটাইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু-সংস্কারের জন্য বোধ হয় নারী ও পুরুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠা ও উপভোগের সমতা সৃষ্টি

করিতে পারেন নাই।* তাঁহার পুরুষের প্রেম-চিত্র অধিকাংশক্ষেত্রেই নারী-প্রেমের মত উজ্জ্বল নয়, কিন্তু তাঁহার কাহিনীতে সামাজিক সুবিধা-ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষই প্রধান। অর্থাৎ শরৎসাহিত্যে অনেকক্ষেত্রেই মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব মর্যাদা পুরুষের সমান্তরাল করিয়া সামাজিক পটভূমিতে পুরুষকে ভালবাসিতে পারে নাই, ভালবাসার কমনীয়তায় দ্রবীভূত হইয়া প্রথম প্রেমের সময় তাহাদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাতেই অথবা তাহার চেয়ে নীচে নামিয়া গিয়াছে। রমা, ষোড়শী, মা শোয়ে, ইন্দু, কমলা, রাজলক্ষ্মী, বিজলী, চন্দ্রমুখী,—ইহারা সকলেই ক্রমশঃ প্রেমাস্পদের কাছে নিজেদের নামাইয়া আনিয়াছে। 'মন্দির' গল্পে জমিদার কন্যা অপর্ণা দরিদ্র, অবহেলিত পূজারী শক্তিনাথের মৃত্যুর পর তাহাকে উপহার দেওয়া যে এসেন্সের শিশি ছুঁড়িয়া জঞ্জালের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল, জঞ্জাল ঘাঁটিয়া সেই শিশি কুড়াইয়া আনিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে তাহার নিজের চেয়ে অনেক বড় দেববিগ্রহের পায়ে সমর্পণ করিয়া শক্তিনাথের কাছে অপরাধ স্খালন করিতে তথা আহত হৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজিতে চাহিল। কিরণময়ীর

* নারীর পুরুষ-সুলভ শক্তির আড়ম্বরের চেয়ে নারী-সুলভ কোমলা রূপের প্রতি শরৎচন্দ্রের কিরূপ আপেক্ষিক অনুরাগ ছিল, তাহা 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনের রাস্তায় ব্রহ্মরমণীদের সম্পর্কে তাঁহার পরিবর্তিত মনোভাব হইতেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথমে এই রমণীদের চলাফেরার স্বাধীনতা দেখিয়া শ্রীকান্ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিল, "রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এদেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি!" কিন্তু ইহারই পরে সামান্য তিন আনা পয়সা ভাড়ার তফাৎ লইয়া কথা কাটাকাটির পর ব্রহ্ম-রমণীরা যখন তাহার সামনে বিক্রয়রত আখওয়ালার আখ বেওয়ারিশ পণ্যের মত তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা হিন্দুস্থানী ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ানকে এলোপাথাড়ি পিটিতে লাগিল, সেই দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কিত শ্রীকান্তের স্বদেশের মহিলাদের ব্রহ্মমহিলাদের মত হওয়াইবার সাধ ঘুচিয়া গেল। এইখানে বইয়ে আছে: "মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজের আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।"

প্রেমের প্রকৃতিতে যে গতি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রথম দিকে ছিল, শেষদিকে তাহা অনেক স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী আর্থিক স্বাধীনতার দৌলতে শ্রীকান্তকে লইয়া যে খেলাই খেলুক, শ্রীকান্তর কাছে প্রেমের পশরা লইয়া যখন সে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার ভূমিকা প্রায়ই সেবিকার, আসন তাহার নীচে। 'নববিধান'-এ উষার, 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর, 'দর্পচূর্ণ'-এ ইন্দুর, 'স্বামী'তে সৌদামিনীর, 'বিরাজ বৌ'-তে বিরাজের স্বামীর নিকট হইতে দূরে চলিবার যাইবার স্বাতন্ত্র্যবোধ যখন তরল হইয়াছে, তখন তাহারা পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। ('পণ্ডিত মশাই'-এর কুসুম অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের জন্য ৫ ভরি সোনা ও ১০০ ভরি রূপার অলঙ্কার এবং দাদা কুঞ্জর জন্য ৫০ টাকা নগদ ও ৫ জোড়া ধুতি চাদরের লোভ সংবরণ করিয়া প্রথম স্বামী বৃন্দাবনের ঘরে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব নিজের অন্তর্বর্তী-কালীন কণ্ঠিবদলের স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতিম্লান বৈধব্য-সংস্কারে বাতিল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ক্রমে বৃন্দাবনকে ভালবাসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি স্বামী-সংস্কার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনের আহ্বান ছাড়াই আপন আগ্রহে বৃন্দাবনের ঘরে গিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের পুত্র চরণ মরিয়া যাইতেছে, কুসুম চরণের মা হইয়া মুমূর্ষু সপত্নীপুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে। তারপর বৈষ্ণব বৃন্দাবন যখন চরণকে হারাইয়া সমস্ত সম্পত্তি জনকল্যাণে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াইয়াছে, কুসুম অবিচলিত নিষ্ঠায় তাহার সঙ্গী হইয়াছে, সংকল্প করিয়াছে বৃন্দাবনকে সে ভিক্ষা করিতে দিবে না, যেমন করিয়া দাদার ভার লইয়াছিল, সেইভাবে বৃন্দাবনেরও ভার লইবে। এই দুঃখের পথে বাহির হইবার প্রাক্কালে কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছে, "আমি যাবই, অবহেলায় ছেলে হারিয়েছি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।") শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের প্রথমাংশে দেবদাসের সহিত পার্বতীর প্রেমে পার্বতীর একটা আত্মমর্যাদার দিক আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরের মেয়ে বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াও পার্বতী দেবদাসদের কুলবধূ হইতে পারিল না, ইহার পর দেবদাস তাহাকে লইয়া পলাইতেও ভয় পাইল। পরবর্তীকালে পার্বতীকে দেবদাস তাহার সহিত পলায়নের জন্য যখন বলিয়াছে পার্বতী দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ব অমর্যাদার প্রতিশোধ লইয়া সে প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়াছে। কিন্তু এই দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদা ও সংযমের সহিত দেবদাসের মৃত্যু সংবাদে পাগলের মত দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া জমিদার-গৃহিণী পার্বতীর স্বামীপুত্র লোকজনের সম্মুখে বাড়ী

হইতে ছুটিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিয়া দেবদাসকে শেষ দেখা দেখিবার আকুলতার মিল নাই।

মোটকথা, স্বামীই হউক, অথবা প্রেমিকই হউক, শরৎসাহিত্যে যেখানেই প্রেমের ছবি, সেখানেই নারীর এই অবস্থা। 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, শিবনাথ ও অজিত এই দুই পুরুষকে সে পরপর ভালবাসিয়া জীবন-সাথীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দুনিয়ার সহিত আচরণে কমল যতই স্বতন্ত্র মর্যাদাবোধ দেখাক, শিবনাথ-অজিতের সহিত তাহার যেটুকু ঘনিষ্ঠতা উপন্যাসে আছে, সেখানে কমলের ভূমিকা একরকম সেবাপরায়ণার। কমল একবার শিবনাথ প্রসঙ্গে নিজেকে গুণী, শিল্পী, কবি শিবনাথের বিকাশের সহায়িকা বলিয়াছে। গ্রন্থের শেষদিকে অজিতের সহিত ঘর বাঁধিবার কথা স্থির হইয়া যাইবার পর কমল অসহায় অজিতকে অতঃপর সেবা করিবার সুযোগে আপন তৃপ্তির কথা আবেগের সহিত উল্লেখ করিয়াছে।* 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়াকে বিদ্রোহিণী চরিত্র বলা হয়, কিন্তু দুর্বৃত্ত স্বামীর বাড়ীতে সে সাধিয়া দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছে এবং সামান্য আশ্রয়টুকুও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া সারা অঙ্গে এই পাষণ্ডের নিষ্ঠুর নিপীড়নের স্মৃতি বহন করিয়া ফিরিয়াছে। তারপর তাহার বিদ্রোহ। 'দত্তা'র বিজয়া বৈষয়িক হিসাবে নরেন্দ্রের উত্তমর্ণ, আর্থিক স্বাধীনতায় তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক। কিন্তু বিলাসবিহারীর ক্ষেত্রে বিলাসের সহিত বিবাহের কথাবার্তাজনিত দুর্বলতা এবং মনিবানা-বোধের মিশ্রণে তবু বিজয়ার কিছুটা আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখা গিয়াছে, নরেন্দ্রের ক্ষেত্রে বিজয়ার ভূমিকা অনেকটা প্রেমিকা প্রার্থীর। নরেন্দ্রকে সে চোখের দেখা দেখিতেও উৎসুক, রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর অপ্রসন্নতার ঝুঁকি লইয়া নারী বিজয়া বারবার বহুচেষ্টা করিয়া নরেন্দ্রকে আপন গৃহে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া, কথা কহিয়া, খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। 'ছবি' গল্পে মা শোয়েও বিজয়ার মতই ধনী ও উত্তমর্ণ, কিন্তু বা থিন আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহার দেনা পরিশোধান্তে অসুস্থ দেহে যখন

* কমল অজিতকে বলিয়াছে: "তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, এত নিষ্ঠুর আমি নই।"

বিদায় লইতেছিল, মা শোয়ের গর্ব, অভিমান সব ধূলায় মিশাইয়া গেল, সে বা থিনের কপাল স্পর্শ করিয়া জরের জন্য শিহরিয়া উঠিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য আপন গৃহে বন্দী করিয়া ফেলিল। ঘোড়দৌড়ের মাঠের বিজয়ী যে পো থিন বা থিনের প্রতি মা শোয়ের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে তাহার ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতেছিল, মা শোয়ের এই হৃদয়গত অবনমনে সে যেন বিস্মৃতির আড়ালে চলিয়া গেল। 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দুর অথবা 'কাশীনাথ' গল্পে কমলার কাহিনীও এই হার মানার। ইহারা স্বামীদের কাছে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছে তখন স্বামীদের শরীর একান্ত অসুস্থ এবং আর্থিক হিসাবে তাহারা রিক্ত। এ অবস্থায় স্বামীদের সেবিকা হওয়ার সুযোগ লাভই ইন্দু-কমলার হৃদয়-অবনমনের অব্যবহিত পরবর্তী প্রাপ্তি। [পল্লীসমাজ'-এ রমা জমিদার, গ্রামে তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে, সামাজিক চাপে সে রমেশের ক্ষতিও করিয়াছে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সে রমেশের পাশে সমান আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করায় নাই, স্বেচ্ছায় অনেক নীচে আপন আসন নামাইয়া লইয়াছে। এইজন্য অবোধ ছোটভাই যতীনের মুখে বা চাষী সনাতনের মুখে রমেশের গুণগান শুনিয়া মন তাহার আনন্দে ভরিয়া যায়, বেদনার সঙ্গে সে মনে মনে ভাবে রমেশের কীর্তির সহিত তাহার নামও যদি কোনক্রমে যুক্ত হইয়া যাইত তাহা হইলে কত না ভাল হইত! রমেশ তাহাকে স্বীকার করে না বলিয়া রমা জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর কাছে চোখের জল ফেলে। একদিন মাত্র দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়া সে তারকেশ্বরের বাসায় পরিচিত লোকচক্ষুর অন্তরালে রমেশকে কাছে পাইয়া প্রাণঢালা যত্নে তাহাকে খাওয়ায়। শরৎচন্দ্রের প্রেমের চিত্র অধিকাংশক্ষেত্রে করুণ ও কোমল, সেখানে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা যতই থাক, নারীর আত্মবিসর্জনের ভূমিকা প্রায়ই দেখা যায়।] 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাস জমিদার ও অপেক্ষাকৃত পুরাতনপন্থী গৃহকর্তা। বোম্বাই-প্রবাসিনী, অতি-আধুনিকা, তরুণী বন্দনার বলরামপুরের মুখুজ্যে পরিবারের গৃহকর্তা বিপ্রদাসের শুচিস্নিগ্ধ মূর্তিতে মুগ্ধ হইবার কথা নয়, কিন্তু তবু বন্দনা পূজারত বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছে এবং ভক্তিনম্র চিত্তের দুর্বলতায় বিপ্রদাসকে একরূপ খোলাখুলি ভালবাসা জানাইয়াছে। এই অশোভন দৃশ্যটিতে বিপ্রদাস মনে মনে বিচলিত বোধ করিলেও বয়স, অভিজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ ও ধর্মবোধে সে ব্যাপারটা এড়াইয়া যাইবার পর বন্দনা শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাসকে তাহার যৌথ পারিবারিকতার সা হ ে

এক করিয়া ভালবাসিয়াছে এবং এই ভালবাসার পরমার্থতায় বন্দনার মুখুজ্যে পরিবারে স্থান পাইবার সর্ত প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণ করিয়াছে দ্বিজদাস, বন্দনা প্রেমের পূজায় সফল হইবার আনন্দেই যেন তাহার আধুনিক নাগরিক জীবন, পূর্বপ্রেমিকের স্মৃতি, সবকিছু বিসর্জন দিয়া দ্বিজদাসের ঘরে আসিয়াছে।* 'গৃহদাহ'-এ অচলা, মহিম, ও সুরেশ এই তিনটি চরিত্র প্রায় সমান গুরুত্ব লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিল, মাঝখানে অসুস্থ মহিম ট্রেনে থাকিয়া গেল, সুরেশ ট্রেন হইতে নামাইয়া লইল অচলাকে। অতঃপর সুরেশের প্লাবনী প্রেমের প্রবাহে অচলার আত্মরক্ষার দুর্বল ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনী। আত্মরক্ষা যে শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, তজ্জন্য শুধু দুর্যোগের রাত্রিই দায়ী নয়, অচলার সুরেশের উদ্দাম ব্যক্তিত্বের কাছে নম্যতাও অনেকখানি দায়ী। তারপর যেদিন মহিমের সহিত রামবাবুর বাড়ীতে অচলার দেখা হইল, সেদিন অচলা স্বেচ্ছায় সুরেশের দেওয়া অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ সজ্জিত করিয়াছে। অথচ মহিমের কাছ হইতে সরিয়া না আসিয়া এই অচলাই একটু অন্যভাবে অঙ্কিত হইলে হয়তো সুরেশের উগ্র প্রেমবাসনা ও মহিমের শান্ত প্রেমরূপের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে পারিত। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অচলার চিত্রাঙ্কনে অচলাকে অন্তরে দুর্বল রাখিয়া এক ধরণের শিল্প-প্রতিভারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 'রবীন্দ্রনাথের' শেষের কবিতায় লাবণ্য যেভাবে শোভনলালকে বিবাহ করিয়া অমিতকে ভালবাসার সংকল্প করিয়াছে, কাব্যিক আবরণে সেই অশ্লীলতার চেয়ে শরৎচন্দ্রের অচলার পৌরুষের কাছে আত্মসমর্পণের প্রবণতার গৌরব বেশি। 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শী জীবানন্দের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহার ভূমিকা সমান সমান নয়, অথচ জীবানন্দ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কর্মক্ষেত্রে ষোড়শী অনন্য-সাধারণ শক্তির স্বাক্ষর রাখিয়াছে। 'শেষ প্রশ্ন'-এ বৃদ্ধ ও প্রায় অথর্ব

* শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাসে 'জাগরণ'-এও কলিকাতার আধুনিকা তরুণী ইন্দু গ্রামে ব্রাহ্মণপণ্ডিত অমরনাথের আল্পনা-আঁকা ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত মাটির বাড়ীতে মুগ্ধ হইয়া ভক্তি করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়াছে। এইখানে গ্রন্থ অসমাপ্ত না হইলে তাহার পরিণতিও হয়তো 'বিপ্রদাস-এর বন্দনার মত হইত।

আশুবাবুকে নীলিমা যেভাবে প্রেমের অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহাতে আশুবাবুর কোন হাত ছিল না। এও বন্দনার বিপ্রদাসকে ভালবাসার মত নিজেকে নীচের স্তরে ভাবিয়া আত্মনিবেদনের ভূমিকা ছাড়া কিছু নয়। নীলিমাকে শরৎচন্দ্র যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে আর যাহাই হউক আশুবাবুর অর্থের প্রতি লোভের মত কোন হীনতা নীলিমার এই আত্ম-নিবেদনের করুণ ছবিটিকে কলঙ্কিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পুরুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার জন্য নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দিয়া ও এজন্য দুঃসহ দুঃখ সহিয়া নারীর আত্মতৃপ্তির পরিচয় শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যত্রতত্র, ইহা শরৎসাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র অসামাজিক প্রেমের মত আধুনিক সমস্যার বলিষ্ঠ রূপায়ণে সাহসী হইলেও এবং তাঁহার রচনায় বর্তমান যুগের নানা জটিল ও কঠিন সমস্যার অবতারণা থাকিলেও নরনারীর সমতাসৃষ্টির জন্য তাঁহার এই অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি বাতিল করিতে চাহেন নাই। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র ইহাকে নারীমনের ঐশ্বর্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এইজন্য শুধু প্রেমের পরিমণ্ডলে স্বাভাবিক পরিচিতি পাওয়া ভদ্র-ঘরেরমেয়েদের ক্ষেত্রে নয়, পতিতা মেয়েদের ক্ষেত্রেও তিনি এই ঐশ্বর্য যত্ন করিয়া ফুটাইয়াছেন। পতিতা পরিবেশে প্রেমের আন্তরিকতাহীন ব্যবসা চলে, কিন্তু পতিতা যখন নারীত্বের স্নিগ্ধ মহিমায় আপন বৃত্তিগত হীনতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়, তখন আলোচ্য প্রেমের পরীক্ষায় শরৎচন্দ্র তাহাকে বিজয়িনী করিতেও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী এবং 'আঁধারে আলো'র বিজলী—দুজনেই ইহার দৃষ্টান্ত। দুজনেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসার জন্য সর্বস্বত্যাগ করিয়াছে, দুজনেই ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া স্বেচ্ছায় চরম দুঃখের পথ মানিয়া লইয়া প্রেমের স্মৃতিটুকুমাত্র সম্বল করিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই সহায় সম্বলহীন মেয়েদের প্রেমের জন্য বৃত্তি-ত্যাগ পাঠক-মনে প্রশ্ন জাগায়, কিন্তু নারীর হৃদয়-ধর্মের দিক হইতে ইহার সৌরভও অনস্বীকার্য। চন্দ্রমুখীর চেয়ে বিজলীর অবস্থা আরও করুণ, তবু চন্দ্রমুখীকে দেবদাস কিছুটা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাকে 'বৌ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, বিজলী সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আত্মপরিচয় দানের পর পাইয়াছে শুধু ঘৃণা। তাহার দুঃখের পাত্র পূর্ণ হইয়াছে গল্পের শেষে, যেখানে চরম দারিদ্র্যে নিরুপায় এই নারী বাধ্য হইয়া আবার পুরাতন পেশায় ফিরিয়া আসিয়াছে, যদিও এজন্য প্রত্যাবর্তনে তাহার ব্যথা ও লজ্জার অন্ত নাই। আবার এইভাবে

ফিরিবার পর সে জানিতে পারিল যে তাহার প্রথম ডাক আসিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাহারই বাড়ীতে। এক নিমিষে হতভাগিনী অনুভব করিল সত্যেন্দ্র তাহাকে অপমান করিবার জন্যই এইভাবে ডাকিয়া আনিয়াছে। এখানে শরৎচন্দ্র অবশ্য সহানুভূতি দিয়া তাহার নিঃসীম বেদনাকে কিছুটা মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রেমসিক্ত অন্তরের পরিচায়ক নিম্নলিখিত কথাকয়টি তাহার মুখে বসাইয়া। নিজের পূর্ণ আত্মসমর্পণ অকপটে তুলিয়া ধরিয়া বিজলী সত্যেন্দ্রের স্ত্রী রাধা-রাণীকে বলিয়াছে: "তাঁরও (সত্যেন্দ্রের) ভুল হয়েছে। তাঁর পায়ে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শরৎচন্দ্রের নায়করা নায়িকাদের তুলনায় প্রাণচাঞ্চল্য ও সক্রিয়তার দিক দিয়া অনেকক্ষেত্রেই কিছুটা নিষ্প্রভ, কিন্তু প্রেমের পটভূমিতে তাহাদের আসন উপরে। আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ, অন্যকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে প্রেমের গভীরতার সৃষ্টি ও পরীক্ষা, ভালবাসিয়া অপ্রাপ্তির বেদনায় অথবা ভালবাসার ধনকে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা হইতে রক্ষার আকুলতায় দুঃসহ দুঃখবরণ,—এসব শরৎসাহিত্যে নায়িকা চরিত্রে গতির সৃষ্টি করিয়াছে। নায়ক অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হইলেই নায়িকাদের সক্রিয়তার সুযোগ আপেক্ষিকভাবে বেশি হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ সক্রিয় হইয়া উঠিলে নারী আপেক্ষিকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র সহিত 'গৃহদাহ'র তুলনা করিলে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা মিলিবে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত অপেক্ষাকৃত শান্ত, নিষ্ক্রিয় চরিত্র অথচ রাজলক্ষ্মীর জীবনপথে সে দীর্ঘসময়ের একান্ত সঙ্গী। এক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মীর সক্রিয়তা আপেক্ষিকভাবে অধিক সুযোগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ অধিকতর সক্রিয় বলিয়া তাহার সঙ্গিনী অচলার আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়।

কিন্তু পুরুষ সক্রিয় হউক আর নিষ্ক্রিয় হউক, প্রেমের চিত্রে অভয়ার বা কমলের মত দু এক ক্ষেত্র ছাড়া শরৎচন্দ্র পুরুষের প্রাধান্য বা মর্যাদা মানিয়া লইয়াছেন। প্রেমের প্রকাশে বা সুখ-দুঃখ-বরণে নারী হয়তো অধিকতর উচ্ছল, পুরুষের দিক হইতে এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস শরৎসাহিত্যে একটু কম, কিন্তু পুরুষ প্রেমের পথে আপন অস্তিত্বকে নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত কম

চেষ্টাই করুক, শরৎচন্দ্রের প্রেমমূলক সাহিত্যে কিন্তু নারীর স্থান সাধারণভাবে পুরুষের নীচেই নির্ধারিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অনেক নায়িকা অতি সহজেই পুরুষকে ভালবাসার সক্রিয়তায় উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী ও অন্নদাদিদি বিপরীত প্রান্তিক চরিত্র হইলেও আলোচ্য বক্তব্যের হিসাবে দুজনের কথাই এক সঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নানা আধুনিক সমস্যা আছে, সেইসব সমস্যার বাস্তব-রূপ প্রায়ই কঠিন ও জটিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মনটি রোমান্টিক। এমনও দেখা গিয়াছে যে, শরৎচন্দ্র নারীমনের মহিমা দেখাইতে স্ত্রী-চরিত্রের কর্তব্যকে প্রেমের উপরে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কর্তব্যানুরক্তির গৌরব যতই থাক, প্রেম আহত হইবে এই সম্ভাবনায় শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'আলো ও ছায়া' গল্পে আছে বালবিধবা সুরমা যজ্ঞদত্তের কাছে আশ্রয় পাইয়াছিল। যজ্ঞদত্ত তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু সে বিধবা এবং অনেক তলার শ্রেণীর মানুষ বলিয়া যজ্ঞদত্তকে সুখী করিতে তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিল মহা উৎসাহে। কিন্তু বিবাহের দিন যত আগাইতে লাগিল ততই সুরমার উৎসাহ কমিতে লাগিল এবং এই সময় আবার যজ্ঞদত্তের বিবাহে আগ্রহ দেখিয়া নৈরাশ্যে মন তাহার একেবারে ভরিয়া গেল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী বারবার শ্রীকান্তকে সুখী করিবার জন্য তাহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছে, কিন্তু পুটুকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব যখন শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে জানাইল, তাহার নিজের প্রেম পাছে আশ্রয় হারায় এই আশঙ্কায় রাজলক্ষ্মী অস্থির হইয়া উঠিল এবং বিবাহ করিতে শ্রীকান্তকে সে শুধু মুখের নিষেধ জানাইল না, বিবাহ হইলে সে গলায় দড়ি দিবার ভয় দেখাইল। শ্রীকান্তর বিবাহ হইলে সে নববধূর হইবে, তাহার থাকিবে না, তাহার প্রেম কক্ষচ্যুত হইবে, এই ভয়াবহ অবস্থা রাজলক্ষ্মী কল্পনাও করিতে পারে না, যদিও কর্তব্যবোধে মাঝে মাঝে সে শ্রীকান্তর প্রকৃত শুভার্থিনী হিসাবে তাহাকে স্থিতিমান সংসারী দেখিতে চাহিয়াছে। এই বিচিত্র মানসিক অবস্থার জন্যই হয়তো রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আপন হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সাধনায় সুনন্দার দেওয়া যে ধর্মবোধ অন্তরে লালন করিতেছিল, স্বেচ্ছায় তাহার সমাধি দিয়া আপন প্রেমিকারূপটিকে নির্বাধ করিয়া তুলিল। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ সর্গে এইজন্যই বোধহয় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে কমললতার কাছে একা ছাড়িয়া না দিয়া মুরারিপুরে শ্রীকান্তর সঙ্গী হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনে লেখা

'মন্দির' গল্পেও নায়িকার এই মনোভাব দেখা যায়। পূজারী শক্তিনাথ অপদার্থ, সে দেবতার পূজা ভাল করিয়া করিতে জানে না। তদুপরি বিধবা জানিয়াও তাহাকে দেলখোস এসেন্সের শিশি উপহার দেয়, এ হেন পুরোহিতকে বিতাড়িত করিয়া জমিদার-কন্যা ভক্তিমতী অপর্ণা কর্তব্যই করিয়াছে; কিন্তু এই শক্তিনাথের প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মিয়াছিল অন্তরের অন্তঃস্থলে, শক্তিনাথ বিতাড়িত হইবার পর, বিশেষভাবে তাহার মৃত্যুসংবাদ আসিবার পর অর্পণার বেদনার আর সীমা রহিল না।

নরনারীর প্রেমের বর্ণনায়, প্রেমের অগ্রগতির পরিচায়ক ও সহায়ক খুঁটি-নাটি ঘটনার বিবৃতিতে শরৎচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পুরুষ ও নারীর হৃদয় পারস্পরিক আকর্ষণে যখন কাছাকাছি আসে, অথবা নারীহৃদয় প্রেম-সুরভিত হইয়া দয়িতের জন্য আত্মবিলোপে আগ্রহী হয়, সেই রোমান্টিক ছবি শরৎচন্দ্র চমৎকার ফুটাইয়াছেন। বাস্তব দিক হইতে এই প্রেমের প্রকৃতি কি, অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে এই প্রেমের মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা লইয়া শরৎচন্দ্র ততটা মাথা ঘামান নাই। আগেই বলা হইয়াছে, প্রেমের জন্য দুঃখবরণ তাঁহার লেখায় হামেশা মিলে, কাজেই প্রেমের ছবি আঁকিতে তিনি হৃদয়গত রূপ, রঙ ও রসের উপর জোর দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রেম বিচার করিতে যান নাই। ভালবাসার মাধুর্য প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়কে বিলসিত করিবে, ভালবাসিয়া দুঃখ পাইলেও ভালবাসার নিজস্ব মহিমা উবিয়া যায় না, এ ধরণের বিশ্বাস লইয়াই তিনি প্রেমচিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। প্রেমের পূজার জাগতিক ফললাভের বাস্তবরূপ লইয়া শরৎচন্দ্র বাড়াবাড়ি করেন নাই, দত্তা, পরিণীতা প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের পরিণতিতে মিলনের ছবি স্বাভাবিক-ভাবেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে ; তবে প্রেম মানুষকে কতটা কোমল ও মহনীয় করিয়া তোলে, মানুষের বাঁচিবার সার্থকতা প্রেমবোধ হইতে কিভাবে স্পন্দিত হয়, শরৎসাহিত্যে তাহা সুন্দর ফুটিয়াছে। ব্যর্থপ্রেমের জ্বালা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সচেতন, নহিলে কিরণময়ীর মত উচ্চশ্রেণীর চরিত্র তিনি আঁকিতে পারিতেন না, কিন্তু দাহকারী নয়, হীরকোজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রেমই নারীজীবনের প্রধান অবলম্বন এরূপ অনুভূতি সিঞ্চিত করিয়া তিনি রাজলক্ষ্মী, ষোড়শী, রমা, চন্দ্রমুখী, বিজলীর মত অনেকগুলি নারী চরিত্র আঁকিয়াছেন। যে পতিতা স্ত্রীলোক ব্যক্তিগত উদ্দাম দেহজ বিলাসিতার উপরই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে ভাবিয়াছে, প্রেম তাহাকে কতটা শান্ত সংযত করিতে পারে,

জীবনের সত্যকার মাধুর্যের কতখানি সন্ধান দিতে পারে, এমনকি প্রতিদান-নিরপেক্ষভাবেও প্রেম তাহাকে কতটা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, তাহাই তিনি বিজলী, চন্দ্রমুখীর মত নারী চরিত্রে দেখাইয়াছেন। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কমললতা কুলমহিলা নয়, ষোড়শী ঠিক এদের শ্রেণীর না হইলেও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থকন্যা নয়, তবু ইহাদের মনে যখন প্রেমের আলো জ্বলিয়াছে, এক বিচিত্র প্রশান্তি ইহাদের ধূসর অতীতকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রেম জীবনের পথ চলায় কত বড শক্তি, চঞ্চল মনকে প্রেম কতখানি প্রশান্ত করিতে পারে, 'চরিত্রহীন'-এ স্নিগ্ধা পুরমহিলা সুরবালার প্রেম-গঙ্গায় অবগাহনকারী উপেন্দ্রের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন'-এর প্রথম দিকের উপেন্দ্রের সহিত শেষদিকের উপেন্দ্রের তুলনা করিলেই কথাটা বোঝা যায়। এই পবিত্র মধুর দাম্পত্য প্রেম সুরবালার কালরোগের বেদনা যেমন ঢাকিয়াছে, তেমনি কালরোগ সত্বেও সুরবালাকে উপেন্দ্রের একান্ত কাছাকাছি রাখিয়াছে। 'অনুরাধা' গল্পটি গল্প হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়, ইহার প্রেম অধ্যায়ও উচ্চশ্রেণীর নয়, তবু এই গল্পেও দেখা যায় যে, কলিকাতার গণ্যমান্য নাগরিক দাম্ভিক বিজয় গ্রাম্য মেয়ে অনুরাধার প্রেমে পড়িয়া অতি শান্ত ভদ্র ও সংযতচরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে জমিদার-সন্তান চন্দ্রনাথ হয়তো পাচিকা কন্যা সরযূর রূপ দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর সরযূর মায়ের কলঙ্কের সংবাদ জানিয়াও তাহার আভিজাত্যের সহিত সেই সংবাদের জন্য ক্ষোভ ও ক্রোধের যে সংঘর্ষ হইতে পারিত, চন্দ্রনাথের মনে সরযূর প্রতি ভালবাসার সুরঝঙ্কারে তাহার উদ্ভব হইতে পারে নাই। শুধু তাই নয়, কাকা মণিশঙ্কর জোড়াতালি দিয়া লোকনিন্দার কণ্ঠরোধ করিলেও ঘটনার সত্যতা সরযূ নিজে চন্দ্রনাথের কাছে স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া এসম্বন্ধে চন্দ্রনাথের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়, কিন্তু সে প্রেমের শক্তিতে সরযূর মায়ের চরিত্র-কলঙ্কের গ্লানি হইতে সরযূকে পৃথক করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ ছিল বলিয়াই 'দত্তা' উপন্যাসে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম-তরুণী বিজয়া হিন্দুসন্তান নরেনকে হিন্দুমতে বিবাহ করিতে কনে সাজিয়া বসিয়া গেল। তাহার সাধের ব্রাহ্মমন্দিরের কথা, ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধবের কথা, হিন্দুসমাজে এ বিবাহের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়ার কথা, এমন কি তাহার পিতার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য গ্রামে লাঞ্ছনার কথা সে যেন ভুলিয়া গেল। নরেনের প্রতি পূর্বাহ্ণে গভীর প্রেম বিজয়ার মনে না জন্মিলে দয়ালের হাজার স্নেহের

ছলনা-মণ্ডিত ব্যবস্থায়ও বিজয়াকে এ বিবাহে রাজী করান যাইত না। 'গৃহদাহ'-এর অচলার স্বামী-সংস্কার ছিল, তাছাড়া মহিমকে সে দীর্ঘদিন ধরিয়া ভালবাসিয়াছে; কিন্তু অন্ততঃ অন্তর্মনে সুরেশকে সে অবশ্যই গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিল। তাহা না হইলে অচলার মত আধুনিকা ব্রাহ্ম তরুণীকে সুরেশ ছলনা করিয়া ট্রেন হইতে নামাইয়া লইল বলিয়াই সে অসুস্থ স্বামীকে বিসর্জন দিয়া সুরেশের সঙ্গে বসবাস করিতে লাগিল, কোন ব্যবস্থা করিয়া বা কাহারও সাহায্য লইয়া সুরেশের কবল হইতে মুক্তির চেষ্টা করিল না, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব?

ব্যক্তি সমাজের অংশ হইলেও সমাজের সামগ্রিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-বোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিচিত্র বাসনা বেদনার সামঞ্জস্য হইবেই এমন কথা নাই। যে ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য হয় না সেখানে সংঘর্ষের উদ্ভব হয় এবং সেই সংঘর্ষ উপন্যাসের গতি সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে এই সংঘর্ষ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, কারণ তিনি চরিত্র প্রস্ফুটনের উপর জোর দিয়া গল্প উপন্যাস লিখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম বা হৃদয়ের ভালবাসা তাহার সাহিত্য কর্মের প্রধান উপাদান বলিয়া এই সামাজিক বিধিবিধানের সহিত সামঞ্জস্য-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-প্রেমকে তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার লেখায় প্রেমের জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণদের মধ্যে উঁচু নীচু ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রেম, উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের প্রেম, হিন্দুর সহিত অহিন্দুর প্রেম, বিধবার প্রেম, সধবার পর-পুরুষের সহিত প্রেম,—তাঁহার রচনায় বহুবিচিত্র পটভূমিতে প্রেম রূপায়িত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী, অপূর্ব-ভারতী, নরেন-বিজয়া, রমেশ-রমা, সুরেশ-অচলা,—ইহাদের প্রেমের ছবি যত সুন্দর হোক সে প্রেমে সমাজের অনুমোদন নাই, আর অনুমোদন নাই বলিয়াই সামাজিক পরিমণ্ডলে আসিলে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই সংঘর্ষে ব্যক্তিপ্রেমের মাধুর্য, কোমলতা ও সৌন্দর্য যত হৃদয়গ্রাহী হউক, সমাজের শক্তি বেশি বলিয়া পরিণতি প্রায়ই ট্র্যাজিক হয় এবং প্রেমিক প্রেমিকাকে দুঃখ সহিতে হয়। শরৎচন্দ্র প্রেমের চিত্রগুলি দরদ দিয়া সুন্দর করিয়া আঁকিলেও সমাজচেতনা আত্যন্তিক ছিল বলিয়া তাঁহার লেখাগুলির পরিণতিও প্রায় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীর পক্ষে সুখের হয় নাই।* আর যেখানে ব্যক্তিগত

* শরৎচন্দ্রের এই দিকটি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবির লিখিয়াছেন,

প্রেমের ব্যক্তিগত সীমায় মিলন হইয়াছে, সেখানে এই মিলনের চিত্র পাঠককে তৃপ্ত করিলেও সমাজের সহিত সংঘর্ষের প্রশ্ন ভবিষ্যতে তোলা থাকিবে বলিয়া সচেতন পাঠক-মনে পড়িয়াও পড়া শেষ হইল না এই ধরণের একটা অস্বস্তিকর ভাব থাকিয়া যায়, ফলে ছোটগল্পের রসের দিকে কাহিনীর গতি কিছুটা ঘুরিয়া উপন্যাসধর্ম অল্পবিস্তর ব্যাহত করে। 'দত্তা' চমৎকার বই, কোন কোন সমালোচকের মতে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে মনোহারী উপন্যাস, কিন্তু এখানে বিজয়ার সহিত নরেনের বিবাহ হইয়া যে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইল, তাহার অনিবার্যতা সামাজিক পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিবে, কিন্তু তাহার পরীক্ষা এই 'দত্তা' উপন্যাসে হয় নাই।* অবশ্য নরেন বিলাতফেরৎ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বলিয়া জাতের বা ধর্মের গোঁড়ামি হইতে তাহার কিছুটা মুক্ত থাকিবার কথা এবং তাহাতে এই অসামাজিক-বিবাহোত্তর জীবনের জটিলতা

"In spite of his revolutionary ardour, there is in Chatterjee an element of conservatism that has often surprised people." (Sarat Chandra Chatterjee, 1963, page 31)

* শরৎচন্দ্র এখানে সমাজবোধের হিসাবে রবীন্দ্র-অনুসারী এবং তাঁহার নিজের সমাজকল্যাণবোধ এখানে কিছুটা আচ্ছন্ন। শিল্পী নীতিবাদী হইবেন, এই মতবাদের আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে অনেকস্থানে করেন নাই, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাহিনীর পরিণতিতে নীতিবোধ বহু জায়গায় কার্যকরী হইয়াছে। 'গোরা'য় ব্রাহ্ম ললিতা ও হিন্দু বিনয়ের বিবাহের পর যে সব সমস্যা উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সে সব গ্রাহ্য করেন নাই। ১৩৬৫ সালের 'দেশ' পূজাসংখ্যায় মুদ্রিত শ্যামাদাস লাহিড়ীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন: "ললিতা বিনয়ের বিবাহে সামাজিক বিঘ্ন কি ঘটতে পারে, সে কথা গোরা নভেলে বিচার্য বিষয় নয়, যে দুর্নিবার আবেগে তারা মিলিত হয়েছে সেইটের মনস্তত্ত্বঘটিত সত্যতাই লেখক কল্পনা করেছে, তার থেকে তার সন্তানদের কী দুর্গতি হতে পারে সেই সামাজিক তত্ত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার স্থান উপন্যাস নয়।

আর্টই আর্টের পরিণাম একথা বলতে বোঝায় আনন্দই আনন্দের পরিণাম। আনন্দের পরিণাম বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়, হিতোপদেশ নয়।"

অনেকখানি হ্রাস পাইবার আশ্বাস থাকায় পাঠকের মনের উদ্বেগ কিছুটা কমিয়া যায়।

সমাজ-চেতনার দিক হইতে, আগেই বলা হইয়াছে, অসামাজিক প্রেমের কথা সম্ভাব্যতার নিরিখে কিছু কিছু উল্লিখিত হইলেও সেই প্রেমের এত বিস্তৃত বর্ণনা শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে ছিল না। এদিকে পাঠকের মন আকৃষ্ট করিয়া শরৎচন্দ্র সমাজে প্রচলিত অনেক বিধিবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন হয়তো রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি সুন্দর করিয়া সবিস্তারে সমাজ-বিগর্হিত বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই সেই সব চিত্রের প্রতি তাঁহার আস্থা আছে এমন কথাও মনে করা ঠিক নয়। যদিও বা কোন ক্ষেত্রে হৃদয়গত মূল্যের জন্য তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকে, তাহা হইলেও সমাজের প্রচলিত বিধিবিধান ভাঙিয়া দিয়া সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মূলে আঘাত করিয়া তিনি সেই প্রেমকে বিজয়ী করিয়া তুলেন নাই। দরদ দিয়া, বাস্তব অনুসরণ করিয়া মানুষের মনের রূপোজ্জ্বল কাহিনী তিনি পাঠকের কাছে রাখিয়াছেন, ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তিনিও হয়তো মানবিক সহানুভূতিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই ধরণের কাহিনী অঙ্কনের উদ্দেশ্য হইল জীবনকে রূপায়িত করা এবং পাঠক তথা সামাজিক মানুষকে সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুপ্রাণিত করা। তারপর পাঠকের সমাজচিন্তা সমস্যা সমাধানের অনুকূল হইয়া উঠিলে সমাজ-দেহে ক্ষত দূরীকরণে সামাজিক চাহিদা দানা বাঁধিবে।

(যে প্রেমে সমাজের অনুমোদন নাই, সেই প্রেম স্বীকার করিবার অনুকূল সামাজিক মানুষের পরিবর্তিত মূল্যবোধ এখনও জাগে নাই বলিয়া শরৎচন্দ্র সমাজকে আঘাত করিয়া সেই প্রেম সার্থক করিতে চাহেন নাই। পক্ষান্তরে যেখানে পারস্পরিক প্রেমের পিছনে সমাজের অনুমোদন আছে, অন্তত তেমন প্রতিবাদ নাই, বহু বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া সেই প্রেমের চিত্র ফুটনে যত্ন লইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সার্থক পরিণতি আঁকিতে তিনি কাতর হন নাই। এই দিকটি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, নায়ক বা নায়িকাকে দুঃখ দিয়া করুণ সাহিত্য সৃষ্টি করার এবং তদ্দ্বারা ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করার চেষ্টায় যে সমালোচনা তাঁহার সম্বন্ধে করা হয়, তাহাতে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হয় না।) সমাজের প্রচলিত বিধানের বৈপরীত্যের ক্ষেত্র ছাড়াও যে ক্ষেত্রে প্রেম অশোভন, চরিত্রের গৌরব যে ক্ষেত্রে প্রেমের সাফল্যে নষ্ট হইয়া যায়,

সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির বেদনাকে শরৎচন্দ্র বেদনার কারুণ্যের পরিমণ্ডলে সীমায়িত রাখিয়াছেন। ইহা চরিত্রের বিশেষত্ব, লেখকের অপরাধ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সব কিছু হারাইয়া 'চরিত্রহীন'-এ দিবাকর কিরণময়ীর কাছে দুর্বোধ্য স্নেহটুকু ছাড়া কিছুই পাইল না, 'শেষপ্রশ্ন'-এ নীলিমা উদ্বেল অন্তরকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া শুধু হাতে ফিরিবার জন্যই আশুবাবুর পায়ে মুখ চাপিয়া চোখের জলে সে পা ভিজাইয়া দিল। কিন্তু যেখানে নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা সার্থক হইলে সমাজের আপত্তি নাই বা সমাজের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত উদারতার সহিত সেখানে প্রেমের সার্থক পরিণতিই আঁকিয়াছেন। এই মনোভাবে মানবতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির'ও স্পর্শ যে কার্যকরী হয় তাহার প্রমাণ 'অরক্ষণীয়া'য় তিনি অতুলকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদার কাছে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সিদ্ধকল্প' গল্পের নায়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অরুণের মত অতুল জ্ঞানদার দিকে শেষপর্যন্ত পিছন ফিরিয়া থাকে নাই। এইজন্যই বাংলার হিন্দুসমাজের আয়ত্তের বাহিরে রেঙ্গুনে অভয়া-রোহিণীর অথবা ভারতী-অপূর্বর ভালবাসা সার্থক করিয়া আঁকিতে শরৎচন্দ্রের সঙ্কোচ হয় নাই। কমলের ভালবাসার মনগড়া দর্শন এবং পর পুরুষকে জীবনে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রকে তাই বোধ হয় পরিণত জীবনে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশে রাখিতে চাহেন নাই, সে ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে বহুদূরে আগ্রায়, যেখানে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর বাস এবং আরো দূরে অজিত ও কমলের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবে, যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। এই প্রসঙ্গে অনুরূপক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সম-মনোভাব উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশ-নন্দিনীতে বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহের অসামাজিক বিবাহকে চাপিয়া রাখিয়া বীরেন্দ্রসিংহের মৃত্যুর পর বিমলার বীরত্ব ও কর্তব্যবোধের উজ্জ্বলতার সুযোগে প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলাদেশের এই কাহিনীর বিপরীতে তাঁহার রাজসিংহ উপন্যাসে সুদূর রাজস্থানে ঘটা কাহিনীতে মাণিকলাল অজ্ঞাতকুলশীলা নির্মল-কুমারীকে একেবারে দু'কথায় বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া আপন ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলার ঘটনাস্থল বাংলাদেশ, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ করিয়া তবেই নবকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নবকুমারের সহিত কপাল-কুণ্ডলার যে পরিবেশে সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহার পরিণতিতে উভয়ের বাঁচিবার প্রশ্নে কৃতজ্ঞতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাবে নিতান্ত লেখকের সমাজবোধ ছাড়া

অন্তকারণে কপালকুণ্ডলার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিবার কথা নয়। সেক্স্‌পিয়ারের টেম্পেস্টে মিরাণ্ডা-ফার্ডিনাণ্ডের অথবা কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমে পড়িবার আগে জাতিকুল মিলাইয়া দেখিবার প্রশ্ন উঠে নাই। 'দত্তা'য় বিজয়ার ভালবাসা নরেনকে তাহার কাছে আনিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্ম মন্দিরের আচার্য হইয়াও হৃদয়বান দয়াল এই মধুর প্রেম ব্যর্থ হইতে দিতে চাহিলেন না, তিনিই তাঁহার বাড়ীতে রাসবিহারীর ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া বিজয়া-নরেনের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দয়াল হিন্দুমতে বিজয়ার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন কারণ পাত্র নরেন হিন্দু। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা দয়াল করে নাই, করিয়াছেন লেখক শরৎচন্দ্র। প্রেমের গৌরবই 'দত্তা' উপন্যাসের মূল আকর্ষণ, সেখানে বিবাহ হিন্দুমতে হইল কি হইল না সে কথা বড় নয়, বিলাতফেরৎ ডাক্তার নরেনের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা যে কোন ধর্মমতে বিজয়াকে বিবাহের অনুকূল ছিল; তবু বাংলাদেশের সমাজের বুকে বসিয়া শরৎচন্দ্র হিন্দুর ছেলেকে (যদিও বিলাত যাইবার জন্য সে-গ্রামে লাঞ্ছিত) ব্রাহ্ম মেয়ের সহিত হিন্দু মতে বিবাহ দিয়া পুরুষ-প্রধান প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাটি মানিয়া চলিতেই উৎসাহবোধ করিয়াছেন।

আবার 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে সন্ধ্যাকে শরৎচন্দ্র পিতার সহিত দেশছাড়া করিয়াছেন। ব্যাপারটি খুবই করুণ। সন্ধ্যার অরুণের সহিত ভালবাসায় খাদ ছিল না, পরস্পরের একান্ত প্রেমের অসার্থকতার জন্য সন্ধ্যা-অরুণ দায়ী নয়। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ এই তরুণ-তরুণীকে দুঃখের পথে ঠেলিয়াছে, অরুণ বিলাত যাইবার জন্য একঘরে হইয়াছে, সন্ধ্যার মা জগদ্ধাত্রী পছন্দ না করায় সন্ধ্যাদের বাড়ী আসা তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। সন্ধ্যার পিতা প্রিয় মুখুয্যের বংশ-গ্লানি প্রকাশ হইয়া পড়ায় কুলীনপুত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ধ্যা তখন বিবাহের বেশেই অরুণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল আশ্রয়ের আশায়। বিপন্না জ্ঞানদার প্রতি সহানুভূতি অতুলকে 'অরক্ষণীয়ায়' জ্ঞানদাকে গ্রহণ করিতে প্রেরণা দিয়াছে, এখানে কিন্তু সন্ধ্যার চরম বিপদের সময় অরুণের দিক হইতে সাড়া আসিল না। অরুণ সন্ধ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ সে বিলাত-ফেরৎ, আধুনিক শিক্ষিত মানুষ সে, হিন্দুসমাজ তাহাকে একঘরে করিয়াছে, হিন্দুসমাজের জন্য ততটা গরজ তাহার থাকিবার নয়। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, অরুণ অভিমান বশে

সন্ধ্যাকে ফিরাইয়াছে, কিন্তু যে অশ্রুমুখী মেয়ে বিবাহের পিঁড়ি হইতে উঠিয়া তাহার কাছে একবুক আশা লইয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রতি অরুণের মত শিক্ষিত ছেলের এই কি অভিমানের সময়? আসলে সন্ধ্যাদের পারিবারিক কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর শরৎচন্দ্র আর অরুণকে সমাজের বিরুদ্ধে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করাইতে উৎসাহবোধ করিলেন না। একঘরে হইলেও অরুণ ব্রাহ্মণ-সন্তান। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের সমাজবোধের জন্যই পিতা প্রিয় মুখুজ্যের সঙ্গে সন্ধ্যাকে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াইতে হইল।

শরৎসাহিত্যে সমাজের অননুমোদিত প্রেমে আর একটি দিক লক্ষ্য করিবার মত। তাঁহার লেখায় প্রায়ই নারী যেখানে পুরুষকে ভালবাসিয়াছে, সেখানে সেই ভালবাসার পাত্র বিশেষ পুরুষটির কেন্দ্রেই এই প্রেম সীমায়িত। হয়তো প্রেমিকার অন্যকে ভালবাসিবার পূর্ব-ইতিহাস আছে, হয়তো বর্তমান প্রেম স্থায়ী হয় নাই এবং পরে সে আবার অপর কাহাকেও ভালবাসিয়াছে, কিন্তু বিশেষ কাহাকেও ভালবাসার যে কাহিনী শরৎচন্দ্র বিশেষ পর্যায়ে আঁকিয়াছেন, সেখানে নায়িকার নিষ্ঠায় ফাটল বড একটা ধরান নাই। অবশ্য ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা বিজয়া, অচলা, মা-শোয়ের জীবনে আসিয়াছে, কিন্তু সেই সমস্যার ক্ষেত্র বাদ দিলে সাধারণ প্রেমের সময়ে শরৎচন্দ্রের নায়িকা একপুরুষমুখী। শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল নারী লতার মত, পুরুষকে অবলম্বন করিয়া তাহার বাঁচার সার্থকতা। এইজন্য ভালবাসার পাত্র সরিয়া গেলেও ভালবাসা নারী মনে মরিয়া যায় না এবং নূতন পাত্রের সন্ধান মিলিলে এবং তাহাতে নারীর মন বসিলে পুরাতন প্রেমের নিষ্ঠা নূতনের ক্ষেত্রেও নূতনরূপে ফিরিয়া আসা অসম্ভব নয়। এই প্রশ্নের উপরই তাঁহার বিধবা নারীদের প্রেম-সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। স্বামী-সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কার, মৃত স্বামীর স্মৃতি জীবন্ত হইয়া নারীকে পরিপূর্ণা রাখিয়াছে শরৎসাহিত্যে কদাচিৎ। ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেম-মহিমার প্রতি স্বীকৃতির জন্যই যে এরূপ হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। 'শেষ প্রশ্ন'-এ কমল শিবনাথকে যখন ভাল-বাসিয়াছে তখন সে একান্তভাবে শিবনাথের, আবার শিবনাথকে নিঃশেষে ছাড়িয়াই অজিতকে সে ভালবাসিয়াছে। 'বিপ্রদাস'-এর বন্দনা সুধীরকে, বিপ্রদাসকে, দ্বিজদাসকে পরপর ভালবাসিয়াছে, দুজনকে একসঙ্গে ভালবাসে নাই। যখন যাহাকে ভালবাসিয়াছে সম্পূর্ণভাবে শুধু তাহাকেই ভালবাসিয়াছে। এইভাবে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কুলত্যাগিনী, পতিতা নহে, অন্ততঃ

বসবাসকারিণী, মেসের ঝি সাবিত্রী 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সুদীর্ঘ পটভূমিতে একমাত্র সতীশকেই ভালবাসিয়া গিয়াছে। এই উপন্যাসে কিরণময়ী স্বামীর স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াই উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে। উপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা কিরণময়ী যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত লালন করিয়াছে, তাহা দিবাকরের সহিত পবিত্র সম্পর্ক রক্ষা ছাড়াও অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে আরাকানে তাহার ঘরে বাড়ীউলি মাড়োয়ারী খরিদ্দার ঢুকাইয়া দিলে এবং কিরণময়ীকে 'বেবুশ্যে' (বেশ্যা) সংজ্ঞা দিলে কিরণময়ীর প্রতিবাদের উত্তেজনায় অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার মধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। 'পল্লীসমাজ'-এ রমা যখন রমেশকে ভালবাসিয়াছে, তাহার বৈধব্য-সংস্কার কিছুটা কার্যকরী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্বামীর প্রতি ভালবাসা বা স্বামীর সহিত একাত্মতার স্মৃতি তাহার এই প্রেমের পথে দাঁড়ায় নাই।

সমাজের অননুমোদিত প্রেমের বিপরীতে যে প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদন আছে তাহার পরিণতিতে প্রায়ই বেদনার পরিবর্তে শরৎচন্দ্র প্রসন্ন আনন্দের প্রবাহ বহাইয়াছেন। শরৎসাহিত্যে ব্যথা-বেদনার আধিক্যের জন্য তাঁহাকে দুঃখবাদী লেখক ভাবা ঠিক নয়, যেখানে সমাজের সমর্থন নাই সেখানে তিনি সমাজ-বহির্ভূত প্রেমকে সার্থক করিতে পারেন নাই বটে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমিক প্রেমিকা প্রভূত দুঃখও পাইয়াছে, কিন্তু সমাজ-সম্মত প্রেমে তিনি মোটেই অনুদার নন। এইজন্য দেখা যায় 'পরিণীতা'য় ললিতাকে ব্রাহ্ম মামার সংসারে হিন্দু করিয়া রাখিয়া শরৎচন্দ্র তাহাকে কিছু দুঃখ দিয়া শেষ পর্যন্ত শেখরনাথের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন, অতুল জ্ঞানদার মায়ের শ্মশানভূমিতে তাহার রোগজীর্ণ হাত দুটি অনুরাগে আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছে, বন্দনা বলরামপুরের বৃহৎ মুখুজ্যে পরিবারের বধূরূপে দ্বিজদাসের পাশে আশ্রয় পাইয়াছে, গ্রাম্য মেয়ে দরিদ্রা অনুরাধার জন্য সহুরে বিলাত-ফেরৎ ধনীর দুলাল বিজয় সানন্দে সমস্ত আভিজাত্য-বোধ বিসর্জন দিয়াছে।

মোটের উপর, মানুষ থাকিলেই মানুষের হৃদয় থাকিবে এবং মানুষের হৃদয় থাকিলেই নরনারী বিশেষ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা জীবন-সত্য। কোন ভাল ঔপন্যাসিকই এই জীবন-সত্যকে বাদ দিয়া লেখনী চালনা করিতে পারেন না। শরৎচন্দ্রও পারেন নাই। কিন্তু বাংলার যে সমাজ ও সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি লিখিয়াছেন এবং যে সুস্থ সুন্দর জীবনবোধ

তাঁহার অন্তরের সম্পদ ছিল, তাহাদের জন্য শরৎসাহিত্যে জীবনের একটা সংযত অথচ আশাবাদী রূপ দেখা যায়। তিনি প্রধানত মহাযুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলার যুগের সাহিত্যিক, তাঁহার ভাঙনধর্মী হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। যে বিধান অন্যায় ও অচল, সমাজের সেই বিধানের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ রাখিয়াছেন, নিজে বর্তমান সমাজ-কাঠামোর বিবেচনায় তাহা পাল্টাইতে না পারিলেও তৎপ্রতি জনমত গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন এবং স্বভাবতই আশা করিয়াছেন যে, এই অন্যায় বিধান ভবিষ্যতে সামাজিক মানুষের চাহিদায় বাতিল হইয়া যাইবে। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের দ্বারাই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষাকারী এই সমাজ, কোন অন্যায় বিধানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সমাজকে সর্বাত্মক আঘাত করিতে শরৎচন্দ্র চাহেন নাই। তিনি সমাজকে বাঁচাইতে চাহিয়াছেন, সমাজের বিশেষ কোন অপ্রয়োজনীয় বা দুর্নীতিগ্রস্ত বিধানকে নয়। এই অন্যায়ের উপর আঘাতের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার সহিত ভাঙনধর্মী আধুনিক সাহিত্যিকদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। এই ভারসাম্য রক্ষার একটা গৌরব অবশ্যই আছে এবং শরৎচন্দ্রের ঐতিহাসিক মর্যাদার তাহা অনুপূরক। এদিক হইতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পথেই চলিয়াছেন। কেহ কেহ এই মনোভাবকে রক্ষণশীল আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণবোধের নিরিখে শরৎচন্দ্রের এই মনোভঙ্গীর দাম অনেক।*

*শরৎচন্দ্রের বিষয়বস্তুর সমালোচনা করিয়াও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক মর্যাদা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন: "কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যে যে জিনিষটি সব চাইতে লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা হচ্ছে এঁরাই প্রথম সচেতনভাবে বাংলাসাহিত্যে নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যোচিত বিষয়ের মর্যাদা দান করেন। ...বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মুখ্যতঃ অভিজাতস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল; শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের স্তরে তাঁর কল্পনাকে সম্প্রসারিত করলেও তার বেশি আর অগ্রসর হননি; কিন্তু শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখায় সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্যজনেরা আর অকুলীন রইল না। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে গণতান্ত্রিকতার বাধাবন্ধহীন অভিযান শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই আন্দোলনের কতিপয় বড়রকমের

শরৎচন্দ্রের গতিশীল নারী-চরিত্রগুলির সাধারণ ধর্ম হয় প্রেম, না হয় স্নেহ। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রেমই হউক আর স্নেহই হউক, দুইই নারী-চরিত্রের কমনীয়তা প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি নারী-চরিত্রের প্রেম যেমন পুরুষের ক্ষাত্রশক্তি বিবর্ধনের প্রশ্নে কার্যকরী হইয়াছে, শরৎসাহিত্যে সেইরূপ নারী-প্রেমের পরিমণ্ডলে পুরুষকে আপন পৌরুষ বিকাশের পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে বড একটা হয় নাই, কিন্তু নারীর নিজের কমনীয়তার বিকাশ ও প্রকাশে শরৎসাহিত্যে প্রেম আশ্চর্য সম্পদ। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা ভালবাসিয়া কিরূপ আত্মপ্রসারিত হয়, তাহা শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের উপন্যাস 'শুভদা'র ললনা হইতে তাঁহার বার্ধক্যে লিখিত উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমল পর্যন্ত অধিকাংশ চরিত্র পর্যবেক্ষণেই উপলব্ধি করা যাইবে। নারীর এই আত্মবিকাশের পটভূমিকায় প্রেম অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া শরৎসাহিত্যে পুরুষের উদ্দাম সম্ভোগ-তৃষ্ণার অনুপস্থিতি ইহার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। পুরুষ যেখানে প্রেমের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, অথচ সে কোন মহৎ আদর্শে সক্রিয় নয়, সেখানে তাহার প্রেম সাধারণতঃ জৈবিক উদ্দামতায় আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে আদর্শপ্রবণ পুরুষের নারীপ্রেম তাহার বিশেষ জীবনবোধের

ত্রুটিবিচ্যুতিও ছিল। যেমন চিত্তের মুক্তির নামে নরনারীর জৈব মিলনের সংস্কারকে কল্লোলীয় লেখকদের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দান। ইউরোপীয় দার্শনিক শ্রেণীর একাংশের প্রচারিত ভোগবাদের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর কল্লোলীয় লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা এবং স্বভাবতই এই মতবাদে প্রবৃত্তির উদ্দামতা অনুচিতভাবে প্রশ্রয় পেয়েছিল। কল্লোলীয় লেখকগণ শুধু দেহবাদী ছিলেন না, দেহবিলাসীও ছিলেন। যুদ্ধোত্তরকালের অস্থিরতা আর অনৈশ্চিত্য এই অসুস্থ মনোভাবের মূলে অনেকখানি পরিমাণে সক্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়।·· দ্বিতীয়তঃ, কল্লোল সাহিত্যের শৈল্পিক মনোভঙ্গীর পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার ভিতরে আবেগের প্রভাব যেরূপ প্রবল, বুদ্ধির প্রাখর্য তেমন নয়।···চিন্তার দিক থেকে কল্লোলীয়দের পুঁজি ছিল যৎসামান্য। আমাদের সাহিত্যে অনুভূতি ও মননশীলতার সার্থকতম ভার-সাম্যের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। তারপরেই শরৎচন্দ্র।—(হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চতুরঙ্গ কার্তিক, ১৩৬১, পৃষ্ঠা ৬১-৬২)।

পথে এক ধরণের শক্তি যোগায়। বাংলা সাহিত্যে কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে সম্ভোগপ্রধান প্রেমের রূপ দেখা যায়, বঙ্কিম সাহিত্যে তাহার বিপরীতভাব চোখে পড়িবে। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ, মৃণালিনীর হেমচন্দ্র, সীতারামের সীতারাম,—ইহারা নারীপ্রেমের জৈবিক পরিধিতে নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এই পরিধির মধ্যে আবদ্ধতায় তাহাদের গৌরব নাই, তাহারা নিজেরাই ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। সীতারাম স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রী বলিয়া সহানুভূতিতে তাহার দিকে হাত বাড়ায় নাই, এইজন্য তাহার সমগ্র জীবনবোধ বিপন্ন হইয়াছে, দেশ স্বাধীন করিবার মত মহৎ কার্যে তাহাকে বঙ্কিম অনুপযুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন। শরৎসাহিত্যে অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের নারীপ্রেমে এই তত্ত্ব এভাবে রূপ পায় নাই, যদিও শরৎচন্দ্রও সম্ভোগনীতি-বিরোধী। তাঁহার 'গৃহদাহ'-এর এক সুরেশ ছাড়া বলিতে গেলে নারীদেহগত প্রেমের কামনা লইয়া আর কেহ সমগ্র জীবনদর্শনকে বাজি ধরে নাই এবং এই বৃহৎ জীবন-সঙ্কটে আপন বৃহৎ সম্ভাবনাময় জীবনকে বলি দেয় নাই। শরৎচন্দ্রের নারী সাধারণত প্রেমের পূজায় পুরুষকে উচ্চাসনে বসায়, কিন্তু প্রেমের আনন্দ-বেদনায় রসভোগে তাহার ভাগ পুরুষের চেয়ে প্রায়ই বেশি। কাজেই পুরুষের উদ্দামতা-হীন কাহিনীতে মনোবাদী প্রেমের আবেগ বেশি হইবে এবং এইজন্যই শরৎ-চন্দ্রের প্রেমে সম্ভোগহীনতার ছাপ। যাহা হউক, প্রেমের দেহসংশ্লিষ্ট যে উষ্ণ আবেগ আমরা গল্প উপন্যাসে সাধারণতঃ পাইয়া থাকি, শরৎসাহিত্যে তাহার অভাব দেখা যায়। অথচ হৃদয়বোধের এবং হৃদয়গ্রাহিতার দিক দিয়া শরৎসাহিত্যে প্রেম রসিকমনকে সব সময়েই তৃপ্তি দেয়।

শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে, এখানে নারী চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, শরৎসাহিত্যে নায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহার প্রেমে বা প্রেমের প্রকাশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উজ্জ্বলতা নাই, কিন্তু নারীর প্রেমের পটভূমিতে তাহার উপস্থিতি শুধু আলোকপাত করে না, গভিরও সৃষ্টি করে। তবে আপন পৌরুষে দীপ্যমান, এমন চরিত্র শরৎসাহিত্যে একেবারে নাই তাহা নয়, 'শেষ প্রশ্ন'-এ রাজেন, 'শ্রীকান্ত'-এ বজ্রানন্দ, 'দেনাপাওনা'য় জীবানন্দ, 'বিপ্রদাস'-এ বিপ্রদাস, 'গৃহদাহ'-এ সুরেশ, 'চরিত্রহীন'-এ উপেন্দ্র আছে। ইহারা কাহারও মুখ চাহিয়া পথ চলে না, পথের ডাকে কাহারও জন্য

অপেক্ষা করে না, কিন্তু তাহাদের সংস্রবে যাহারা আসে তাহাদের মনে ইহাদের ঋজু পবিত্র চরিত্র অবিস্মরণীয় দাগ কাটিয়া যায়। তবু প্রেমের ক্ষেত্রে 'শ্রীকান্ত'র ছায়াতেই যেন শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুরুষ চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে যেমন তাঁহার অধিকাংশ নারীচরিত্রে কমনীয়তার হিসাবে অন্ততঃ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্নদাদিদির স্পর্শ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের গতিশীলতার ও অধিকতর সক্রিয়তার কারণ বোধ হয় বাঙ্গালী জীবন যেরূপ বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিকতার ভারে মন্থর, তাহার ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র পুরুষ চরিত্রগুলিকে তাঁহার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাহাদের স্বরূপেই আঁকিতে চাহিয়াছেন; পক্ষান্তরে তাঁহার আবেগ ও কবি-কল্পনা আশ্রয় পাইয়াছে বহির্জীবনে অপেক্ষাকৃত অচেনা অন্তঃপুরের রহস্যলোকের অধিবাসিনী নারী চরিত্রের পটভূমিতে। বাঙ্গালী নারী শান্ত, স্নেহময়ী, কল্যাণরূপিণী,—এই সাধারণ প্রকৃতি এক্ষেত্রে তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাছাড়া কর্মোৎসাহের অভাব থাকিলেও পুরুষের নিয়ন্ত্রণে বাংলার সমাজব্যবস্থা চলে, সেখানে পুরুষের রচিত বিধিবিধানে পদে পদে নারীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয় এবং সমগ্রভাবে তাহাকে অধীনতার নাগপাশে বন্দী হইয়া থাকিতে হয়, এই নিপীড়িত নারী মনের বেদনাময় অনুভূতি শরৎচন্দ্র প্রকাশ করিবার আগ্রহ বোধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র ব্যথাতুর অনুভূতির পরিমণ্ডলে তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নময় হৃদয় উন্মোচিত করিয়া নারীর দুঃখবহনের জীবন্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। শরৎসাহিত্যের এই দিকটি এত সুন্দর যে ইহার মূলে বাস্তবতার কিছু অভাব থাকিলেও তাহা পরিতৃপ্ত পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

এতক্ষণ যে সব কথা আলোচিত হইল তাহা হইতে মোটামুটি বলা যায় যে, নারী-মনের কমনীয়তায় ও রোমান্টিক ভাবে শরৎসাহিত্য অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে দেহের জৈবিক দিকটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। ইহা শরৎচন্দ্রের বিশেষ মানস গঠনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত প্রেমে যদি শেষোক্ত জৈবিক দিকটি যথাযথভাবে যুক্ত হইত, বিপুল আবেগ ও রোমান্টিক মনের সহিত যদি দেহের দিকটি উপযুক্তভাবে মিশিয়া সাহিত্য-রূপ পাইত, তাহা হইলে শরৎসাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি মর্যাদার অধিকারী

হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় শরৎচন্দ্রের প্রেমের কাহিনীতে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যৌবনের উত্তাপও অনেক ক্ষেত্রে ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং শান্ত মাধুর্যময় একপ্রকার দার্শনিকতার ছাপ এগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের কাছে কল্লোল গোষ্ঠীর উগ্র দেহবাদী সাহিত্যসৃষ্টি কেহই আশা করে না, কিন্তু জীবনের ছবি আঁকিতে গিয়া প্রেমকে অবলম্বন করিলেও দেহকে একরূপ অস্বীকার করিয়া প্রায়ই মনোবাদী প্রেমের একমুখিতা আঁকিয়া শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবন হইতে অবশ্যই কিছুটা সরিয়া আসিয়াছেন। শরৎচন্দ্র যেভাবে সম্ভোগহীন মনোভঙ্গীতে দেহকে এড়াইতে চাহিয়াছেন, তাহা জীবনধর্মী কথাসাহিত্যিকরূপে তাঁহার স্থায়ী সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার কিছুটা প্রতিকূলতা করিতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধর্মের সহিত ভারতীয় সাহিত্যের সনাতন যে জীবনাদর্শের একান্ত যোগ আছে তাহাতে ভোগবাদী জীবনরূপ বড় করিয়া দেখা হয় নাই, কিন্তু আধুনিক কালের নরনারীর হৃদয়বেদনা লইয়া প্রধানত যে সাহিত্যের কারবার, তাহাতে এই হৃদয়বেদনার আশ্রয় দেহকে উপেক্ষা উপন্যাসের ন্যায় সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যকৃতিতে নিঃসন্দেহে এক ধরণের শূন্যতা সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্র নারীকে প্রিয়া করিয়াছেন, গৃহিণী করিয়াছেন, এমন কি রাজনৈতিক বিপ্লবের নেত্রী করিয়াছেন ও সমাজবিপ্লবের কর্মী করিয়াছেন, সর্বোপরি তাহাকে স্নেহময়ী জননীরূপ দিয়াছেন, কিন্তু নারীর দেহরূপের যে সুবিস্তৃত পটভূমিকায় যুগে যুগে পুরুষের পৌরুষ ও কর্মোন্মাদনা প্রেরণা পাইয়াছে, তাহার স্পর্শে উন্মীলিত, উদ্বেলিত হইয়াছে, অবসাদে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইয়াছে, মনের পাশাপাশি যে দেহরূপ সর্বদেশের সর্বকালের প্রেম-সাহিত্যের বিরাট এক উপাদান,—শরৎচন্দ্র তাহার প্রতি আপন প্রতিভা অনুযায়ী যথেষ্ট দৃষ্টি দেন নাই। যে মানুষ আমাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে, যাহারা আমাদের নিতান্ত পরিচিত, তাহাদের লইয়া মনোরম গল্প রচনায় এবং হৃদয়বাদী প্রেমের মধুর করুণ রূপায়ণে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের নরনারীর নরম মনে যে সমাদর পাইয়াছেন তাহার মূল্যও কম নয়, কিন্তু তাঁহার লেখার অভাবাত্মক এই দিকটির দিকে সমালোচকদের নজর না পড়িয়া পারে না। নারীর দেহরূপ অবলম্বন করিয়া প্রেমসঞ্চারের গতির পরিবর্তে শরৎচন্দ্র বরং চেষ্টা করিয়াছেন পুরুষের কামনার উত্তাপ হইতে নারীদেহকে কতখানি সরাইয়া

রাখা যায়, অন্তত কতখানি ঢাকিয়া রক্ষা করা যায়। এই গার্হস্থ্য-সংযমের মাধুর্য স্বীকার করিয়াও এরূপ সম্ভোগবিরোধী মনোভাব আধুনিক সাহিত্যবিভাগ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুকূল কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকদিন সুরেশের সঙ্গে একবাড়ীতে নিরালায় বাস করিয়াও গৃহদাহের অচলা শুধুমাত্র একটি দুর্যোগের রাত্রে লেখকের আভাস অনুযায়ী অন্ধকারে তলাইয়া গিয়াছে এবং পরদিন প্রভাতে মড়ার মত রক্তশূন্য মুখে লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়াছে, 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ী লেখকের ইতিবৃত্ত বর্ণনার আড়ালেই অনঙ্গ ডাক্তারের কামনার ইন্ধন জোগাইয়াছে, 'শ্রীকান্ত'-এ রাজলক্ষ্মী গভীর রাত্রে পা টিপিয়া শ্রীকান্তর শয্যাগৃহে আসিয়া মশারীর কোণ তুলিয়া তাহার কপালে আবেগকম্পিত হাতখানি মাত্র রাখিয়াছে, শরৎচন্দ্রের নারীপুরুষের আদিম জৈবিক সম্পর্ক বর্ণনা বলিতে গেলে এইখানেই শেষ। 'স্বামী' গল্পের সৌদামিনী ও 'বিরাজ বৌ'-এর বিরাজ পরপুরুষের সহিত স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বিবরণশূন্য অনেকখানি সময় কাটাইয়া স্বামীর কাছে ফিরিল, প্রায় কাজের কথার মধ্যেই দেবদাস, সত্যেন্দ্র, এমন কি শুভদার চরিত্রহীন স্বামী হারাণের পতিতালয়ের মুহূর্তগুলি কাটিয়া গেল, তারকেশ্বরের বাসায় রমেশ একরাত্রি বাস করিল, তবু রমার যত্ন করিয়া খাওয়ানোর তৃপ্তিটুকু ছাড়া রমেশের মনে এই অভাবিত পরিবেশ কোন রকম দাগ কাটিতে পারিল না, শেষের পরিচয়ে সবিতার দীর্ঘ তের বছরের পর পুরুষ রমণীবাবুর সঙ্গে বসবাসের বর্ণনাহীন দ্রুত বিবৃতির পর সিঙ্গাপুরের কোটিপতি ব্যবসায়ী বিমলবাবু তাহার জীবনে আসিল, কিন্তু শরৎবাবুর কলমে এই ব্যবসাদার ধনী মানুষটি সংস্কৃতি-সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর রুচিমান ভদ্রলোক হইয়া সবিতার মানস জগতের বন্ধু হইয়া উঠিল। এইভাবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বাস্তব সমস্যাতেও বাস্তবকে যেন কিছুটা এড়াইয়া গিয়াছে। ১৩৩১ সালের চৈত্রমাসে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পূর্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে

তাদের সুখ দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" কিন্তু এই বিবৃতি অনুযায়ী যদি তলার শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হয়, তাহা হইলে দেহের দিক এরূপ সঙ্কুচিত করিয়া লেখা কি সম্ভব? তবু বুদ্ধিজীবী উচ্চমধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে মনোবাদী প্রেমের কাহিনী বিন্যস্ত হইলে হয়তো অবাস্তবের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ যে সব মানুষের আনন্দের উপকরণ বাহিরের বিলাসসজ্জায় বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে নাই,তাহাদের কাহিনীতে মানবদেহের অঙ্গীকার অস্বীকৃত হইলে তাহাতো অবাস্তবতার দোষদুষ্ট হইতেই পারে।

মোটামুটি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্ণ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যমণ্ডল পরিব্যাপ্ত। এই সময়টিই সারা পৃথিবীতে সমাজজীবনে বিপুল আলোড়নের যুগ। এসময় মানুষের ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ ও স্বার্থপরতার যেমন চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মমুক্তির মহান আবেগ স্পন্দিত হইয়াছে। বন্ধন হইতে মুক্তি, জড়তা হইতে মুক্তি, সংস্কার হইতে মুক্তির উৎসাহে জনচিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছে। নারীপ্রগতির ইতিহাসে এই কয় বৎসর খুবই উল্লেখযোগ্য। বাংলার সমাজজীবনেও এ সময় গুরুতর আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, এযুগের জীবনাবেগের হিসাবে অত্যন্ত শ্লথগতি বাঙ্গালী ততটা সক্রিয় হইয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু জীবনস্রোত পরিবর্তনের আগ্রহ সেও অনুভব করিয়াছে এবং আগ্রহের একটা কার্যকরী রূপ তাহার মানসলোকে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বহির্জগতের সঙ্গে বাঙালী এযুগে গভীর নৈকট্য অনুভব করিয়াছে যদিও সেই নৈকট্যের সুযোগে আপনাকে যথেষ্ট চলমান করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই। তখন বাংলাসমাজে নারী ছিল অন্তঃপুরচারিণী; বাহিরে সংগ্রামশীল জীবনে, সমাজের সংগঠনে ও সংরক্ষণে নারীসত্তার সক্রিয়তা অল্পই প্রভাব বিস্তার করিত। এজন্য শরৎচন্দ্রের যুগের সমাজচিন্তায় পৃথিবীব্যাপী আবেগের যে যৎসামান্য স্পর্শ বাংলার সমাজমানসকে বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল সমাজমানসকে কিছুটা চঞ্চল করিয়াছিল, বাঙ্গালী মেয়েদের তাহা বিশেষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ হিসাবে শরৎসাহিত্য বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক আপেক্ষিক প্রগতিমুখিতার সুযোগ লইয়া শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মেয়েদের যেসব

কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সেগুলিতে অন্যায় ও দুর্নীতির কবলে দীর্ঘকালের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী অসহায় আত্মসমর্পণের ছবির প্রবণতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, এমন কি বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়াছেন। অতীতের যে সব প্রথা সুস্থ, যে সব প্রত্যয় কল্যাণধর্মী, যুগ-পরিবর্তনের অঙ্গাঙ্গী ভাঙনের সম্ভাবনা হইতে তাহাদের সযত্নে রক্ষা করিয়া শরৎচন্দ্র মাতৃজাতির কল্যাণী রূপটিকে যেমন বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে তিনি মানুষ হিসাবে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারবোধে সচেতন হইয়া উঠিবারও আহ্বান জানাইয়াছেন। বাঙ্গালী মেয়েদের সমাজরূপের তৎকালীন পশ্চাৎপদতার নিরিখে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র জীবনের বাস্তব ছবি ফুটাইয়াছেন বলিয়াই এই জাগরণের বস্তুগত সংগ্রামী রূঢ়তা তেমন করিয়া ফুটে নাই, কিন্তু আবেগ ও ইঙ্গিতের হিসাবে নারীপ্রগতির একটা মহান আকাঙ্ক্ষা শরৎসাহিত্যে দেদীপ্যমান। বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালী মানসগঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সমাজজীবনে মেয়েদের স্থান সম্পর্কে সুচিন্তিত ধারণা লইয়া নারীচরিত্র আঁকিয়াছেন, তাই তাঁহার রমা পল্লীসমাজের হীনতা অভ্যাসের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্পষ্টভাবে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়া যেমন ইহার আশু পরিবর্তনের জন্য সমস্ত সামাজিক মানুষের কাছে পরোক্ষ আবেদন জানাইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছে, তেমনি অমানুষ স্বামীকে কাছে পাইয়া তাহাকে লইয়া সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের সমস্ত সম্ভাবনা হারাইয়া ও বিনাদোষে তাহার পশুপ্রকৃতির কাছে অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অভয়া শেষপর্যন্ত বাঙ্গালী মেয়ের স্বামীসংস্কার বা সতীত্ব-সংস্কার বিসর্জন দিয়াছে এবং স্বামীর সহিত সব সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ভালবাসার মূলধনটুকু সম্বল করিয়া নূতন নীড় রচনার সংগ্রামের পথে স্থির সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার বিপরীতে অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়'-এ সবিতা সুদীর্ঘকাল হীন উপপতির সঙ্গে একত্র বসবাস করিয়াও মহান স্বামী ব্রজবাবুর স্মৃতি বুকে ভরিয়া রাখে এবং সামান্য সুযোগ পাইয়াই ব্রজবাবুর কাছে আপন অনুশোচনার অসহায় বেদনার ভার উজাড় করিয়া দেয়। আধুনিক নাটকের একরূপ জন্মদাতা ইবসেন নারীর আত্মমুক্তির বলিষ্ঠ অপরূপ ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু 'A Doll's House' নাটকে নায়িকা নোরা একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, সে শুধু নিজের মান অপমানটুকুই বড় করিয়া দেখিল,

তাহার স্বামীর সংসারের সমগ্র কর্তব্য, সহস্র মধুর স্মৃতি, এমনকি অসহায় সন্তানদের চিন্তা পর্যন্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যের উত্তেজনায় গ্রাহ্য করিল না।* শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসের বন্দনা কিন্তু শুধু নিজে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায়, অথবা শুধু দ্বিজদাসকে স্বামীরূপে পাইবার অধিকারটুকুর জন্যই নিজের আধুনিক স্বচ্ছল 'স্বাধীন জীবন পিছনে ফেলিয়া দ্বিজদাসের পত্নীত্ব গ্রহণ করে নাই, দ্বিজদাসের কথামত দ্বিজদাসের সঙ্গে বিপ্রদাস, দয়াময়ী, সতী, বাসু, গৃহদেবতা, লোকজন, মুখুজ্যে পরিবারের বৃহৎ মর্যাদা সব কিছুর সঙ্গে এক হইয়াই বধূরূপে বলরামপুরের জমিদার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। প্রেমে, স্নেহে, ত্যাগে বাঙ্গালী নারীর মহিমার সহিত তাহাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা সৃষ্টি হইলে তাহারা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাইবে, এই প্রত্যয় লইয়াই শরৎচন্দ্র তাঁহার নারীচরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, 'বিপ্রদাস' 'শেষ প্রশ্ন'-এর চার বৎসর পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে 'শেষ প্রশ্ন'-এর তুলনায় অনেকেই 'বিপ্রদাস'কে দুর্বল বলিয়া মনে করেন,** কিন্তু তবু এই 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসখানির মধ্যে তাঁহার নারীর স্বরূপের চিরকালের বিশ্বাস ব্যাহত করিয়া যেভাবে তিনি কমলের বিদ্রোহী প্রকৃতি আঁকিয়াছিলেন, সে কাজ রচনার বলিষ্ঠতার বা বৈচিত্র্যের

*A Doll's House নাটকের নাট্যকারের জীবনবোধ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন: "At the core of Ibsen's doctrine is an excessive individualism, a naked assertion of the rights of every man to live his own life more or less in disregard of the right of others." (*A Doll's House*—The World's Library of Best Books, Vol. I., Edited by Wilfrid Whitten.)

**প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বিপ্রদাস" সম্পর্কে নিম্নরূপ কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, " 'বিপ্রদাস' যে শরৎচন্দ্রের নিকৃষ্টতম রচনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ কম।"—(শরৎচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৭৮।)

মূল্য-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার সাহিত্যিক কর্তব্যের হিসাবে ঠিক হয় নাই বলিয়া বোধ হয় শরৎচন্দ্র নিজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই অনুশোচনার অনুভূতিই হয়তো তাঁহাকে বিপ্রদাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমলের বিপরীতে সতীকে, অথবা শেষ অবধি সংযত পরিমণ্ডলে আত্মস্থতায় পরিতৃপ্তা বন্দনাকে লক্ষ্য করিলেই কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইবে।

যাহা হউক, প্রেমের উগ্রতাবিহীন রূপও যে পাঠকদের মুগ্ধ করে, শরৎসাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তাই তাহার প্রমাণ। নারীর মনের আর একটি স্নিগ্ধ দিক শরৎচন্দ্রের লেখায় চমৎকার ফুটিয়াছে, তাহা হইল নারীর স্নেহের দিক। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রে মমতাময়ী রূপটি প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই স্নেহভাব বর্তমান।* বাঙালীর ভাবপ্রবণতার হিসাবে এই মমত্ববৃত্তির আবেদন স্বভাবতঃই অধিক হয়। এইজন্যও শরৎচন্দ্র বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। 'পল্লীসমাজ'-এর বিশ্বেশ্বরী, 'বিন্দুর ছেলে'র অন্নপূর্ণা ও বিন্দু, 'চন্দ্রনাথ'-এর হরিবালা, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'বিপ্রদাস'-এর অন্নদা, দয়াময়ী, 'অরক্ষণীয়া'র ভামিনী, 'নিষ্কৃতি'র সিদ্ধেশ্বরী, 'পরিণীতা'র ভুবনেশ্বরী, 'দর্পচূর্ণ'র বিমলা, 'শ্রীকান্ত'এ শ্রীকান্তের পিসিমা ও সুনন্দার বড়জা কুশারী গৃহিণী, 'মামলার ফল'-এর গঙ্গামণি, 'পণ্ডিত মশাই'-এর কুসুম, 'গৃহদাহ'-এর মৃণাল ও সুরেশের পিসিমা প্রভৃতি স্নেহময়ী নারী চরিত্রগুলি যে কোন পাঠকের মন জয় করিবে। ইহাদের সন্নিবেশে কাহিনীতে সিদ্ধরসের সঞ্চার হইয়াছে। নারীর এই স্নেহময়ী ভাব শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যেও বর্তমান এবং কোন কোন সময় একই চরিত্র প্রেমিকা ও মমতাময়ী রূপে দুদিক হইতে পাঠকের হৃদয় রসাপ্লুত করে। শরৎচন্দ্রের

---

* অবশ্য 'পল্লীসমাজ'-এ রমার মাসী, 'বামুনের মেয়ে'তে রাসমণি, 'পণ্ডিত মশাই'-এ বৃন্দাবনের শাশুড়ী, 'স্বামী'তে ঘনশ্যামের বিমাতা, 'বড়দিদি'তে সুরেন্দ্রনাথের বিমাতা, 'চরিত্রহীন'-এ অঘোরময়ী, 'চন্দ্রনাথ'-এ হরকালী, 'মেজদিদি'তে কাদম্বিনী, 'অরক্ষণীয়া'র স্বর্ণমঞ্জরী প্রভৃতি কয়েকটি কুটিল ও স্বার্থপর নারীচরিত্রও শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন। তবে এই চরিত্রগুলি প্রায়ই সহায়িকা চরিত্র, তাহারা কাহিনীর প্রধান চরিত্র নয়।

সামাজিক কল্যাণ বোধের সঙ্গে নারীচরিত্রের এই মমতাময়ী রূপের একটা যোগ আছে বলিয়াই মনে হয়। 'শ্রীকান্ত'-এ রাজলক্ষ্মী, কমললতা, 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ী, সাবিত্রী, 'পথের দাবী'তে ভারতী, 'পল্লীসমাজ'-এ কুসুম, 'আলো ও ছায়া'য় সুরমা, ইহাদের সকলের মধ্যেই প্রেমের প্রবাহ, কিন্তু মমতাময়ী রূপের ঔজ্জ্বল্যও ইহাদের কম নয়। 'বড়দিদি' উপন্যাসে মাধবীর সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রেম যদি জাগিয়াই থাকে, তাহা আসিয়াছে অসহায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর স্নেহ-করুণার ভিতর দিয়া। 'বিলাসী' গল্পে মুসলমান সাপুড়ে কন্যা বিলাসী তাহার জন্য ধর্ম দেওয়া স্বামী মৃত্যুঞ্জয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, কিন্তু অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে গল্পে তাহার ভূমিকা সেবিকার, পরম মমতায় বাহিরের সহস্র বিপদ হইতে সে মৃত্যুঞ্জয়কে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে। এমন কি 'শেষপ্রশ্ন'-এর স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কমল যেভাবে হরেন, রাজেন, অজিতকে যত্ন করিয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতক শিবনাথের সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেও তাহার মধ্যে আলোচ্য দুই হৃদয় বৃত্তির মিলিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'আঁধারে আলো'র বিজলী পতিতা, সে পরে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু পতিতা থাকিতে থাকিতেই সত্যেন্দ্রকে লইয়া যখন সে খেলা করিতেছিল, তখনই তাহার সত্যেন্দ্রকে সকালে অভুক্ত দেখিয়া যত্ন করিবার খাবার খাওয়াইবার জন্য আকুলতা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। শরৎচন্দ্রের মনে এই স্নেহময়ী নারীরূপের প্রভাব কিরূপ প্রবল ছিল এবং এই কোমল দিকটিকে তিনি কিরূপ নারী চরিত্রের সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের ক্ষুদ্র চরিত্র 'মৈত্রেয়ী'কে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। এই মেয়েটিকে বন্দনা-দ্বিজদাসের মূল কাহিনীর মধ্যে প্রক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাকে প্রতি-নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয় নাই, সামান্য কিছুক্ষণের জন্য সম্ভাবনার আমেজে তাহাকে আনিয়া দ্বিজদাস-বন্দনার মিলনের পটভূমিতে লেখক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কাহিনীর রসে মসগুল পাঠক তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি থাকার কথা নয়, কিন্তু অল্প ক্ষণের ভূমিকায় মৈত্রেয়ীর যে স্নেহময়ী সেবিকারূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মমতাময়ী বঙ্গললনার স্বাভাবিক রূপেরই প্রতিকৃতি। শশধর-বিপ্রদাসের কলহের পর বলরামপুরের মুখুজ্যে বাড়ীতে ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ

সৃষ্টির মত সব কিছু ওলট পালট হইয়া গেল, সেদিনকার ভয়ঙ্কর রাত্রিতে দ্বিজদাসের খাওয়া হইল কি না তাহা লক্ষ্য রাখিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। কিন্তু গভীররাত্রে অভুক্ত দ্বিজদাসকে গরম খাবার খাওয়াইতে আসিল মৈত্রেয়ী। ঘরের মধ্যে দ্বিজদাস হয় তো খাইতেছে, হয় তো খাবার ঢাকা পড়িয়া আছে, সে আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, হয়তো ক্লান্তিতে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের বাহিরে অন্ধকার বারান্দায় কিন্তু মৈত্রেয়ী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দ্বিজদাসের খাইতে খাইতে কিছু দরকার হয় এইজন্য সে অপেক্ষা করিতেছে।

(বস্তুতঃ, নারী চরিত্রগুলির প্রেম ও স্নেহই শরৎসাহিত্যকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে, ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় ভাব নাই, রবীন্দ্রনাথের উদার বিস্তৃত ভাবজগৎ নাই, অনাড়ম্বর পরিমণ্ডলে সাধারণ দোষগুণের মানুষদের লইয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আলোচ্য স্নেহপ্রীতির ঐশ্বর্যে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র শুধু নিজেদের উজ্জ্বল ও মনোরম করে না, পারিপার্শ্বিকের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এই হৃদয়বৃত্তি মানবতাবোধের সঙ্গে একীভূত একথা আগেই বলা হইয়াছে। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রকৃতি-পরিণতি বিচার করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। জমিদারের কাছারিবাড়ীর বিরক্তিকর পরিবেশে জমিদার জীবানন্দকে ষোড়শী আপন স্বামীরূপে চিনিতে পারিল; তাহার পর স্বামীর প্রতি প্রেম ও মমতার স্পর্শে এই রুক্ষ ভৈরবীর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া অলকা ফিরিয়া আসিল, বিগলিত হইতে সুরু করিল তাহার নারীসত্তা, দেবতার কাছে নিবেদিতা ষোড়শীকে পিছনে ফেলিয়া নারী অলকা স্বামী জীবানন্দকে ভালবাসিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র এই উপলক্ষে দেখাইয়াছেন যে, ষোড়শীর এই ভালবাসা জীবানন্দের হীন চরিত্রে ধীরে ধীরে বিপুল ও মহৎ পরিবর্তন আনিয়াছে। ষোড়শীর প্রেম জীবানন্দকে নবজীবন দিয়াছে। যে আত্মকেন্দ্রিক, বিলাসী, অত্যাচারী, লম্পট জীবানন্দের ছবি 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রথম দিকে পাঠককে অনিবার্যভাবে ক্ষুব্ধ করে, শেষ-দিকের প্রজাবৎসল, সত্যপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প, প্রেমিক জীবানন্দের সঙ্গে তাহার যেন মিলই নাই।)

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মাতৃত্ববোধে নারীর এই মমতাময়ী রূপের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়াছে। শরৎসাহিত্যে প্রেমিকাদের স্নিগ্ধ কোমল যে

অন্তর ফুটিয়াছে, তাহাতেও মাতৃত্বধর্মিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য এই নায়িকাদের প্রেমের সংগ্রামী রূপ বা গতির অভাব পাঠকদের কাছে স্নিগ্ধ রসাধিক্যের ফলে ততটা প্রত্যাশিত হয় না। অবশ্য প্রেমিকা নায়িকাকে এতটা মমতা-নির্ভর করা শিল্পকলার দিক হইতে ঠিক কি না সে প্রশ্ন এ যুক্তিতে মীমাংসিত হইবার নয়।

তবে সত্যকার জননীত্বের পটভূমি যেখানে রচিত হইয়াছে, সে আপন সন্তানের ক্ষেত্রেই হউক আর পরের ছেলের প্রতি নারীর অপত্য-স্নেহ বিতরণের ক্ষেত্রেই হউক, শরৎসাহিত্য সেখানে অত্যন্ত মধুর। এই মাধুর্য যেন নিজের ছেলের ক্ষেত্র অপেক্ষা পরের ছেলের ক্ষেত্রে আরও বেশি।* 'রামের সুমতি'তে নারায়ণী নিজের ছেলে গোবিন্দ অপেক্ষা পুত্রোপম চঞ্চল কিশোর দেবরটিকে যেন অধিকতর স্নেহসিঞ্চন করিয়াছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে গোড়ার দিকে বিশ্বেশ্বরী পুত্র বেণী না গেলে তাঁহারও রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধে গিয়া দাঁড়ানো সম্ভব নয়, এই ধরণের স্নেহ প্রবণতা একবার মাত্র দুর্নীতি-পরায়ণ পুত্র বেণীর প্রতি দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু গ্রন্থের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হীন পুত্রের উপর তাঁহার স্নেহের বহির্মুখী প্রকাশ ক্রমে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে এবং দেবর-পুত্র রমেশের ও সম্পর্কিত দেবরকন্যা রমার উপর তাহা অবিরাম ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। 'মেজদিদি'র সমগ্র কাহিনী হেমাঙ্গিনীর নিজের পুত্রকন্যার প্রতি মাতৃত্বের পরিপ্রকাশে ততটা নয়, যতটা বড়জা কাদম্বিনীর বৈমাত্র ভাই কেষ্টর প্রতি স্নেহ প্রবণতায়। 'পরিণীতা'র ভুবনেশ্বরী ধনী-গৃহিণী, কিন্তু নিজের পুত্র শেখরনাথের তুলনায় তিনি যেন দরিদ্র প্রতিবেশী-কন্যা ললিতাকে অধিক স্নেহ করিয়াছেন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে দয়াময়ী বিপ্রদাসের বিমাতা, দয়াময়ী পারিবারিক কলহের সময় কন্যার মুখ চাহিয়া বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে জামাতা শশধরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সারা উপন্যাসে

* শরৎচন্দ্রের যৌথ পরিবারের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল। নারীমনের এই স্নেহশীল রূপ সেই যৌথ পরিবার প্রথা বজায় রাখিতে সক্রিয় সহায়তা করে, কারণ মেয়েরাই সংসার পরিচালনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, হয় তো অন্তর্মনে এইজন্য নারী-চরিত্র পরিকল্পনার সঙ্গে তাহার স্নেহময়ী রূপের কথাও শরৎচন্দ্রের মনে হইয়াছে।

পুত্রস্নেহ বর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি আপন পুত্র দ্বিজদাসের তুলনায় সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকেই অধিকতর স্বীকার করিয়াছেন। সতীর শ্রাদ্ধের পর পুত্র দ্বিজদাসের কাছে সর্বক্ষমতাময়ী জমিদার-গৃহকর্ত্রী রূপে না থাকিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসের সহিত অজানা তীর্থের দুঃখ-কঠিন পথে পাড়ি দিয়াছেন। ('শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীর সপত্নীপুত্র বঙ্কুর প্রতি মাতৃত্বের মর্যাদাবোধ উপন্যাসের প্রথম দিকে রাজলক্ষ্মীর প্রেমিকা-জীবনের পথে দারুণ নৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে, এমনকি বঙ্কুর জন্য তাহার কাছে দেবতার চেয়ে প্রিয় শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী বুকের মধ্যে ব্যথা-সমুদ্র চাপিয়া রাখিয়া অসহায় ভাবে শুষ্ক মুখে বিদায় দিয়াছে।) ('পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে কুসুমের মনোভাব পরিবর্তনের যে কাহিনী রচিত হইয়াছে, তাহাতে বৃন্দাবনের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ যতখানি, বৃন্দাবনের পুত্র মাতৃহীন শিশু চরণের প্রতি অপত্য স্নেহের আকর্ষণ তাহার চেয়ে কম নয়। চরণকে কেন্দ্র করিয়াই কণ্ঠিবদলের স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্যের সংস্কার হইতে ধীরে ধীরে কুসুমের মন মুক্ত হইয়াছে। চরণকে পাওয়া যাইবে এজন্যও কুসুমের মন তাহার প্রথম স্বামী বৃন্দাবনমুখী হইয়াছে। তাহার মাতৃত্বের ক্ষুধা কতখানি ছিল তাহা বৃন্দাবন যেদিন চরণকে লইয়া তাহার বাড়ী প্রথম আসিয়াছে, সেদিনই বুঝা গিয়াছে। কুসুম বৃন্দাবনের সম্মুখ হইতে চরণকে জল খাওয়াইতে ঘরে লইয়া গেল। এইখানে বইয়ে আছে "কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বুক তাহার ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া হাঁফাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।") 'অনুরাধা' গল্পে ধনীপুত্র আধুনিক মানুষ বিজয়কে সহায়সম্বলহীনা কুড়ি বছরের অনূঢ়া সাধারণরূপা গ্রাম্যকন্যা অনুরাধা যে জয় করিয়াছে, সেজন্য তাহার জননীধর্ম যতটা সাহায্য করিয়াছে, প্রেমিকারূপ সে তুলনায় বিশেষ কিছুই করে নাই। প্রকৃতপক্ষে মাতৃহীন একমাত্র পুত্র কুমারকে অনুরাধা পরম স্নেহে গ্রহণ করায় এবং কুমারও পরম নির্ভরতায় অনুরাধাকে আশ্রয় করায় বিজয়ের মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনুরাধা গল্পটি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলোচনায় নিম্নলিখিত যে মনোজ্ঞ বিবরণ

অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন. তাহা হইতেই এই কাহিনী রচনার পিছনে শরৎচন্দ্রের নারীসত্তার সম্পর্কে অনুভূতি উপলব্ধি করা যাইবে—"ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' গল্পটি সবে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সময়ে এটি প্রকাশিত হয় সে সময় অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের দেহসর্বস্ব প্রেমের বন্যা বয়ে চলেছে, সেই কারণে এই গল্পটিকে যেন তার প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদরূপে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একদিন কথা হয়।

তিনি বললেন দেখ, কোন কিছু প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি 'অনুরাধা' লিখি নি। এতে নায়িকার যে মাতৃমূর্তি, সেবাপরায়ণতা, চরিত্রের মাধুর্য নায়ককে মুগ্ধ করলে—তার ফলে নায়কের চিত্তে যে অনুরাগের রঙ রঞ্জিত হ'ল, তা তো অলীক নয়—সেই-ই তো প্রেম। নারী চরিত্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে যে শিল্পী উপভোগ করতে না পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্যসৃষ্টি কখনও সার্থক হতে পারে না। দেহে প্রেমের যে স্থান নেই তা নয়, কিন্তু তার স্থান ঠিক গাছের শেকড়ের মত—মাটির নীচে।"—(শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬৯)।

নারী চরিত্রের বিপরীতে শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে ইহাদের চলমানতার অভাব প্রায়ই দেখা যায়। বাঙ্গালীর সমাজজীবনে যে অবক্ষয় শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কর্মজীবনে বাঙ্গালী পুরুষের যে উৎসাহহীন রূপ তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, জীবনের সমালোচনা বা প্রকৃত ছবি উপন্যাস বলিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেই অবক্ষয় বা নিশ্চলতার রূপ ফুটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ও যে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন খুব বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল ছিল তাহা নয়, কিন্তু বঙ্কিম আদর্শবোধের স্থান সর্বোপরি নির্ধারণ করায় তাঁহার সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি আদর্শের গৌরববোধে অনেক ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। জগৎসিংহ, ওসমানের মত পুরুষচরিত্র, প্রতাপ, ভবানী পাঠক, সত্যানন্দের মত পুরুষচরিত্র বঙ্কিমের এই আদর্শবোধের ফল। শরৎচন্দ্রের সময়ে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা, জাতীয় জীবনে শৌর্যাভাব, ব্যক্তিজীবনে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভীরুতার অনেক প্রসার ঘটিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে দৃপ্ত-সবল, সক্রিয় পুরুষচরিত্র, বিশেষ করিয়া উদাত্ত নায়ক

চরিত্র গড়িয়া তোলা আদর্শবোধদৃপ্ত কল্পনাশ্রয় ছাড়া ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। যে শিল্পী বাস্তব জীবন অবলম্বন করিয়া তাহার সমালোচনা করিবেন, তিনি সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতে সমুন্নত জীবনকে স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু যে বর্তমান মানুষকে তিনি আঁকিবেন তাহার মধ্যে নিজ যুগ ও পরিবেশের অতিক্রম অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যুগধর্মের দ্বারা তাহার মানসিক বৈচিত্র্য অনেক সংযত হয়। কাজেই শরৎচন্দ্রের মত ঔপন্যাসিক আপন যুগের পরিচিত মানুষদের ছাড়া অন্যকে আঁকিবেন কি করিয়া এবং ফলে তাঁহার পুরুষ চরিত্র সমকালীন বাঙ্গালী পুরুষদের নিষ্ক্রিয়তা ও ভাববিলাসের যৌথ ছাঁচে গড়া হইয়াছে। তাছাড়া বঙ্কিম রোমান্স-প্রবণ লেখক ছিলেন, তিনি কল্পনার রাশ যেভাবে আলগা করিয়া দিয়া জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুরুষচরিত্র আঁকিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের মত জীবন-অনুসারী লেখকের রোমান্টিক মানসগঠন সত্ত্বেও সেইরূপ কল্পনা-নির্ভর হওয়া কঠিন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সব্যসাচীর মত বীর চরিত্র আছে, সব্যসাচী বিপ্লবী, বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু তবু সেরূপ চরিত্র আপন পরিচিত বাঙ্গালী পুরুষদের মধ্যে সহজে দেখা যায় না এইজন্যই বোধ হয় সব্যসাচীকে তিনি বাংলার, এমনকি ভারতের বাহিরে পূর্ব এশিয়ার কর্মক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বস্তুত শরৎসাহিত্যে অপেক্ষাকৃত গতিহীন বা নিষ্ক্রিয় পুরুষচরিত্রের ছড়াছড়ি। ইহারা বড় জীবন চায় না, বড় জীবনের সমস্যাও চায় না। ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে ছোট খাটো স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন লইয়াই তাহারা দিন কাটায়। তবে শরৎচন্দ্রের এই ধরণের চরিত্র প্রায় নির্বোধ নয়, ইহারা অনুভূতিশীল, নারীপ্রেমের বিকাশে ইহাদের অন্তরঙ্গতা গতি ও আবেগের সৃষ্টি করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত কর্মবিমুখ, কিন্তু সততা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে ইহারা মোটামুটি সচেতন। সর্বোপরি ইহারা হৃদয়বান। যে মানবতাবোধের উপর জোর দিয়া শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রগুলির উজ্জ্বল রূপায়ণ করিয়াছেন, পুরুষ চরিত্র রূপায়ণেও সেই মানবতাবোধের স্থান তুচ্ছ নয়। এখানেও শরৎচন্দ্রের সেই দুঃখীর প্রতি শোষিতের প্রতি সহানুভূতি, সেই সারল্যের প্রতি সুন্দরের প্রতি মমতাবোধ। এই মানবপ্রীতির প্রেরণাতেই বোধহয় শরৎচন্দ্র 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের গ্রাম্য সমাজপতি জমিদার মণিশঙ্করকে পারিবারিক বিরোধ. এমনকি পারিবারিক

মর্যাদাবোধ ভুলাইয়া ভ্রষ্টা মায়ের নিষ্পাপ কন্যা সরযুকে ঘরে ফিরাইয়া লইতে চন্দ্রনাথকে সাহায্য করাইয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত মানবদরদী লেখক ছিলেন, তাঁহার 'কাশীবাসিনী' গল্পটিও এমনি এক ভ্রষ্টা মা ও নিষ্পাপ কন্যার কাহিনী। কিন্তু সেখানে কন্যার সাজানো সংসারে মা কাহাকেও কোন পরিচয় না দিয়া অতিথিরূপে আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা কাহারও কানে যায় নাই। সমাজ-সচেতনতার জন্যই এই পর্বতপ্রমাণ মাতৃস্নেহকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া প্রভাতকুমার রসসৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এখানে শরৎচন্দ্র সামাজিকভাবে অনেক উদারতা দেখাইয়াছেন। তিনি সরযূর মায়ের কলঙ্ক রাখালের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রনাথের কাকা মণিশঙ্করকে মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করিয়া নিষ্পাপ সরযূকে পাপ হইতে পৃথক বলিয়া সে পাপী নয়, এই আদর্শদ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে গাঁজাখোর নীলাম্বর লেখকের এই মানবতাবোধের কারুণ্যসিঞ্চিত হইয়া তারকেশ্বরে মরণাপন্ন কুলত্যাগিনী স্ত্রী বিরাজকে ঘরে ফিরাইয়া লইতে আগ্রহী হইয়াছে। 'স্বামী'র ঘনশ্যাম অথবা 'শেষের পরিচয়'-এর ব্রজবাবুর কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে রাজী হওয়ার পিছনে তাহাদের বৈষ্ণবী মনোভাব কিছুটা কার্যকরী হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবু লেখকের মানবতাবোধ অসামাজিক উভয় পরিবেশেই পুরুষমনে উদারতা সঞ্চার করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র সব্যসাচী, 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ, 'শেষপ্রশ্ন'-এর রাজেন, 'শ্রীকান্ত'র বজ্রানন্দ, 'গৃহদাহ' এর সুরেশ প্রভৃতির মত বিচিত্র, সক্রিয়, গতিশীল, কয়েকটি পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। 'পণ্ডিত মশাই'-এর বৃন্দাবন এবং 'পল্লীসমাজ'এর রমেশের নামও এই প্রসঙ্গে করাযায়। কিন্তু এসত্ত্বেও দেখা যায় (শরৎচন্দ্র অনেকগুলি পুরুষ চরিত্রেই শ্রীকান্ত'র ছাঁচে তৈয়ারী, অমনি বুদ্ধিমান, অমনি নিষ্ক্রিয়, অনুভূতিশীল প্রেমিক, সৎ ও শান্ত। এইরূপ পুরুষচরিত্র নিজেরা পৌরুষের জোরে আপন চলার পথ করিয়া লয় না সত্য, কিন্তু তাহারা নারীচরিত্রে আলো ফেলিয়া, প্রেরণা দিয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে।) শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষাল, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে, 'অনুপমার প্রেম'-এর চন্দ্রবাবু, 'বিরাজ বৌ'-এ পীতাম্বর, 'দত্তার রাসবিহারীর বা 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর জয়লাল বাঁড়ুয্যের মত হীন বা স্বার্থপর কয়েকটি পুরুষচরিত্রও সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্য উপন্যাসে আসে নাই, আসিয়াছে লেখকের ভাবসত্যকে সংঘাতের ভিতর দিয়া গতি ও প্রতিষ্ঠা দিতে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন'-এর আশুবাবু, 'দত্তা'র দয়াল, 'দেনাপাওনা'র ফকির সাহেব, 'পরিণীতা'র গিরীন, 'নিষ্কৃতি'-র গিরিশ প্রভৃতি কয়েকটি শান্তরসাশ্রিত পুরুষচরিত্র আশ্চর্য মহিমামণ্ডিত করিয়া আঁকিয়াছেন, এক এক খণ্ড আকাশের তারার মত এই চরিত্রগুলি সাধারণ জনতার মধ্যে স্নিগ্ধদ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। তবু তাহারা যে রক্তমাংসের মানুষ এ পরিচয়ও তাহাদের অঙ্গাঙ্গী হইয়া আছে।

শরৎসাহিত্যে 'শেষ প্রশ্ন'-এর রাজেন সবচেয়ে উন্নতশীর্ষ দৃঢ় পুরুষচরিত্র, তাহার পরই 'শ্রীকান্ত'র বজ্রানন্দ। কিন্তু ইহারা সহায়ক চরিত্র মাত্র, নায়ক নয়।[1] শরৎচন্দ্রের নায়ক চরিত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হইল 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দ ও 'গৃহদাহ'-এর সুরেশ। শরৎসাহিত্যের নিষ্ক্রিয় শান্ত নায়কদের ভিড়ে এই চলমান জীবন্ত উজ্জ্বল চরিত্রদুটিকে যেন ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়। এই চঞ্চল ও প্রচলিত মূল্যবোধে আঘাতকারী চরিত্র দুইটিকে প্রেম যে ভাবে ধীরে ধীরে শান্ত ও স্থিতিবান করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অঙ্কন বিশেষ ঔপন্যাসিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। জটিলতার দিক হইতেও চরিত্র দুইটি সার্থক উপন্যাসের চরিত্র। 'দেনা পাওনা'র প্রথম দিকে জীবানন্দ অসৎ, চরিত্রহীন, মদ্যপ, কিন্তু সে জীবনরসিক এবং নিঃসঙ্গতার অন্তর্লীন অপ্রকাশ্য বেদনা তাহার পথের আলো ম্লান করিয়া দিয়াছে বলিয়াই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার শ্রদ্ধাবোধ টুটিয়াছে, আপন জীবন লইয়া তাই তাহার জুয়াখেলা। চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জে তাহার ঘরে জীবানন্দ সেদিন প্রভাতের অরুণালোকে তাহারই গৃহে বিগত রাত্রিতে একরূপ বন্দিনী ষোড়শীকে শুধু কালের বিস্মৃতির গর্ভে পরিত্যক্তা তাহার বিবাহিতা স্ত্রী অলকা বলিয়াই চিনিল না, সঙ্গে সঙ্গে চিনিল নিজেকে, বুঝিল সে তখনও একেবারে ফুরাইয়া যায় নাই, তখনো চেষ্টা করিলে হয়তো জীবনের আস্বাদ সে ফিরিয়া পাইতে পারে। তারপর নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া ষোড়শীর সহিত জীবানন্দের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, কিন্তু প্রতিপদেই সে নবজীবনের নূতনতর স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। 'গৃহদাহ'-এ সুরেশ উপন্যাসের সুরু হইতেই হৃদয়ের আবেগ এবং মানবতাবোধের ব্যাপ্তিতে উজ্জ্বল। সে প্রাণচঞ্চল কিন্তু (জীবানন্দের মত) জীবনরসিক নয়। তাহার সহিত জীবানন্দের আর

একটি পার্থক্য—সে জীবানন্দের মত বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তবচেতনাসম্পন্ন নয়। জীবানন্দ প্রত্যেক ঘটনাকে তাহার নিহিত মূল্যে যেমন উপলব্ধি করিয়াছে, সুরেশ তাহা পারে নাই। জীবানন্দ ষোড়শীকে চিনিয়াছে, তাহার অলকারূপ এবং ষোড়শীরূপের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্তাকে জীবানন্দ ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও চিনিয়াছে বলিয়া যৌবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছানো পরিণত মানসকে সে সংযত রাখিয়াছে, সম্ভাব্য প্রাপ্তির উত্তেজনায় অবিন্যস্ত জীবনে হাত বাড়াইবার অধিকার বোধকে এখানেও সে সম্প্রসারিত করে নাই। সুরেশের মধ্যে এই পরিণত মনের ছাপ নাই, সে হিসাবে ভুল করিয়াছে এবং আপাত পাওয়ার অন্তর্লীন অপ্রাপ্যতার গভীর বেদনায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। তাহার প্রেম, তাহার আবেগ, তাহার উত্তেজনা, তাহার চরিত্রধর্ম, সবই নায়কোচিত, কিন্তু তাহার মন একটু অপরিণত। জীবানন্দের মত রসিক মন থাকিলে সুরেশ ভালমন্দ সম্ভব অসম্ভবের পার্থক্য বুঝিতে পারিত। প্রকৃতপক্ষে জীবানন্দ তাহার মানসগঠনের দৌলতেই বিশৃঙ্খলার ফলাফল দেখার উত্তেজক আগ্রহে পথচলার শক্তি পাইয়াছে। সুরেশ বন্ধুপত্নীকে হরণ করিয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে কাজটি জঘন্য, সমাজের দিক হইতে অত্যন্ত আপত্তিকর। এই সমাজবোধের প্রভাব পড়িয়াছে অচলার আচার-আচরণে। কিন্তু সুরেশের প্রাণের আবেগ এক ভ্রান্ত প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে সে এভাবে নিরুপায় ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, একথা না বুঝিলে সুরেশকে চেনা যাইবে না। ভুল হইলেও সুরেশ বিশ্বাস করিত অচলা তাহাকেই ভালবাসে, মহিমকে নয়। অচলার বিচলিত মনের কোন কোন আবেগমথিত উক্তিতেও তাহার এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হয়। সুরেশ ধরিয়া লইয়াছিল ঘটনাচক্রেই অচলার সহিত মহিমের বিবাহ হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে মহিমের প্রতি অচলার অনিবার্য আকর্ষণ নাই। বিবাহরূপ সামাজিক সংস্কারকে ভালবাসার আবেগে অস্বীকার করিয়া সুরেশ প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠার আশাতেই অচলাকে ট্রেণ হইতে ভুলাইয়া নামাইয়া লইয়া সামাজিক বিদ্রোহ করিয়াছে। অচলার প্রতি গভীর প্রেমবশে সুরেশের মনে হইয়াছিল অচলাকে না পাইলে তাহার জীবন শূন্য থাকিয়া যাইবে। মহিমের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, মহিমের উপস্থিতির প্রভাব না থাকিলে, তাহার প্রতি অচলার অন্তরের প্রকৃত প্রেম ধীরে ধীরে আপনি উৎসারিত

হইবে, অচলা সুখী হইয়া তাহাকেও সুখী করিবে, এইজন্যই সুরেশ অচলাকে লইয়া অন্ধকার ভবিষ্যতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সুরেশ অচলার অপরিহার্য প্রবল স্বামী-সংস্কারকে দৈহিক মিলনের পর অচলার ভাঙ্গিয়া পড়ার মধ্যে যে মুহূর্তে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার নিরুত্তাপ দেহের সান্নিধ্যে মহিমের অনুরাগিণী স্ত্রী অচলাকে যখনই সুরেশ চিনিয়াছে, তখনই অচলা সুরেশের চক্ষে সত্যকার পরস্ত্রী হইয়া গিয়াছে। গল্পের জন্যই হউক বা সাধারণ পাঠকদের জন্যই হউক, ইহার পর মহিম তাহাদের সম্মুখে রামবাবুর ডিহিরির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু মহিম এখানে উপস্থিত না হইলেও এবং মাঝুলিতে প্লেগ মহামারীর মধ্যে সুরেশ না গেলেও অচলার প্রতি সুরেশের পুরানো আবেগ তাহার চরিত্রের বর্তমান সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আর বোধ হয় ফিরিয়া আসিত না।

আগেই বলা হইয়াছে শরৎচন্দ্র সমাজহিতৈষী মানুষ ছিলেন এবং মোটামুটি সামাজিক মানুষ ছিলেন। তিনি সমাজের কল্যাণ হউক এরূপ মনোভাব লইয়াই সমাজের বিশেষ বিশেষ দোষত্রুটির ছবি ফুটাইয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন এইভাবে পাঠক পাঠিকার লক্ষ্য আকৃষ্ট হইলে জনমতের চাপে দুর্নীতি ও হীনতার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইয়া সমাজ আপন স্বাভাবিক মর্যাদায় মানুষকে পরিচালিত করিবে। এই সমাজ তাহার অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মঙ্গলময় আশ্রয়ভূমি। সমাজের কোন কোন বিধিব্যবস্থা পালটানো দরকার, কিন্তু সমাজ প্রয়োজনীয় বৃহৎ সংস্থা বলিয়া বিশেষ বিশেষ দোষত্রুটিতে তাহার মধ্যে যথেষ্ট গ্লানি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও সেগুলি সমাজের অংশমাত্র এবং সেগুলির প্রতিবাদে সমাজের উপর সামগ্রিক আঘাত হানা মূঢ়তা। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক মন ছিল, কিন্তু তিনি রোমান্স লেখক নন। তিনি আবেগের সহিত কাহিনী বা চরিত্র ফুটাইতেন, কিন্তু পরিচিত সামাজিক পরিমণ্ডলের সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়া সে কাহিনী বা চরিত্রকে তিনি কল্পনা-সর্বস্ব করিতেন না অথবা সমাজের সহিত সংগ্রামের ক্ষেত্রে সরাসরি সমাজকে পরাজয়ের গ্লানিতে ডুবাইতে চাহিতেন না। তিনি সমাজকে স্বীকার করিয়া সমাজের বিকাশই চাহিয়াছেন। সমাজের বিবিধ দোষত্রুটি

জোরের সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকে যেমন শরৎচন্দ্রকে আধুনিক লেখক বলেন, শরৎসাহিত্যে কাহিনীর পরিণতিতে সমাজসম্পর্কে রক্ষণশীলতার ভাব দেখিয়া অনেকে আবার তাঁহাকে পুরাতনপন্থীও বলিয়া থাকেন। বিচ্ছিন্নভাবে এই দুই বিপরীত প্রান্তিক মন্তব্যেরই কিছুটা যথার্থতা আছে আবার একসঙ্গে বিবেচনা করিলে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনার, বিশিষ্টতায় মুগ্ধ হইতে হয়।) শরৎচন্দ্র যখন 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নীতি মানিয়া লন নাই, তখন কল্যাণের জন্য সাহিত্যরচনায় তাঁহার প্রবণতা স্বাভাবিক। সমাজকে সামান্য কারণে নস্যাৎ না করিয়া সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের সুস্থ পরিবর্তন তিনি চাহিয়াছেন। সমাজের যে সব নিয়ম প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়ায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সমকালীন মানুষের জীবন বা কল্যাণের সহিত যাহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগ নাই, সেগুলি বাতিল হইয়া যাক, তাহাদের সংশোধন করিয়া লাভ নাই, ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই অভিমতের আলোকে তিনি কাহিনী ও চরিত্রবিন্যাস করিতে চাহেন নাই, আপন আবেগের স্পন্দনটুকু সেখানে রাখিয়া বাকী কাজ দেশ ও কালের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।* সমাজের কিছু বিধান আছে যেগুলি প্রকৃত মহৎ ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, কিন্তু শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছেন কায়েমী স্বার্থের চাপে সেগুলি কলঙ্কম্লান। সেগুলিকে কলঙ্কমুক্ত করা সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই কাজ। সাহিত্যিকও সমাজ-হিতৈষী, সে হিসাবে শরৎচন্দ্রও শিল্পরুচি ব্যাহত না করিয়া যতটুকু সম্ভব এই কর্তব্যপালনে উৎসাহিত হইয়াছেন। সমাজ অল্পের জন্য নয়, সকলের জন্য, সকলের মুখের পানে চাহিয়াই সমাজের

*'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা ও রমেশকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করায় কোন কোন পাঠক মনঃক্ষুণ্ণ হন। এসম্পর্কে তাঁহার নিজের বক্তব্য শরৎচন্দ্র 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" প্রবন্ধে রাখিয়াছেন: "উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানুষের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকু

বিধি-ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া চাই।** মোটের উপর, সমাজ তাহার অন্তর্ভুক্ত মানুষদের কল্যাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া আছি হিসাবে নিযুক্ত বলিয়া মানুষের সহিত শত্রুতা করা, মানুষের উন্নতি প্রতিহত করা, প্রচলিত আছে বলিয়াই পুরাতন বিধির দোহাই দিয়া অগ্রগতিশীল চিন্তার সংস্কারগত বাধার বেড়াজাল সৃষ্টি করা,—এসব সমাজের কাজ নয়। প্রগতির সহিত এই ধরণের প্রতিকূলতা যদি সমাজ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ব্যাধি দূর করিয়া সমাজকে ঠিক মত চলিতে সাহায্য করাই দরকার। মানুষের প্রয়োজনে যেমন সমাজ, সমাজের প্রয়োজনে তেমনি মানুষ। শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলি ও চরিত্রগুলি এই সুস্থ সমাজের প্রত্যাশী। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই শরৎসাহিত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় কালিদাস রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "আমাদের ধর্মজীবন যে কতকগুলি নিরর্থক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে—শরৎচন্দ্র

যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'

**'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে (শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, সপ্তম সম্ভার) শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজও ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপর চলে না। অন্ততঃ আমি বোঝাপড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলেই কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সহিত দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বৌভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজ-কর্মে হাতে পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং সেই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয় সেই বস্তুটিকে সমাজধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি।"

তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে আমরা আদর্শ গোষ্ঠীবন্ধনের ও একান্নবর্তিতার গৌরব করি এবং আমাদের সংসার-গুলিকে হৃদয় তীর্থ বলিয়া অভিহিত করি—উহার অন্তরালে কত বড় ফাঁকি, কত বড় ভূয়ো ও মেকি যে ঐ তথাকথিত তীর্থকে আমাদের ধর্মতীর্থ-গুলির মতই পাপদূষিত ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া রাখিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের চোখে ধরা পড়িয়াছে।"—(শরৎসাহিত্য, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা—২)

সমাজের তথা সমাজের মানুষের এই কল্যাণকামনা শরৎচন্দ্রের অন্তরের মহৎবৃত্তি, তাঁহার সমাজ-চেতনার ভিত্তি বলা চলে। এই জন্যই বিচ্ছিন্ন ঘটনায় সমাজের বা সমাজ-কর্ণধারদের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেও এবং সমাজের দোষত্রুটি সমালোচকের কঠিন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহা স্পষ্টরূপে ফুটাইলেও সমাজের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি খড়্গ ধারণ করেন নাই, বরং সমাজ তাহার প্রয়োজনের গুরুত্ব লইয়া কিভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে, নিজের কল্যাণসাধনের বিধি ব্যবস্থা সম্পাদনে অক্ষম সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা সমাজ কিভাবে করিয়া যাইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সমাজকে হীনতামুক্ত করিয়া বাঁচাইতেই চাহিয়াছেন।*

সমাজের ত্রুটি বিদূরিত করিতে, সমাজকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কল্যাণধর্মিতা রক্ষা করিতে শরৎচন্দ্র কতখানি আগ্রহী ছিলেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে স্পষ্ট আত্মপ্রকাশের মধ্যে ধরা পড়ে। কলা-শিল্পে লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে সচেতন ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সমাজবোধে তিনি এত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, আপন বক্তব্য বলিষ্ঠভাবে সোজাসুজি উত্থাপন করিয়া তিনি তত্ত্বের চাপে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যন্ত করিয়াছেন। যেখানে তিনি বক্তব্য চরিত্রের মাধ্যমে রাখিয়াছেন,

*শরৎ-সাহিত্য গ্রন্থে (১৯৫৬) শ্রীকালিদাস রায়ের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি এসম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য,—"পক্ষান্তরে যতই তর্করত্নদের লইয়া ব্যঙ্গ করুন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে জাতীয় রক্ষণশীলতার ভাবও প্রচ্ছন্ন আছে। উহাই তাঁহার সংস্কারমুক্ত উদাসী বিদ্রোহভাবকে সংযত ও পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। কেবল তাহাই নয়—উহাই তাঁহার রচনায় একটা শুচি সংযম ও কল্যাণশ্রীও সঞ্চার করিয়াছে। নতুবা শরৎসাহিত্য ধ্বংসাত্মক (Iconoclast) উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইত।"—পৃষ্ঠা ৩০।

সেখানে তবু কথাশিল্পগত আলোচ্য ক্রটি কিছুটা মানাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন কোন জায়গায় তিনি স্পষ্টত প্রবন্ধের ভঙ্গিতে আপন কথা রাখিয়াছেন।* আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে শিল্পের অঙ্গহানি বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমের সময় কথাশিল্প ভাল দাঁড়ায় নাই বলিয়া এবং বঙ্কিম এহিসাবে কিছুটা পথিকৃৎ বলিয়া তাঁহার এরূপ ক্রটি শরৎচন্দ্রের অনুরূপ ক্রটির চেয়ে অবশ্যই কম সমালোচনা-যোগ্য। তবে যেখানে শরৎচন্দ্র আবেগে এভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার নীতিবোধ, কর্তব্যানুরক্তি ও কল্যাণধর্মিতা অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়ে বলিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগহানির পথে তাহাদের সহানুভূতি ও দরদই অনেকখানি বাধা দেয়। এই প্রসঙ্গে এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই কল্যাণবোধের আবেগে

*'বিলাসী' গল্পের উপসংহার শরৎচন্দ্রের এই ক্রটির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এখানে শরৎচন্দ্র যেন প্রবন্ধের মত করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন। গভীর আবেগে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া প্রিয় হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার উপর তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার আবেগ-বিক্ষুব্ধ মনের যে প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত বলিয়া ইহার শিল্পমূল্য কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। 'বিলাসী' গল্পের শেষে আছে,—"আমার মনে হয় যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ এবং ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্বপ্রকার হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে। বিলাসকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—

অত্যুচ্ছ্বাস প্রকাশ ছাড়াও শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে এমন দৃশ্যের বা পরিস্থিতির অবতারণা করিয়াছেন, যাহা পড়িতে হয়ত খুব ভাল লাগে, লেখকের উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শে যাহা অত্যন্ত মনোরম, কিন্তু চিন্তা করিলে, বিচার করিলে যাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শরৎসাহিত্যে যৌথ পারিবারিক প্রথার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই যৌথ পরিবার প্রথার প্রতি লেখকের মমতা 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিন্দুর ছেলে', 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতিতে বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। এই বইগুলিতে একবার নানা কারণে যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়া সেই যৌথ পরিবার জোড়া লাগিয়াছে। এই জোড়া লাগা ভাল, ইহা হওয়া উচিত, যৌথ পরিবারের ছবি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, এই জন্যই এসম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ। তাহা না হইলে শরৎচন্দ্রও দেখিয়াছেন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টাইয়া যাইবার সহিত যৌথ পরিবার ভাঙিয়া যাইবার সম্পর্ক কিরূপ, ভূমিনির্ভরতার স্থান অধিক-মাত্রায় শিল্প-বাণিজ্য নির্ভরতা অধিকার করিলে কিরূপে যৌথ পরিবারের মানুষ

অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি। কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখে নাই।...আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধের দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথ্য সামাজিক বিধিব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দুসমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে টিকিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি; প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয়—এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে-চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে সে যে বেশ থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।"

বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহ হইবার ফলে নূতন পরিবেশের সহিত মনের নিঃস্বার্থ একাত্মতা কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে বলিয়া যৌথ পরিবার কিরূপ অনিবার্যভাবে ভাঙনের পথে চলিয়াছে। কাজেই শরৎচন্দ্র প্রীতি বা হৃদয়াবেগ দিয়া যৌথ পরিবারের ভাঙন রোধ করিলেও তাহা টিকিয়া থাকিবে না, ইতিহাসের দুর্দম প্রবাহে এই পুরাতন মনোরম প্রথাটি অবশ্যই লোপ পাইবে। কিন্তু তবু হিতবাদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যৌথ-পারিবারিকতার সপক্ষে লিখিয়াছেন।* অনুরূপভাবেই শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত জমিদারী প্রথা বা মহাজনী প্রথা সম্পর্কে সমালোচনা করা চলে। জমিদারী বা মহাজনী প্রথার ভিত্তি অন্যায় মুনাফাবৃত্তির উপর, মানুষকে শোষণ করিয়াই জমিদার বা মহাজনের স্বাচ্ছন্দ্য। শরৎচন্দ্র কিন্তু এই দুই প্রথার সম্বন্ধে কটাক্ষপাত না করিয়া জমিদার ও মহাজনের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের বা হীনতার ভিত্তিতে তাহাদের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। হীন কাজ যে করে সে তো অবশ্যই হীন, কিন্তু হীন কাজ না করিয়াও হীন পরিমণ্ডলে বাস করিলে সেই পরিমণ্ডলের প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই মানুষের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে হীনতামুখী করিয়া তুলিতে পারে, তাহার ভাল থাকা শুধু প্রকৃতি-দত্ত ভাল মানসিক গুণ বা বৃত্তি অথবা ভাল কাজের পরিচিতির উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল নয়, এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বিশেষ ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাই জমিদার ও মহাজনের হীনতা জমিদারী-মহাজনী কারবারের সহিত কতখানি জড়িত, সে ছবি শরৎ-সাহিত্যে স্পষ্ট নয়। অবশ্য নিপীড়িত দরিদ্র প্রজা বা খাতকের বিপরীতে জমিদার-মহাজনকে আঁকিবার সময় কোথাও বৃত্তির সহিত বৃত্তি-গ্রহীতা মানুষের অপরিহার্য সংযোগ রক্ষিত হইয়াছে, তবে সে ছবি যতটা শরৎচন্দ্রের মানবতাবোধজাত, ততটা সমাজচিন্তা

*শুধু যেখানে এই যৌথ পরিবার রক্ষা পাইয়াছে, সেইখানেই শরৎচন্দ্রের যৌথ পরিবারের প্রতি মমতা সংরক্ষিত হইয়াছে এমন নয়, 'মামলার ফল', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'বিরাজ বৌ', 'দেবদাস', এই ধরণের যে সব রচনায় যৌথ পরিবারের স্থায়ী ভাঙ্গন দেখানো হইয়াছে, সেখানেও এই পরিণতিতে লেখকের বেদনা সহজেই অনুভূত হয়।

বা অর্থনৈতিক চিন্তাজাত নয়। পরে "অর্থনৈতিক চেতনা" শীর্ষক অধ্যায়ে এসম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইবে।

সমাজ অধঃপতিত হয় সমাজের মানুষের দ্বারা। যাহাদের লইয়া সমাজ তাহারা যদি হীন হয়, তাহা হইলে সমাজের সম্ভাবনা ব্যর্থ হইবেই, সমাজ বড় হইবে না। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'বিরাজ বৌ', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলার গ্রাম্যসমাজের উপরের স্তরের একশ্রেণীর লোকের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহারা অনেকেই নানা দোষদুষ্ট, তাহাদের পরিচালিত বা প্রভাবিত সমাজ তাই আপন কর্তব্য-পালনে বা মানুষের আশানুরূপ হিতসাধনে অসমর্থ। ইহারা ভাল হইলে দেশের চেহারা অবশ্যই অন্যরূপ হইবে। সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবন অনুসরণ করিয়া দোষীকে দোষীই দেখাইয়াছেন, পল্লীসমাজের একশ্রেণীর মানুষের দোষের ফলেই সমাজরূপ বিবর্ণ হইতেছে। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন যে, উপরোক্ত দোষীদের চরিত্র-চিত্রণ তাহাদিগকে তথা সমাজকে বাঁচাইবার প্রধান উপায়। ইহাদের দেখিয়া পাঠক সমাজ ইহাদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হইবে এবং আপন হইতে এই দোষ ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াসী হইবে, এই আশাই শরৎচন্দ্রকে পল্লীসমাজ লইয়া গল্প উপন্যাস লিখিবার প্রেরণা দিয়াছিল। পল্লীসমাজের একটি শোচনীয় অভাবাত্মক দিকের প্রতি শরৎচন্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহা হইল পল্লীগ্রামে শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাব না ঘুচিলে পল্লীসমাজের সত্যকার উন্নতি হইতেই পারে না। তাঁহার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে পল্লীগ্রামের জাতিভেদ, দলাদলি, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি তীব্ররূপ পাইলেও এবং ইহাদের কুফল সম্বন্ধে পাঠকমনে বিরুদ্ধমত সৃষ্টির চেষ্টা হইলেও পল্লীসমাজে শিক্ষাপ্রসারের যে আন্তরিকতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য কম নয়। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁহার 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৪১) যথার্থই বলিয়াছেন যে, "পল্লীসমাজে তাঁর বক্তব্য মোটের উপর এই: জাতিভেদ ছোঁয়াছুয়ি এসবের ফলে হিন্দুসমাজে দুর্দশা দেখা দিয়েছে কিনা এসব প্রশ্ন অগ্রগণ্য নয়, অগ্রগণ্য প্রশ্ন হচ্ছে পল্লীর সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালা, তাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, তাদের অভীত করা।"

শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উন্নতির মূল, শিক্ষার প্রসার না ঘটিলে

জাতির উন্নতি অসম্ভব। এই শিক্ষা কেতাবী এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকার হওয়াই দরকার। শরৎচন্দ্র সামাজিক মানুষের মনের সুস্থতার জন্য উভয়বিধ শিক্ষার উপরই জোর দিয়াছেন। যাহা ভাল, যাহা কল্যাণকর, মানুষকে সে সম্বন্ধে শিক্ষাই প্রেরণা জোগায়। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' প্রভৃতি রচনা দ্বারা শরৎচন্দ্র আশা করিয়াছেন, যাহা মঙ্গলদায়ক সেদিকে পাঠকের মন তিনি আকৃষ্ট করিতে পারিবেন। রেঙ্গুন হইতে ৮।৪।১৯১৩ তারিখে প্রেরিত এক পত্রে 'বিন্দুর ছেলে' সম্পর্কে তিনি প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিয়াছিলেন, (এই গল্পে) "একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙ্গালী ঘরের কথা! অনেকটা মেয়েদের জন্য—তারা যেন শিক্ষালাভ করে এই ইচ্ছায় লেখা।" শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে কেতাবী শিক্ষার উপর যেরূপ জোর দিয়াছেন তাহা সকলেরই চোখে পড়িবে।* এই উপন্যাসে প্রেম এবং পল্লীসমস্যা—দুইই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট, পল্লীসমস্যার মধ্যে যে হীনতার অন্ধকার অঙ্কিত হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিক্ষার আলো পড়িলে সে অন্ধকার অবশ্যই দূরীভূত হইবে। তাই তিনি 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশকে বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন। রমেশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়াছে, গ্রামে বিদ্যালয় তৈয়ারী করিয়া, বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করিয়া বা বিদ্যালয়ে পড়াইয়া তাহার সেই অধীত বিদ্যা ঠিকমত কাজে লাগান যাইবে না, কিন্তু গ্রামে সে জমিদার, শিক্ষিত, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, সে সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়ে যুক্ত থাকিলে গ্রামবাসী উৎসাহিত হইবে এবং গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভে অনুপ্রেরণা পাইবে, এই জন্য শরৎচন্দ্র রমেশকে গ্রামেই

* শরৎচন্দ্র নিজে শিক্ষার কিরূপ অনুরাগী ছিলেন তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' (১৯৬৫) গ্রন্থে লিখিয়াছেন; "সামতা-বেড়ের পাশে পাণিত্রাসে ছেলেদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও তখন এখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে এসে ও অঞ্চলে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হ'ল। সে বিদ্যালয়টি আজও রয়েছে এবং সেটি এখন একটি বড় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।"—(পৃষ্ঠা-২২৮)

আটকাইয়া রাখিলেন। ‘পণ্ডিত মশাই’ উপন্যাসে বৃন্দাবনের সাধনা গ্রামে শিক্ষার প্রসার, নিজের পাঠশালাটিকে যত্ন করিয়া চালানো সে বড় কাজ বলিয়া মনে করে। গ্রামের যাহাদের নিম্নশ্রেণীর লোক বলে, সেই তথাকথিত তলার মানুষদের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জন করিয়া বৃন্দাবন তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবার সাধনায় সাফল্যলাভের আশা রাখে। যাহারা পড়িবে বা যাহাদের ছেলেমেয়ে পড়িবে, তাহারা এই শিক্ষার আলোতে অভ্যস্ত নয়, সুতরাং আগে তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে এই শিক্ষায় তাহাদের সত্যকার লাভ কি। যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারা যেন গ্রামবাসীর বা ছাত্রের শ্রদ্ধার যোগ্য হন। ‘পণ্ডিত মশাই’-এ বন্ধু কেশবের সহিত বৃন্দাবনের এ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের এই গুরুতর সমস্যার দরদী আলোচনা।* ‘বিপ্রদাস’ মানুষের মন লইয়া লেখা উপন্যাস, তবু জমিদার বিপ্রদাসের চরিত্রের মহত্ত্ব আঁকিতে শরৎচন্দ্র তাহার শিক্ষানুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহার কলিকাতার বাড়ীতে গ্রামের অনেকগুলি ছেলের বিনাখরচে খাইয়া থাকিয়া কলেজে পড়িবার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মায়ের মত অন্নদা এখানে তাহাদের দেখাশুনা করে। ‘শ্রীকান্ত’ তৃতীয় পর্বে সুনন্দার স্বামী গঙ্গামাটির যদুনাথ কুশারীর মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র জমিদারদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

* কেশব বৃন্দাবনকে বলিল, বর্তমানে সবাই একথা বুঝিয়াছে যে দেশের যদি কোন কাজ থাকে ত ইতর সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়া আর যাই করা যাক না কেন তাহা পণ্ডশ্রম হইবে। সে এজন্য চেষ্টা করিয়াছে অনেক। কিন্তু তাহার দুঃখ এই যে সে চেষ্টায় মোটেই সাড়া মিলে নাই। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, “আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোন মতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মান সম্মান নষ্ট করে দিন-কতক ছোটলোকদের বাড়ী পর্যন্ত ঘুরেছিলাম —না, তবুও না—”

এইভাবে ছোটলোক কথাটি বারবার ব্যবহারে চাষী বৈষ্ণব বৃন্দাবনের স্বভাবতঃই খারাপ লাগিল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে শান্তভাবে বলিল, “ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে

যদুনাথ অধ্যাপক, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তিনটি ছাত্রের ভরণপোষণও তিনি করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তবু শিক্ষাদানের মহৎ কর্তব্য তিনি আঁকড়াইয়া আছেন। রাজলক্ষ্মীর সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া যদুনাথ আবেগে বলিয়াছেন, "অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্যদেবের কাছে যা পেয়েছি, সে ত কেবল ন্যস্ত ধন—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা।" (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে লইয়া দ্বিতীয়বার যখন গঙ্গামাটিতে গিয়াছে, সেখানে আনন্দ তাহার সাহায্যে শিশু-শিক্ষালয় খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।) শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণে'র নায়ক অমরনাথ মহান দেশপ্রেমিক কর্মী, সে জাতীয় সংগ্রামে সাধারণ মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, বিলাতী কাপড বয়কটের জন্য হাটে পিকেটিং করিবার সংকল্প হাটের মালিকদের জানায়। কিন্তু অমরনাথ ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাপনা তাঁহার মহান বৃত্তি। আলেখ্যর বন্ধু ইন্দু যেদিন প্রথম রে সাহেবের সহিত গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়া অমরনাথকে দেখিল, অমরনাথ তখন ছাত্রদের পড়াইতেছিল। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে অমূল্যর পাঠশালায় এবং স্কুলে যাওয়ার ছবিগুলি কাহিনীর অগ্রগতিতে অবশ্যই সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিন্দুর ছেলেকে মানুষ করিতে

পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাডি বাড়ি ঘুরে মান ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।"

বলা বাহুল্য, বৃন্দাবনের এই কথার শ্লেষ কেশবকে লজ্জিত করিল। তাহার পর বৃন্দাবন আসল কাজের কথায় আসিল, বলিল, "কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শোখো, তারপরে তাদের মঙ্গল কামনা ক'রো, তাদের ছেলে-পিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। তার আগে নিজেদের আচার ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপডা জানা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, এ যতক্ষণ না করছ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত করনা কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকদের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।"

তাহাকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখাইবার আগ্রহের কার্যকরিতার সঙ্গে শরৎচন্দ্র শিক্ষার জন্য আপন আগ্রহও নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রকাশ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র পাপী ও অপরাধীর অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহারা ইহাদের মানসিক বা চারিত্রিক দুর্বলতায় নিজেদের, নিজ পরিবারের এবং সমগ্রভাবে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। শরৎচন্দ্র হীনকে হীন করিয়া আঁকিয়াছেন, কিন্তু মানুষের সম্ভাবনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া হীন সম্পূর্ণ হীন বা চিরকালের জন্য হীন, একথা তিনি মানিতেন না। হীনতা জাত দুর্গতি, দুর্নীতির জন্য ক্ষতি যাহা হইবার তাহা তিনি দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষতির জন্য তিনি যাহারা হীন তাহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যে মন্দ কাজ করে তাহাকে সেই মন্দ কাজের পরিমণ্ডলে শরৎচন্দ্র ভাল বলেন নাই, কিন্তু মন্দ কাজ মানুষের বৃহৎ জীবনের একাংশ মাত্র বলিয়া মন্দ কাজ করা সত্ত্বেও মানুষের ভাল হইতে কোন বাধা নাই এবং ভাল হইবার সম্ভাবনা তাহার নষ্ট হয় না। এইভাবে একমুখী চরিত্রের পরিবর্তে নানা ভাব ও ঘটনার সংঘাতে জটিল ও অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ চরিত্র আঁকিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যকে আধুনিক যুগের হিসাবে অনেক আগাইয়া দিয়াছেন। সমাজকে ভালবাসিতেন বলিয়াই সামাজিক মানুষ ভ্রষ্ট হইলেই তাহাকে তিনি চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট ধরিয়া লইতেন না এবং ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কোন বড় গুণ থাকিলে তাহা ফুটাইতে যত্ন লইতেন। কোন কোন সময় এই গুণ এত উজ্জ্বল হইয়াছে যে, পাপের ছবি অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এইজন্য কাহারও কাহারও কাছে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, এইভাবে পাপীর মধ্যে পাপ নিরপেক্ষভাবে মহৎ দিক ফুটাইয়া শরৎচন্দ্র পাপীর প্রতি আপেক্ষিক যে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে পাপের প্রতি সামাজিক বিরূপতা হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহার ফলে দুর্বল চরিত্র বা সাধারণ লোকের পক্ষে পাপ পুণ্যের পার্থক্য সহজে ও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হইবে বলিয়া ইহাতে সমাজের বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। পাপীকে পাপের দিক হইতেই পরিচিত করা ভাল, না হইলে পাপ অস্পষ্ট হইয়া পাপী চরিত্রের উজ্জ্বল মনুষ্যত্বের কোন দিক যদি বড় হয়, তাহা হইলে পাপকে চিনিতে অবশ্যই অসুবিধা

হইবে। সামাজিক দিক হইতে এইরূপ সমালোচকের অভিযোগ সত্বেও শরৎচন্দ্র কিন্তু মানবতাবোধে এবং বৃহত্তর সমাজ-চেতনায় সামাজিক সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষকে কোন কোন দিকের দৈন্য সত্বেও তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদিকে বড় হইবার সুযোগ গ্রহণের প্রেরণা দিয়াছেন। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ ত্রয়োদশ সম্ভারে তাঁহার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে তিনি মানুষের মধ্যে ভালমন্দ উভয় দিকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার ধারণা যখন মন্দের মধ্যেও ভগবানের দেওয়া আত্মা আছে, তখন তাহার বড় হইবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মন্দভাবটুকুর জন্য প্রতিরুদ্ধ করিবার অধিকার তাঁহার নাই।*

এই মানবপ্রীতিমূলক সমাজ-চেতনার জন্যই শরৎচন্দ্রের হাতে সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, জীবানন্দ, দেবদাস, চন্দ্রমুখী, বিজলী, সবিতা, রাজলক্ষ্মী, সুরেশ প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে পরিচিত মন্দ দিকের উদ্ঘাটনের সঙ্গে অন্তর্লীন ভালো দিকেরও প্রকাশ ঘটিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহারা সচ্চরিত্র বা সাধুপ্রকৃতির নয়, জীবনে ইহাদের এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে

* পাপীর চরিত্রে তাহার পাপ নিরপেক্ষভাবে ভাল দিক দেখাইবার ফলে যাঁহারা মনে করেন যে, ইহাতে পাঠকদের মন্দের প্রতি সমুচিত ঘৃণাভাব লঘু হইয়া যায় ও তজ্জন্য সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাঁহারা বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের মাতাল ও পতিতা চরিত্রগুলির উপর জোর দেন। দেবদাসের প্রেমিকরূপ তাহার মাতলামি ও পতিতা পল্লীতে দিনযাপনের গ্লানি আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং পতিতালয় বাস্তব নোংরা রূপের পরিবর্তে প্রেমের পীঠভূমি হইয়া আকর্ষণীয় হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ কেহ কেহ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিশিষ্ট সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৭) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীর প্রেমিকা রূপ বাস্তব জীবনায়নে বিধৃত না হওয়ায় এই চরিত্রটি স্বাভাবিক হয় নাই। তুলনায় উভয় দিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের ঝুমুর দলের মেয়ে বসন্ত বলিষ্ঠতর চরিত্র। বসন্ত চমক সৃষ্টি করে না। রাজলক্ষ্মী করে, কিন্তু তাহাতে রাজলক্ষ্মী চরিত্র হৃদয়গ্রাহী হইলেও স্বাভাবিকতা হারায়।

া এমন কাজ ইহারা করিয়াছে, যাহাতে সমাজের অনুমোদন তো াই-ই, প্রতিবাদ আছে বিস্তর। তবু তাহাদের এই হীন রূপের বপরীতেও মনের কোন কোন মহৎ দিকের পরিচয় শরৎচন্দ্র ফুটাইয়াছেন বং দোষগুণের সমন্বয়ে তাহাদের পুরো মানুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী বাইজী, পতিতা স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহার উদারতা, ীতিবোধ, দুঃখীর দুঃখমোচনে তাহার সহৃদয় ব্যাকুলতা, সর্বোপরি ালবাসার ধনকে একান্তভাবে বিশিষ্টভাবে ভালবাসা, এইসব দুর্লভ গুণে তাহার কলঙ্কলিপ্ত জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।) ('দেনা-াওনা'র জীবানন্দ দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র, কিন্তু ইতিপূর্বেই দেখানো হইয়াছে, াহার হৃদয়ে এক নিঃসঙ্গ প্রেমিক পরিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষায় পথের পর দুচোখ মেলিয়া আছে, এই করুণ ছবিও দেনাপাওনা উপন্যাস াঠ আরম্ভ করিলে ক্রমে পাঠকের মনে জাগিয়া উঠিবে। দেবদাস তিতালয়ে যায়, মদ খায়, কিন্তু সে পতিতাকে ঘৃণা করে, একনিষ্ঠ প্রমিক সে, ব্যর্থ প্রেমের দুঃখ ভুলিতেই সে মাতাল হয়। 'দেবদাস' পরিণত হাতের রচনা, কিন্তু ইহাতেও শরৎচন্দ্রের উপরোল্লিখিত মানবিক পরিচয় মিলে। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 'হরিলক্ষ্মী'র হরিলক্ষ্মী ক ধনী, দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র; সে লেখাপড়া জানে, তাহার স হইয়াছে, কিন্তু গল্পের প্রথমদিকে মানবিক সদ্‌গুণের তাহার একান্ত াভাব। হরিলক্ষ্মী তুচ্ছ কারণে কমলাকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িল, ামীকে দিয়া কমলার স্বামী বিপিনের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া দরিদ্র ই পরিবারটিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিধবা মলা এবং তাহার পুত্র নিখিলকে এই হরিলক্ষ্মীই বুকে টানিয়া ইয়াছে। আসলে তাহার বাহিরের রূঢ়তা এবং নীচতার ভিতরে যে হমরী নারী ঘুমাইয়া ছিল, তাহার জাগরণই এই গল্পের কাহিনী। কাদশী বৈরাগী' গল্পে সুদখোর পাষণ্ড বলিয়া প্রথম দিকে যাহার প্রতি ন ঘৃণা জাগে, অভাগিনী পদস্খলিতা ছোট বোন গৌরীকে গভীর তায় যেভাবে সে প্রতিকূল সংসারের আঘাত হইতে বাঁচাইতেছে এবং বসায়িক সততা যেরূপ নীতিনিষ্ঠভাবে সে অনুসরণ করিতেছে, তাহা খিয়া গল্পের শেষ অংশে তাহার প্রতি বিরূপ ভাব পাঠকের মনে আর বশিষ্ট থাকে না। ইহারা সকলেই মানুষ,, দৈত্যের চেয়ে মানবিক

সম্ভাবনা ইহাদের অনেক বেশি, একটু পরিবেশের আনুকূল্য পাইলেই, সেই মানবিক সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটিতে পারে, ইহাই শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে, গোটা মানুষকে আঁকিবার জন্য শরৎচন্দ্র যেমন আপাত-মন্দ মানুষের অন্তর্লীন ভাল দিকের প্রকাশ ঘটাইবার চেষ্টা তেমন করিয়াছেন, একই প্রেরণায় যাহাকে সমাজে ভালো বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহার দুর্বলতার দিকও উন্মোচিত করিয়াছেন। এইভাবে 'সতী' গল্পে যে সতীসাধ্বী নির্মলা স্বামীর পাদোদক না খাইয়া জলগ্রহণ করে না এবং স্বামীর কঠিন বসন্তরোগে সতী-সাবিত্রীর মত রুগ্ন স্বামীর জীবনরক্ষার মানত করিয়া সাতদিন শীতলা মন্দিরে দেবতার চরণামৃত ছাড়া আর কিছু না খাইয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তাহার সতীত্বের অতি-অহংমন্যতার দুর্বলতাও শরৎচন্দ্র নিষ্করুণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই দুর্বলতার ফল এত সংঘাতিক যে হরিশ-নির্মলার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হইয়াছে, হরিশের ঘর সন্দেহপ্রবণা, মুখরা, অকারণে অভিমানিনী স্ত্রীর আধিপত্যে মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। এই সতীত্বের বাড়াবাড়ি যে একটা রোগ, ইহাই শরৎচন্দ্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া নির্মলা যদি সংযতভাবে স্বামীকে ভক্তি করে, তাহা হইলে তাহাদের দাম্পত্য জীবন অনায়াসেই আদর্শ ও সুন্দর হইতে পারে।* তাঁহার লেখার নানাস্থানে, ধর্ম হউক আর সমাজ-সংস্কার হউক, গোঁড়ামির কুফল সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অনুরূপভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

---

* ধর্মের মুখোস পরিয়া 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যের মত যাহারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অধর্মের আশ্রয় লয় তাহাদের প্রতি শরৎচন্দ্র বিরূপ। কিন্তু 'সতী' গল্পে প্রতিফলিত তাঁহার মনোভাব ঠিক এই শ্রেণীর নয়। এখানে সম্ভাবনাপূর্ণ সুস্থ জীবনের অনেকটা বৃথা অপচয়ের জন্য বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আতিশয্যের প্রতি বিরূপতাজাত। অবশ্য সাধারণ নারী হিসাবে নির্মলা স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ-প্রবণতা দেখাইয়াছে। ইহা হয়তো বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পাতিব্রত্যের জুলুমে বিরক্ত স্বামী হরিশের তাহার প্রতি অবহেলার প্রতিক্রিয়ায়।

সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল এক সঙ্গে গমন। সমাজের অন্তর্ভুক্ত যাহারা, তাহাদের সমস্বার্থ সমাজ-সংজ্ঞায় অভিব্যক্ত হয়। সমাজ যদি কোন দিক দিয়া আঘাত পায়, তখন প্রত্যাঘাত দিবার জন্য সে 'দণ্ডনীতি' রচনা করিয়া রাখে। এইজন্য বলা হয় 'দণ্ডনীতি' সামাজিক ক্রোধের বিধিবদ্ধ রূপ। যাহারা সমাজের রক্ষক তাহারা সামাজিক বিধি-বিধানভঙ্গকারীদের উপর এই দণ্ড প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে। বলা বাহুল্য, অপরাধের গুরুত্ব হিসাবেই দণ্ডের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। সাহিত্যিক, বিশেষ করিয়া কথাসাহিত্যিক, যে জীবনের কথা বলেন, ব্যক্তিগত ও সমাজগত দুই জীবনই ইহার মধ্যে আছে। এই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। কাজেই ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনবোধের সহিত কতটা সংযুক্ত এবং কতটা বিযুক্ত একথা কথাসাহিত্যিককে সচেতনভাবে মনে রাখিতে হয়। সুতরাং যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজের বিরোধী হইয়া সমাজের দণ্ডযোগ্য হয়, তখন সেই দণ্ডদানের দায়িত্ব কিছুটা কথাসাহিত্যিককে লইতেই হয়, কারণ ইহাও জীবনেরই অংশ। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের সহিত ন্যায়াধীশ বা বিচারকের পার্থক্য আছে। বিচারক সামাজিক বিরোধিতার দণ্ড দেন প্রধানতঃ প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুসরণ করিয়া, অপরাধীর মনের খবরের উপর তিনি খুব বেশি জোর দেন না। কিন্তু কথাসাহিত্যিককে এই ব্যক্তি-মনের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজবিরোধিতার বিচার করিতে হয়। যদি তাঁহার মনে হয় বিরোধিতার সঙ্গত কারণ আছে, মানুষ হিসাবে এই বিরোধিতা স্বাভাবিক, তাহা হইলে সমাজের প্রচলিত আইন যাহাই হউক, এবং সে আইনের ব্যবহার এই চরিত্র-চিত্রণে যত অপরিহার্যই হউক, তাঁহার সহানুভূতি কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি-চরিত্রের উপর পড়ে। লেখকের এই সহানুভূতি সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারে। (উপন্যাস বাস্তব জীবনের ছবি বলিয়া ঔপন্যাসিক হয়তো সমাজকে মানিয়া সংশ্লিষ্ট চরিত্রকে দুঃখ দেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মনের সমর্থন থাকে না বলিয়া তাঁহার লেখায় বিচিত্র বেদনারস উদ্ভূত হয়। ইহাও ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি বড়ো দুঃখের মাধুর্য। ট্র্যাজেডি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি।) শরৎচন্দ্র সারা সাহিত্যিক জীবনেই বলিতে গেলে এই ট্র্যাজেডির অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম দিকের রচনা

'দেবদাস'-এ কারুণ্য হয়তো শিল্পকলার হিসাবে অসংযতভাবে প্রকা
পাইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি ইহার গঠনপ্রয়াস ট্র্যাজেডিসুলভ।

কথাসাহিত্যিক বিচারকর্তা বা সমাজরক্ষক নন, সমাজের মানু
হিসাবে সমাজের বিধি-বিধানের জন্য তাঁহার আগ্রহ থাকেই, কি
তাঁহার মনোযোগ অধিক নিবদ্ধ হয় ব্যক্তিমনের গতি-প্রকৃতির উপর
অবশ্য এই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কথা
সাহিত্যিকের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য-নির্ণায়ক
এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যখন তিনি গল্প উপন্যাসের কাহিনী বা চা
বিন্যাস করেন, তখন অবশ্যই সামাজিক বিধি-বিধানের উপর আঘাতে
প্রশ্ন এবং এই আঘাতকারীকে শাস্তিদানের প্রশ্ন তাহার সম্মুখে উপস্থি
থাকে। কিন্তু এইভাবে সামাজিক প্রশ্নে জড়াইয়া গেলেও প্রধান
কাহিনী বা প্লট ও চরিত্র লইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হয় বলি
সামাজিক বিধি অনুস্মৃতি বা অস্বীকৃতির নিরিখে চরিত্রকে রূপায়ি
করিবার প্রশ্ন তাঁহার কাছে তত গুরুতর নয়। বাস্তব কার্যকার
সম্পর্ক থাকিলে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ চরিত্রের পক্ষে অসম্ভব ন
কিন্তু কথাসাহিত্যিক দেখিবেন সেই অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের সংশ্লে
সংশ্লিষ্ট চরিত্রের পক্ষে কতটা স্বাভাবিক হইয়াছে। যে পারিপার্শ্বিকে
মধ্যে মানুষ বাঁচে এবং যে চিন্তাধারার দ্বারা তাহার মন তরঙ্গি
ও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই পারিপার্শ্বিক বা চিন্তার ছাপ তাঁহা
সাহিত্যকৃতিতে পড়া অস্বাভাবিক নয়। আগেকার দিনে স্থূল কতকগুলি
ধারণা লইয়া লেখক কাহিনী লিখিতেন বলিয়া পূর্ব হইতে পরিণতি
স্থিরীকৃত হইয়া যাইত এবং সেই পরিণতির হিসাব রাখিয়াই চরি
সৃষ্টি বা চরিত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হইত। এই ছকে বাঁধা চরিত্র
গুলিতে লেখকের সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির (যদিও অস্বীকৃতি প্রায়
দেখা যাইত না) পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত। পৃথিবী
সর্বত্রই এইভাবে কথাসাহিত্যের পত্তন হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভা
পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যেরও এই অবস্থা ছিল। মানুষের জীবন
বিচিত্র, মনের সমুদ্রে যে নানারঙের ভাব-তরঙ্গের খেলা চলে, পরিবেশ
আবহাওয়া বা সংস্কার চরিত্রের উপর অপরিহার্য প্রভাব বিস্তার করি
চিন্তা এবং কর্মের অপ্রত্যাশিত সব বিচিত্রতার সৃষ্টি করে, এক

বঙ্কিমের সময় হইতেই বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হইতেছে। বিশৃঙ্খলার যুগে সমাজরক্ষার দায়িত্ব, নিজের সরকারী চাকুরী প্রভৃতি নানা অসুবিধার জন্য বঙ্কিম তাঁহার মৌল প্রতিভার পূর্ণ স্বাক্ষর তাঁহার লেখায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু গল্প-সর্বস্ব বাংলা সাহিত্যের আসরে কাহিনী বা প্লট সাজাইয়া বঙ্কিম ইহাতে জটিল মানব চরিত্রের স্থান করিয়া দিয়াছেন। জটিল চরিত্রে জটিল মনের ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ বা ইঙ্গিত থাকে। মনের জটিল ক্রিয়া অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লীলা সংঘর্ষের জন্য হয়। সমাজ সম্পর্কে মানুষের চেতনা উভয় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল হইতে পারে, অর্থাৎ, সমাজ মানুষের চলার পথে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া তাহার পথচলা কঠিন করিয়া তুলিতে পারে অথবা অভ্যন্ত মনের গতিকে বিশৃঙ্খল করিয়া অভাবিত মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে। ব্যক্তি-চরিত্র এইভাবে সামাজিক আবহাওয়ায় গঠিত ও চালিত হয়। যে লেখক এই ব্যক্তি-চরিত্রের স্রষ্টা, তাঁহার নিজের প্রত্যয় এরূপ চরিত্র গঠনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। লেখকের যদি সমাজের স্থিতিশীল রূপে বিশ্বাস থাকে, তিনি প্রায়ই এমন মূল চরিত্র সৃষ্টি করেন যাহা পুরাপুরি সামাজিক, সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধে লেখকের আস্থা এই সামাজিক চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং তাহার সাহায্যে উপন্যাসের ফলশ্রুতিও সমাজের হিসাবে রক্ষণশীল হয়। কিন্তু যাঁহারা পরিবর্তনশীল যুগ-চাঞ্চল্যে নিজেরা চঞ্চল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজের প্রচলিত বিধি-বিধানের ত্রুটি সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তিত, তাঁহাদের লেখায় সেই মানস-চাঞ্চল্যের ছাপ পড়ে, তাঁহাদের সৃষ্ট অনেক চরিত্রে বিশেষতঃ মূল বা প্রধান চরিত্রে এই চঞ্চল মনের সাক্ষাৎ মিলে। বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিক কালে বিচিত্র-মন চরিত্রসমূহ সৃষ্টির যে প্রবণতা দেখা যাইতেছে, ইহার পিছনে তরঙ্গিত যুগ-মানসের প্রভাব আছে। তবু এ যুগেও আস্তিক্য-প্রত্যয়ী স্থিতিবাদী শাস্ত্রসাশ্রিত শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব যে অসম্ভব নয়, বাংলাসাহিত্যে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের বিপরীতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিলে এ ধারণা স্পষ্ট হইবে। আধুনিক কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ধরণের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়, দুজনের মধ্যেই সংঘর্ষ-মুখর যুগ-চেতনার স্পর্শ দেখা যায়, দুজনেই মানুষের

জীবনে অর্থনীতির ও রাজনীতির চাপে পরিবর্তিত সামাজিক রূপ সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তবু একথা ঠিক যে 'আরোগ্য নিকেতন'-এর লেখকের রচনায় সে আস্তিক্যবাদী আশ্বাস আছে, 'বি. টি. রোডের ধারে'র লেখকের মধ্যে সে আশ্বাস নাই। অবশ্য আপন কালের বিশৃঙ্খলায় অধিকতর আতঙ্কিত হইয়া ভাঙনধর্মী, নৈরাশ্যবাদী, কঠিন বস্তুগত রূপপ্রধান এক ধরণের লেখার উৎসাহ আজকাল পৃথিবীর নানাদেশে দেখা যাইতেছে, কিন্তু বিশৃঙ্খলার স্বীকৃতি দিয়াও শৃঙ্খলার জন্য অনুসন্ধিৎসা, দুঃখের মধ্যেও আশা ও আশ্বাসের অবতারণা, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের অস্তিত্ব অনুভূতি এ যুগেও অনেক লেখকের লেখার মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ যুগের বিশৃঙ্খলা এবং হতাশা, অবক্ষয় এবং ক্লান্তি আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সি' উপন্যাসে রাখা হইয়াছে, কিন্তু এই গ্লানিমার উর্ধ্বে মানব-জীবনের অম্লান মহিমাও তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই লেখকদের বক্তব্য, আমাদের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,—'জীবনের পরাজয় নাই।'

শরৎচন্দ্রও জীবনের এই অপরাজিত মহিমার আশ্বাস দিয়াছেন, যদিও সামাজিক গ্লানি ও বিশৃঙ্খলার চিত্র তিনি স্পষ্ট করিয়াই আঁকিয়াছেন।

সমাজ যখন স্থিতিবান রূপ হারাইতে সুরু করে, মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা যখন চারিদিকের বিচিত্র ধাক্কায় শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়ে, পরিচিত মূল্যবোধে সন্দেহ যখন দানা বাঁধে, সেই অবস্থায় একশ্রেণীর শক্তিশালী সাহিত্যিক চেষ্টা করেন জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনমুখী ছবি আঁকিয়াও অভ্যস্ত সামাজিক মূল্যবোধকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া রাখিতে। তাঁহারা আশাবাদী, তাঁহাদের সাহিত্যে আশ্বাস থাকে মানুষকে আপন অন্তরালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সঞ্চরমাণ অজ্ঞানতা, জড়তা ও হীনতা দূরীকরণে সক্রিয় হইবার আহ্বান থাকে। যাহা সত্য ও সুন্দর তাহা শুধু পুরাতন বলিয়াই বাতিল হইতে পারে না, ইহাও তাঁহাদের প্রত্যয়। আর একশ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা জগতের সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়াই জীবনের ক্রমবর্ধমান রুক্ষতা জটিলতাকে চোখ বুজিয়া অস্বীকার করেন। এই লেখকদের পাইয়া সমস্যাক্লিষ্ট পাঠক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের বাস্তবসমস্যা হইতে

পলায়নপরতা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর লেখকরা সমাজের অবক্ষয়, হতাশা ও পঙ্কিলতাই আঁকেন, সত্যসুন্দরের আরতি ইঁহাদের কাছে কল্পনাবিলাস, নৈরাশ্য তাঁহাদের লেখায় প্রতিধ্বনিত। শরৎচন্দ্রকে এ হিসাবে প্রথম শ্রেণীভুক্ত বলা চলে, যদিও আশা বা আশ্বাস তাঁহার লেখায় বাহ্যত প্রায়ই স্পষ্ট নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটামুটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা যাইতে পারে।

শরৎচন্দ্র সমাজের সমস্যাসমূহ বাস্তবদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং কাহিনীর মধ্যে সেগুলি প্রতিফলিত করিয়া তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ করিতে স্বভাবতই সমকালীন কঠিন ও জটিল সমস্যাসঙ্কুলতার পটভূমিকায় তাঁহার চরিত্রগুলিতে জটিলতা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র শুধু সামাজিক সমস্যাগুলির আত্যন্তিকতা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই সঙ্গে তিনি ইহাদের জন্য মানুষের কি দুর্গতি ঘটে এবং অসহায়ভাবে সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করিয়া মানুষ কিভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও দেখাইয়াছেন। শরৎসাহিত্যে উপরোক্ত প্রথমশ্রেণীর আশ্বান কম বলিয়া সমস্যাগুলি প্রায়ই শেষপর্যন্ত সমস্যাই থাকিয়া গিয়া পাঠককে আতঙ্কিত করিয়া রাখে। এই দিক দিয়া শরৎসাহিত্য নিষ্ঠুর, তাহার চিত্রগুলির অধিকাংশই সমস্যার চাপে ব্যথিত মানবাত্মার দীর্ঘশ্বাস। অবশ্য শরৎচন্দ্র সমস্যার ছবি আঁকিয়াই প্রায়ক্ষেত্রে থামিয়া গিয়াছেন, সমস্যার সমাধান করিতে বড একটা চেষ্টা করেন নাই। হয় তিনি এদিকে হদিশ পান নাই অথবা কথা-সাহিত্যিক হিসাবে জীবনে বাস্তবরূপ উদ্ঘাটনই শুধু তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি হয়তো ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমস্যা সমাধানের তাত্ত্বিক প্রয়াস তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব সত্ত্বেও শুভান্তক সমাধানের দিকে ঝুঁকিয়াছেন, এসব ক্ষেত্রে তাঁহার রচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, পাঠক পড়িয়া খুশী হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণে অনেকসময় তাঁহার সমস্যার সমাধান জোড়াতালি বলিয়া মনে হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দত্তা'র বিজয়ার মনে ব্রাহ্মসংস্কারের বিলোপের পূর্বেই তাহার প্রেমানুভূতির উপর জোর দিয়া হিন্দুমতে তাহার বিবাহ দেওয়া, 'স্বামী' ও

'বিরাজবৌ' উপন্যাসে গৃহত্যাগিনী স্ত্রীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন, 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে রাখালকে জেলে পুরিয়াই 'সরযূ'র মাতৃকলঙ্ক সমস্যার সমাধান, 'দেনা-পাওনা'য় ষোড়শীর জীবানন্দকে সরাইয়া লইয়া যাইয়াই 'কে' সাহেবের ক্রোধ হইতে জীবানন্দকে রক্ষায় স্বস্তিভাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে যে সব গ্রন্থে সমস্যা সামাজিক ততটা নয় যতটা ব্যক্তিগত, সেখানে মিলনান্তক পরিণতির স্নিগ্ধ রূপ সৃষ্টি পাঠকমন হরণ করিয়া লয়। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'নিষ্কৃতি', 'ছবি', 'পরিণীতা', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'দর্পচূর্ণ', 'নববিধান', প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস এই শ্রেণীর। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে অতুল চরিত্রে, 'পরেশ' গল্পে পরেশ চরিত্রে বা 'হরিলক্ষ্মী' গল্পে হরিলক্ষ্মীর চরিত্রে যে হীনতা সঞ্চারিত হইয়াছিল, কাহিনীর শেষে তাহা বিদূরিত হওয়ায় পাঠক গভীর তৃপ্তি বোধ করে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক জীবনে সবকিছু হারাইবার বেদনার অভিজ্ঞতার পর জ্ঞানদা, গুরুচরণ বা কমলা সমাপ্তিতে তবু যেটুকু আশ্রয় পাইয়াছে, তাহা অবশ্যই অনেকখানি শান্তিবহ। 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'বিলাসী' প্রভৃতি রচনায় শরৎচন্দ্র নির্মমভাবেই সমাজের দৈন্য আঁকিয়াছেন। সমাজের হীনতা, ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সীমাবদ্ধ সঙ্গতির জন্য শক্তিমান সমাজের পীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ, এইসব রূঢ়-বাস্তব ছবি পাঠককে বেদনাতুর না করিয়া পারে না।' 'অরক্ষণীয়া'য় রূপহীনা দরিদ্র অনূঢ়া জ্ঞানদার দুঃখ লাঞ্ছনা, বিশেষ করিয়া তাহার বিবাহের দায়ে অস্থির তাহার নিজের মায়ের যে কোন ভাবে তাহার বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা, 'হরিলক্ষ্মী'তে কমলার স্বামী বিপিনের শক্তিমান প্রতিবেশীর অন্যায় মামলার দায়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ও শেষপর্যন্ত মৃত্যু, 'মহেশ'-এ মহেশের অপঘাত মৃত্যুর পর আমিনার হাত ধরিয়া চাষী গফুরের চিরকালের অনভীপ্সিত ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করিতে যাওয়া, 'দেবদাস'-এ পার্বতীর বাড়ীর সামনে রাস্তায় অজ্ঞাত পথিকরূপে তালসোনাপুরের জমিদার-সন্তান দেবদাসের অসহায় মৃত্যুবরণ, 'আঁধারে আলো'তে সত্যেন্দ্রের ছবিখানি মাত্র বুকে লইয়া সত্যেন্দ্রের উৎসবালোকিত গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে বিজলীর রাতের অন্ধকারে নরকাবাসে প্রত্যাবর্তন; 'বামুনের মেয়ে'তে পিতা প্রিয় মুখুজ্যের হাত ধরিয়া সর্বহারা অশ্রুমুখী সন্ধ্যার বৃন্দাবনের

পথে যাত্রা, 'গৃহদাহ'-এ সুরেশের স্মৃতির দাহ বুকে লইয়া কাহিনীর সমাপ্তিতে মহিমের আশায় অচলার দিন গোনার পালা, এইসব বেদনার্ত ছবি শরৎচন্দ্র জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। 'বড়দিদি'তে সামাজিক সমস্যার অঙ্কুর ছিল, কিন্তু আপনভোলা সুরেন্দ্রনাথের জন্য বিধবা মাধবীর দরদ মাঝপথে আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে। পিতৃবিয়োগান্তে ভাইয়ের সংসারে মাধবীর অসুবিধা এবং শ্বশুরবাড়িতে জমিদারের শোষণের বেদনাও তাহার চরিত্রকে নায়িকা চরিত্রের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা দিতে পারে নাই। এইজন্যই গ্রন্থশেষে সুরেন্দ্রনাথকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাইয়া মাধবী তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দৃশ্য যতখানি করুণ বা Pathetic, ততখানি ট্র্যাজেডির জ্যোতি ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। 'শ্রীকান্ত' দীর্ঘায়তন উপন্যাস, ইহার চারিটি খণ্ডে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর চরিত্র কেন্দ্র করিয়া সামাজিক সমস্যার ছাপ আছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যায় বাস্তব রূঢ় আঘাতের চেয়ে এই চরিত্র দুইটির বারবার কাছে আসার ও দূরে সরিয়া যাইবার ছবিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিজেদের সংস্কার, বাহিরের সামাজিক প্রভাব যেখানে প্রত্যক্ষভাবে কম কার্যকরী হইয়াছে। 'দেনা-পাওনার' ষোড়শী-জীবানন্দের কথাও এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকারা সামাজিক বন্ধনের হিসাবে অনেকটা স্বাধীন, শ্রীকান্ত বা জীবানন্দ এবং রাজলক্ষ্মী বা ষোড়শী কাহারও মাথার উপর অভিভাবক নাই, নিয়ন্ত্রণকারী পরিজন বা সুহৃদ নাই, এককথায় তাহারা যদি নিজেদের কেন্দ্র করিয়া অসামাজিক কিছু করে তাহা হইলে তাহাদের বাধা দিবার সুযোগ সমাজের খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াও স্বাভাবিক ভাবে মিলিতে পারিল না। সমাজ এই মিলনে কিরূপ আপত্তি করিত, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ ইহাদের ক্ষেত্রে সমাজ এত বিচ্ছিন্ন যে, সমাজ উৎসাহ করিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাধা দিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সামাজিক চেতনাই এই অসামাজিক ভালবাসার ক্ষেত্র দুইটিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।*

* বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের একটি উক্তি শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের সমর্থন করে,—"সমাজ ও রুচিতে আঘাত দিলে সাহিত্য হতে পারে—একথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিয়েই সাহিত্য হয় না—একথা ততোধিক সত্য।"—(আত্মস্মৃতি, ১৩৬১, পৃষ্ঠা—২৭৩)

প্রকৃতপক্ষে রাজলক্ষ্মীর বা ষোড়শীর ভালবাসা যে স্বাভাবিক মিলনে সার্থক হইতে পারিল না, তজ্জন্য ইহাদের, তথা লেখকের সমাজসংস্কারই বেশী দায়ী। ইহাদের মন বলিয়াছে এইরূপ মিলন শুভ নয়, সমাজকে এভাবে অবজ্ঞা করিয়া, বহু প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি অস্বীকার করিয়া এইরূপ ব্যক্তিগত তৃপ্তিমূলক মিলন কল্যাণবহ হইতে পারে না। তাহারা আপন মনের নিষেধেই বাহিরের সামাজিক বিধিনিষেধ না মানিবার আপেক্ষিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষিত মিলনের সুযোগ বৃথা যাইতে দিল।

অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ও পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যবৃত্ত, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর বীক্ষণশক্তি তাঁহার ছিল বলিয়া বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। নানা দিক হইতে সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তমূলক মনোভাব তিনি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবশ্য শিল্পকলার দিক হইতে রচনায় সমস্যার সমাধান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা তিনি উচিত বলিয়া মনে করেন নাই। এই কারণে তাঁহার লেখায় বিষয়বস্তুর বা সমস্যার বিশ্লেষণ থাকে এবং সে সম্বন্ধে শিল্পীর ভাবদৃষ্টির ছাপ থাকে, যদিও সরাসরি সমাধানের প্রয়াস প্রায়ই থাকে না। এজন্য যে মানসিক শক্তি দরকার তদুপযোগী কিছু কিছু পড়াশুনাও শরৎচন্দ্র করিয়াছিলেন। এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়াই তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজের লেখায় এবং তাঁহার সম্পর্কে অন্যলোকের লেখায় শরৎচন্দ্রের বহু বিষয়ে পড়াশুনার আগ্রহের খবর মিলে। উপন্যাসক্ষেত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই ব্রহ্মদেশের প্রবাস-জীবনে শরৎচন্দ্র অনেক বিষয় পড়িয়া ও চর্চা করিয়া কিছুটা মন তৈয়ারী করিয়া লইয়াছিলেন।* এই মানস গঠনের প্রস্তুতি

*রেঙ্গুনের ডি এ জি অফিসের কর্মচারী শরৎচন্দ্র ২২।৩।১৯১২ তারিখে মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি চিঠিতে লেখেন, "গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।" শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী; ১৩৫৪, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪।৯।১৯১৩ তারিখে 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে শরৎচন্দ্র একটি

তে ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধারূপে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ বিধি-বিধানগুলির কবল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহী হইতে চাহেন নাই, তাঁহার আশঙ্কা ছিল হঠাৎ এইরূপ সামাজিক বিধি ভাঙিবার অত্যুৎসাহ দেখাইলে তাহা সমাজ ভাঙিবার অপচেষ্টায় পরিণত হইতে পারে। রাজনীতি বা সমাজনীতির দিক হইতে শরৎচন্দ্রকে সনাতনপন্থী বলা চলে না, কিন্তু যুক্তিবাদের চাপে তিনি পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করার জন্যও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। বরং অভ্যস্ত পুরাতন প্রচলিত বিধিব্যবস্থার জন্য তাঁহার একধরণের দরদ ছিল এবং তিনি বুদ্ধিবিবেচনা দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন সেই সব পুরাতন ব্যবস্থায় ত্রুটি কোথায় কি ভাবে আছে। অবশ্য ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি যখনই নিঃসংশয় হইতেন তখনই আবেগের সঙ্গে ত্রুটির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র জীবনের জটিলতা ও সমাজের অসাম্য সম্পর্কে সচেতন হইয়াও শুধু বস্তুলীন আর্তির মধ্যে ডুবিয়া না গিয়া সেগুলির হৃদয়সংবেদী ভাবমূল্যের দিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন, ফলে এই সহানুভূতি তাঁহার রচনাকে নিষ্ঠুরতা, কাঠিন্য ও জড়তা হইতে অনেক সময় রক্ষা করিয়াছে। প্রজা-জমিদারের স্বার্থপরতন্ত্র সমস্যাকে তিনি তাই পূর্বসিদ্ধান্তমূলক তির্যক দৃষ্টিতে না দেখিয়া খোলা-চোখে দেখিয়াছেন, এজন্যই শরৎচন্দ্রের রচনায় এই ব্যবস্থার ত্রুটি ও গ্লানি সত্ত্বেও প্রজা-জমিদারের মানবিক সম্পর্কে মূল্যবোধের দিক হইতে অন্তরের স্বীকৃতি ঘটিয়াছে। এইভাবে হৃদয়মূল্য স্বীকৃতিতে সমস্যার কেন্দ্রিকতা লঘু হইয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, কিন্তু মানবতাবোধী শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়মূল্য অস্বীকার করিয়া লেখনী চালনায় প্রস্তুত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক আশাবাদ শরৎচন্দ্রের ছিল না একথা সত্য, বরং তিনি সমস্যা লইয়া লিখিতেন বলিয়া প্রায়ই সমস্যার জটিলতায় প্রবেশ করিয়া সে সম্বন্ধে একটা উত্তেজনাকর ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন, কিন্তু তবুও অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি, মিথ্যাচারের

লেখেন,—"আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।" শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী—১৩৫৪, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের স্ফুরতা তাঁহার রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে ছড়ানো হইলেও সেই প্রবণতাই তাঁহার অন্তরের একান্ত আশ্রয় ছিল না, সুযোগ সুবিধা মিলিলেই বা পরিস্থিতি অনুকূল হইলেই তিনি সহস্র দুঃখের মধ্যে যে রঙ ও রস মানুষের সান্ত্বনা ও আনন্দ তাহার অবতারণা করিতেন। তাঁহার এই দ্বিমুখী প্রচেষ্টার সার্থক নিদর্শন পল্লীসমাজ উপন্যাস, যেখানে তিনি সামাজিক সমস্যার দৈন্য ও কুশ্রীতা এবং প্রেমরূপের লাবণ্য পাশাপাশি কৃতিত্বের সহিত তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যিক এবং উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যিকের মৌল প্রতিভার হিসাবে পর্যবেক্ষণশক্তি, বিষয়বস্তুর সমন্বয়সাধন ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন, কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপে শক্তির পরিচয়দান ছাড়াও আপন হৃদয়ের প্রত্যয় ও ভাবাদর্শকে রচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরা, সাহসের সহিত জটিল, কঠিন ও প্রচলিত ব্যবস্থার অনাস্থাসূচক সমস্যার অবতারণা প্রভৃতি শরৎসাহিত্যে দেখা যায়। এইসঙ্গে লেখকের অফুরন্ত মানবপ্রীতি মিশিয়াছে। শরৎচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল শ্রেণীর মানুষের ভাল লাগিয়াছে, ইহা তাঁহার বিস্ময়কর কৃতিত্ব। অবশ্য সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার যে ক্ষমতা বড বড ঔপন্যাসিকদের থাকে, শরৎচন্দ্রের সেদিক হইতে একটু দুর্বলতা ছিল, কিন্তু সমাজের প্রদাহী সমস্যাবলীর প্রতি মানবপ্রেমিকের উদার দৃষ্টি লইয়া তিনি আলোকপাতের চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমস্যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের সমস্যা, বিশেষ করিয়া শক্তিমান অন্যায়কারীর পেষণে নিপীড়িত দুর্বলের যে সমস্যা সেই সমস্যা অবতারণায় শরৎচন্দ্রের অধিক উৎসাহ ছিল।* ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বনামধন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নানা বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। ডিকেন্সের মতই তিনি ভাবপ্রবণ, সমাজসমস্যা সম্পর্কে

* সমালোচক উইলিয়াম হেনরি হাডসন ভাল উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশে বলিয়াছেন: "A novel is really great only when it lays its foundation broad and deep on the things which most constantly and seriously appeal to us in the struggles and fortunes of our common community." (*An Introduction to the Study of Literature*, 2nd Edition, page 173.)

সচেতন, মানুষের দুঃখবেদনায় অশ্রুসজল। ডিকেন্সের মতই তাঁহার আবেদন রস-প্রধান। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনরূপ প্রত্যক্ষ হয়,—শান্ত, ধর্মমুখী, পারিবারিক, স্নেহপ্রীতিমুখর সাধারণ জীবনরূপ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৪ সালের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ পল্লীবাংলার বাঙ্গালীর জীবনের বহিরঙ্গ কাঠামোটি অত্যন্ত যত্নের সহিত আঁকিয়াছেন এবং এ হিসাবে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি।* খুব কঠিন অথচ সাধারণ জীবনের সহিত তেমন সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ সমস্যা শরৎচন্দ্র প্রায়ই এড়াইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধি দিয়া, চিন্তা দিয়া, সমস্যার গভীরে ঢুকিয়া, তাহার বস্তুতান্ত্রিক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যা সমাধানের প্রয়াস তিনি করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য সহানুভূতির সঙ্গে তিনি জটিল সব সমস্যার সাধারণের অনুভূতিবেদ্য রূপ দিয়াছেন। মানুষের মনুষ্যত্ব বা মানবিক গুণাবলী যেসব সমস্যার চাপে স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না, যেসব সমস্যা সম্ভাবনাপূর্ণ মানবদেহে কর্কট রোগের মত অবস্থান করিয়া সমাজের অগ্রগতি প্রতিহত করিতেছে, সেগুলি যে ভয়ঙ্কর এবং সেগুলির প্রতি মনঃ-সংযোগ যে

---

*এই 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধেই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎসাহিত্যের আলোচনায় বলিয়াছেন; "তাঁহার বৈপ্লবিক চরিত্রগুলিও, এমন কি সর্ব-আদর্শ বর্জনকারিণী কমল পর্যন্ত কথায় বার্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে বাঙ্গালী-সুলভ ভাব-প্রবণতা ও আন্তর সৌকুমার্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার লৌহমানব সব্য-সাচীর অন্তরেও স্নেহভালবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত—মনে হয় যেন তাঁহার মারণাস্ত্রের বিস্ফোরণ শক্তি ভাবাবেগের গোলাপজলে সিঞ্চিত। তাঁহার নাস্তিক প্রবৃত্তিসর্বস্ব কিরণময়ীতেও মনীষার অপরূপ দ্যুতির ফাঁকে ফাঁকে বাঙালী মেয়ের কোমল রমণীয়তা, গার্হস্থ্যধর্ম ও আচারের কমনীয় প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু ইহারা বাঙালী জীবনে অপেক্ষাকৃত সুলভ বলিয়াই ইহাদের মনোভঙ্গীর নূতন ছন্দটি, জীবন-রস-পিপাসায় নূতন আগ্রহটি আরও সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।…শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে বাঙালী রাখিয়াই তাহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার সুসঙ্গত প্রবর্তন করিয়াছেন—আধুনিক জীবনের সমস্যাকীর্ণ পথে তাহাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের ছাড়পত্র দিয়াছেন।"

অত্যাবশ্যক, শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িলে পাঠক-পাঠিকার মনে একথা জাগিবেই। স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আধুনিক মানব সভ্যতার উন্নতি-অবনতি কতখানি জড়াইয়া আছে ইহা হয়তো শরৎচন্দ্রের রচনা পড়িলে ভাল বুঝা যায় না, কিন্তু তাহা পাঠে একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে মানবসমাজের প্রায় অর্ধাংশের হৃদয়মূল্য-উপেক্ষা, তাহাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাহাদের সম্যক উপলব্ধিকে অবহেলা সভ্যতার বিকাশ প্রতিহত না করিয়া পারে না। এইজন্যই শরৎচন্দ্র ১৩২০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় "অনিলা দেবী" ছদ্মনামে অনেক পড়াশুনা করিয়া ধারাবাহিক ভাবে সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারণাত্মক "নারীর মূল্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। সমাজ সমস্যার এইরূপ বিষয়বস্তুকে তিনি এত গুরুত্ব দিয়াছিলেন যে, অনুরূপ সমাজ সমস্যা লইয়া তিনি বারোটি প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এসম্পর্কে রেঙ্গুন হইতে ৪।৪।১৯১৩ তারিখে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন; "আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি, ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব যথা—(১) নারীর মূল্য (২) ধর্মের মূল্য (৩) ঈশ্বরের মূল্য (৪) নেশার মূল্য (৫) মিথ্যার মূল্য (৬) আত্মার মূল্য (৭) পুরুষের মূল্য (৮) সাহিত্যের মূল্য (৯) সমাজের মূল্য (১০) অধর্মের মূল্য (১১)··· (১২)···

বোধকরি বছর দুই লাগবে শেষ করতে। মত কি? ভাল হবে? দ্বাদশ মূল্য নাম দেব মনে করছি।"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, ১৩৭০, পৃষ্ঠা ১৯৭ হইতে উদ্ধৃত।)

যে জমিদারী বা ভূম্যধিকার ব্যবস্থার উপর মূলত শরৎচন্দ্র তাঁহার কথা-সাহিত্যের পটভূমি রচনা করিয়াছেন, তাহার সহজাত সমস্যাগুলি অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির দিক হইতে হয়তো তিনি তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই ব্যবস্থার মূল্য অতীতে যাহাই থাকুক, পরিবর্তিত পটভূমিকায় ভূমধ্যকারীদের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার নিরিখে পরের শ্রমের উপর ও অনুপার্জিত মুনাফার উপর মূলত নির্ভরশীল এই জমিদার সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন যে দেখা দিয়াছে, একথা শরৎসাহিত্যের পাঠকদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শরৎচন্দ্র 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাসী

হইয়া লেখনী চালনা করেন নাই, যে হিতবাদী সাহিত্যধর্মের স্বাক্ষর বাংলা-সাহিত্যে টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ রাখিয়াছেন, মোটামুটি সেই পথেই শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের পদচারণা। বহু বিচিত্র আধুনিক সমস্যা লইয়া রচনার সাফল্যে নাট্যকার বার্ণার্ড শ'র সহিত শরৎচন্দ্রের তুলনাই হয় না, কিন্তু বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল এই যে, উভয়েই সমস্যার উপর লিখিতে আগ্রহী ছিলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন হইতে ১২।৫।১৯১৩ তারিখে লেখা এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র, যাঁহারা তাঁহার চরিত্রহীনের নিন্দা করিয়াছিলেন তাঁহারা এই উপন্যাসের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলেন না কেন এই অভিযোগ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "চরিত্রহীন ফিরিয়া (Registry) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি Tolstoy'র 'Resurrection' (the greatest book) পড়িয়ো। ক্ষতস্থান মাত্রেই যে দেখাতে নাই জানি না।...সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। Austen, Mary Corelli প্রভৃতি এবং Sara Grend সমাজের অনেক ক্ষতস্থান উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।"—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২ হইতে উদ্ধৃত।) শরৎচন্দ্র উত্তরকালে 'শেষপ্রশ্ন'-এর মত সমস্যা-কণ্টকিত উপন্যাস লিখিয়াছেন। এই উপন্যাসের যে পটভূমি তাহার অভিজ্ঞতা হয়তো শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল না, ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে সমস্যা তাহার জটিলতা হয়তো শরৎচন্দ্রের পক্ষে দুর্ভর ছিল। এই সমস্যাকীর্ণ উপন্যাস লিখিবার প্রস্তুতি শরৎচন্দ্রের ভাল ছিল না একথা স্বীকার করিলেও শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে অবশ্যই ছোট করা হয় না। কিন্তু তবু সমস্যা লইয়া লিখিবার প্রয়োজন তিনি শুধু হৃদয়ে নয়, সাহিত্যকর্মে স্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই বিচিত্র উপন্যাসের সৃষ্টি। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের প্রতিভার ও লিপিকুশলতার একজন ভক্ত, কিন্তু শেষজীবনের লেখায় সঙ্গতি-অতিরিক্ত পরিক্রমায় শরৎচন্দ্র যে বিপজ্জনক পথ ধরিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি শরৎচন্দ্রের নিন্দা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সমস্যার উপর লেখার প্রবণতা যে তাঁহার প্রতিভার বা সুনামের হানি ঘটাইয়াছে, ইহাই এই মন্তব্যের মূলকথা। অন্নদাশঙ্করের মন্তব্যটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা অতিভাষণের দোষদুষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু রূঢ়তা বাদ দিয়া মূল ইঙ্গিত

ধরিলে এই মন্তব্যের মূল্যও বুঝা যাইবে। অন্নদাশঙ্কর বলিয়াছেন,—"আইডিয়ার দিকেই মানুষ ঝুঁকছে। সোস্যালিজম্ প্রভৃতি আইডিয়াগুলি ক্রমে কথাসাহিত্যেও প্রবেশ করছে। শরৎচন্দ্রও শেষবয়সে আইডিয়ার দাবী মেনেছিলেন। কিন্তু মানা যথেষ্ট নয়, জানা আবশ্যক। ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে নতুন ধরণের উপন্যাস লিখলে তা কেউ নেবে কেন? শরৎচন্দ্রের বিবরণী শক্তি ও বেদনাবোধের সঙ্গে তৃতীয় কোন গুণের সমাহার ঘটেনি, তাই ভাবজিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার তৃপ্তি হয় না তাঁর শেষ জীবনের লেখা পড়ে।"—('প্রবন্ধ'—শরৎচন্দ্র ; 'বিনুর য়্যাডভেঞ্চার'।)

কল্লোলযুগের তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেই শিল্পকর্মে কৃতী ছিলেন, কিন্তু জীবনবোধে অবিন্যস্ত ভাব থাকায় তাঁহাদের সেই শিল্পকর্ম সার্থক বিষয়বস্তুর আশ্রয় পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের ক্ষমতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের লেখায় রূঢ়ভাবে প্রকাশমান 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম'কে সাহিত্যের সামগ্রী হিসাবে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা উচিত যে, শ্রমজীবী সহ এই দরিদ্রদের শোষিত জীবনরূপ প্রকাশের এবং মানুষের অন্তরঙ্গ বাসনা-কামনার অঙ্গাঙ্গী যৌন প্রবৃত্তি মানুষের জীবনায়নে রূপায়ণের আকাঙ্ক্ষা আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্মুখে সাহিত্যকৃতির এক বৃহৎ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতই কল্লোলগোষ্ঠীর যৌন-সাহিত্য-প্রীতির বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের শোষিত রূপ অঙ্কনে তাঁহার অনুরাগ ও আবেগে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার কিছুটা আত্মিক মিল দেখা যায়। জীবন-শিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্র মানব মনের বাসনা-কামনা ও যৌন তৃপ্তি বুঝিতেন না বা ইহাদের বাস্তবতা স্বীকার করিতেন না এমন নয়, কিন্তু লালসার অসংযত রূপ প্রকাশে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। অনুজ-প্রতিম সাহিত্যিকদের সৃষ্ট দেহবাদী গল্পে যে প্রতিভাদৃপ্ত উজ্জ্বলতা, তাহা অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এই পথে পদচারণার মোহ তিনি অনুভব করেন নাই। অথচ এই ধরণের লেখা লিখিতে যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন হয়, শরৎচন্দ্রের তাহার অভাব ছিল না।*

* 'শেষ প্রশ্ন' রচনার পর সামতাবেড়ে, পাণিত্রাস হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ তারিখে শরৎচন্দ্র 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়কে একখানি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়া ইউরোপের দেশগুলিতে এবং সমগ্রভাবে সারা পৃথিবীতে সমাজ চিন্তার পুনর্মূল্যায়নের যে তাগিদ দেখা দেয়, অপেক্ষাকৃত সনাতনপন্থী ভারতীয় সমাজজীবনে তাহা যথেষ্ট না হইলেও কিছুটা সাড়া জাগাইয়াছিল। বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মনে এই পরিবর্তনের চাহিদা অধিকমাত্রায় দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গলার সমাজজীবনে ইহার কিছুটা প্রভাব পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। সেইসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রবাহ ও ঘটনার বৈচিত্র্য সমাজজীবনের এই আলোড়নমুখিতাকে আরও গতিশীল করে। যুদ্ধের পর ইংরেজের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আশা শূন্যে মিলাইল, ভারতবাসী পাইল রাউল্যাট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ঘোষণা অনুযায়ী দ্বৈতশাসনের ফাঁকিবাজিতে স্বায়ত্তশাসনের ছেলেখেলা। বিক্ষুব্ধ দেশ মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেলিত হইল। এই সময় সোভিয়েট রাশিয়া হইতে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ এদেশের তরুণ-মনে দরিদ্রের অসহায় অবস্থা এবং তাহাদের বাসনা-কামনার সম্ভাব্যরূপ সম্পর্কে সহানুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করিল। এইসঙ্গে শ্রমিকসঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চালু হইয়া শ্রমিকদের লোকচক্ষুর সম্মুখে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্টভাবে টানিয়া আনিল। ইহার বিপরীতে জমিদার-মহাজন-প্রভৃতি শোষণকারীদের কায়েমী স্বার্থের মুখোস খুলিয়া পড়িল। পরিণতবয়সী শরৎচন্দ্র এই যুগসন্ধিরও সাহিত্যিক। স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের চেতনায় মূল্যবোধের পুনর্নির্ধারণে আগ্রহ, গণতান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্টির উৎসাহ অনুভূত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক সাহিত্যে মানুষের সঙ্গে

পত্রে লেখেন যে, শেষপ্রশ্ন লেখার সময় "আরও একটা কথা মনে ছিলো। সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম, এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়তো পাবে যে নোঙরা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব, রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস সাহিত্যের একটা বড় কাজ।" (শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১৩৬১, পৃষ্ঠা ৩৭৭ হইতে উদ্ধৃত।)

মানুষের কৃত্রিম বিভেদ স্বীকৃত হয় না, ইহার ভিত্তি মানবতাবাদের উপর। মানবদরদী হিসাবে শরৎচন্দ্রও চাহিলেন মানুষের কৃত্রিম শ্রেণীগত অসাম্য ঘুচাইতে, সামাজিক কুসংস্কার, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি বিদূরিত করিতে। দরিদ্র ও শোষিতদের প্রতি মমত্ববোধে তাই তাঁহার রচনা যেমন উজ্জ্বল, সম্পদশালী ও সামাজিক সুবিধাভোগী জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণীর শোষকদের ও সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উপর তেমনি তাঁহার অনুরাগের অভাব দেখা গিয়াছে।* তাঁহার গ্রামকেন্দ্রিক চিত্রগুলিতে এই পক্ষপাতমূলক মনোভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ধনতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্যের জন্য সমাজজীবনে অসমতার সমস্যা তীব্র হইয়াছে, শরৎচন্দ্র সেখানে নিষ্ঠুরভাবে উপরের স্তরে যাহারা অধিষ্ঠিত এবং কায়েমী স্বার্থ কার্যকরী করিয়া যাহারা স্বভাবতই নিজেদের সুবিধা করিয়া লয়, তাহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। যেখানে পারিয়াছেন, তিনি এই সুবিধাবাদী তথাকথিত উপরের তলার লোকদের হীন কার্যকলাপ দেখাইয়া তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের এই কায়েমী-স্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে জমিদার ও ব্রাহ্মণ এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও তাঁহার রোষবহ্নি হইতে রেহাই পায় নাই।† 'মহেশ'

* ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬ তারিখে বাজে শিবপুর হইতে মহেন্দ্র নাথ করণকে লেখা একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্র সমাজে অন্যায় বর্ণভেদের গ্লানি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিয়া লেখেন,—"মহেন্দ্রবাবু, আমি কেবল দুইটি জাত মানি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই একটা সুনির্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের, মস্তিষ্কের।...এইগুলিই (শিক্ষা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনাবোধ, উদ্যম, আন্তরিকতা) বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে বাগ্দীই বা কি—এইগুলো না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনায় জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।"

† পল্লীসমাজ উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, হালদার মশায় প্রভৃতির সহযোগে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ডের ষড়যন্ত্র করে। এই মিলিত হীনাচারের বিপরীতে বিশ্বেশ্বরী চরিত্র শরৎচন্দ্রের মানবিক

'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্পে এবং 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। অবশ্য শরৎচন্দ্র মানবিক গুণের পূজারী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ বা জমিদারদের যেখানে সামাজিক বা মানবিক কর্তব্যপালনে উৎসাহিত করিয়া আঁকিয়াছেন বা যেখানে তাহাদের চরিত্র-গৌরব ফুটাইয়াছেন, সেখানে তাহাদের তাঁহার উল্লিখিত ক্রোধের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক যদুনাথ ও তাহার স্ত্রী সুনন্দার তো কথাই নাই, রাজলক্ষ্মীর নায়েব কাশীরাম ও তাহার স্ত্রী পরস্বাপহরণের দোষযুক্ত হইলেও অন্যান্য মহৎ হৃদয়বৃত্তির জন্য শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধদৃষ্টি লাভ করিয়াছে। 'কাশীনাথ' গল্পের 'কাশীনাথ' বা অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এর অমরনাথ শরৎচন্দ্রের বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া প্রধান চরিত্র। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের বিপ্রদাস বা 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের জীবানন্দও প্রথম দিকের তুলনায় শেষদিকে অনেক স্নিগ্ধ। প্রথম দিকে তাহাদের যে চরিত্র ফুটানো হইয়াছে, তাহা রূঢ়, দাম্ভিক ও স্বার্থপর। বিপ্রদাস তবু সংযত গৃহকর্তা, জীবানন্দ দুশ্চরিত্র ও মাতাল। কিন্তু উপন্যাস দুইখানির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহাদের হীনতা কমিয়া ক্রমেই মানবিক গুণ যত প্রকাশ পাইয়াছে, ততই উপন্যাসে ও পাঠক হৃদয়ে তাহাদের মর্যাদা বাড়িয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন'-এর

মহিমাবোধ এবং নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে উজ্জ্বল। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে গোলমাল পাকাইবার জন্য গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশ্বেশ্বরীকে দাঁড করাইয়া শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন সমাজে প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচারসমূহ অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখে টিকিতেই পারে না। সুকুমারীকে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইবার জন্য নিমন্ত্রিত বাহিরের লোকদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া কুলমহিলা বিশ্বেশ্বরী দৃঢ়কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন: "গাঙ্গুলী মশায়কে ভয় দেখাতে মানা ক'রে দে রমেশ। আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল যে, আমি সবাইকে আদর করে বাড়ীতে ডেকে এনেচি—সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্মের বাড়ীতে হাঁকা-হাঁকি চেঁচা-মেচি গালি-গালাজ করতে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধা হবে, তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।"

আশুবাবু ধনী ব্যক্তি, শুভদার জমিদার জমিদার ভগবান নন্দীও তাই, ইহাদের চরিত্র যেভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহাতে তাহারা মানবিক গুণসম্পন্ন সৎ ব্যক্তি, তাহাদের বিরুদ্ধে তাই শরৎচন্দ্রের অভিযোগ নাই। শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীও ধনী, তাহার বৃত্তি সমাজের দিক হইতে ভাল নয়, কিন্তু রাজলক্ষ্মী মানবিক গুণসমৃদ্ধা বলিয়া শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধিগত হীনবৃত্তির জন্য তাহার বিশেষ বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বরং মানবিক গুণাবলীর জন্য তাহার চরিত্র মাধুর্য প্রকাশের সঙ্গে তাহাকে ভালভাবেই ফুটাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সুরেশের কথাও উল্লেখ করা যায়। সুরেশ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মিশ্রিত মনোভাব। তাহার মানবিক গুণগুলি এবং সেই গুণের বাস্তব ব্যবহারের সহায়করূপে অর্থস্বাচ্ছল্য যেমন দেখানো হইয়াছে, আবার অচলাকে লইয়া পলায়নের পর এই অর্থস্বাচ্ছল্যের উপর নির্ভর করিয়াই সুরেশ অবস্থা আয়ত্তে আনিতে চাহিয়াছে। দুই বিপরীত প্রান্তিক কার্যকরিতার জন্যই বোধহয় সুরেশকে তাহার অর্থস্বাচ্ছল্যের সহিত এক করিয়া আঁকা হইলেও তাহার চরিত্রের পরিণতির রূপায়ণে এই আর্থিক দিকটিকে শরৎচন্দ্র শুধু বিবৃতই করিয়াছেন, এসম্পর্কে তাঁহার অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।*

জমিদার, ধনী বা ব্রাহ্মণদের এই মানবিক রূপায়ণের বিপরীতে ইহারা হীন বলিয়া হীনরূপে চিত্রিত, এমন ছবিও শরৎচন্দ্রে যথেষ্ট আছে। বলিতে গেলে এই ছবিগুলি এমন বলিষ্ঠভঙ্গিতে আঁকা হইয়াছে যে, ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় মিলে। 'পল্লীসমাজে'র বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে, 'মহেশ' গল্পের তর্করত্ন, 'অনুপমার প্রেম'-এর চন্দ্রবাবু, 'পণ্ডিত মশাই'-এর তারিণী, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর জয়লাল বাঁড়ুয্যে ও নিমাই রায়, 'অভাগীর স্বর্গ'-এ জমিদারের গোমস্তা ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কুলপুরোহিত প্রভৃতি এই শ্রেণীর হীন চরিত্র। 'দেনাপাওনা'র জনার্দন রায় বা শিরোমণি গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোলক চাটুয্যের মত অত খারাপ নয়, তবু স্বার্থপর এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণেরা ষোড়শীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার হীনতা শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করিয়াই ফুটাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র

* শরৎসাহিত্যে লেখকের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তা সম্পর্কে পরবর্তী 'অর্থনৈতিক চেতনা' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মোটামুটি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলার সমাজ, বিশেষ করিয়া পল্লীসমাজ দীর্ঘদিনের গতিহীনতার অভিশাপে জড়তাগ্রস্ত, জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনশীল রূপের সঙ্গে তাহার পরিচিতি নাই বলিলেই চলে। জড়তাগ্রস্ত -বলিয়া নূতন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সাহসও এই সমাজের নাই।* ইহার উপর কায়েমী স্বার্থের জন্য একদল জমিদার, ধনী অথবা ব্রাহ্মণ ও তাহাদের হাতের লোকেরা সমাজের যেটুকু অগ্রগতির বা জীবনায়নের সম্ভাবনা ছিল, তাহার পথও রোধ করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপ স্বার্থপরদের সংযত করিতে না পারিলে এবং মানুষের প্রয়োজনে সমাজ—এই সত্য স্বীকার করিয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন উপলব্ধি করিয়া সমাজের বিধিবিধান সংশোধন করিয়া না লইলে বাংলার সমাজ-জীবনের অগ্রগতি হইতে পারে না, হীনতার অভিশাপে তাহার আরও অধঃপতন ঘটিবে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা-রমেশের প্রেমের ছবি ফুটাইয়া তাহাদের অসামাজিক ভালবাসাকে শরৎচন্দ্র নির্মল ভালবাসা রূপেই সহানুভূতির সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন. কিন্তু সেইসঙ্গে ক্ষুদ্রতা ও হীনতার জালে জড়াইয়া সমাজ যেভাবে রমাকে রমেশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহাকে প্রাণপ্রিয় রমেশের জেলে যাইবার কারণ করিয়া তুলিয়াছে, শেষপর্যন্ত রমাকে দেশান্তরী করিয়াছে, সে ছবি শরৎচন্দ্র গভীর দরদের সহিত আঁকিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, তিনি শুধু সমস্যার চিত্রই আঁকিয়াছেন, সেইজন্য এই ব্যথা তেমন আক্ষরিক রূপ পায় নাই। কিন্তু রমার দুর্ভাগ্যকে শরৎচন্দ্র স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করেন নাই এবং

* গ্রামের সামাজিক মানুষদের চিত্ত চাঞ্চল্য সম্পর্কে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের রামবাবুর মুখে শরৎচন্দ্র চমৎকার একটি মন্তব্য বসাইয়াছেন। অচলা যখন রামবাবুকে বলিল যে তাহার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন, "রামবাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন সত্যিকারের, না পাঁচজন কলকাতায় এসে দুদিন সখ করে যেমন হয় তেমনি? তারা ব্রাহ্মদের দলে বসে হিন্দুদের কষে গাল দেয়—তেমনি গাল সত্যিকার ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আনতে পারে না—তারপরে ঘরে গিয়ে সমাজে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মদের নাম করে আবার এমনি গালিগালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিন্দুদের চৌদ্দপুরুষও কখনো মুখে আনতে পারে না। বলি, তেমনি ত না?"

যে সমাজে রমার এই দুরবস্থা ঘটিল সেই সমাজের নিহিত দুর্বলতা ও হীনতা যে কত গভীর ও ব্যাপক তাহা ফুটাইতেও শরৎচন্দ্র ইতস্তত করেন নাই। গোলক চাটুয্যে, বেণী ঘোষাল, জনার্দন রায়ের মত সমাজপতি তাহাদের পর্বতপ্রমাণ হীনতার চাপে সমস্ত অগ্রগতির সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ করিয়া সমাজকে কিভাবে ছোট করিয়া দিতেছে, 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ' বা 'দেনাপাওনা' উপন্যাস পড়িলে তাহা সাধারণ পাঠকও উপলব্ধি করিবে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে যে যুগ বিধৃত হয়েছে সে সময়ে কৌলীন্য প্রথার জন্য সমাজে বহু কন্যা এবং কন্যার আত্মীয়-স্বজন নানাভাবে বিপন্ন হইত। সে যুগ চলিয়া গিয়াছে, সে যুগের কৌলীন্য প্রথারও আজ অবসান ঘটিয়াছে। ভূমিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বর্তমানে শিল্পতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে বলিয়া সমাজের আকৃতি-প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবু গোলক চাটুয্যের বা বেণী ঘোষালের মত হীন সমাজপতির বা শক্তিমান সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তির হীনতা হইতে সমাজের মুক্তি অবশ্য কাম্য এবং বিপরীতে মানুষের কল্যাণে সমাজবোধের রূপান্তর ও মানবিক গুণসমৃদ্ধ নেতৃত্বে সমাজের অগ্রগতি অত্যাবশ্যক, এই ভাবসত্য 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি উপন্যাসে বলিষ্ঠভাবে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের মত মানবদরদী সমাজবোধ-সম্পন্ন কথাসাহিত্যিক যখন কোন সামাজিক সমস্যার ছবি আঁকেন এবং সেই সমস্যার গ্লানিতে সমাজ ও সামাজিক মানুষের বিপদ দেখান, তখন তাঁহারা অবশ্যই আশা করেন না যে, তাহাদের এই সমস্যার ছবি চিরকালীন বাস্তব-মূল্য-সমন্বিত হইবে। বরং তাঁহারা ইহা ভালভাবেই জানেন যে, একদিন এই সমস্যার অবসানে এইরূপ চিত্র ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে এবং তখন রচনার কলাশিল্পগত মূল্য রচনার সমগ্রতায় শিল্প হিসাবেই বিচার্য হইবে। কিন্তু তবু কল্যাণবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণের মহৎ আবেগ লইয়া তাঁহারা সমস্যা চিত্রিত করেন এবং আশা করেন পাঠকমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইলে ও ইহার দূরীকরণে সামাজিক চাহিদার উদ্ভব হইলে ইহা অবশ্যই বিদূরিত হইবে। এই পরিণতি তাঁহাদের রচনাকে সাময়িক মূল্যচিহ্নিত করিয়া ভবিষ্যতে পুরাতন দিনের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে সাহিত্য-তীর্থ হইতে দূরে সরাইয়া দিবে কিনা সেকথা এইরূপ সাহিত্যকে বড় একটা ভাবেন না। সমস্যা লইয়া লিখিতে অভ্যস্ত নাট্যকার বার্ণার্ড শ-ও তাঁহার সমস্যাকীর্ণ নাটকের পরিণতি সম্পর্কে

অনুরূপ মনোভাবই পোষণ করিতেন।* এইভাবে সমস্যাভিত্তিক রচনায় লেখকের জীবন-দৃষ্টির ছাপও থাকিয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে রচনা কিছুটা প্রচার-ধর্মী হইয়া যায়। লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা কথাসাহিত্যের একটি গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সমস্যালীনতা এই নৈর্ব্যক্তিকতার সুযোগ কমাইয়া দেয় এবং লেখায় লেখকের মন ও মত প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহাতে ব্যক্তিগত বিশেষ ধারণাকে বহুমনে সঞ্চারিত করিবার সম্ভাবনা থাকে। নাটকের মাধ্যমে জনমত গড়িয়া উঠার সুযোগ অবশ্য বেশি, কিন্তু সমস্যাভিত্তিক উপন্যাসেও এই প্রচার-ধর্মিতার সম্ভাবনা কম নয়।† শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কলাশিল্পগত মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু অনেক উপন্যাসে তিনি সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। কাজেই সমস্যা আনিয়াছেন বলিয়া স্বভাবতই তিনি সমস্যার সমাধান চাহিয়াছেন এবং সমাধানের সুযোগ মিলিলে সমাজকল্যাণ ও মানবতা-বোধের গৌরবে সেই প্রাপ্তিতেই তাঁহার সন্তুষ্ট হইবার কথা, অন্ততঃ এই সমস্যার পরিমণ্ডলে কলাশিল্পের দিক হইতে রচনার মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে সে কথা শরৎচন্দ্র ভাবেন নাই।

শরৎচন্দ্র সামাজিক কাঠামোর পুরাতন মহৎ ও সুন্দর দিকগুলি বাঁচাইয়া

* "বস্তি এবং গণিকালয়, শতকরা ৩৫ ভাগ মুনাফার উপরে সভ্যতা যখন নির্ভর করবে না তখন শ-র আজীবন সাধনার অনেকাংশে সার্থক হবে সন্দেহ নেই। শ নিজেই সে কথা বলে গেছেন তাঁর 'The Widower's Houses' নাটকখানির উদ্দেশ্য-প্রসঙ্গে: I heartily hope the time will come when the play will be both utterly impossibe, utterly unintelligible."—(সরোজ আচার্য—সাহিত্যরুচি, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৮)

†"সাহিত্যে প্রচার নীতির প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন 'জগতের যা চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দ মঠ, দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইবসেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হ্যামসুন-বোয়ার-ওয়েলস্-এ আছে।" এইজন্যই শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনায় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।"—(অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৯)

রাখিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি সমাজের পরিবর্তন চাহিয়াছেন ইহার দুর্নীতি ও দুর্বলতার নিরিখে, ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহী মনোভাব লইয়া সব কিছু চূর্ণ করিয়া দিলে নূতন সমাজ যুগের চাহিদায় যুগের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিবে, এই মনোভাব তাঁহার ছিল না। এইজন্যই তিনি স্বার্থপর, দরিদ্র-শোষক সমাজপতি ও সম্পদশালীদের উপর আঘাত হানিয়াছেন, কিন্তু যৌথ-পরিবার প্রথার মত পুরাতন সমাজরীতির বিরোধিতা করেন নাই। যৌথ পরিবার প্রথার উপর বাংলার পুরাতন সমাজ জীবন বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। এই প্রথা নানা দিক হতে কল্যাণকর, কাজেই পরিশ্রমজীবিদের অভিশাপের ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে শরৎচন্দ্র যৌথ-পারিবারিকতার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাবের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিপ্রদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পরেশ' প্রভৃতি রচনায়, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ যেভাবে তাহার ও তাহার স্ত্রীর স্নেহের পাত্রী খুড়তুতো ভাই রমেশের স্ত্রী শৈলর নামে তাহার দেশের সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া যৌথ পরিবারের মান বাঁচাইয়াছে, 'বিন্দুর ছেলে'তে বিন্দুকে যেভাবে মৃত্যুর সীমানায় লইয়া গিয়া অন্নপূর্ণা-বিন্দুর বিরোধ মিটাইয়া বৈমাত্র ভাইদের সুন্দর যৌথ সংসারটি বাঁচাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 'রামের সুমতি'তে নারায়ণী যেভাবে নিজের মাকে বাড়ী হইতে সরাইবার কথা ভাবিয়া বৈমাত্র দেবর রামকে বুকে টানিয়া লইয়াছে, 'বৈকুণ্ঠের উইলে' যেভাবে গোকুল নিজের শ্বশুর নিমাই রায়কে অপদস্থ করিয়া বৈমাত্র ভাই বিনোদ ও সৎমা ভবানীর সহিত সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া লইয়াছে, 'বিপ্রদাসে' দ্বিজদাস অনমনীয় মনোবলে বিপ্রদাসের সহিত মুখুয্যে বাড়ীর ভাঙন যেভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে,—এসব চিত্র শরৎচন্দ্রের যৌথ পরিবার প্রথার প্রতি অনুরাগের স্পর্শবাহী। এমনকি শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীকে দিয়া শরৎচন্দ্র কুশারী পরিবারের আদর্শগত বিরোধ মিটাইয়া দিয়াছেন, এক্ষেত্রে বিরোধের মূল আদর্শের প্রশ্নটি হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে একপাশে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু যৌথ পরিবারের সংরক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই নয়, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শরৎচন্দ্র প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থায়ী করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে চন্দ্রনাথের কাকা মণিশঙ্কর প্রথমে যাহাই করুন, শেষে তাঁহার জন্যই সরযূর মাতৃকলঙ্ক চাপা পড়িয়াছে এবং সরযূ সপুত্র স্বামী চন্দ্রনাথের ঘরে মর্যাদার সহিত স্থান পাইয়াছে। যৌথ পারিবারিকতা সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনে, বিশেষ করিয়া

কৃষিসভ্যতা ও গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে শিল্পসভ্যতা ও নাগরিক সভ্যতার সম্প্রসারণে ক্ষয়িষ্ণু হইতে বাধ্য, কিন্তু এই ঐতিহাসিক কালগত অনিবার্যতা সত্ত্বেও ইহার মধুর সুন্দর রূপটি শরৎচন্দ্র প্রসন্নমনে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যৌথ পারিবারিক প্রথার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ইহাতে কয়েকজনের উপর বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের দুরূহ দায়িত্ব আসিয়া পড়ে এবং আপেক্ষিকভাবে সে দায়িত্ব পালনে তাহাদের কষ্ট স্বীকার করিতে হয় বেশি, পক্ষান্তরে এই সুযোগ লইয়া অনেকে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে আরামে দিন কাটায়। তবে ঠিক এই যৌথ-পরিবার প্রথাগত পরশ্রমজীবিত্ব ও পরশ্রমজীবিত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত না হইয়াও বলা যায় যে, যেখানে স্বার্থপরতাবশে কেউ অন্যের কাঁধে মতলব করিয়া বসিয়া আশ্রয়দাতার মুখের পানে না তাকাইয়াই নিজে সুখে দিন কাটায় বা কাটাইবার চেষ্টা করে, শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাহাদের ধিকৃত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে চন্দ্রনাথের মাতুল মাতুলানী, 'পথনির্দেশ'-এ গুণীনের মাতুল পরিবার, 'স্বামী'তে ঘনশ্যামের বিমাতা, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। তবে এইভাবে যাহারা ধিকৃত হইয়াছে মূল চরিত্রের হিসাবে তাহারা প্রায়ই পরগাছা শ্রেণীর, যৌথ পরিবারে রক্ত-সম্পর্কের মানুষদের একান্নবর্তিতার হিসাবে তাহারা অনেকেই পড়ে না। যে সব যৌথ পরিবারে এই রক্তের সম্পর্কের মানুষগুলির মধ্যে পারিবারিক ভাঙন প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে, সেখানে শরৎচন্দ্র উদারভাবেই তাহা করিয়াছেন। বিমাতা, বৈমাত্র ভাই, এমন কি খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইদের লইয়া সংসার একসঙ্গে টিকাইয়া রাখিবার দিকে শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রবণতা ছিল।

অবশ্য যৌথ পারিবারিকতা বা আত্মীয় স্বজনের ভিতর প্রীতিভাব বাঁচাইয়া রাখিবার স্বাভাবিক প্রবণতা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী সংসারে আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষজাত বিরোধও তাঁহার পারিবারিক চিত্রগুলিতে স্থান দিয়াছেন। ইহা বাস্তবচিত্র। এই বিরোধে কোথাও কোথাও শক্তিমানের হাতে অসহায়ের পীড়নের করুণ চিত্রও ফুটিয়াছে। অরক্ষণীয়ায় জ্ঞানদা ও তাহার মা দুর্গামণির অসহায়তা এবং দুর্গামণির দেবরের সংসারে তাহার ও জ্ঞানদার লাঞ্ছনা মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। এইভাবে যে বিরোধ দেখা যায় তাহা প্রধানত মেয়েদের মধ্যেই তীব্র হয়, তবে পুরুষরাও যে একেবারে এই বিরোধে নির্লিপ্ত থাকে, এমন

নয়। 'মামলার ফল' গল্পে গয়ারামকে গঙ্গামণি যতই ভালবাসুক, গয়ারামের পিতা ও বিমাতার সহিত গঙ্গামণির ও তাহার স্বামী শিবুর সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত, অনেকটা অনুরূপ তিক্ত সম্পর্ক মেজদিদির হেমাঙ্গিনী ও তাহার স্বামী বিপিনের সহিত বড়জা কাদম্বিনী ও তাহার স্বামী নবীনের। 'চন্দ্রনাথ'-এর প্রথম দিকে খুড়ো মণিশঙ্কর চন্দ্রনাথের সহিত শত্রুতাই করিয়াছেন 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশের সহিত জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর প্রীতির সম্পর্ক থাকিলেও জাঠতুতো দাদা বেণী তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়া জেলে পাঠাইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী তাহার সপত্নী-পুত্র বঙ্কুর জন্য অতো করিল, শ্রীকান্তকে বলিতে গেলে বঙ্কুর মাতৃত্বের অনুভূতিতেই সে কাছে টানিয়াও দূরে সরাইয়া দিল, সেই বঙ্কুর সহিত শেষ দিকে তাহার সম্পর্কে ভাঙন ধরিয়াছে। 'বিরাজ বৌ'-এ নীলাম্বর ও পীতাম্বর দুই ভাই, কিন্তু পীতাম্বরের হীনতার জন্য সংসারটি ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবনের অবিবাহিত অবস্থায় যে বোন ছিল তাহার প্রাণ, সেই কুসুমকে পরবর্তীকালে সে নিদারুণ অবহেলা করিয়াছে। 'বিপ্রদাস'-এ দয়াময়ীর সহিত বিপ্রদাসের সম্পর্কে শেষপর্যন্ত জোড়া-তালি লাগিয়াছে বটে, কিন্তু শশধর বিপ্রদাসের বিরোধের সময় দয়াময়ী স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ, পারিবারিক মর্যাদাবোধ এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিলে বলরামবাটীর সমৃদ্ধ মুখুজ্যে পরিবারটি ঐরূপ শ্রীহীন হইয়া পড়িত না। এ সকল ছবি সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের বাস্তব চিত্র।

(শরৎচন্দ্রের রচনায় যে বুদ্ধি-প্রাধান্যের চেয়ে হৃদয়-প্রাধান্য বেশি দেখা যায় সেকথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র প্রেমের, মাতৃত্বের, স্নেহপ্রীতির যৌথ পারিবারিকতার, শ্রেণী-চেতনার, শ্রেণীসংগ্রামের, লোভ ও ক্ষমতাপ্রিয়তার দেশাত্মবোধের, মানবিক বৃত্তি-সংঘর্ষের বহু জটিল সমস্যার অবতারণা তাঁহার কথাসাহিত্যে করিয়াছেন। সমস্যার বাস্তব রূপায়ণের সঙ্গে তিনি আপন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রধানতঃ হৃদয়ের দিক দিয়াই সমস্যাগুলির পরিণতি ও ফলশ্রুতি পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।) আগেই বলা হইয়াছে, সমাজের কল্যাণমুখী পরিবর্তন আসুক, মানুষের প্রয়োজনে সামাজিক বিধি বিধান সংশোধিত হউক, ইহা তিনি চাহিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া সর্বাত্মক ভাঙনের উৎসাহ তিনি দেখান নাই। সমাজের রূপ কি, কি তাহার ভাল, কি তাহার মন্দ, তাহার এই ভালমন্দ কতটা যুগধারায় প্রসূত, কতটা ব্যক্তিগত, ইহাও তাঁহার লেখায় যথেষ্ট না হইলেও কিছুটা দেখাইবার প্রয়াস আছে। পল্লীবাংলার সমাজ

লইয়া তিনি কাহিনী লিখিয়াছেন, এখানে মানুষের যে হীন ছবি আঁকিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বাংশে দায়ী না করিয়া যে সকল কারণে বা সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে এই হীনতায় তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছে তাহার পরিচয়ও লেখার ফাঁকে ফাঁকে রাখিয়াছেন। তবে আধুনিক কথাসাহিত্যিক হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার লেখায় আরও মননশীল সচেতনতা থাকিলে ভাল হইত। শরৎচন্দ্র সমাজতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি লইয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজের ও অন্যের বিবৃতিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার রচনা পড়িলে মনে হয় এই পড়াশুনা হয় খুবই কম ছিল আর না হয় যাহা তিনি পড়িয়াছিলেন, হৃদয়মূলক সাহিত্যসৃষ্টির ঝোঁকে তাহা তিনি ভাল করিয়া কাজে লাগাইতে পারেন নাই। আধুনিক সামাজিক উপন্যাসে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণের উপযোগী কেতাবী জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, তাহার লেখায় দুয়েরই কিছুটা অভাব ছিল। সেইজন্য এই সকল সমস্যার আকৃতিগত ভয়ংকরত্ব আমাদের যতটা অভিভূত করে, প্রকৃতিগত সম্যক পরিচিতি আমাদের ততটা চিন্তিত করে না। 'পল্লীসমাজ'-এ বেণী রমেশের ক্ষতি করিল একথাই পাঠক বড় করিয়া দেখে, কিন্তু প্রচলিত সমাজ-কাঠামোতে রমেশ ও বেণীকে দুই ব্যক্তি রূপে না দেখিয়া সমাজশক্তির দুই সংঘর্ষমান অংশরূপে দেখিলে সমস্যাটির সমাজগত দিক আরও ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। যাহা হউক, তবু হৃদয়ের সাহায্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভগবৎদত্ত প্রতিভা ও সীমায়িত পড়াশুনা লইয়া শরৎচন্দ্র সামাজিক যে সব গুরুতর সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে শুধু সাহস নয়, সমাজমঙ্গলের আগ্রহ এবং শক্তির পরিচয় মিলিয়াছে। ভাবপ্রবণ, কাব্যধর্মী, স্থূল-নীতি-নির্ভর বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ-অভ্যস্ত পটভূমিতে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্র সমাজ-কাঠামোকে পঙ্কিলতামুক্ত ও সম্প্রসারিত করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা এক ধরনের ঐতিহ্য-অনুরাগ, ইহা নিন্দার বিষয় নয়। শরৎচন্দ্রের তীব্র ভাবাবেগ ছিল। কোন কোন সময় এই ভাবাবেগ স্বাভাবিক যুক্তিবোধ, এমন কি নীতিবোধকে অতিক্রম করিয়াছে।* শরৎচন্দ্র মানবজীবনের তৃপ্তিমূলক কমনীয় রূপটির অপেক্ষাকৃত অনুরাগী

---

* এই হিসাবে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্ত কর্তৃক অভয়ার স্বামীর অপরাধ বিচারের কাহিনীটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীকান্ত অফিসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভার পাইয়াছিল অভয়ার স্বামীর গুরুতর অপরাধের তদন্ত করিবার।

ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রে হীনতার দিক যেমন কম, সক্রিয়তার দিকটিও তেমনি দুর্বল। তবু পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রে জীবন্তরূপ ফুটাইতে তিনি অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছেন। মোটের উপর নারীজাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবোধ, নারীচরিত্রের স্নিগ্ধরূপে আসক্তি, নারীর কল্যাণধর্মিতায় দৃঢ়বিশ্বাস, দেহগত প্রেমে আগ্রহহীনতা, সমকালীন পরিচিত পুরুষদের ছাঁচে আপেক্ষিক ভাবে কর্মবিমুখ অধিকাংশ পুরুষচরিত্র অঙ্কন,—এইসব তাঁহার উপন্যাসের সাধারণ রূপ; কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মানবিকতা, রোমান্টিক চেতনা, সমস্যা সন্ধানের ও লেখায় নূতন নূতন সমস্যার অবতারণায় উৎসাহ, ব্যক্তিকে সমাজের অংশরূপে দেখিয়া তাহার চরিত্রে সামাজিক নীতি দুর্নীতির প্রভাব আবিষ্কার, ব্যক্তি চরিত্রকে, বিশেষ করিয়া স্বষ্ট নারী চরিত্রকে, আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আন্তরিকতা, চমৎকার কাহিনী রচনায় ক্ষমতা এবং সুন্দর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি গুণাবলীর সহায়তায় শুধু বাংলা-কথাসাহিত্যের আসরে নয়, সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নরম বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনের উজ্জ্বল ছবির জন্য বিশ্বসাহিত্যেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য কিছুটা স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দী, কানাড়ী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, গুরুমুখী, মালয়ালম, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁহার গল্প-উপন্যাস অনূদিত হইয়াছে তো বটেই, --ইংরেজীতে তাঁহার 'নিষ্কৃতি', 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব), 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'চরিত্রহীন', রুশভাষায় 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত' (১-৪ খণ্ড), 'আঁধারে আলো' ও 'মহেশ', ইতালীয় ভাষায় 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস অনূদিত হইয়া বিদেশে তাঁহাকে পরিচিত ও সমাদৃত করিয়াছে। বাস্তবিক গল্পের মিষ্টতায় বা হৃদয়গ্রাহিতায় শরৎচন্দ্র অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।* বাঙ্গালীর বিশেষ মানস গঠন শরৎ-সাহিত্যের

অভয়ার প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীকান্ত অভয়ার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিয়াছে, তাহাকে দুষ্কৃতকারী জানিয়াও মিথ্যা রিপোর্ট দিয়া। এই ত্রুটি মানবিক আবেগজাত। শরৎচন্দ্র এখানে অভয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীকান্তের কৃতকর্মের সুস্পষ্ট অন্যায়কে নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন।

* সমালোচক ই, এম, ফর্স্টরের মতে গল্পই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দিক :—
"We shall all agree that the fundamental aspect of the novel

বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই, এই মানস গঠনের পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত সেই জনপ্রিয়তা কমিতে পারে না। কিন্তু একথা বাদ দিলেও প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলির চমৎকার চিত্রায়ণের কৃতিত্বে শরৎচন্দ্র চিরকালই শুধু বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার কাছে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সংবেদনশীল পাঠকসমাজের কাছেই প্রিয় কথাসাহিত্যিক হইয়া থাকিবেন।*

is its story-telling aspect."—(E. M. Forster—Aspect of the Novel, 2nd impression, page-10)

* সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের লেখার ত্রুটি বিচ্যুতির স্পষ্ট সমালোচক, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মহান শক্তি সমগ্রভাবে অভিনন্দিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"No other Bengali author, not Rabindranath himself, has Saratchandra's measure of immediate success. Like Dickens he was the idol of his public···A heartcharmer he has been, a heartcharmer he will always be."—(Buddhadeb Basu, An Acre of Green Grass, 1948, pages-27-28.)

অর্থনৈতিক-চেতনা

ব্যক্তি ও সমাজের স্বরূপ নির্ণয়ে অর্থনৈতিক পটভূমিকার গুরুত্ব আধুনিক চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আগে ঘটনার পরিচয় ঘটনার সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত বাস্তব পরিচিতিতে, হৃদয়বোধের পরিচয় হৃদয়বোধের প্রকাশে অনুভূত হইত, চরিত্রকে পাঠক চিনিত চরিত্রটি ন্যায়-অন্যায় যেসব কাজ করিত বা ভাল মন্দ যেপথে চলিত তাহার ভিত্তিতে। যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ হইতে সুরু করিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন, রুচি বা ফ্যাশন প্রবর্তন পর্যন্ত সব কিছু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইত প্রত্যক্ষ রূপ দ্বারা, এগুলির পিছনে কোন্ অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করিতেছে বা কিরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে ও তদ্দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়া এগুলি আলোচ্য আকৃতি পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে কেহই বড একটা মাথা ঘামাইতেন না। তারপর গণতন্ত্রের দিকে মানব সভ্যতার ঝোঁক বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নীতিগতভাবে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্য স্বীকৃত হওয়ার ফলে এবং এই স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসমতার পেষণে অনবরত আহত হইবার প্রতিক্রিয়ায় কার্যকারণ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক পটভূমির সন্ধান আজকাল অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হইতেছে। সাহিত্যের জগৎ রসের জগৎ, সৃজন ও গঠনের আনন্দ-সংস্থানে তাহার প্রধান সার্থকতা। তবু সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষ বলিয়া এবং বিশেষভাবে সামাজিক মানুষ বলিয়া মানুষের হৃদয় লইয়া রসসৃষ্টিমূলক কারবারেও সে হৃদয় কিভাবে তরঙ্গিত হইল তাহা বিচার-বিশ্লেষণে কিরূপ অর্থনৈতিক অবস্থা সে হৃদয়ের আশ্রয়, একথা সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনার প্রয়োজন আজ আর তুচ্ছ কথা নয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ওলট-পালটের ভিতর দিয়া জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা অধিকতর বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে এবং চিন্তার জগতে এই ধারণা ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফলে রোমান্সের বা রোমান্টিকতার আবেদন প্রধানতঃ মাধুর্যের পরিমণ্ডলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতেছে, পাঠকের সমগ্র চিত্ত-চেতনার পিপাসা নিবারণে তাহার

ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। বিশেষ করিয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তু-তান্ত্রিক পটভূমির প্রয়োজন অধিকতর স্বীকৃত হইতেছে, কারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লওয়ার উপর উপন্যাসের অগ্রগতি নির্ভরশীল। কাজেই জগৎ-জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের এই বস্তুধর্মিতা সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহার পটভূমিতে কি অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রিয়াশীল এবং চরিত্রগুলির সংগঠনে সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব কতখানি তাহা বুঝিতেই হইবে।*

বলা বাহুল্য, সাহিত্যের সংজ্ঞা বা মূল্যবিচারে এই ধরণের যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার অনুপূরক হিসাবে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনার পরিবর্তিত রূপ কাজ করিতেছে। আগেকার অদৃষ্টবাদ বা দেব-নির্ভরতা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্রম-প্রতিষ্ঠায় এখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এখন একথা একরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সমাজে উৎপন্ন পণ্য ভোগ করে যে সামাজিক মানুষ, তাহার সন্তোষ-অসন্তোষের সহিত চিত্ত-তরঙ্গের যোগ অচ্ছেদ্য এবং পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার হারাহারি-ভাবে ভোগ্য পণ্যের প্রান্তীয় উপযোগিতা পণ্যভোগকারী মানুষের মনের গতি রূপায়ণে সক্রিয় হয়। এই উৎপাদন ও বণ্টননীতিতে ব্যবসায়িক মূলসূত্র অনুযায়ী মুনাফাবৃত্তির একটা ঝোঁক থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেই ঝোঁকই অনেক সময় মানসিক সন্তোষের মাত্রা নির্ধারণের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় শ্রেণীগত প্রভাব থাকিলে পণ্যভোগ-কারীর একধরণের শ্রেণীসংস্কার জন্মাইবারও সম্ভাবনা থাকে। সাহিত্যে শ্রেণীগত চিত্তরূপের অভিব্যক্তি সরাসরি খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে, তবে ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত ভিত্তিতে যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহার ব্যঞ্জনা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ

*এ যুগের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মানুষকে যে চিন্তাবিপ্লবের মধ্যে টেনে এনেছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি সেই বিপ্লবকে যে পরিমাণে পোষকতা করেছে, এবং সর্বোপরি রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক বিস্তার এই বিপ্লবকে যতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার সুযোগ দিয়েছে, তাতে সাহিত্যাদর্শেও ওলটপালট অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটে গেছে।—(শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শতাব্দী ও সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা-৮৫)

না থাকিয়া বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী অনেক সময় শ্রেণীগত ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া উঠিতে পারে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক কথাসাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার সামাজিক গল্প উপন্যাসে ব্যক্তি-চরিত্রের ভাব-ভাবনার এই শ্রেণীগত প্রসারধর্মিতা অপ্রত্যাশিত নয়। অবশ্য ব্যক্তিগত পরিধিতেই সীমায়িত ব্যক্তি-চরিত্রের আনন্দ-বেদনার কাহিনীও তিনি লেখেন নাই এমন নয়, তবে সেরূপ লেখা 'ছবি' গল্পের মত দু'এক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ যে সমস্যা লইয়া লিখিয়াছেন এবং ব্যক্তি-চরিত্রের মাধ্যমে লিখিত হইলেও সেই সমস্যার একটা সামাজিক রূপ আছে। তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সমস্যা ও সেই সমস্যাজড়িত ব্যক্তি-চরিত্রের জীবনসংগ্রাম ব্যঞ্জনার হিসাবে শ্রেণীগত ব্যাপ্তিলাভ করিয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গোফুর যখন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, তখন সে শুধু বিশেষ এক গ্রামের বিশেষ একজন গরীব চাষী নয়, মুসলমান হইয়াও সে শুধু মুসলমান রূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় না, * তাহার সুখদুঃখকে একান্তভাবে তাহার একার সুখদুঃখ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, সে উপস্থিত হয় সেই দুর্ভাগা কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে, যাহারা আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় বহিয়া প্রাণপাত করিয়া ফসল ফলায়, অন্ন যোগাইয়া দেশবাসীকে বাঁচায়, অথচ যাহারা নিজেরা অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে লাঞ্ছিত হয়, নিষ্করুণ ভাবে শোষিত হয়, অসহায় ভাবে চরম দারিদ্র্যে দিন কাটায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে শস্য তাহারা বহুকষ্টে উৎপন্ন করে, সেই শস্যের অতি সামান্য অংশই তাহাদের নিজের ভোগে আসে। সপরিবারে অর্ধাশনে অনশনে থাকা এবং কথায় কথায় পরশ্রমজীবী মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-জোতদারের দ্বারা নিপীড়িত হওয়াই

* অবশ্য কোন কোন সাম্প্রদায়িক রচনায় ব্যক্তির কথা ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সম্প্রদায়ের একাংশে বা সর্বাংশে প্রসারিত হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে গোফুরের মত একজন মুসলমান ব্যক্তির কথা সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা হইতে পারে। 'মহেশ' গল্পে কিন্তু ধর্মে মুসলমান হইলেও গোফুরকে এইভাবে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না করিয়া অন্যভাবে তাহার সমবৃত্তির কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি করা হইয়াছে।

তাহাদের জীবন। ইহার উপর আছে মহাজনের ও ব্যবসায়ীর লোভের শিকার হওয়ার দুর্ভাগ্য। গোফুর সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে বাঙলার কৃষককুলের প্রতীক। 'মহেশ' গল্পে গোফুরের এই শোষিত রূপের ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্রের এইরূপ শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিও যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, জমিদার ও তর্করত্নশ্রেণীর সুবিধাভোগী শোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁহার ক্ষোভও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের জ্ঞানদা চরিত্রটিকেও এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়। জ্ঞানদা গরীব বিধবার বিবাহযোগ্যা কন্যা। পরের আশ্রয়ে দুঃখকষ্টে তাহার ও তাহার মায়ের দিন কাটে। এক্ষেত্রে গরীব ঘরের কুরূপা মেয়ের বিবাহ দেওয়ার যে ভয়াবহ সমস্যা তাহাই জ্ঞানদার ব্যক্তিগত চরিত্র ছাপাইয়া অনুরূপ সব পরিবারের অনূঢ়া রূপহীনা কন্যাদের সম্পর্কে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ছাড়া জ্ঞানদার বিবাহ-সম্ভাবনা যত অনিশ্চিত হইয়াছে, তাহার প্রতি আত্মীয় পরিজনের এমন কি নিজের মায়ের মনোভাবও কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে যুগে যৌথ পরিবারের ভাঙনের সূচনা হইয়াছে, সে যুগে অসহায় পরনির্ভরশীল জ্ঞানদা ও জ্ঞানদার মায়ের দুর্গতি শুধু তাহাদের নয়, অনুরূপ সমস্ত পরনির্ভরশীল অসহায়দের। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে কুঁয়াপুর নামক বিশেষ একটি পল্লীগ্রামে কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু পল্লীসমাজের সমস্যারূপে এই ঘটনাগুলির পরিধি শুধুমাত্র কুঁয়াপুরেই সীমাবদ্ধ নয়। এই গ্রামে অবস্থাপন্ন বা উচ্চবর্ণের মানুষ অসহায় দরিদ্র বা নিম্নবর্ণের মানুষদের যেভাবে নিগৃহীত করিয়াছে, যেভাবে শিক্ষার সমস্যা মানুষকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, যেভাবে গ্রামের সামাজিক হীনতা মানুষের মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে সব সমস্যা অবশ্যই শুধুমাত্র কুঁয়াপুর গ্রামের নয়, সারা দেশের অনুরূপ সমস্যাপীড়িত সমস্ত গ্রামের। এই গ্রামের বিধবা রমার হৃদয়সমস্যা এবং সমাজ শক্তির কাছে পরাজিত তাহার নিরপরাধ জীবন স্বপ্নের বিষাদান্ত পরিণতি রমার একার সমস্যা নয়, তাহার মত সমস্ত অভাগিনীর সমস্যা। 'অভাগীর স্বর্গ' বা 'বিলাসী' গল্পে জাতিভেদ প্রথার যে রুক্ষ কঠিন রূপ অথবা 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কৌলীন্য প্রথার যে ত্রুটি ব্যক্তি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্যক্তিগত সীমা ছাড়াইয়া এই সমস্যাক্লিষ্ট সারা সমাজের পরিধিতে পরিব্যাপ্ত। এইজন্যই এইসব গল্প-উপন্যাসের উল্লিখিত সমস্যা

অপ্রচলিত হইয়া গেলে সমগ্রভাবে গল্প-উপন্যাসের আবেদন কমিয়া যাইতে বাধ্য। অবশ্য উপন্যাসের চেয়ে নাটকে এইরূপ সমস্যার প্রসারধর্মিতা আরও ক্রিয়াশীল হয় কারণ নাটকে চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উপস্থিত হয় এবং সমস্যা পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্যে স্পষ্টতর হয়।*

* তবে ধনী দরিদ্রের বা জমিদার প্রজার অথবা সামাজিক উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতদের বেলা এই শ্রেণীরূপ দেখা গেলেও শরৎ-প্রতিভার অপর উজ্জ্বল আশ্রয় ব্যক্তিপ্রেমের বিকাশ-প্রকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে শ্রেণীগত ব্যঞ্জনা বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রে ইহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না, সেখানে ব্যক্তি-চরিত্র বা ব্যক্তি-মানসের রূপায়ণে পাঠকের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরিয়া রাখা যায়, কিন্তু শরৎসাহিত্যে যেখানে পতিতা মেয়েরা প্রেম করিয়াছে, সেখানে তাহাদের ব্যক্তিরূপ বৃত্তিরূপকে একেবারে ঢাকিয়া দিয়া অর্থনৈতিক বীক্ষণের হিসাবে শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। পাঠকের সহানুভূতি মানুষ হিসাবেই তাহাদের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এইভাবে 'আঁধারে আলো'র বাইজী বিজলী অথবা 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী ভালবাসার স্পর্শে নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাইজী বৃত্তি বা পতিতা-বৃত্তির বাস্তব ছাপ তাহাদের উপর হইতে একরূপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ইহাদের প্রেমরূপ অধিক জায়গা জুড়িয়া থাকায় তাহারা যেন পতিতা পরিবেশ হইতে উত্তরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহস্থ ঘরের প্রেমিকা নারীর রূপ লাভ করিয়াছে। 'চরিত্রহীন'-এ মেসের ঝি সাবিত্রী সম্বন্ধেও একই কথা মনে হয়। সাবিত্রীর কথাবার্তা আচার আচরণেও তাহাকে ঝিবৃত্তি হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, প্রেমিকারূপে তাহার বৃত্তির দৈন্য একেবারে মুছিয়া দেওয়া হইয়াছে বলা চলে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সর্বাধিক ফুটিয়াছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী চরিত্রে। রাজলক্ষ্মী যে পেশাদার বাইজী, বৃত্তির আনুষঙ্গিক একরূপ অপরিহার্য ছিল যে তাহার দেহ-বিক্রয়, ধনী-বিলাসীদের বাগানে-শিবিরে তাহাদের মুঠার মধ্যে টাকা লইয়া সাজিয়া গুজিয়া বাইজী হইয়া গিয়া সুন্দরী যুবতী রাজলক্ষ্মী যে তাহার উপন্যাসে বর্ণিত ধর্মভাব আর শুচিবায়ুর জোরে দেহদানের বাধ্যবাধকতা এড়াইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কোথাও বাস্তব বাইজী

কাজেই উপরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই শ্রেণীগত সমস্যার ইঙ্গিত যখনই রাখা হয়, তখনই সমস্যা সমাধানের একটা প্রচেষ্টা, অন্তত একটা আবেগ সাহিত্যে দেখা যায়। এইজন্য সামাজিক উপন্যাস বা নাটকে লেখকের নিজস্ব জীবনবোধ বা ভাবদৃষ্টির গুরুত্ব অনেকখানি। সুতরাং সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা যদি লেখকের রচনায় রূপ লাভ করে অথবা লেখকের রচনায় সেই সমাধানের ইঙ্গিত থাকে এবং পাঠকের বা দর্শকের মানসলোকে সেই আকাঙ্ক্ষা যদি আলোড়ন আনিতে চায়, তাহা হইলে আলোচ্য সমস্যার চিত্রধর্মিতা বা বাস্তব আকৃতির সুস্পষ্ট রূপায়ণ তো চাই-ই, অধিকন্তু সমস্যার মূলীভূত কারণ-গুলির হদিশ থাকাও দরকার। চিকিৎসক যেমন রোগের মূল অনুসন্ধান করিয়া রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগের মূল কারণটি প্রতিরোধের জন্য রোগ-চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণেই, চেষ্টা করেন, সাহিত্যিককেও সেইরূপ সামাজিক সমস্যার চিত্র উপস্থাপিত করার সময় সমস্যাটির কার্য-কারণ সম্বন্ধ-বাচক পটভূমি সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে। তবে এই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সাফল্য লেখকের বুদ্ধি-বিবেচনা, পড়াশুনার তারতম্যের উপর যে অনেকটা নির্ভরশীল, সে কথা না বলিলেও চলিবে। সমস্যার সঙ্গে সমকালীন মানুষের পরিচয় থাকে, লেখক স্বাভাবিক-ভাবেই নিজের যুগের সমস্যাগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সামাজিক উপন্যাসে সামাজিক এই সমস্যার স্থান করিয়া দেওয়া তেমন কঠিন নয়। কিন্তু উপন্যাসে সেই সমস্যা সন্নিবিষ্ট করার যে উদ্দেশ্য তাহা সফল হইবে যদি সমস্যা যথেষ্ট স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। ইহার অর্থ, লেখককে সমস্যার কারণ হইতে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পর্যন্ত সমস্ত ছবিটি কল্পনা করিয়া লইয়া তদনুযায়ী লিখিতে হইবে। আগেকার দিনে লেখকের এই সচেতনতা ছিল

জীবনের কালো দিকটি ফুটে নাই। তাহার কথাবার্তা, রুচি ও ভাবভঙ্গীতে এবং গভীর প্রেমের গতি-প্রকৃতিতে তাহার সঙ্গে বড় ঘরের নায়িকা হইবার মত মেয়ের খুব বেশি তফাৎ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাইজী রাজলক্ষ্মীর বৃত্তিগত জীবনের ছাপ না থাকায় তাহার চরিত্রটি ব্যক্তিগত হইয়াছে, শ্রেণীগত হয় নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে এই বাইজী চরিত্রটি কিছুটা বাস্তবতা-বিচ্যুত হইয়াছে।

না বলিলেই হয়, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এই চেতনা ক্রমশ উপন্যাস-নাটক লেখকদের অনেকের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে ও নাটকের ক্ষেত্রেও এই নূতন ভাবতরঙ্গ সাম্প্রতিক কালে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে রোমাণ্টিকতাই মূলসুর, বাংলা সাহিত্যেও রোমাণ্টিকতার প্রভাব অত্যধিক, তবু এখন বাংলা নাটক-উপন্যাসে কাল্পনিক, অস্পষ্ট, আবেগপ্রধান, খুশী মাফিক ঘটনা ও চরিত্র বিন্যাসের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সমস্যার অধিকতর বোঝাপড়া ও তাহার রূপায়ণ দেখা যাইতেছে।

সামাজিক ঘটনা সংস্থান ও চরিত্র পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক পটভূমি উপলব্ধির গুরুত্বের কথা আগেই বলা হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্যক অবহিতির জন্য কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারদের অর্থনৈতিক চেতনা অত্যাবশ্যক। তাঁহাদের কাহিনী বা প্লট এবং চরিত্র কল্পনার মূলে যে অর্থনৈতিক অবস্থা কাজ করে, এযুগে সে সম্পর্কে তাঁহাদের উদাসীন থাকা চলে না এবং যদি বিশ্লেষণের ঘূর্ণিতে তাঁহাদের সৃষ্টিকে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আলোচ্য অর্থনৈতিক পটভূমির সহিত তাঁহাদের সৃষ্টির স্বরূপের সামঞ্জস্য বহুলাংশে সৃষ্টির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করিবে। বাস্তব জীবন-নির্ভরতাই সামাজিক উপন্যাসের প্রধান উপাদান, সেইজন্য সমালোচক জন কারুথারসের ভাষায় বলা যায় যে, 'যে ঔপন্যাসিক জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান, তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃত হইবার অধিকার হারান।'* এ অর্থে জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ানো মানে বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করা। ইহার বিপরীতে বলা যায়, বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাসই প্রকৃত উপন্যাস। এই বাস্তব-জীবন-ভিত্তি অনেকাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এদিকে লেখকের চেতনা জাগ্রত থাকা চাই। এইরূপ অর্থনৈতিক চেতনার অভাব সত্ত্বেও রোমান্স সৃষ্টি হইতে পারে, কোমল ভাবপ্রবণ হৃদয়-বৃত্তির লীলা-সমন্বিত বা সিদ্ধ-রসাত্মক সাদাসিধা কাঠামোর মনোহারী কাহিনী রচিত হইতে পারে,

*"The moment the novelist turns his back on life he forfeits his claim."—(John Carruthers : Sheherazade or the Future of the English Novel, 1st Edition, Page—28)

কিন্তু জটিল সামাজিক সমস্যাকে যদি সামাজিক নাটক উপন্যাসের বিষয়বস্তু করিতে হয়, তাহা হইলে লেখকের এই অর্থনৈতিক চেতনা খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। লেখকের সৃজনী প্রতিভা বহুলাংশে ভগবান-দত্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু সামাজিক নাটক-উপন্যাস রচনায় সেই প্রতিভা সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ করিতে হইলে লেখকের প্রতিভার বাস্তব জগৎকে আশ্রয় করা চাই।

অবশ্য সিদ্ধরসের ক্ষেত্রেও লেখকের অর্থনৈতিক চেতনার মূল্য একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ছেলে মাকে বা মা ছেলেকে ভালবাসে, স্বামী স্ত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে ভালবাসে (অথবা ইহাদের যে কোন একজন প্রেমের প্রতিদান নিরপেক্ষভাবেই অপরকে ভালবাসে), মানুষ মানুষকে ভালবাসে,—এসব সিদ্ধরসের ব্যাপার, কিন্তু অর্থনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন লেখক এই ভালবাসার স্বরূপ চিত্রণে নিঃসন্দেহে অধিকতর সফল হন। এই ভালবাসার বাস্তবে বিকৃতি ঘটিতে পারে, প্রেম বা স্নেহ ঈর্ষা বা ঘৃণায় রূপান্তরিত হইতে পারে, ভালবাসার প্রচলিত আবেগের পিছনে নিহিত দুর্বলতা বাস্তবের পরীক্ষায় উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এসব ক্ষেত্রে লেখকের অর্থনৈতিক চেতনার মূল্য অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে দুর্গামণির জ্ঞানদার প্রতি সে স্নেহহীনতার মর্মান্তিক ছবি আঁকিয়াছেন, দুর্গামণি যেভাবে কন্যাকে বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া নিশ্চিত বৈধব্যের দিকে ঠেলিয়া দিতে যাইতেছেন, তাহার পিছনে সংস্কারাচ্ছন্ন দুর্গামণির দুঃসহ দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের পরিচয় তো খুঁজিতে হয় না। আর একটি দৃষ্টান্তে কথাটি আরও পরিষ্কার হইবে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার মহামন্বন্তরের একটি ঘটনা লইয়া জনৈক শিল্পী একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। ছবিতে ছিল এক শীর্ণা ভিখারিণী মায়ের কোলে এক শীর্ণ সন্তান। মা একটি মগ মুখে তুলিয়া ব্যগ্রতার সহিত মগের দুধ গলাধঃকরণ করিতেছে, শীর্ণ ছেলেটি আকুল লোলুপ চোখে হাত বাড়াইয়া সেই দুধের মগটি মায়ের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। আমাদের মাতৃস্নেহের চিরন্তন ধারণার হিসাবে চিত্রখানি বীভৎস এবং আপত্তিকর সন্দেহ নাই। মা ক্ষুধায় যেরূপ কাতরই হউক, ঐরূপ শীর্ণ ক্ষুধিত আপন সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া ভিক্ষালব্ধ দুধটুকু নিজে উদরসাৎ করিবে, একথা সাধারণ অবস্থায় ভাবাও যায় না।

কিন্তু আমাদের মাতৃস্নেহ সম্পর্কে এই চিরন্তন ধারণার যত স্নিগ্ধতাই থাক, তাহার পিছনে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজবোধের এবং স্বাভাবিক সময়কার তাত্ত্বিক মূল্যবোধের প্রভাবই বড় কথা। এখানে শিল্পী যে করুণ ভয়ঙ্কর ছবিটি আঁকিয়াছেন, তাহার সমগ্র পরিবেশটিই সমাজ-নিরপেক্ষ। এখানে অস্বাভাবিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিশৃঙ্খলায় সবকিছু এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মনে প্রচলিত মূল্যবোধ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থার একেবারে ওলটপালটে মাতৃস্নেহের পরিচিত বহু পুরাতন রূপটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক পটভূমিকা রূপান্তরের কঠিন দান, অর্থনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এই অভাবিত অবস্থার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব। কাজেই আলোচ্য চিত্রটি বিশেষ অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে সচেতন শিল্পীর একখানি বাস্তব সমস্যা-চিত্র, এইভাবেই বলা যায় সামাজিক সমস্যা কণ্টকিত বাস্তব জগৎ ও জীবনের চিত্রাঙ্কণ-প্রয়াসী কথাসাহিত্যিকের বা নাট্যকারের অর্থনৈতিক চেতনা অনুপূরক উপাদান।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মুখে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বড়দিদি' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ইহার অনেক পূর্ব হইতেই শরৎচন্দ্র কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। কাজেই জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হইলে কি হইবে, সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর সম্পদ, উনবিংশ শতাব্দীর নন। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার জীবনের প্রথম চব্বিশটি বছর কাটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মানসলোকে এই শতাব্দীর উদার প্রশান্ত, আশ্বাসময় মূল্যবোধ সঞ্চারিত হওয়ার কিছুটা সুযোগ অবশ্যই হইয়াছিল কিন্তু ইহা আশানুরূপ হইতে পারে নাই এই জন্য যে, শৈশবে, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্র উপযুক্ত সংস্কৃতি-মূলক আবহাওয়ায় থাকিবার সুযোগ পান নাই। ইহার ফলে তাঁহার সমবয়সী বা সমকালীন অনেকের সঙ্গে তাঁহার মানস গঠনের একটা পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে মাত্র ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অস্তিবাদী আশাবাদী প্রত্যয় ও উদার জীবনবোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথের মানস-লোক যেভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল, শরৎচন্দ্রের তাহা হয় নাই। অবশ্য এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মত যুগৈশ্বর্যে মন গড়িয়া

তুলিবার সুযোগ না পাইলেও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁহার বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যেও সাধারণ মানুষের ও তাহাদের সমাজের যে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সহজাত প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জীবন-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল। কাহারও কাহারও ধারণা, অত্যন্ত প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবন বিচিত্র, বহুমুখী, চঞ্চল, এমনকি একটু উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাঁহার জীবনদৃষ্টি সম্প্রসারিত হয় এবং সার্থক উপন্যাস রচনায় সুবিধা হয়। এই অভিমতের স্বপক্ষে স্বনামধন্য রুশ ঔপন্যাসিক ডস্টয়ভস্কির কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা হয়। প্রতিভার বা সৃষ্টির ঐশ্বর্যে 'দি ব্রাদার্স ক্যারামাজোভ' অথবা 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'-এর লেখক ডস্টয়ভস্কির সমশ্রেণীর না হইলেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার আল্‌গা জীবনযাপন প্রণালীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ সাধারণ মানুষ ও তাহাদের সমাজ লইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া এবিষয়ে তাঁহার ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগিয়াছিল। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত বড় দিক কত আছে, সে কথা তিনি পরবর্তীকালে আবেগের সঙ্গে একাধিক বার স্বীকারও করিয়াছেন। ১৩৩৭ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত এক সভায় (এই সভার বিবরণ 'চন্দননগরের আলাপ সভায়' শিরোনামায় ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত হয়) এসম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষ কি তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নেংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না। সে সব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভেতরে থাকতে লাগলো।··· আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোন-দিন ছিল না।···concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই। পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগেনা।" এই সভাতেই তাঁর বিচিত্র দেশভ্রমণের পরিচয় দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "পেটের দায়ে চলে গেলাম নানাদিকে। অভিজ্ঞতা তাই থেকে। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়িনি। দেখতে থাকৃতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হ'ত।

সমস্ত Island-গুলা (বর্মা, জাভা, বোর্ণিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার অধিকাংশই ভাল নয়—smugglers।এই সব অভিজ্ঞতার ফল—'পথের দাবী'। বাড়ীতে ব'সে, আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, ১৩৭০, পৃষ্ঠা ২২৩ হইতে উদ্ধৃত।)

কাজেই দেখা যাইতেছে মানস-গঠনের হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর কিছুটা প্রভাব তাঁহার মনের উপর পড়িলেও বিংশ শতাব্দীর সংক্ষুব্ধ উদ্বেলিত যুগমানস কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মধ্যেও সক্রিয় হইয়াছিল। তবে এই সময় ইউরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাসাহিত্য জগতে প্রচলিত জীবন-বোধে যে ভাঙন প্রায় সাধারণ ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাংলাদেশের বিশেষ মানসিক গঠন ও উনবিংশ শতাব্দীর ঔদার্যবাদী আবহাওয়ার প্রভাবে সে তুলনায় শরৎচন্দ্র অনেক সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বাস্তবতা-নির্ভর আধুনিক সাহিত্যিক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার আধুনিকতা সংযম দ্বারা বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাঁহাকে বাঁধা ধরা কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না, তাঁহাকে এক বিশেষ শ্রেণীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সামাজিক সমস্যামূলক গল্প-উপন্যাস রচনায় আধুনিক কথাসাহিত্যিক-সুলভ একটা প্রবণতা শরৎচন্দ্রের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। এখন দেখা যাক, এই ধরণের সামাজিক সমস্যা লইয়া লেখায় লেখকের যে অর্থ নৈতিক চেতনার আবশ্যকতা ইতিপূর্বে আলোচিত হইল, তাহা শরৎচন্দ্রের মধ্যেও কতখানি ছিল।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়া শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, "অনেকে বলেন—কিছু constructive করলেন না, কোন সমস্যার পূরণ করলেন না; সব শেষে কিম্ভুত কিমাকার হয়ে গেল। আমি বলি ও আমার কাজ নয়। আমি দেখালুম গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাদের উৎপীড়িত করলো। সমাজের কি gain হলো? এই দুটি জীবনের যদি মিলন হতে পারতো, এ জিনিষটা যদি সমাজ নিতে পারতো, তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হ'তো। আমরা তাদের repress করলাম; দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম, সেইজন্য conclusion'ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

Social reform বা Construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা।"—(শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভার, অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা।)

—এই উদ্ধৃতিটুকুতে শরৎমানসের প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে আধুনিক শিল্পীর অনেক লক্ষণ ছিল, কিন্তু এযুগের সমস্যা-শিল্পীর সবচেয়ে যেটি বড় দিক, সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার আমূল বিশ্লেষণ এবং পরিণতির ইঙ্গিতদান,—সেদিক হইতে তিনি ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই; সম্ভবত সেদিক হইতে তিনি ততটা সচেতন শিল্পীও ছিলেন না। সমস্যাকে তিনি প্রধানত দেখাইয়াছেন বহিরঙ্গরূপে, অন্তরঙ্গরূপে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখাইতে পারিয়াছেন। সমস্যাকে তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে যেভাবে জটিল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সমস্যার প্রত্যক্ষ রূপটুকুই তাহাতে বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। সমস্যা সমাধানে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই একথা মুখে বলিলেও সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান তিনি কামনা করিয়াছেন, কিন্তু সমস্যা কি করিয়া জন্মাইল, কোথায় ইহার ভিত্তি, কোন পাপের, দুর্নীতির বা ত্রুটির জন্য সমাজে এইরূপ সমস্যা টিকিয়া থাকে, এই সমস্যা দূরীকরণে কেন সামাজিক ক্ষোভ তেমন করিয়া দানা বাঁধিতেছে না বা ফাটিয়া পড়িতেছে না,—এসব কথায় শরৎচন্দ্র যথাযথ মনঃসংযোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরিণতি সম্বন্ধেও একই কথা। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আবেগ শরৎচন্দ্র বহুবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সে আবেগ সক্রিয় কর্মপন্থার আভাসবহ নয়, হয় দীর্ঘনিঃশ্বাসে, না হয় অভিযোগের রুক্ষতায় তাহা ভারাক্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত দুটি গল্প 'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' ধরা যাক। দুটি গল্পেই শ্রেণীমূলক চিত্র আছে, এক শ্রেণীতে আছে অসহায়, শোষিত, পরার্থজীবী দরিদ্ররা, আর এক শ্রেণীতে আছে শক্তিমান, পরশ্রমজীবী, ধনী পীড়নকারীরা। গল্প দুইটির বিশেষত্ব হইল দুইটিতেই চরিত্রগুলিকে সুবিধাভোগী উৎপীড়ক এবং বঞ্চিত উৎপীড়িত—এই দুইভাগে সোজাসুজি ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে। পাঠকদের মন যাহাতে সহজেই লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি অনুকূল হয় সেজন্যই সম্ভবতঃ এরূপ করা হইয়াছে, কিন্তু তবু এইরূপ গল্প পড়িলেই মনে হয় সমস্ত ঘটনাই যেন শরৎচন্দ্রের লেখনী হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিল এবং যেটুকু বাহির হইল সেইটুকুই সব,

তারপর মাথার উপর ঈশ্বর রহিলেন যে ঈশ্বর দরিদ্রের সম্বল, আর রহিল বিপুলা পৃথিবী ও অনন্ত কাল। যে দুর্নীতির বিষাক্ত রূপ গল্পদুটিতে ক্লান্তিকর বিষণ্নতা ছড়ায় তাহা কিরূপে বিদূরিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন বলিষ্ঠ প্রত্যাশা নাই, আছে শুধু করুণ পটভূমিতে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া অসহায় অভিযোগ। তবু 'মহেশ' গল্পের অভিযোগে তীব্রতা আছে, চলতি দুর্নীতিমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগই ইহার প্রধান দিক হইলেও নিপীড়িতের বাঁচিবার একটা দাবী ইহাতে অন্তর্লীন রহিয়াছে, মাটির সঙ্গে চির সম্পর্কিত গোফুর চাষীর উঠতি বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া নৈতিকতার হিসাবে পঙ্কিল পরিবেশে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করিতে যাইবার সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের ও সমাজের প্রতি একটা নিরুপায় আর্তিসূচক বিক্ষোভ ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে; কিন্তু অভাগীর স্বর্গে কাঙালীচরণের অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইতে হইতে খড়ের ধোঁয়ার মধ্যে মায়ের স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনার করুণরসে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার কথা, উভয় গল্পেই জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টি হানা হইয়াছে, জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে নয়। জমিদার শোষণ করে, অন্যায় করে, সেই শোষণ এবং অন্যায়কেই শরৎচন্দ্র গল্প দুইটিতে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, এই অন্যায় আর শোষণ যদি জমিদারের সহৃদয়তায় বন্ধ হয় এবং কিছুটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জমিদার-প্রজার সম্পর্ক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, জমিদারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যেন আর বলিবার কিছু থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরদাস মুখুয্যে যদি কাঙালীচরণকে তাহার মাকে পোড়াইবার জন্য একটি গাছ দান করিতেন এবং জমিদার ও তাঁহার পার্ষদ-পুরোহিত গোফুরের সহিত একটু মানবতামূলক সহৃদয় ব্যবহার করিয়া সামান্য সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে 'অভাগীর স্বর্গ'-এ কাঙালীচরণ বামুন মায়ের মত কাঠের আগুনে পোড়া মায়ের মুক্তির নিশ্চিত সম্ভাবনায় বিভোর হইয়া যাইত, গল্পের ফলশ্রুতিতে নির্বাধে সিঞ্চিত হইত শান্তিবারি, এবং গোফুরও জমিদারের প্রতি বিমুখ না হইয়া মালিকত্বের মায়াবাদের প্রভাবেই যেন অভিশাপের আগুন বর্ষণের পরিবর্তে গল্পের ফলশ্রুতিতে শান্তিজল ছড়াইয়া দিত। সেক্ষেত্রে কাঙালীচরণ ও গোফুর দুজনের ভবিষ্যৎই দারিদ্র্যকে ভগবানের দেওয়া ভাগ্যরূপে মানিয়া লইয়া গতানুগতিকভাবে কালহরণের

ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। লেখক অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রতিবাদের ঘূর্ণিতে সেক্ষেত্রে মাথা গলাইতেন না বলিয়া পাঠকেরও দৃষ্টি সেদিকে পড়িবার কারণ ঘটিত না। সাম্যবাদের উদ্গাতা কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন ধনতন্ত্রের ট্র্যাজেডির বীজ ধনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত, সেকথা সামন্ততন্ত্রের পক্ষে আরও সত্য। প্রয়োজনের জন্য হউক বা না হউক, জমিদারী প্রথার উদ্ভব পরশ্রমজীবীত্বের ভিত্তিতে, সুতরাং মানুষকে শোষণ করিবার সাফল্যের উপরই জমিদারের অস্তিত্বের বনিয়াদ। স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সুস্থ সমাজগঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন শোষক ও পরশ্রমজীবীর বিলোপ এবং শ্রমশক্তির উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণ যথাসম্ভব হ্রাস। প্রত্যেক মানুষকে তাহার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া ন্যায্যপ্রাপ্য লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া এবং পরিশ্রম ছাড়াই সামাজিক অব্যবস্থাজনিত যে শোষণ চলে তাহা বন্ধ করা এই প্রচেষ্টার অনুপূরক কর্তব্য। সমাজতন্ত্র চায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ, দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পূর্ণ অধিকার এবং জাতীয় সম্পদে জনগণের মালিকানা। এতোটা না হইলেও পরশ্রমজীবী জমিদারের শোষণ বন্ধ হইবে ক্ষেতে, খামারে, কলে কারখানায়, ব্যবসা বাণিজ্যে অন্যায় শোষণ বন্ধ হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা সমাজবোধ-সম্পন্ন সামাজিক কথাসাহিত্যিকের কাছ হইতে ন্যায়তঃই আশা করা যায়। শরৎচন্দ্র সামাজিক কথাসাহিত্যিক, সমস্যার উপর লেখার প্রবণতা তাঁহার বৈশিষ্ট্য, সে হিসাবে শরৎসাহিত্যে শোষণমূলক এবং অনুপার্জিত মুনাফায় স্ফীতিলাভের সুযোগদানকারী জমিদারী প্রথার মূলনীতির বিরুদ্ধেই একটা বিক্ষোভ থাকা উচিত ছিল। জমিদারী প্রথা জিনিষটাই সাম্যচিন্তার প্রতিকূল, প্রথাটি মূলতঃ কুপ্রথা, জমিদার এই প্রথার অন্তর্ভূত বলিয়া তাহার অস্তিত্বের ভিত্তি শোষণ এবং দুর্নীতি, সুতরাং ব্যক্তিগত সহৃদয়তা থাকিলেও এই কলঙ্কিত পরিবেশে তাহার সংশ্লেষ প্রশংসার ব্যাপার হইতেই পারে না,—ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া জমিদার-সত্তাকে এইভাবে শরৎচন্দ্র দেখেন নাই। জমিদারী প্রথার মত অসাম্যমূলক প্রথার প্রশ্নে বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক চেতনা হইতে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত হওয়ার কথা, শরৎসাহিত্যে তাহা প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র মূলনীতিগত প্রশ্নটি উপেক্ষা করিয়াই জমিদারী প্রথার অস্তিত্বের স্বাভাবিকতা যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে জমিদারের সৎ ও অসৎ আচার-আচরণের উপর

তাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় জমিদারেরা অনেকক্ষেত্রেই ধিক্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধিক্কার আসিয়াছে প্রথাগত সুবিধাভোগীর মানবিকতার অবক্ষয়ে লেখকের বিতৃষ্ণায়। ইহা বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক চেতনার লক্ষণ নয়।

শরৎসাহিত্যে জমিদার অনেক। সেখানে কোন জমিদার ভাল, কোন জমিদার মন্দ। 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে বা 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষালের মত জমিদার হীনরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গোলক চাটুয্যের বা বেণী ঘোষালের জমিদারীর দৌলতে পরের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরামে থাকার অধিকার সম্পর্কে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তোলেন নাই, তাহাদের এইভাবে জীবনযাপনকে তিনি অন্যায় বলেন নাই, তাহারা কতকগুলি দুর্নীতিমূলক কাজ করিয়াছে, তিনি সেগুলির প্রতি ধিক্কার জানাইয়াছেন। 'বড়দিদি'র জমিদার সুরেন্দ্রনাথের নামে কর্মচারীরা যদি অসহায়া বিধবা মাধবীর সম্পত্তি গ্রাস করে, তাহা হইলে সে কলঙ্ক জমিদার সুরেন্দ্রনাথেরই, জমিদারী ভোগ করিতেছেন বলিয়া সেজন্য তিনিই দায়ী, কিন্তু শরৎচন্দ্র জমিদার সুরেন্দ্রনাথকে যে অব্যাহতি দিয়া ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ উপন্যাসের পরিসমাপ্তির করুণ অধ্যায়টি। 'বড়দিদি'র শেষ দিকে শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে ঘোড়ায় চড়াইয়া মরণযাত্রায় পাঠাইয়াছেন, তাহার বৃত্তিগত কলঙ্ক-কালিমা করুণার প্রবাহে মুছিয়া দিয়াছেন। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের আশুবাবু প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। আশুবাবু খুব ভালো লোক, সহৃদয়, কলারসিক, গুণগ্রাহী, বন্ধুবৎসল, ধনী ব্যক্তি। তাঁহার গৃহে বহু বিদ্বজ্জন রসিকজনের সমাবেশ ঘটে, উচ্চাঙ্গের নানা আলোচনা হয়, অজস্র সুখ্যাতি ধারায় আশুবাবু ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু এই ভালো লোকটি যখন সাংস্কৃতিক বিলাসে, উৎসবে, প্রীতিভোজে বিপুল অর্থব্যয় করেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁহার সহৃদয়তার কথাই বলেন, বৃত্তিতে আশুবাবু যে জমিদার সে কথাটা তাঁহার যেন একবারও মনে হয় না। এত টাকা সুদূর আগ্রায় বসিয়া আশুবাবু ব্যয় করিতেছেন, সে ব্যয় এক হিসাবে অপব্যয়, কারণ যাহাদের জন্য সেটাকা ব্যয়িত হইতেছে তাহাদের অভাব বা দুঃস্থতা নাই। আশুবাবুর সখের জন্য, অভ্যাসের জন্য, কিছুটা মর্যাদার জন্য এই অর্থব্যয়। কিন্তু এ অর্থ কোথা হইতে

আসিতেছে? আসিতেছে আশুবাবুর জমিদারীর গরীব প্রজাদের শোষণ করিয়া, ইহা আশুবাবুর অনুপার্জিত মুনাফা। ইহাই তাঁহার বিলাসবহুল জীবনযাপনের রসদ। আশুবাবুর জমিদারীর যে গরীব প্রজারা তাঁহার এই বিপুল খরচ জোগায়, ইহার সঙ্গে তাহারা কত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত চোখের জল মিশাইয়া দেয় সে খবর লেখক, আশুবাবু, অথবা আশুবাবুর আসরের বিদগ্ধ সজ্জন-মণ্ডলী,—কেহই রাখেন না। হৃদয়ের অনুভূতিই এখানে বড কথা, ভালো-মন্দের স্থূল প্রচলিত বোধই এখানে বিচারের মাপকাঠি। 'দেনা-পাওনা উপন্যাসে জীবানন্দ প্রথমাংশে মাতাল, চরিত্রহীন, উৎপীড়ক জমিদার, সে সেখানে ঘৃণার্হ রূপেই চিত্রিত। তাহার পর ষোড়শীর সংস্পর্শে আসিয়া যতই সে শুধরাইয়া গিয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহার এই পরিবর্তনকে অভিনন্দিত করিয়াই যেন তাহাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসের শেষাংশের জীবানন্দ জমিদারই আছে, কিন্তু যেহেতু জমিদার জীবানন্দ প্রজাদের জন্য মাঠে সাঁকো তৈয়ারী করিয়া দিয়া কিম্বা অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা জমি ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া তাহাদের কিছু কিছু কল্যাণ করিতেছে, মদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নেশা ছাড়িয়া দিয়াছে, শরৎচন্দ্রের আগেকার বিরাগ ক্রমে অনুরাগে দাঁড়াইয়াছে। লেখক শরৎচন্দ্রের বোধ হয় খেয়ালও নাই ইহার পরও চণ্ডীগড়ে জমিদারী থাকিবে, বীজপুরের জমিদারকে চণ্ডীগড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, গোমস্তা দিয়াই খাজনার টাকা আদায় হইবে।

শরৎচন্দ্রের এই হৃদয়বোধের অপেক্ষিকতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের জমিদার বিপ্রদাস। গ্রন্থের প্রথম দিকে বিপ্রদাস কড়া জমিদার, তাহাকে 'অত্যাচারী জমিদার' বলা হইয়াছে। কলকাতায় তাহার মস্ত বাড়ী এবং সেখানে বিরাট তেজারতী কারবার চলে। বিপ্রদাস প্রথমদিকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাধা দেয়, বিদ্রূপ করে। তেজারতী কারবার নিঃসন্দেহে শোষণাত্মক বৃত্তি। উপন্যাসের গোড়ায় বিপ্রদাস প্রশংসাভাজন তো নয়ই, বরং প্রতিক্রিয়াশীলরূপে পাঠকদেরও অশ্রদ্ধাভাজন। তারপর ক্রমেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গ্রন্থের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিতে এক থাকিলেও দরদী জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতৃবৎসল পুত্র, দায়িত্বশীল গৃহকর্তা, দৃঢ় চরিত্রবান সাহসী পুরুষ, সহৃদয় ভদ্রলোক ও নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ হিসাবে বিপ্রদাস যতই ফুটিয়াছে, তাহার প্রতি লেখকের তথা পাঠকের

অনুরাগ ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা গ্রন্থের প্রথমে যেটুকু ছিল, ব্যক্তি বিপ্রদাসের মহত্ত্বপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হইতে হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। শেষপর্যন্ত আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়াছে মহামানব বিপ্রদাস, গ্রন্থারম্ভের দাম্ভিক, কটুভাষী, জবরদস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল, জমিদার ও কুসীদজীবী বিপ্রদাস ধীরে ধীরে যেন বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনা বলিষ্ঠ হইলে 'বিপ্রদাস' অন্যদিক হইতে মূল্যবান উপন্যাস হইতে পারিত। গ্রন্থের প্রথমে যে সম্ভাবনা ছিল, হৃদয়প্রধান উপন্যাস সৃষ্টির আবেগে তাহা যেন ইচ্ছা করিয়াই সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে মনোরম গল্প, চমৎকার চরিত্র, হৃদয়ের নরম ভাব-গুলির লীলাখেলায় বিপ্রদাস সুখপাঠ্য উপন্যাস হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উপন্যাসের গ্রন্থনে যে চিন্তা বা মননশক্তি প্রকাশের সুযোগ ছিল, যে অর্থনৈতিক চেতনার সম্ভাবনাময় স্পর্শ গ্রন্থারম্ভে দেখা গিয়াছিল, তাহার সার্থক বিকাশ ঘটিলে 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট সংযোজন হইতে পারিত।

শরৎচন্দ্রের এই খণ্ডিত অর্থনৈতিক চেতনার আরও প্রমাণ মিলিবে 'জাগরণ' নামক 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত উপন্যাসে অসমাপ্ত এই উপন্যাসের সাহেব একজন বড় জমিদার, কিন্তু তিনি নির্বিবাদী হৃদয়বান ব্যক্তি, তাঁহার একমাত্র কন্যা আলেখ্য তাঁহার হইয়া জমিদারী চালাইতেছে। যেহেতু রে সাহেব ভালমানুষ, শরৎচন্দ্রের লেখনীতে তাঁহার সুন্দর স্নিগ্ধ রূপটিই ফুটিয়াছে এবং এই অসমাপ্ত উপন্যাসে 'আলেখ্য' চরিত্রটি যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার জমিদারী পরিচালনায় দৃঢ়তার ফলে প্রজাদের অসুবিধাদির জন্য শরৎচন্দ্র তাহাকে পাঠকদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অথচ আলেখ্য পাঠকদের বিরাগ পাইলেও এবং রে সাহেব অনুরাগভাজন হইলেও জমিদারী প্রকৃতপক্ষে আলেখ্যর নয়, রে সাহেবেরই, এবং জমিদারী প্রথার অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে আলেখ্য পিতার প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়া যে সব কাজ করিয়াছে তাহার যৌক্তিকতাও তাহার নিজের দিক হইতে যথেষ্ট আছে। গ্রামে চারিদিকের দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে আলেখ্য তাহাদের বাড়ীর বিলাসিতার জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করিতেছে, রে সাহেব তাহা একরূপ মানিয়া লইয়াছেন। এই অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তিনি যেটুকু আপত্তি করিয়াছেন

তাহা প্রজাদের মুখ চাহিয়া নয়, তাঁহার নিজের আর্থিক অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। অবস্থা চরমে উঠিয়াছে যখন বার্ধক্য ও অকর্মণ্যতার অজুহাতে আলেখ্য জমিদারীর সামান্য বেতনের কর্মচারী নয়ন গাঙ্গুলীকে ছাঁটাই করিল এবং আতঙ্কে ও অসহায়তার অবসাদে নয়ন গাঙ্গুলী যখন আত্মহত্যা করিয়া বসিল। বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলী সত্যই একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেরেস্তায় মাহিনা দিয়া রাখা একরূপ দান খয়রাতির ব্যাপার, তাহার নিকট হইতে কাজ খুব কমই পাওয়া যাইত। তাছাড়া কর্মচারীদের মধ্যে বসিয়া একজন যদি কাজ না করিতে পারে, সমগ্র পরিবেশের উপরও তাহার কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আলেখ্য এই দিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়াই ছাঁটাইয়ের হুকুম দিয়াছিল। সম্ভবতঃ পেন্সন দিবার রেওয়াজ জমিদারীতে ছিল না এবং নূতন করিয়া সে প্রথা প্রবর্তনের প্রশ্নও আলেখ্যর মনে জাগে নাই। নয়ন গাঙ্গুলির আত্মহত্যার পর আলেখ্যর অন্তরে অকৃত্রিমভাবেই অনুশোচনা জাগিয়াছে, সে দুঃখের সঙ্গেই অনুভব করিয়াছে তাহার নির্দেশের ফলে একটা জলজ্যান্ত মানুষ এইভাবে আত্মহত্যা করিল। কর্তব্য হিসাবে যে যাহা করিয়াছে তাহার শোচনীয় ফল তাহাকে যথেষ্ট ব্যথাতুর করিল। পিতা রে সাহেবের কাছেও আলেখ্য তাহার এই ব্যথিত ভাব খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াছে। সামান্য আয়টুকু চলিয়া যাওয়ায় নয়ন গাঙ্গুলী হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিল, অথচ তাহার নিজের বিলাসিতা কত,—একথাও আলেখ্য রে সাহেবের কাছে বেদনার সহিত উল্লেখ করিয়াছে।* তবু আলেখ্য লেখকের

* আলেখ্য পিতার কাছে ধনী-দরিদ্রের অসাম্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছে: "ও বিধান যত পুরানো, যতই কেন না চিরদিনের হউক, কিছুতেই ভাল নয়। জগতে ধনী ও দরিদ্র যদি থাকে থাক, কিন্তু এমন একান্তভাবে, এমন উপায়হীন কঠিন বাঁধনে কেউ কারও হাতের মধ্যে থাকা কোন মতেই মঙ্গলের বিধান হতে পারে না; ধনীরও না, দরিদ্রেরও না। এতটুকু মুঠোর চাপে যার মানুষ চাপা পড়ে, অন্ততঃ সে কিছুতেই বলতে পারে না। লোকে বলে তার মাথার ঠিক ছিল না, তবুত আমি একথাটা জীবনে ভুলতে পারব না যে তার পাঁচ বছর আয়ু আমার ওই একটা আয়নার মধ্যেই রয়ে গেছে। আরও কত

সহানুভূতি পায় নাই এবং লেখকের বিরূপতায় পাঠকের সহানুভূতি হইতেও সে বঞ্চিত হইয়াছে। অথচ যাহার জমিদারী, সেই রে সাহেবকে এই শোচনীয় ঘটনা স্পর্শ করিতে পারে নাই। রে সাহেব ভাল লোক, তাঁহার মুখে নীতিবাক্য; আলেখ্য রে সাহেবের প্রতিনিধি হইলেও যেহেতু তাহার নির্দেশের জন্যই নয়ন গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করিল, কর্তব্যের জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সেই যখন গরীব মানুষটিকে ছাঁটাই করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহার আর ক্ষমা নাই। গ্রামের নিঃসম্পর্কিত বৃদ্ধ নিমাই ভট্টাচার্য আসিয়া উপযাচক হইয়া এই উপলক্ষে আলেখ্যকে অনেকগুলি শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু নিমাই ভট্টাচার্য জমিদার রে সাহেবকে এই ব্যাপারের সহিত মোটেই জড়াইলেন না। তাঁহার কথার মধ্যে প্রাজ্ঞতার ছাপ আছে, কিন্তু আলেখ্যকে যথাযথভাবে বুঝিবার চেষ্টা তিনি করিলেন না। গ্রামের যুবকর্মী অমরনাথের উল্লেখ করিয়া নিমাই ভট্টাচার্য নরম গলায় আলেখ্যকে অত্যন্ত কঠিন কথা শুনাইলেন,—"অমরনাথ বলছিলেন তোমার কাপড়-জামা-জুতো-মোজার খরচ,—তিনি বলছিলেন তোমার আয়না-চিরুণী-সাবান-গন্ধের অত্যন্ত ব্যয়, একজনের ভাত কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে আর একজনের এইগুলোর প্রয়োজন যে কোন অবস্থাতেই বড় হতে পারে এ কুশিক্ষা যদি কোথাও পেয়ে থাক ত সে তোমায় আজ ভুলতে হবে; যারা জন্মেছে তারা যত দুর্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এ সত্য তোমায় শিখতেই হবে।" বলা নিষ্প্রয়োজন, বড় জমিদারের মেয়ে বিলাসিতা করে, শরৎচন্দ্রের আরও অনেক জমিদার-তনয়-তনয়া বিলাসিতা করিয়াছে, কিন্তু শুধু বিলাসের জন্য তাহারা শরৎচন্দ্রের নিন্দাভাজন বড় একটা হয় নাই, কিন্তু যেহেতু আলেখ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারই জারি করা হুকুমের ফলে অথর্বপ্রায়

লোকের মরণ ইতিহাস যে আমার জুতো জামার পরতে পরতে লেখা আছে তাই বা কে জানে বাবা?" তারপর তাহার পিতা যখন তাহাকে এসব কথা এমন করিয়া ভাবিতে বারণ করিলেন, বলিলেন যে এ রকম করিয়া ভাবিলে সংসারে বাস করা যায় না, তাহার উত্তরে আলেখ্য বলিয়া উঠিল,—"তোমার কপালে ত বুড়ো মানুষের রক্তের দাগ নেই বাবা!"

নয়ন গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করিল, আলেখ্য এজন্য অকৃত্রিম বেদনাবোধ করিলেও সেইহেতু খুনের অপরাধের শাস্তি দিতেই যেন তাহার উপর লেখক উল্লিখিত বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। এই দুর্ঘটনাটি না ঘটিলে সামান্য বদান্যতার মধ্য দিয়াই সম্ভবত নয়ন গাঙ্গুলীর পর্ব সমাপ্ত হইত, আলেখ্যের প্রাচুর্যকে এভাবে প্রজাদের দারিদ্র্যের বিপরীতে লাঞ্ছিত করিবার প্রয়োজন শরৎচন্দ্র অনুভবই করিতেন না।* ঘটনাটি যখন আলেখ্যের জন্য ঘটিয়াছে তখন তাহার নিন্দা লাভ স্বাভাবিক, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যেহেতু রে সাহেব এই ব্যাপারে একটু বিষণ্ণ ও লজ্জিত, সেই হেতু শরৎচন্দ্র তাঁহাকে সব দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন। অথচ জমিদারী রাখার জন্য আলেখ্যর এইভাবে যদি কিছু আর্থিক লাভ হয়, তাহাতো প্রকৃত মালিক রে সাহেবের খাতাতেই জমা পড়িবে। এছাড়া একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, আলেখ্যকে শরৎচন্দ্র শুধু নিমাই ভট্টাচার্য বা অমরনাথের দ্বারা ধিক্কৃত করেন নাই, অতঃপর অসমাপ্ত উপন্যাসখানির সামান্য যে কয়খানি পাতা লেখা হইয়াছে তাহারই মধ্যে আলেখ্যর ইন্দুমতী নামে এক স্নিগ্ধ শান্ত বান্ধবীকে আনিয়া আলেখ্যর বিপরীতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটানো হইয়াছে,

* আলেখ্যের হুকুমের শোচনীয় পরিণতি শরৎচন্দ্র যেন শোষিতদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশের দুর্লভ সুযোগরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। নিমাই ভট্টাচার্য আলেখ্যকে পূর্বোক্ত উপদেশ দেওয়ার পরও ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে শরৎচন্দ্র যে কথাগুলি বসাইয়াছেন, সেগুলি বাস্তবক্ষেত্রে শাসক ও শোষিত সম্পর্কে তাঁহার নিজেরই কথা: "এতবড় জমিদারীর দৈবাৎ আজ তুমি মালিক, তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ জোগাতে আর একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এতো হতেই পারে না; এবং যে সমাজ বিধানে এত বড় অন্যায় করাও আজ তোমার পক্ষে সহজ হতে পারল এ বিধান যতদিনের প্রাচীন হোক, কিন্তু এটা সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হতে পারে না। আমি বুড়ো হয়েছি, সেদিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু একথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ, তাদেরই ছেলেপুলের কাছে আর একদিন তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।"

যাহার ফলে পাঠকের দৃষ্টিতে আলেখ্য আরও ম্লান হইয়া গিয়াছে। অমরনাথের বাড়ীতে আলেখ্যের স্থান মর্যাদাবহ নয় নিশ্চয়, কারণ অমরনাথের সমাজ-কল্যাণের সংগ্রাম জমিদারী-পরিচালিকা আলেখ্যের বিরুদ্ধেই বহুলাংশে কেন্দ্রীভূত, তাছাড়া অমরনাথের যে স্বদেশী আন্দোলন, তাহার আঁচও কিছুটা আলেখ্যদের জমিদারী স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়া লাগেই। কিন্তু অমরনাথের বাড়ীতে ইন্দুমতী যখন একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাড়ী শুদ্ধ সবাই অভাবিত সৌজন্যে অভ্যর্থনা করিয়াছে। ইন্দু আসন গ্রহণ করিলে অমরনাথের জননী উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়াছেন,—"গরীবের ঘরে ঠিক সন্ধ্যার সময় মা কমলা এলেন।" এই সময় ইন্দুমতীর বিপরীতে পাঠকের মনশ্চক্ষে স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলিয়া দেওয়া আলেখ্যের প্রতিচ্ছবি। অথচ আলেখ্যের আন্তরিক অনুশোচনার নিরিখে এই তুলনার সুযোগ সৃষ্টিতেও কিছুটা নিষ্ঠুরতার স্পর্শ কি অস্বীকার করা যায়? আলেখ্যের ব্যাপারটি মানবদরদী সহৃদয় লেখক শরৎচন্দ্র মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয়ের বেদনাবোধের দিক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই এই সম্ভাবনাময় তরুণী চরিত্রটি এইভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে অন্যথায় তাহার হৃদয়, তাহার কাজের যুক্তি, সিদ্ধান্তগ্রহণে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ফাঁক, কাজের বিষাদময় পরিণতিতে দৈবের হাত, জমিদারী প্রথার মত সামন্ততান্ত্রিক পরশ্রমজীবীত্বের ব্যবস্থায় অতিরিক্ত-শ্রমমূল্য-শোষিত মানুষের সঙ্গে কাজের অতিরিক্ত মানবিক সম্পর্কের অভাব এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে জমিদারী প্রথাপুষ্ট-জমিদারের আত্মকেন্দ্রিকতার অভ্যাস,—এসব দিকও শরৎচন্দ্রের লেখায় যথাযথ বিবেচিত হইতে দেখা যাইত। আলেখ্য যে কাজ করিয়াছে তাহার পরিণতি মারাত্মক হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা দুর্ঘটনা। জমিদারী প্রথার মূলগত ত্রুটি না দেখিলে জমিদারী পরিচালনার সাধারণ ধারণায় একথা সকলেই জানে যে, আলেখ্য যে হুকুম দিয়াছে সেরূপ হুকুম জমিদারদের হামেশাই দিতে হইয়াছে। আলেখ্যর জামা কাপড়ে বিলাসিতার দিকটি শরৎচন্দ্র নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার ঘটনাটিকে অধিকতর করুণ করিবার জন্যই অত বড় করিয়া আঁকিয়াছেন, না হইলে পরশ্রমজীবী অর্থবান জমিদারের এই ধরনের ভোগ্যপণ্যের বিলাসিতায় টাকা খরচের ফলে তাহা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য সঞ্চালিত হইবার একটা অর্থনৈতিক ভাল দিকও আছে। যক্ষের মত অর্থস্তূপ সঞ্চয়ের চেয়ে ইহা সমাজের স্বার্থে ঢের বড় কথা। তাছাড়া সত্যসত্যই

এই জামা-কাপড়ের বিলাসিতার ব্যাপারটি মোটের উপর জমিদারের স্বচ্ছলতার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অথচ এই বিলাসিতাটুকুর জন্যই আলেখ্যর লাঞ্ছনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু শরৎসাহিত্যে যেখানে জমিদারের অথবা অর্থবান ব্যক্তির শোষণ বা হীনতা প্রকাশ পায় নাই, সেক্ষেত্রে তো শরৎচন্দ্র খারাপ বলিয়াই বিলাসিতাকে এমনি করিয়া দরিদ্রের সম্ভাব্য শোষণ বা ক্ষতির নিরিখে রূঢ় আঘাত করেন নাই। 'শেষ প্রশ্ন'-এ জমিদার আশুবাবুর বিলাসের কথা আগেই বলা হইয়াছে, 'বিপ্রদাসে'র তেজারতী কারবারী জমিদার বিপ্রদাসের জননী দয়াময়ীর ব্রত পালনের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য শরৎচন্দ্র নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেন নাই। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ প্রভৃত ধনশালী ব্যক্তি, তাহার ব্যয়বাহুল্যও লক্ষণীয়, সুরেশ নিজে পরিশ্রম করিয়া উল্লেখযোগ্য কিছুই উপার্জন করে না, কিন্তু লেখক সুরেশের প্রচুর অর্থব্যয়ের জন্য কোন আঘাত করেন নাই। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীকে দুহাতে পয়সা খরচ করিতে দেখা গিয়াছে, তাহার অর্থব্যয় প্রায় সবসময়েই তাহার মহিমা প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে, তাহাকেও উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে জমিদার করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থপ্রাচুর্য বা খুশীমত বিপুল অর্থব্যয়ের জন্য রাজলক্ষ্মীর নিন্দা করা হয় নাই। বজ্রানন্দ দেশভক্ত জনসেবক সন্ন্যাসী, দুঃখী-মানুষের দুঃখে সে সব সময়েই কাতর, শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে বহু কথা বলিয়াছে। কিন্তু এই বজ্রানন্দ জমিদার রাজলক্ষ্মীর বিরুদ্ধে একটা কথা উচ্চারণ তো করেই নাই, বরং হাসিমুখে আগ্রহের সহিত তাহার দৈনন্দিন জীবনের ব্যয়বাহুল্যে যোগ দিয়াছে এবং আনন্দের ভাগ লইয়াছে। 'শুভদা' উপন্যাসে জমিদার ভগবান নন্দীর সেরেস্তার সামান্য বেতনের দুশ্চরিত্র কর্মচারী হারাণ তহবিলের প্রায় তিন হাজার টাকা চুরি করিল, হারাণের স্ত্রী শুভদা নন্দী মহাশয়ের সঙ্গে নিজে দেখা করিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া ও চোখের জল ফেলিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। হারাণকে এভাবে মাপ করাইয়া শরৎচন্দ্র শুভদার চোখে এবং পাঠকের চোখে জমিদার নন্দী মহাশয়কে মহাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এই হারাণই যদি আত্মহত্যা করিয়া বসিত, তাহা হইলে ক্ষমা করার সুযোগ না থাকায় নন্দী মহাশয়কে আলেখ্যের মত শুধু অনুতাপই করিতে হইত এবং সেক্ষেত্রে হয়তো শরৎচন্দ্র অন্যভাবে নন্দী মহাশয়কে আঁকিতেন। হারাণ এত পাপিষ্ঠ যে ধরা পড়িবার পর তাহাকে ক্ষমা করা

সামাজিক দিক হইতে ভাল কথা নয়, তবু স্ত্রী শুভদার স্বামীভক্তি, পত্নীর কর্তব্য, গৃহিণীর দায়িত্ব, ভগবান নন্দীর মানবিক মহত্ত্ব, হারাণের সংসারের দায়, এই সব মিশিয়া সামাজিক দুষ্কৃতকারীর দণ্ডবিধানের গুরুত্বকে একেবারে লঘু করিয়া দিল। যদিও হারাণ দুশ্চরিত্র, সে দরিদ্র এবং এই চাকুরী ব্যতীত তাহার পরিবার প্রতিপালনের স্বাভাবিক পথ খোলা নাই। চাকুরী খতম করিয়া নন্দী মহাশয় তহবিল ভাঙ্গার জন্য যদি তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চালাইতেন এবং অভাবে আতঙ্কে হারাণ যদি কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান হারাইয়া আত্মহত্যা করিত, তাহা হইলে নয়ন গাঙ্গুলীর প্রতি প্রবাহিত করুণাধারা সম্ভবত হারাণের ক্ষেত্রেও দেখা যাইত এবং সামাজিক হিসাবে করণীয় কাজ করিয়া পরিবর্তে জমিদার নন্দীমহাশয়ের ভাগ্যে হয়ত আলেখ্যের মতই ধিক্কার জুটিত। জমিদার ভগবান নন্দীর সম্পর্কে জমিদারী প্রথার সহজাত দৈন্য দেখানো হয় নাই এবং হারাণের উপরোল্লিখিত অবস্থা ঘটিলেও সেদিক হইতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস শরৎচন্দ্র করিতেন বলিয়া মনে হয় না। ‘পথনির্দেশ’ গল্পে গুণীন অর্থবান, গরীব অসহায় সুলোচনা ও তাহার কন্যা হেমকে গুণীন মর্যাদার সহিত আশ্রয় দিয়াছে, শরৎচন্দ্র গুণীনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু গুণীনের পরশ্রমজীবীত্বের জন্য তাঁহার কোন চিন্তা নাই। ‘দত্তা’য় বিজয়া জমিদার, জমিদারীর মুনাফার টাকায় সে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করিয়া বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু ‘দত্তা’ উপন্যাসে বিজয়ার প্রেমের বিকাশ ও প্রকাশে পরশ্রমজীবীত্বের রূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এখানে আরও লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, বিজয়ার সহিত নরেনের সার্থক প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করিল, দুজনে একাত্ম হইল; কিন্তু জীবনবোধের দিক হইতে লেখক যে বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার নরেনকে গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কৃষকদের উন্নতির এবং নিজস্ব একটি ছোট ল্যাবরেটরি তৈয়ারী করিয়া সাধারণের কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, বিজয়ার জমিদারী বৃত্তির ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের চোখের সমুখে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনের বিপুল অর্থব্যয়ের জন্য সেই নরেনের মনে শরৎচন্দ্র কোন বিরুদ্ধ-চিন্তার উদ্ভব করান নাই।

আসলে মানুষের মনুষ্যত্বকে যে প্রাচুর্য লাঞ্ছিত করে, শরৎচন্দ্রের বিক্ষোভ তাহারই বিরুদ্ধে। জমিদার যেখানে প্রজার মঙ্গলসাধন করে অথবা প্রজা-

নিরপেক্ষভাবে আপন মানবিক সদ্‌গুণের পরিচয় দেয়, শরৎচন্দ্রের প্রশংসা সেখানে অযাচিতভাবেও বর্ষিত হয়, পক্ষান্তরে যে জমিদার জমিদারীর সুযোগ লইয়া প্রজাদের উৎপীড়িত করে, মানুষকে ছোট করে অথবা অন্যভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, শরৎচন্দ্র তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। এইজন্যই আশুবাবু, রে সাহেব, রমেশ, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, ভগবান নন্দী, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছে, পক্ষান্তরে বেণী ঘোষাল, গোলক চাটুযে, জীবানন্দ (প্রথম দিকের জমিদার জীবানন্দ, শেষদিকের ষোড়শী-প্রভাবিত জীবানন্দ নয়), 'মহেশ' গল্পের জমিদার, আলেখ্যর মত জমিদারের কপালে নিন্দাই জুটিয়াছে।* শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনা যদি দৃঢ়ভিত্তিক হইত, তাহা হইলে সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য সৃষ্টিকারী এবং মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদসৃষ্টিকারী বংশানুক্রমে মুনাফা লুটিবার কল জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁহার একটা সচেতন বিরূপতা দেখা যাইত এবং ভাল-মন্দ-নিরপেক্ষভাবে ও ব্যক্তি মানুষের হৃদয়াবেগের প্রশ্ন নিরপেক্ষভাবে জমিদারদের চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্র আর্থিক বনিয়াদের দিকটিও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতেন।**

*দেনা-পাওনায় জীবানন্দ ছাড়া আর এক জমিদারকে ধিক্কার জানানো হইয়াছে চণ্ডীমন্দিরের অতিথি উমাচরণের বর্ণনায়। তাঁহার বিরুদ্ধেও অভিযোগ মানবতার অভাবের। উমাচরণ ভাগ্যহীন নিঃসম্বল মানুষ, মৃত্যু তাহাকে জগতে একা করিয়া দিয়াছে। উমাচরণের করুণ অবস্থার সঙ্গে তাহাদের গ্রামের জমিদারের ছবি একসঙ্গে মিলাইয়া দিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে বৈষ্ণব, বাটি আগে ছিল মানভূম জেলায় বংশীবট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই—এ যাহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তিনি পশ্চিমের কোন এক সহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে।"

**শরৎচন্দ্রের 'হরিচরণ' গল্পে দুর্গাদাসবাবুর মারের ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁহার চাকর হরিচরণের মৃত্যু হইল। দুর্গাদাসবাবু এই মৃত্যু সংবাদ পাইবার সময় দুর্গাদাসবাবুর অসুস্থা স্ত্রী অনেকটা ভাল হইয়াছে। দুর্গাদাসবাবু অনুতপ্ত বোধ করিলেন কৃতকর্মের জন্য, মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ চাকরটি ভালই

শরৎচন্দ্র দরিদ্রদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, শোষণ ও উৎপীড়নের তিনি ছিলেন বিরোধী। জাতীয় ধনসম্পদের বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থার সহজাত দুর্নীতি সম্বন্ধে তিনি ততটা সচেতন ছিলেন না। শরৎচন্দ্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু সে অন্যায়ের প্রত্যক্ষ রূপেরই বিরুদ্ধে। যে অন্যায় আপাত দৃষ্টিতে প্রকাশমান নয়, যাহা বুঝিতে হইলে খুঁজিতে হয়, অথচ যে অন্যায়ের শক্তি যথেষ্ট এবং যাহা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, এমনকি সমাজের মনে ক্ষত সৃষ্টি করে, তাহার জন্য শরৎচন্দ্রের মত মানবতাবাদী মহান্ সাহিত্যিকের যতখানি মনোযোগ আশা করা যায়, ততখানি মনোযোগ তিনি দেন নাই। তাছাড়া যে অন্যায়ের প্রত্যক্ষ রূপের শরৎচন্দ্র বিরোধিতা করিয়াছেন, সেই অন্যায় কিভাবে কায়েম হয়, অন্যায়ের ব্যবহারিক যুক্তি কি, অন্যায় শক্তি পায় কোথা হইতে, এসব লইয়া শরৎচন্দ্র কমই চিন্তা করিয়াছেন। অথচ অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই চিন্তার গুরুত্ব যথেষ্ট। দরিদ্রের মুখের গ্রাস যাহারা কাড়িয়া লয় তাহারা অমানুষ, কিন্তু মুখের গ্রাসটুকু মাত্র রাখিয়া মৌখিক মিষ্ট ব্যবহারে মন ভিজাইয়া দিয়া যাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে, তাহাদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে, তাহাদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বিশেষ মুখ খোলেন নাই। দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ধনবণ্টনের অসম ব্যবস্থা-সমূহের বিলোপের উপর নির্ভর করিতেছে, এসম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আবেগ যতটা প্রবল, চিন্তা ততটা স্বচ্ছ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের প্রায় ৪০ বৎসর আগেকার লোক, তবু বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থনৈতিক চেতনার দিক হইতে শরৎচন্দ্র অপেক্ষা সচেতন ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে এই চেতনার পরিচয় হয়তো তেমন স্পষ্টভাবে মিলিবে না, কিন্তু তাঁহার চিন্তাশীল একাধিক প্রবন্ধে এই অর্থনৈতিক চেতনার বলিষ্ঠতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে এই কথাটি মানুষের জীবনের আর্থিক ভিত্তির উপর জোর দিয়া লেখার হিসাবেই বলা হইতেছে। এ ব্যাপারে অধিকতর রোমান্টিক ভাবাশ্রয়ী বুদ্ধদেব বসুর মত লেখকের কাছে পাঠকের যে প্রত্যাশা, শরৎচন্দ্রের

ছিল। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্যক্তি হরিচরণের জন্যই দুর্গাদাসবাবুর এই বেদনাবোধ, কিন্তু একটা মানুষকে এইভাবে হত্যাতেও মালিকত্বের বা মনিবত্বের দৈন্য এবং দাসত্বের অসহায়তা সম্পর্কিত সামাজিক গ্লানি সম্বন্ধে দুর্গাদাসবাবুর তথা লেখকের মনে কোন প্রশ্ন জাগে নাই।

কাছে প্রত্যাশা সে তুলনায় অবশ্যই বেশি। শরৎচন্দ্র নিপীড়িত কৃষকের জন্য বেদনা বোধ করিয়াছেন, কিন্তু যে কৃষক প্রত্যক্ষভাবে নিপীড়িত বা শোষিত নয়, সামাজিক অন্যায় অসমবণ্টন-নীতিগত তাহার দুর্ভোগের জন্য সচেতনতা না দেখাইয়া তাহার অন্য সুখ-দুঃখের কথা বলিলে তাহা অর্থনৈতিক চেতনার পরিচয় হইবে না।

'পল্লীসমাজ'-এ প্রজা সনাতন জমিদার বেণী ও রমার সম্মুখে বিদ্রোহ ভাব দেখাইয়াছে, অত্যাচারে নিপীড়নে অস্থির হইয়া বেণী ও রমার জন্য রমেশের কারাবরণে ক্ষিপ্ত হইয়া সনাতনের দল রমার দুর্গাপূজার প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু সহৃদয় ভাল জমিদার বলিয়া রমেশকে তাহারা দেবতা মনে করে। নিজেদের কৃষক-জীবনের দুঃখ রমেশের প্রাচুর্যের বিপরীতে অনুভূত হয়-ই, তবু রমেশের ব্যক্তিগত ভাল ব্যবহারে তাহারা পরিতৃপ্ত। রমেশের জমিদারত্বের বিরুদ্ধে বা নিজেদের চিরন্তন অসহায় দুঃখবরণের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ বা প্রতিবাদ নাই। রমেশ যত ভালই হউক, সে ভালত্বকে তাহার ব্যক্তিগত করিয়া দেখা এবং অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জমিদারী প্রথার অবসান চাহিলে রমেশের জমিদারত্বের অবসান কাম্য, এই অর্থনৈতিক দৃষ্টি-কোণ হইতে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে ব্যাপারটা বিবেচনা করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু দরিদ্র কৃষিজীবীদের লইয়া বেশি না লিখিলেও যেটুকু লিখিয়াছেন তাহাতেই সমস্ত কৃষিজীবীর দারিদ্র্যের মূল কারণটি অনুধাবন করিয়া সেখানে নাড়া দিবার এবং পাঠককে সেই কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।* অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের বক্তব্য উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধে

*বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির এই সূত্রে উল্লেখ করা চলে। এখানে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, "জমিদারের ঘরে ধান আছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়াড়ি বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পারিলে ধন-সম্পদ আছে বিবেচনা করেন না।"

বিবৃত হইয়াছে; শরৎচন্দ্রও প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সমস্যা আলোচনায় যে ফাঁক তিনি তাঁহার উপন্যাসে রাখিয়া গিয়াছেন, নিতান্ত টুকরো কথায় ছাড়া প্রবন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া সে ফাঁক পূরণ করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই।*

শরৎচন্দ্র প্রবল হৃদয়ানুভূতিসম্পন্ন লেখক ছিলেন। অর্থনৈতিক চেতনা ছাপাইয়া তাঁহার হৃদয়াবেগ কত উপরে উঠিতে পারে তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীকান্ত চতুর্থ সর্গের শেষে কমললতার বিদায় দৃশ্য। দৃশ্যটি অতি মনোরম, শরৎচন্দ্রের বর্ণনা এখানে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু যুবতী কমললতা একবস্ত্রে, শূন্য হাতে, একাকী অপরিচিত জগৎ ও অজানা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াইল, সঙ্গী-সাথী না লইয়া সে বৃন্দাবনে একা চলিল, এই কল্পনা বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাভাবিকতা বিরোধী। কমললতার মনের যে অবস্থাই হউক, সংসারের বক্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইবার মত মেয়ে সে নয়। গহর কমললতাকে অনেক টাকা দিয়াছিল, শ্রীকান্তও সম্ভবতঃ প্রস্তুত ছিল প্রয়োজনে কমললতাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে; কমললতা কিন্তু কিছুই না লইয়া বৈরাগিণী হইয়া ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইবার সংকল্প লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্রীকান্ত তাহার বৃন্দাবনের টিকিটখানি কাটিয়া দিয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনে যাওয়ার সংকল্প থাকিলেও কমললতা প্রথমে শ্রীকান্তের কাছ হইতে অত দূরের টিকিট চায় নাই, কাছাকাছি টিকিটই লইতেছিল, শ্রীকান্ত ব্যথা পাইবে বলিয়াই বৃন্দাবনের টিকিট লইতে সে রাজী হইল। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে গোলক চাটুয্যের বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদা বৃন্দাবনের পথে নিরুপায় হইয়া পা বাড়াইয়াছে, দুর্বৃত্ত বকধার্মিক ভগ্নীপতির আশ্রয়ে তাহার ধর্ম গিয়াছে, সমাজে তাহার স্থান নাই, কিন্তু জ্ঞানদা তাহার উপায়হীনতা সত্ত্বেও গাড়ীভাড়া ইত্যাদির জন্য পঞ্চাশটি টাকা সন্ধ্যার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কমললতা শুধু ভগবানের পায়ে আপনাকে অর্পণ করিয়া শূন্য হস্তে অজানা পথে ভাসিয়া পড়িয়াছে।

*শরৎচন্দ্রের এই ধরণের অর্থনৈতিক চেতনা সংশ্লিষ্ট কিছু টুকরো কথা ১৩৪৪ সালের ১৬ই বৈশাখ সংখ্যার 'বাতায়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি দু-চার পংক্তির, খণ্ড চিন্তার লিপিবদ্ধ রূপ মাত্র।

ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের প্রশ্নে এইরূপ অর্থ নৈতিক চিন্তার আচ্ছন্নতার ছবি শরৎ-সাহিত্যে বিরল নয়। 'শেষ প্রশ্ন'-এ দেখা যায়, শিবনাথ যখন কমলকে ছাড়িয়া গেল, তখন শরৎচন্দ্র কমলের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাহার এই হৃদয়ের দিকটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ চলিয়া যাইবার পর কমল ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল বলিয়া স্ত্রী হিসাবে শিবনাথের নিকট হইতে কিছুই দাবী করে নাই এবং শিবনাথের বিরুদ্ধে কোন কথাই উচ্চারণ করে নাই। অথচ শিবনাথ তাহাকে অকূলে ভাসাইয়া দিয়া অন্যায়ভাবেই চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর কমল জামা সেলাই করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা সংস্থান করিতে থাকে। তাহার মনের ঐশ্বর্য দেখাইবার জন্যই শরৎচন্দ্র এই কৃচ্ছ-সাধনের দিকটি উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়াছেন, এইভাবে জীবিকার্জনের কাঠিন্য, গ্লানি, সম্ভাব্যতার সঙ্গতির প্রশ্ন তুলেন নাই। অথচ কমল চরিত্রের বিকাশে তাহার উদার অতিথি-বাৎসল্যের দিকটি দেখাইতে হইবে, সুতরাং কমল অতিথি সৎকার করিয়াছে, হরেন, রাজেন, অজিত তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে, এসব খরচ কমল চালাইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র কমলের দারুণ অভাবের কথা সরাইয়া রাখিয়া তাহার অতিথি বাৎসল্যকে ফুটাইয়াছেন বলা চলে, প্রকৃতপক্ষে অভাব কমলের পথে প্রতিবন্ধক হয় নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমলের বিপরীতে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন আশুবাবুর আত্মীয়া বেলা দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘর হইতে চলিয়া আসিয়া সেই স্বামীর নিকট হইতেই মাসোহারা আদায় করিয়াছে, এবং যে স্বামীকে সে ত্যাগ করিয়াছে তাহারই দেওয়া টাকায় স্বচ্ছল জীবনযাপন করিতে তাহার বাধিতেছে না। পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্র বেলার বিপক্ষে এবং কমলের পক্ষে। নীলিমার মুখ দিয়া তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে কমলকে সমর্থন জানাইয়াছেন। বেলা যে-ভাবে স্বামীকে ছাড়িয়া আসিয়াও সেই স্বামীর টাকা ভোগ করে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া নীলিমা বলিয়াছে, "কমল আর যাই করুক, যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইত না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরত।" বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তটিতে অর্থ নৈতিক চিন্তার উর্ধ্বে লেখকের হৃদয়ানুভূতি এবং জীবনদৃষ্টি বড় হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, শরৎচন্দ্র মানুষকে তাহার হৃদয়ের দিক হইতে গ্রহণ করিয়া দরদের সহিত আঁকায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে

তিনি অন্যান্য বিবেচনার উপর যথাযথ জোর দিতে পারেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে, দরিদ্র ও শোষিতের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমবেদনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর শোষণের ইতিবৃত্তকে ঠিকমত বিচার করিতে পারেন নাই, দুঃখী, দরিদ্র, শোষিতের প্রতি সমবেদনা তাঁহার সাহিত্যে এমন তীব্র আবেগে স্পন্দিত হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না থাকিলেও অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে পাঠকমন সচেতন হইয়া উঠে। ক্ষোভ অথবা কারুণ্য সিঞ্চিত করিয়া এই অস্বস্তিকর সামাজিক দৈন্যের কথা পাঠক সমাজকে শুনাইতে শরৎচন্দ্রের ক্লান্তি ছিল না। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্ত গঙ্গামাটিতে নিস্তব্ধ নিরালা রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী আনন্দের মুখ হইতে একটানা শুনিয়া গিয়াছে পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য আর অসহায়তার কথা।* এরূপ কথা বলিতে, শুনাইতে, তাহার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে শরৎচন্দ্রকে বহুস্থানে দেখা গিয়াছে। এই আবেগের আধিক্যে তিনি কোথাও কোথাও অপ্রাসঙ্গিকভাবেও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়া এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে সুনন্দার দ্বারা অতি-প্রভাবিত রাজলক্ষ্মীর প্রতি কিছুটা অভিমানবশত শ্রীকান্ত গঙ্গামাটি হইতে চলিয়া গিয়াছিল; বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সারিয়া শ্রীকান্ত যখন গঙ্গামাটিতে ফিরিতেছে সেই সময় গ্রামবাসীদের সহিত কথাবার্তার মধ্যে গ্রামবাসীর মুখে বিদেশী শোষক শাসনকর্তৃপক্ষের রেললাইন বসাইয়া দরিদ্র পল্লীঅঞ্চলের শোষণ এবং দুঃখবৃদ্ধির ক্ষুব্ধ কাহিনীর অবতারণার জন্য পাঠক বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে কবি গহর

*'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে এই জায়গায় আছে, "দেশ বলিতে যেথায় দেশের চৌদ্দ আনা নরনারী বাস করে, সেই পল্লীগ্রামের কাহিনীই সাধু (আনন্দ) বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই—জঙ্গলের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম যেথায় বিকৃত পথভ্রষ্ট মৃতকল্প, জন্মভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না থাকা যে কত বড় না থাকা, মনে হইল আজিকার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই দৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।"

পল্লীনিবাসে শ্রীকান্তকে যখন সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে, এই সময়ে শ্রীকান্তর মুখে কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য, পল্লীর রাস্তাঘাটের দুরবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। মোটের উপর, ধনীর প্রাচুর্যের বা ক্ষমতাবানের শোষণের বিপরীতে দরিদ্রের এই দুর্দশার জন্য বেদনাবোধ অবশ্যই শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনার পরিচায়ক, তবে সে চেতনা পূর্ণাঙ্গ নয়, খণ্ডিত। কিন্তু অর্থনৈতিক চেতনা খণ্ডিত হইলেও যাহা এই চেতনার শেষ কথা, অর্থাৎ অসাম্যের, দুর্নীতির প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আবেগ সৃষ্টি, সে কর্তব্য সম্পাদনে শরৎচন্দ্র ব্যর্থ হন নাই। প্রাচুর্যের জুলুমের সহিত শোষণের হীনতা মিশিয়া দেশে যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, শেষপর্যন্ত তাহা থাকিবে না, মানুষের কৃত্রিম ভেদ শেষ অবধি লোপ পাইবে, এই ধরনের একটা আশাবাদ শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল, যদিও সেই আশাবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের যোগ ছিল কম, প্রধানতঃ হৃদয়ানুভূতির উপরই ছিল ইহার ভিত্তি। কিন্তু অর্থনৈতিক বনিয়াদ পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক সূত্রের উপলব্ধি বা অর্থনৈতিক ফলাফলের হিসাবে শরৎচন্দ্রের চেতনা তেমন সবল না হইলেও তাঁহার লেখক-মানসের অসামান্য দরদের স্পর্শে দরিদ্র শোষিতদের দুঃখ সুস্পষ্ট-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমকালীন দেশের অবস্থা তাঁহার লেখায় সুন্দর ফুটিয়াছে, এ হিসাবে লেখাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, বিশ্লেষণ উচ্চশ্রেণীর না হইলেও এ যুগের অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিচয়ও এই লেখা-গুলিতে পাওয়া যায়। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার ভূমিকা সক্রিয় সৈনিকের, ভারতে বিদেশী শাসন ও শোষণের কলঙ্কিত ছবি শরৎচন্দ্র বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলিষ্ঠভাবে ফুটাইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসে জমিদার বা অর্থবান ব্যক্তি প্রধান চরিত্র। এইরূপ চরিত্রের জীবিকা সংস্থানের প্রশ্ন লইয়া শরৎচন্দ্রকে বিব্রত হইতে হয় নাই, কারণ, বিত্তশালীর জীবিকার সমস্যাই নাই, জমিদারী সম্পদের আয়ে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইভাবে কতকগুলি নায়ক চরিত্রে বা প্রধান চরিত্রে জীবিকার্জনের কঠিন সমস্যা না থাকায় বাঙ্গালী জীবনের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের নিরিখে তাহাদের গতিপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সীমায়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ জীবিকার সমস্যা এমনিই একটি বড় সমস্যা, মনের উপর তাহার চাপ পড়ে প্রচুর, তাছাড়া জীবিকা সমস্যার সহিত অনেক সময় মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতির

সংঘর্ষ বাধে এবং তাহাতে চরিত্র জটিল হইয়া উঠে। এইরূপ জটিল চরিত্রই উপন্যাসের উপযুক্ত। জীবিকার সঙ্গে জীবনের মিল এবং অমিল, উভয় সম্পর্কই সম্ভব। সুতরাং এই চরিত্রগুলির জীবিকা সমস্যা না থাকায় অথচ বাঙ্গালীর জীবনবোধের নিরিখে ইহাদের প্রসার তেমন বেশী না হওয়ায় চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য 'পল্লী-সমাজ'-এ যেমন রমেশকে বা 'বিচিত্রা'য় আরম্ভ করা (শ্রাবণ, ১৩৪২) 'আগামীকাল' উপন্যাসে এককড়িকে জনকল্যাণের কাজে লাগান হইয়াছে, অনুরূপভাবে কোন কোন চরিত্রকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপ অর্থবান বা জমিদার ছাড়া শরৎচন্দ্র আরও কয়েকটি পুরুষ প্রধান চরিত্র আঁকিয়াছেন যেগুলির আয়ের হদিশ দেওয়া হয় নাই, অথচ উপন্যাসের হৃদয়গত প্রয়োজনে যাহাদের প্রায় সমস্ত সময় আটকাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই ধরণের প্রধান-চরিত্রের জীবিকা সংস্থান কেমন করিয়া হয়, এ প্রশ্ন স্বভাবতই অনবধানী পাঠকেরও মনে জাগে এবং সন্তোষজনক উত্তর তাহারা যদি খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে তাহাদের কাছে সমগ্র কাহিনীটি কিছুটা কল্পনাবিলাস বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাস্তব জগতে যাহার পৈতৃক সূত্রে বা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নাই, যাহার নিজের উপার্জন নাই এবং যাহাকে পোষণ করিবার স্বাভাবিক দায়িত্ব কাহারও নাই, এমন দরিদ্র যদি উপন্যাসের নায়ক হিসাবে ক্রিয়াশীল হয়, বস্তুগত বিশ্লেষণে তাহার অস্তিত্বে একটা ফাঁক অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। শরৎসাহিত্যে এইরূপ বিত্তহীন অথচ কর্মহীন চরিত্র অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু যাহারা আছে তাহাদের প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে আগ্রহোদ্দীপক। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত অথবা 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মহিম এই ধরণের চরিত্র। উপন্যাসে ইহারা প্রায় সময় বেকার জীবন যাপন করিয়াছে, উপন্যাসের বর্ণনায় তাহাদের বিত্তহীনতারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, অথচ কার্যক্ষেত্রে তাহাদের অর্থাভাবের তীব্রতা কোথাওই বড় একটা দেখানো হয় নাই, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মোটামুটি স্বচ্ছল-ভাবেই আর্থিক দায়িত্ববহনে তাহাদের আগাইয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। মনে হয়, উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বলিয়া তাহাদের হৃদয়ের চিত্রাঙ্কনে অধিকতর মনোযোগ দিয়া শরৎচন্দ্র এ হিসাবে অনেকটা অমনোযোগী হইয়াছেন। এই আর্থিক দিকটির সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতার প্রয়োজন আছে, কারণ, এই চরিত্রগুলির জীবিকার প্রশ্ন বাস্তবতার হিসাবে ইহাদের জীবনের সহিত কিছুটা

জড়াইয়া আছেই এবং উপন্যাসে যে কাঠামোতে ইহাদের রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা যদি নাও থাকে, অন্ততঃ কিছুটা আর্থিক স্থিতিশীলতার সুবিধা না থাকিলে কাহিনীর গঠনরীতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যায়। 'দত্তা'র নরেনের মত কম ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র এই ত্রুটি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন। নরেনও প্রেমিকের যে ভূমিকায় জড়াইয়া গিয়াছিল এবং বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার হইয়াও সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহার চরিত্রের অর্থনৈতিক সঙ্গতি সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠিতে পারিত, কিন্তু শরৎচন্দ্র নরেন চরিত্রটির জীবনায়নের সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই তাহাকে আঁকিয়াছেন। 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল অন্যহিসাবে খুবই বলিষ্ঠ চরিত্র, কিন্তু শরৎচন্দ্র নরেনের জীবনযাপন সহজ করিয়া যেভাবে সেক্ষেত্রে আর্থিক দিকটি মানাইয়া লইয়াছেন, কমলের ক্ষেত্রে তাহা পারেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে কমলকে হৃদয়ের দিক হইতে আঁকিতে গিয়া অর্থনৈতিক রূপটি অবহেলিত হইয়াছে। নরেনের চেয়ে শিবনাথ-পরিত্যক্তা কমলের জীবিকা-সংস্থানের সংগ্রাম অনেক কঠিন, সে গরীব শ্রমিকদের ছেলেমেয়ের জামা সেলাই করিয়া চালায়। কিন্তু তাহার অতিথি সেবা আছে, বাড়ীভাড়া আছে, ঝিয়ের বেতন আছে, নিজের খরচ আছে। আগ্রার মত শহরে এত খরচ কি করিয়া কমল চালায় তাহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারে না।

পুরুষ চরিত্রের তুলনায় স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ স্ত্রীচরিত্রই গতিবেগসম্পন্ন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নায়িকাদের পাশে নায়কদের অনেকস্থলেই ম্লান মনে হয়। অর্থনৈতিক চেতনার দিক হইতে এই নায়িকা চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রকে খুব কম ঝুঁকি লইতে হইয়াছে, কারণ তাঁহার সাহিত্যে মেয়েরা অধিকাংশক্ষেত্রে আসিয়াছে হৃদয়ের কারবারী হইয়া, ভালবাসা স্নেহমমতার ব্যাপারেই প্রায়ক্ষেত্রে তাহাদের ভূমিকা নির্ধারিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক হিসাবে সমাজে মেয়েদের স্বাভাবিক অবস্থা অনুযায়ী তাহারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবার সুযোগ কম। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি, দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের সুনন্দা, 'পণ্ডিতমশাই'-এর কুসুম, 'গৃহদাহ'-এর অচলা, অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়'-এর সবিতা,—ইহারা যত বলিষ্ঠ নারীচরিত্রই হউক, আর্থিক হিসাবে ইহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, এদিক

হইতে সর্বাংশে ইহারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণীতে আছে 'চন্দ্রনাথ'-এর সরযূ, 'পথ-নির্দেশ'-এর হেম, 'দেনা-পাওনা'র হৈম, 'দর্পচূর্ণ'র ইন্দু, বিমলা, 'দেবদাস'-এর পার্বতী, 'বিরাজ বৌ'-এর বিরাজ, 'স্বামী'র সৌদামিনী, 'নববিধান'-এর 'উষা, 'পরিণীতা'র ললিতা, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'চরিত্রহীন'-এর সুরবালা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিও অধিকাংশক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা নিরপেক্ষভাবে হৃদয়বৃত্তির দিক হইতে আঁকা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গতিশীল প্রধান চরিত্রগুলির কেহই কিভাবে খরচের টাকা আসিবে এ সম্বন্ধে চিন্তিত নয়, 'গোরা'র সুচরিতা, 'নৌকাডুবি'র কমলা, 'যোগাযোগ'-এর কুমু, 'ল্যাবরেটরী'র সোহিনী, 'দুইবোন'-এর উর্মিলা, 'মালঞ্চে'র নীরজা,—ইহাদের কাহাকেও টাকা পয়সার জন্য ভাবিতে হয় না। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর জীবনের গতিপরিণতিতে অর্থ নৈতিক চেতনার গুরুত্ব সংস্থানের সুযোগ ছিল, কিন্তু তাহার চরিত্র রূপায়ণে এই দিকটিতে কবি বিশেষ নজর দেন নাই। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যর অর্থকরী বৃত্তির উল্লেখমাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহার রোমান্টিক প্রেমিকার ভূমিকায় উপন্যাসে আর্থিক প্রশ্ন মাথা তুলিবার সুযোগ পায় নাই।

শরৎসাহিত্যে কতকগুলি স্ত্রী-চরিত্র আছে যাহারা আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছল এবং চরিত্রের অগ্রগতিতে এই আর্থিক স্বচ্ছলতা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা থাকার জন্যই তাহাদের মানসিক জটিলতার বিকাশ ও প্রকাশের অনেকখানি সুযোগ ঘটিয়াছে। 'দত্তা'র বিজয়া, 'বড়দিদি'র মাধবী (পিতৃগৃহে), 'জাগরণ'-এর আলেখ্য, 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রগুলি অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনা কিছুটা কার্যকরী হইয়াছে বলা চলে। শিবনাথ তাহার জীবন হইতে বিদায় লইলে কমলকে সামান্য জামা সেলাইয়ের কাজে লাগাইয়া শরৎচন্দ্র এই সামান্য আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ দিয়া তাহার চরিত্রবিন্যাসের পথ করিয়া লইয়াছেন, এই বৃত্তির আশ্রয়ে আগের কমলের হিসাবে এই সময়কার কমলের চরিত্র লক্ষণীয়ভাবে স্থিতিশীলতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা চলে যে, শরৎচন্দ্র স্বাধীন বৃত্তিসম্পন্ন যে চরিত্রগুলি আঁকিয়াছেন তাহাদের অনেকের মধ্যেই অর্থনৈতিক চেতনার কিছুটা সক্রিয়তা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়। বাইজী বা পতিতা শ্রেণীর স্ত্রীলোকগুলি, এমনকি 'চরিত্রহীন'-এর মেসের ঝি সাবিত্রীর বৈশিষ্ট্যও এ হিসাবে লক্ষণীয়।

বস্তুতঃ সাবিত্রীর বৃত্তিই তাহাকে ভ্রষ্ট-জীবনের পঙ্কিলতায় নিমজ্জমান অবস্থাতেও নিজেকে কোনক্রমে ভাসাইয়া রাখিবার সুযোগ দিয়াছে এবং এই বৃত্তিগত আনুকূল্যটুকুই নিষ্ঠার সহিত ব্যবহার করিয়াও সে জীবনে প্রেম ও কর্তব্য-বোধের মহান সমন্বয় ঘটাইয়াছে। এই শ্রেণীর স্ত্রী-চরিত্রগুলিকে ভালবাসা যখন একেবারে ডুবাইয়াছে, তখন অবশ্য অর্থনৈতিক চিন্তা তাহাদের সংশ্লেষ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং হৃদয়ানুভূতির প্রবলতাই তাহাদের গতিপথ নির্ধারণ করিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহারা স্বাধীনবৃত্তির মানুষ, ততক্ষণ তাহাদের বৃত্তি তাহাদের নিজ নিজ পথ স্থির করিবার সুবিধা দিয়াছে এবং সে পথে সুখ বা দুঃখ যাহাই আসুক, তাহার দায়িত্ব তাহারাই গ্রহণ করিয়াছে।

'গৃহদাহ' জটিল মনস্তত্ত্বমূলক উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকা অচলার চরিত্র গঠনেই বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার যেমন স্ফুরণ ঘটিয়াছে, তাঁহার অর্থনৈতিক চেতনারও (যাহা প্রায় সর্বত্রই খণ্ডিত) তেমনি অনেকখানি সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'গৃহদাহ'-এর নায়িকা অচলার জীবন অর্থনৈতিক পটভূমিকার চাপেই অবিন্যস্ত হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্মনে সব সময় এই চাপ কার্যকরী হইয়া তাহার চরিত্রের জটিলতা বাড়াইয়াছে। সুরেশের অসামাজিক জৈব কামনাকে অচলা যত ঘৃণাই করুক, সুরেশের ব্যক্তিত্বের কাছে সে নিজেকে হারাইয়া না ফেলিয়া পারে নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে, সুরেশ যে বুদ্ধিমতী আধুনিকা অচলাকে লইয়া একত্রে ঘর বাঁধিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেজন্য তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতা নিঃসন্দেহে বহুলাংশে দায়ী এবং সুরেশের এই অর্থপ্রাচুর্য অবশ্যই অচলাকে অনেকটা অভিভূত করিয়াছে। সুরেশের ধনৈশ্বর্যের আকর্ষণ অচলার সচেতন মনে যদি নাও থাকে, অচেতন মনে অবশ্যই ক্রিয়াশীল হইয়াছে।* দুর্যোগের

*অনুরূপ মন্তব্য পরিণীতার ললিতা, পথনির্দেশের হেম, এমনকি রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত সম্পর্কেও করা যায়। শেখরের টাকা ধীরে ধীরে ললিতাকে শেখরের দিকে, গুণীনের অর্থ-স্বাচ্ছল্য হেমকে গুণীনের দিকে নিঃসন্দেহে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছে। এই আকর্ষণ অবচেতন মনে দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হেম শ্বশুরবাড়ীতেও দেবরের সহিত বিরোধে নিঃসম্পর্কিত গুণীনের টাকার জোরের ভয় দেখাইয়াছে। শ্রীকান্ত মুখে না বলিলেও কাজকর্ম ছাড়িয়া

রাত্রিতে রামবাবুর বাড়ীতে একঘরে শয়ন করিতে বাধ্য হইয়া অচলার আত্মরক্ষা সম্ভব হইল না, পরদিন সকালে রামবাবুর চোখে পড়িয়াছে তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখ, অনুশোচনার দহনে অচলার সমস্ত লালিত্য যেন একরাত্রে ম্লান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আবার সুরেশের দেওয়া অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া অচলা সুরেশের গৃহ হইতে রামবাবুর বাড়ী গিয়াছে। এইভাবে সুরেশের সঙ্গে রামবাবুর বাড়ী যাওয়ার মধ্যে অচলার অসহায় অবস্থার সহিত মানাইয়া লইবার চেষ্টা কিছুটা অবশ্যই আছে, কিন্তু সেইসঙ্গে সুরেশের অর্থস্বাচ্ছল্য তাহাকে প্রতিকূল পরিবেশেও মোটামুটি ভালভাবে দিনযাপনের সুযোগ দিবে, এই ধারণাও অচলার মনে কার্যকরী হইয়াছে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে অচলা যে মহিমের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও মহিমকে এড়াইয়া সুরেশের প্রতি ঝুঁকিয়াছে, ইহার মূলে সুরেশের অর্থপ্রাচুর্যের প্রভাব অন্তত: কিছুটা কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী যে চরিত্র হিসাবে অতটা উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ তাহার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য ও স্বাধীনতা, অন্যথায় শুধু ভালবাসা সম্বল হইলে শ্রীকান্তর মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানের জন্য ওই ভাবে নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়া রাজলক্ষ্মীর পক্ষে মোটেই নিরাপদ হইত না। বস্তুতঃ রাজলক্ষ্মীর পেশাত্যাগ প্রেমকে আরও গতিশীল করিয়াছে, শ্রীকান্তকে আরও গভীরভাবে এবং নিবিড়ভাবে ভালবাসিবার সুযোগ দিয়াছে। অর্থাভাব থাকিলে এই পেশা ছাড়িবার যে অসুবিধা হইত, তাহা 'আঁধারে আলো'র বিজলীর ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র নিজেই দেখাইয়াছেন। অবশ্য রাজলক্ষ্মীর অর্থপ্রাচুর্য শ্রীকান্তর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার পূর্ববর্তীকালের উপার্জন ধরিয়া লইলে সমগ্র উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী যেভাবে ইচ্ছামত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে, তাহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল শরৎচন্দ্রের বিচিত্র বলিষ্ঠ সৃষ্টি, এই চরিত্রের বাস্তব মূল্য যাহাই হউক, অর্থনৈতিক দিক হইতে চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র কিছুটা সচেতনভাবে আঁকিয়াছেন। কমলের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া তাহার নিকট হইতে শিবনাথ সরিয়া যাইবার পর, কমল নিজেও সচেতন এবং তদনুসারেই সে তাহার জীবন

রাজলক্ষ্মীর সহিত নিজেকে যে এতখানি জড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পিছনে প্রেম ছাড়া রাজলক্ষ্মীর অর্থপ্রাচুর্যও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছে। তবে আবার যখন অজিত অবলম্বন হিসাবে জুটিয়াছে, কমল তখন নিজের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা গুটাইয়া লইয়া অজিতের উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহার সহিত পাঞ্জাবে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী অত্যুজ্জ্বল স্ত্রীচরিত্র, এরূপ সচল স্ত্রীচরিত্র বাংলা-সাহিত্যে খুবই কম। এই চরিত্রটির মানসিক জটিলতা যেখানে শুরু হইয়াছে, সেখানে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পটভূমিকা রাখা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বামী হারাণের অসুখের সময় অনঙ্গ ডাক্তার শুধু ডাক্তারি করিতে তাহাদের বাড়ী আসে নাই, কিরণময়ীর দিকে হাত বাড়াইয়া সংসার খরচের অর্ধেক ভার লইয়াছে এবং এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কিরণময়ী যদিই বা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার শাশুড়ীর নিরুপায়তাজনিত লোভ তাহা করিতে দেয় নাই। 'পরিণীতা'য় গরীব ঘরের মেয়ে ললিতা যে ধনী প্রতিবেশী শেখরনাথের সঙ্গে আপন জীবনকে ওইভাবে জড়াইয়া ফেলিল, তাহার জন্য শেখরনাথের টাকার এবং সেই টাকায় কুমারী বয়সেই ললিতার ভাগ বসাইবার অবাধ সুযোগ যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছে। 'পথনির্দেশ'-এ হেমনলিনীকে গুণীনের সহিত সম্পর্কেই শুধু নয়, তাহার জীবনের প্রসারে ও প্রতিষ্ঠায় গুণীনের অর্থ স্বাচ্ছল্যের সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা কম সাহায্য করে নাই। পল্লীসমাজ, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, বড়দিদি, প্রভৃতি উপন্যাস-গল্পে নারী হৃদয়ের যে মাধুর্য, যে স্নেহশীলতা উৎসারিত হইয়াছে, রমা, নারায়নী, বিন্দু, হেমাঙ্গিনী ও মাধবীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য ব্যতীত তাহা হয়ত দানা বাঁধিবারই সুযোগ পাইত না। দানে, সাহায্যে, উপহারে, আপ্যায়নে এই সব নারীর কোমল হৃদয়পদ্ম যেভাবে দল মেলিয়াছে, আর্থিক অভাব থাকিলে সেগুলির প্রকাশ ও বিকাশ এমনভাবে হইত কিনা জোর করিয়া বলা যায় না।

তবে এই প্রসঙ্গেই পুনরায় উল্লেখ করা দরকার যে, হৃদয়াবেগ-প্রবণ লেখক শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে বাস্তবতামূলক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিরপেক্ষভাবেই হৃদয়বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'আঁধারে আলো'র বিজলী বা 'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী ইহার দৃষ্টান্ত। 'শ্রীকান্ত'র বৈষ্ণবী কমললতা বা 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যের বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদা সামাজিক বিরূপতার চাপে লক্ষ্যহীন পথকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু বিজলী বা চন্দ্রমুখী এরূপ সামাজিক বিরূপতার মুখোমুখি দাঁড়ায় নাই, প্রেমের জন্যই কঠোর দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছে।

'দেবদাস'-এর জন্য তবু চন্দ্রমুখী প্রতীক্ষা করিয়াছে, একদিন দেবদাসকে পাইবার আশা লইয়া চন্দ্রমুখী ব্যবসা ছাড়িয়া দুঃখের কঠিন জীবন মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু বিজলী নিশ্চিতভাবে জানিত যে, সত্যেন্দ্রকে সে কখনই পাইবে না; অথচ সত্যেন্দ্রের প্রতি ভালবাসায় ব্যবসা ছাড়িয়া সে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ধূসর নিরাশ্বাস জীবনযাপন করিয়াছে। তাহার যাইবার জায়গা নাই, পতিতা-পল্লীতেই তাহাকে বাস করিতে হইবে, পেটের দায়ে হয়তো তাহার ভালবাসার গৌরব টিকিবে না, তবু পাছে বাইজী জীবনে আবার সে জড়াইয়া পড়ে এইজন্য বিজলী নিজের যোগ্যতা অনভ্যাসে এবং বাজারে অনুপস্থিতির জন্য কমিয়া গিয়াছে জানিয়াও পারিশ্রমিকের হার বাড়াইয়া দিয়াছে, লোকে যাহাতে এই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাহাকে ডাকিতে উৎসাহ না পায় এবং সেও যাহাতে এই হীনবৃত্তির পঙ্কিলতার স্পর্শ হইতে কিছুটা দূরে থাকিতে পারে। তাহার উপায় নাই, উপার্জনের অন্যপথ জানা নাই, বাইজী বৃত্তি করিয়াই তাহাকে জীবনধারণের মত কিছু রোজগার করিতে হইবে তবে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করিবার মত অর্থোপার্জনে ঝোঁক দিয়া তাহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; তাছাড়া পতিতা পল্লীতে বাস করিয়া বৃত্তি ছাড়িয়া সৎজীবন যাপন করা একান্ত কঠিন, সে সংকল্প প্রকাশ্যে করিলে পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূল চাপ আসিতে বাধ্য এবং সে চাপ বিজলীর মত অসহায় নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোক ঠেকাইতে পারে না। সেইজন্য নামে মাত্র ব্যবসা চালাইয়া অথবা ব্যবসা চালাইবার ভাণ করিয়া প্রেমের মধুর স্মৃতি বুকে বহিয়া বিজলী বাইজীবৃত্তির গ্লানি হইতে যথাসম্ভব আপনাকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

যৌথ পরিবার প্রথা বহুদিন আমাদের দেশে পারিবারিক শৃঙ্খলা, মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদ রক্ষায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, সম্প্রতি নানা কারণে সেই যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। শরৎচন্দ্র প্রাচীন এই প্রথার প্রতি অনুরাগী ছিলেন, যদিও তিনি অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন যে, এই প্রথার অস্তিত্ব বর্তমান যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় স্থায়ী হওয়া একরূপ অসম্ভব। আগে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে পারিবারিক মর্যাদাবোধ বড় ছিল, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ বেশি ছিল, এবং উপার্জনের জন্য আগেকার মানুষ নিজের কৃতিত্বের চেয়ে অদৃষ্টের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া সেই সৌভাগ্যে গর্বস্ফীত না হইয়া অথবা নিজের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট

হইয়া সমগ্র পরিবারের প্রতি উদারভাবে তাহার কর্তব্য পালন করিতে আনন্দ বোধ করিত। এ যুগে মানুষকে অনেক সময় আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতে হওয়ায়, আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রসার ঘটায়, জীবনযাত্রা জটিল হওয়ায়, জিনিষপত্রের দর বাড়ায়, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সর্বোপরি নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্য কাজে-কর্মে ও সুবিধার আশায় নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যার সহিত গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বসবাসে অভ্যস্ত হওয়ায় আগেকার সেই যৌথ পরিবারের বন্ধন এখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্র অবশ্য জানিতেন যে, অর্থনৈতিক বিবেচনায় যৌথ পরিবার প্রথা পরশ্রমজীবিত্বের প্রশ্রয় দেয়, ইহাতে পরনির্ভরশীলদের মনে স্বার্থপরতা ও ঈর্ষা জাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, কারণ, আইনগত অধিকারের এবং মর্যাদার প্রশ্নে পরিবারের উপার্জনশীলদের বিপরীতে নিজেদের অবস্থার জন্য ইহারা অন্তর্নিহিত হীনতাবোধে ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু তবু হৃদয়ানুভূতি-প্রবণ লেখক হিসাবে অসহায়ের পরম আশ্রয় এবং উপার্জনশীলদের সংযত থাকিবার অনুপ্রাণনা সৃষ্টিকারী যৌথ পারিবারিক প্রথার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই দুর্বলতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত 'নিষ্কৃতি' গল্পে ফুটিয়াছে। 'নিষ্কৃতি'-তে বেকার রমেশ স্ত্রী পুত্র লইয়া জ্যাঠতুতো দাদা গিরিশের সংসারে বাস করে, তাহাতে তাহার বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না, বরং তাহার স্ত্রী শৈলই সংসার চালায়, উপার্জনশীল গিরিশের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী শৈলকে কন্যার মত দেখেন এবং পরম বিশ্বাসে তাহার হাতে ঘরসংসারের সব ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। গিরিশের ছোটভাই হরিশ উকিল, সস্ত্রীক সে বিদেশে ছিল, একদিন সপরিবারে ফিরিয়া আসিল। হরিশ এবং তাহার নয়নতারা ভাল মানুষ সিদ্ধেশ্বরীর মন ভাঙাইয়া রমেশকে পরিবার লইয়া দেশের বাড়ীতে পৃথক হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল। তারপর হরিশ রমেশের সহিত মামলা বাধাইল। মামলার খরচ চালাইতে ক্রমে ক্রমে শৈলর সব গহনা চলিয়া গেল। এদিকে স্নেহময়ী সিদ্ধেশ্বরী রমেশের, শৈলের, বিশেষ করিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েগুলির জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই সময় একদিন গিরিশের নিমন্ত্রণ হইল গ্রামে। সেদিন শৈলদের দেখিয়া আসিবার এবং বাচ্ছাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী বিশেষ করিয়া গিরিশকে বলিয়া দিলেন। গিরিশ গ্রামের বাড়ীতে গিয়া শৈলর নিরাভরণ অবস্থা দেখিয়া ও সব কথা শুনিয়া তাঁহার নিজের নামে কেনা দেশের সেই বাড়ী ও জমিজমা

সমস্ত শৈলর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। গিরিশের এই কাজ, বলা বাহুল্য, হরিশ ও নয়নতারার ক্ষোভের কারণ হইল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী ইহাতে সবিশেষ আনন্দিত লইলেন। এই হইল মোটামুটি 'নিষ্কৃতি'র কাহিনী। এই গল্প হইতে বুঝা গেল শরৎচন্দ্র জোড়াতালি দিয়া হইলেও গিরিশের যৌথ পরিবারের ভাঙন উপস্থিত প্রতিরোধ করিলেন এবং তাই তাঁহার তৃপ্তি। অবশ্য এইভাবে শৈলর নামে সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া বেকার রমেশের হাত হইতে সম্পত্তি সত্যই রক্ষা করা যাইবে কি না এবং এজন্য খুড়তুতো ভাই রমেশ তাঁহার সংসারে থাকিয়া যাইবার সুযোগ পাইলেও অতঃপর তাঁহার নিজের ভাই হরিশ ও তাহার স্ত্রী নয়নতারাকে তাঁহার সংসারে শান্তিরক্ষা করিয়া মানাইয়া নেওয়া সম্ভব হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে সহৃদয় গিরিশ বা গিরিশের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র দুজনেই ভাবিয়া দেখিলেন না। গিরিশ বড় উকিল, এইভাবে কঠিন সমস্যা কোনক্রমে নিতান্ত সাময়িকভাবে চাপিয়া দিলে ভবিষ্যৎ অনর্থ বন্ধ হইবে কি না, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে মোটেই চিন্তিত করেন নাই। যদি অতঃপর রমেশ গ্রামেই থাকে, তাহা হইলেও শহর জীবনে অভ্যস্ত রমেশকে গ্রামের বাড়ীতে বেকার অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া তাহার মানসিক ভারসাম্য রক্ষার সুষ্ঠু পথ কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তবু শরৎচন্দ্র এই গল্পে উপস্থিত খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইদের যৌথ পরিবারটিকে আসন্ন ভাঙনের হাত হইতে যে রক্ষা করিতে পারিলেন, যৌথ পরিবারের প্রতি প্রসন্ন তাঁহার মন তাহাতেই যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। অর্থনীতির দিক হইতে ইহাতে যৌথ পরিবারের বড় আদর্শ ও কর্তব্য,—অসহায়দের আশ্রয় দান,—কার্যকরী হইল, বেকার রমেশ সপরিবারে দারুণ সঙ্কট হইতে যৌথ পরিবারে ফিরিয়া আসিয়া বাঁচিয়া গেল। হৃদয়বোধের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র ইহাতে স্বভাবতঃই আনন্দিত। তাঁহার আর একখানি উপন্যাস 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ অনুরূপ আগ্রহে শরৎচন্দ্র যৌথ পরিবারকে রক্ষা করিয়াছেন। গোকুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাহার বিমাতা ভবানী ও বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদের সহিত বিরোধ মিটাইয়া লইয়া যৌথ সংসারের পুরাতন রূপটি ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং ইহার জন্য তাহার শ্বশুর নিমাই রায়ের সাহায্যই শুধু ফিরাইয়া দেয় নাই, স্ত্রীর অশান্তির দায়িত্ব লইয়া তাহাদের যৌথ পরিবারের বিরুদ্ধচারী নিমাই রায়কে প্রচণ্ড অপমান করিয়াছে। গোকুলদের যৌথ পরিবার রক্ষার মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী লেখকের হাতে এই উপন্যাসে

কন্যা-জামাতার স্বার্থরক্ষা করিতে আসিয়া নিমাই রায় কুচক্রী ও হীন প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত দুইটি গল্প 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'তে লেখকের যৌথ পরিবার রক্ষার প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই গল্পদুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়, কাজেই ইহাতে প্রতিফলিত যৌথ পরিবারের আদর্শ তাহাদের নরম মনে সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক এবং তাহা যদি সত্যই হয় সেক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য অধিকতর সার্থক হইয়াছে বলা চলে। 'শুভদা' উপন্যাসে হারাণ অসচ্চরিত্র, সে বেশ্যাসক্ত, নেশা করে এবং সর্বোপরি সে চোর, মনিবের তহবিল হইতে প্রায় তিন হাজার টাকা ক্রমে ক্রমে সরাইয়াছে। কিন্তু হারাণের প্রায় অচল সংসারের যে রূপটি শরৎচন্দ্র ফুটাইয়াছেন, সেখানে হারাণের স্ত্রী শুভদা যেমন আছে, তেমনি আছে হারাণের বিধবা দিদি, টানাটানি বা অন্য কোন অজুহাতে বিধবা দিদিকে তাহার সংসারের কর্ত্রীত্ব হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিমাতার সহিত বিরোধের জন্য বিপ্রদাস স্ত্রী সতী ও পুত্রকে লইয়া বলরামপুরের পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সতীর মৃত্যুর পর সেই সংবাদ সমেত বিপ্রদাস যখন বাসুকে লইয়া ফিরিয়াছে, তখন দ্বিজদাস সাগ্রহে স্বেচ্ছায় বৌদিদির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া বাসুকে পৈতৃক বাড়িতে আটকাইয়া দিয়াছে। এই সময় তাহার মা দয়াময়ীও কন্যার গৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং সতী চলিয়া গেলেও এইভাবে ভাঙা মুখুজ্যে পরিবার আবার জোড়া লাগিয়াছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি পড়িলে মনে হয় যেন বিপ্রদাসের পরিবারের মাঝের ভাঙনটাই অপ্রকাশিত অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা, শেষের সকলকার মিলনাত্মক যৌথ পরিবারের রূপটিই স্বাভাবিক সুন্দর রূপ।

পণ প্রথা সম্বন্ধেও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ যুক্তির চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। পণপ্রথা খুবই খারাপ জিনিষ এবং শরৎচন্দ্র স্বভাবতই ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। নারীর স্বাধীনতা, নারীকে নিজস্ব মহিমায় সংস্থাপন শরৎচন্দ্রের লেখার একটি প্রধান দিক, সে হিসাবে নারী-জীবনের পক্ষে মহা-অসম্মানকর পণপ্রথার তিনি বিরোধিতা করিতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু পণপ্রথার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে, আলোচনার সময় সে দিকটি মনে রাখা উচিত। শরৎচন্দ্র তাঁহার আবেগপ্রবণ মানব-হিতৈষী মন লইয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বহুদিন হইতে

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির হাতিয়ার লইয়া লড়াই করা এক জিনিষ, আর হঠাৎ আবেগ বশে এই দুঃখজনক প্রথার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা অন্য জিনিষ। শরৎচন্দ্রের মধ্যে শেষের দিকটির প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। একটি দৃষ্টান্তেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তটি 'শ্রীকান্ত'চতুর্থ পর্বের। পুঁটু নামে মেয়েটিকে শ্রীকান্ত নিজের গলা হইতে নামাইয়া তাহার পছন্দমত পাত্র কালিদাস বাবুর ছেলে শশধরের সঙ্গে বিবাহ দিতে আপন পকেট হইতে বিবাহের পণস্বরূপ আড়াই হাজার টাকা দান করিবে বলিয়া কথা দিয়া বসিল। কিন্তু পরের জন্য তাহার সীমাবদ্ধ সঞ্চয় হইতে এতগুলি টাকা বাহির করিতে আবেগের মুখে সে যে প্রতিশ্রুতিই দিয়া থাক, ব্যাপারটা ভাবিবার যত সময় মিলিতেছিল, ততই এই বোকামির জন্য শ্রীকান্ত মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল। তারপর পাত্র আশীর্বাদের দিন পাত্রের পিতা কালিদাসবাবু অভ্যাগতদের সামনে যখন দাম্ভিকতা দেখাইলেন, শ্রীকান্ত তখন আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। তাহার অর্থশোক ও তজ্জন্য ক্ষোভ যেন এই সুযোগে ফাটিয়া পড়িল, মনের ঝাল মিটাইবার জন্য বিশেষ করিয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে শ্রীকান্ত উত্তেজিত হইয়া এক কড়া বক্তৃতা দিয়া বসিল। ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে অথবা সাধারণ ভাবসত্য হিসাবে এসব কথা বলিলে হয়তো মানাইয়া যাইত, কিন্তু ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে অপমানিত করা হইল বরের পিতা কালিদাস বাবুকে তাঁহারই বাড়ীতে বসিয়া। এ অবস্থায় শ্রীকান্তর বক্তৃতার যত জোরই থাক এবং তাহার উক্তির নীতিগত মূল্য যাহাই হউক, ইহার বাস্তবদিকও একটা আছে এবং সেদিকে দৃষ্টি দিলে শ্রীকান্তর এইভাবে বরের পিতা কালিদাসবাবুকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে আত্মীয় পরিজনবর্গের সম্মুখে অপমান করা কখনই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। পণপ্রথা দেশে চলিতেছে, পাত্র হিসাবে শশধর স্বচ্ছল গৃহস্থ সন্তান, বি. এ. পাশ, সমাজের চলতি অবস্থায় আড়াই হাজার টাকা পণ পাওয়া তাহার পক্ষে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া নয়, এবং আরও বড় কথা এই যে, শ্রীকান্তর উত্তেজিত নিন্দাবাদে কালিদাসবাবু যদি রাগ করিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দিতেন, শ্রীকান্ত টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিলেও হত-ভাগিনী মেয়েটির ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া যাইত। তাছাড়া গ্রামে তো পুঁটুর দরিদ্র পিতাকে সপরিবারে বাস করিতে হইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে অপমানিত শক্তিমান কালিদাসবাবুর যদি প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে তাহা হইলে পুঁটুদের কে বাঁচাইবে? পণপ্রথার অর্থনৈতিক কোন যৌক্তিকতা আছে কি

না এবং সর্তহীনভাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে অবিমিশ্র নিন্দা করা চলে কি না, সে প্রশ্নও একেবারে তুচ্ছ নয়। বর্তমানে হিন্দু কন্যাও পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হইতেছে, 'শ্রীকান্ত' রচনাকালে পিতার সম্পত্তিতে বিবাহিতা কন্যার কোন অধিকার ছিল না সেকথাও মনে রাখিতে হইবে। শরৎচন্দ্র অবশ্য এসব দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি এক্ষেত্রে আবেগের বশে পাঠকের ভাললাগার মত করিয়া বহুনিন্দিত পণপ্রথার বিরুদ্ধে শ্রীকান্তর মুখ দিয়া গালিগালাজ করাইয়াও শেষ পর্যন্ত কালিদাসবাবুর বিবেক-বোধ জাগ্রত করিয়া শ্রীকান্তকেই জিতাইয়া দিলেন। কালিদাস বাবু শান্ত ভাবে পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রাখার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকান্তর দেওয়া টাকা গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছেন এবং বিনাপণে পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হইয়াছেন। হৃদয়প্রধান লেখক কালিদাসবাবুর আরও উদারতা দেখাইয়াছেন। যে শ্রীকান্ত একটি প্রচলিত প্রথা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে বসিয়া তাঁহাকে নিদারুণ অপমান করিল, তিনি সেই শ্রীকান্তর মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং বিবাহের প্রীতিভোজের দিন তাহার বাড়ীতে আসিয়া উৎসবে যোগ দিতে শ্রীকান্তকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মুখে মেয়ের বাপের কর্তব্যবোধ ও দৃঢ়তা জাগাইবার এক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া এই প্রসঙ্গটি যেভাবে শেষ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার হৃদয়প্রাধান্যেরই পরিচয় মিলে। এইখানে আছে ঃ—নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাত জোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।"
—বলা নিষ্প্রয়োজন, এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি সমাজের অবস্থানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে মেয়ের বিবাহ দিতেছে না এমন সকলের কাছেই মুখরোচক, কিন্তু যে বেচারী বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা, তিনি ইহার মধ্যে লেখকের সহানুভূতিজনিত সান্ত্বনার স্পর্শলাভ করিলেও সত্যকার আশ্বাস কি পাইয়াছেন? বিশেষ করিয়া এখন হইতে অর্ধ-শতাব্দী কি ততোধিক পূর্বেকার সমাজে বয়স্থা মেয়ে ঘাড়ে লইয়া এবং সমাজের বিরূপতার দায়িত্ব লইয়া মেয়ের বাপের

পক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে ছেলের বাপকে এভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো সত্যই অত্যন্ত কঠিন ছিল।

মানুষ দারিদ্র্যের চাপে হীন হইয়া যাইতে পারে, ধনীর শোষণের যন্ত্র হইয়া পড়িতে পারে, একথা শরৎচন্দ্র জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই তিনি ভৈরব আচার্যের মত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভৈরব রমেশের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াও ভালোমানুষ রমেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া অথবা সাধারণভাবে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন না করিয়া শক্তিমান ধনী ও সমাজপতি বেণী ঘোষালের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল এবং রমেশের জেলের কারণ হইল। কিন্তু এই ভৈরবের মত চরিত্রের স্বাভাবিকতা দেখাইয়াও শরৎচন্দ্র ভৈরবের বিপরীতে বেণী ঘোষালের গ্রামেই তাহার অপ্রীতিভাজন হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও অতি দরিদ্র দীনু ভট্টাচার্যকে রমেশের প্রশংসাকারী রূপে দেখাইয়া মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা জানাইয়াছেন। ভৈরবের মত স্বার্থপর ভীরু সাধারণ মানুষ অবশ্যই অনেক আছে, কিন্তু দীনুর মত লোকও আছে বলিয়া সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হইতেছে। সনাতন প্রভৃতি গ্রামের চাষীরা রমেশের নিকট-সংস্রবে আসিয়া তাহার মহত্ত্বে প্রভাবিত হইয়া বেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, দীনু ভট্টাচার্য এইরূপ বিদ্রোহী চরিত্র নয়। রমেশের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতাও নাই, রমেশের দ্বারা সে বিশেষ প্রভাবিত নয়, তাহার সমাজ-সংস্কারও প্রবল, তাহার অন্তরে সত্য-স্বীকৃতির আকুতি আছে বলিয়া সে রমেশের পক্ষে, বেণীর বিপক্ষে। দারিদ্র্য মানুষকে হীন পরিবেশে টানিয়া আনিয়া হীন করিতে পারে একথা অনেকক্ষেত্রে-সত্য কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়, শরৎচন্দ্রের ইহাই ধারণা। যে ক্ষেত্রে সাধারণ গরীব মানুষ এই হীনতার উর্ধ্বে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে তাহার প্রচারে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ছিল, কারণ এই প্রচার দ্বারা মানুষকে সত্যের ও ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি সমাজকল্যাণের আশা রাখিতেন। এইজন্যই 'হরিলক্ষ্মী' গল্পে অট্টালিকাবাসিনী দাম্ভিকা ধনীগৃহিণী হরিলক্ষ্মীর বিপরীতে কুটিরবাসিনী দরিদ্রা কমলার বহু ক্ষতি সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া সত্যের পথে চলিবার দৃঢ়তাকে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত জিতাইয়া দিয়াছেন। হরিলক্ষ্মী তাহাকে আয়ত্তে না পাইয়া স্বামী শিবচরণকে দিয়া মামলা বাধাইল, কমলার সর্বস্ব গেল, তাহার স্বামী বিপিনকেও সে হারাইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিলক্ষ্মীই দম্ভ ভুলিয়া নিজের অন্যায় উপলব্ধি করিয়া কমলার সব ভার লইয়া তাহাকে

কাছে টানিয়া লইল। এইভাবে সার্থক স্বচ্ছলতার প্রতিপত্তি ও দম্ভ একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ জয় ঘোষণা কতটা বাস্তব হইয়াছে অথবা সর্বস্বান্ত হইবার ও স্বামীকে হারাইবার ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সাধারণ নারী কমলার আত্মমর্যাদাবোধ ওইভাবে অটুট রাখা কতখানি স্বাভাবিক হইয়াছে সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু এইভাবে কমলার জন্য হরিলক্ষ্মীর মানস-পরিবর্তনের চিত্র অনুধাবন করিলেও শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের সহৃদয়তার এবং সমগ্রভাবে তাঁহার সমাজকল্যাণকর ভাবদৃষ্টির পরিচয় মিলিবে।*

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের শেষ পর্যায় পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, ধনী ও জমিদারদের দাপট সেখানে প্রচণ্ড, কিন্তু সেই দাপটের কাছে দরিদ্র ও অসহায়দের লাঞ্ছনার, এমনকি আত্মসমর্পণের ছবি দেখাইলেও শরৎচন্দ্র সেই দাপটের মূলগত অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিই বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের মহান কৃতিত্ব। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ইঙ্গিত ও সমাজতান্ত্রিক পটভূমির পদসঞ্চারের স্পন্দন অবধানী পাঠকের কাছে ধরা পড়ে; বেণীর লাঞ্ছনায় এবং রমেশের প্রতিকূল পরিবেশেও মর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং সেই সঙ্গে অত্যাচারী জমিদার বেণীর ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গের তুলনায় কুঁয়াপুর-পীরপুরের দরিদ্র-শোষিত হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়া পাইবার পথে দৃঢ়নিষ্ঠ পদক্ষেপ উপরোল্লিখিত পটভূমি পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে শরৎচন্দ্র এতটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, সেখানে তিনি এমন পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, অথবা চরিত্রের গতি-প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিয়াছেন

*শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-এ কুসুম চরিত্রের আত্মমর্যাদাবোধ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে অপরিসীম দারিদ্র্যে কষ্ট পাইয়াছে, বিবাহের পর তাহার একমাত্র অবলম্বন দাদা শ্বশুরালয়ভক্ত হইয়া তাহাকে আরও নিঃসঙ্গ, আরও বিপন্ন করিয়াছে, বৃন্দাবন তাহাকে পত্নীরূপে ঘরে লইয়া যাইতে চায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কুসুম নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়াছে এবং বৃন্দাবনের পত্নীত্বের সত্যকার অধিকার উপলব্ধি না করিয়াছে ততক্ষণে সে দুঃসহ দারিদ্র্যকেই আঁকড়াইয়া থাকিয়াছে। এই জন্যই সে বৃন্দাবনের মায়ের আশীর্বাদী সোনার বালা ফিরাইয়া দিয়াছে।

যাহাতে সহজেই বুঝা যায় সমাজের প্রচলিত অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রতি তাঁহার সমর্থন নাই। 'মহেশ' গল্পে এই মনোভাব স্পষ্ট, 'বাল্যস্মৃতি' 'হরিচরণ' প্রভৃতি গল্পেও অনুরূপ মনোভাব দেখা যায়। 'মহেশ'-এ গোফুর চাষী দারিদ্র্যে ও জমিদারের অত্যাচারে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে গ্রাম ছাড়িয়াছে। 'বাল্যস্মৃতি'-তে গরীব মেসের চাকর গদাধর অসহায়তার অভিশাপে লাঞ্ছিত হইয়া চাকুরী হারাইয়াছে। 'হরিচরণ' গল্পে চাকর হরিচরণ জ্বর গায়ে মনিবের লাথি খাইয়া শেষপর্যন্ত মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু এইসব দরিদ্র-অসহায়দের ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে তাহাদের দুর্ভাগ্যের জন্য শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি যাহা আভাসে ইঙ্গিতে একথাই বলিতে চাহিয়াছে যে, এই অন্যায় অব্যবস্থা সংসারে চিরকাল চলিতে পারে না, যাহারা নিজেদের স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতার দম্ভে এরূপ কাজ করে, তাহারা আপন শ্রেণীস্বার্থের কবর খনন করিতেছে। হরিচরণের মনিব দুর্গাদাস হরিচরণের মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে লাথি মারিয়া মরণের মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য মানবিক দুঃখবোধ করিয়াও মনিবানার ভ্রান্ত মর্যাদাবোধে এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটিকে একবার চোখের দেখা দেখিতে পর্যন্ত গেল না। দুর্গাদাসের এই মনোভাব ফুটাইয়া শরৎচন্দ্র প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী হীনতার দিকটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। এই উন্মোচনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাঁহার নিজের বিরাগ পাঠকমনে সঞ্চারিত করা। মানুষ দরিদ্র হইলে যে অসহায় অবস্থায় তাহার দিন কাটে, শক্তিমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার সাহস তাহার কিরূপ লোপ পায়, ক্রমে সে কিভাবে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ ভুলিয়া বসে, 'হরিচরণ' গল্পের হরিচরণ বা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের ভৈরব তাহার দৃষ্টান্ত। এই দারিদ্র্যের দৈন্য মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তি কতখানি শুকাইয়া দেয় 'অরক্ষণীয়া'র দুর্গামণি চরিত্রে তাহা শরৎচন্দ্র কঠোরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। দুর্গামণি অসহায়া দরিদ্রা জননী, কন্যা জ্ঞানদার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিবার সঙ্গতি তাঁহার নাই। সমাজের চাপ সহিয়া সহিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া দুর্গামণি জ্ঞানদার বিবাহ না হইবার কথায় শিহরিয়া উঠেন, তাঁহার সংস্কার তাঁহাকে যে কোন উপায়ে জ্ঞানদার বিবাহের জন্য উত্তেজিত করে। এ অবস্থায় দুর্গামণি শেষ পর্যন্ত সাধারণ কন্যাস্নেহ বা বিবেচনাবোধ পর্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছেন এবং মা হইয়া একমাত্র কন্যাকে বৈধব্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও বৃদ্ধের হাতে জোর করিয়া তুলিয়া দিতে

চাহিয়াছেন। এই করুণ চিত্রে শরৎচন্দ্র যে দুর্গামণিকে ব্যক্তি চরিত্র হিসাবেই শুধু নিষ্ঠুরা করিয়া আঁকিয়াছেন তাহা নহে, যে হীন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর্থিক অসহায়তার সুযোগ লইয়া মানুষকে নানা দিক হইতে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের রসটুকু শুষিয়া লইতে চায়, তাহার বিরুদ্ধেও শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে। অসহায় দুর্গামণির কাছে কন্যার সুখশান্তির চেয়ে সামাজিক বিধান, নিজের সংস্কার বড় হইয়াছে, এই দৃশ্য খুবই করুণ, কিন্তু দুর্গামণি যে সমাজে বাস করেন এবং যে অর্থনৈতিক দৈন্যের পেষণে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হয়, তাহার পরিবর্তন ঘটিলে তিনি অবশ্যই জননীসত্তা এভাবে সঙ্কুচিত করিতেন না। *

দারিদ্র্য দুর্বল মানুষকে কত অসহায়, কত ছোট করিয়া তোলে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে হারাণের অসুখের সময় কিরণময়ী সম্পর্কে অঘোরময়ীর মনোভাবে তাহার সম্যক পরিচয় মিলে। কিরণময়ী অঘোরময়ীর একমাত্র পুত্রের বধূ, তাঁহার পুত্র মৃত্যুশয্যায়, এই সময় কিরণময়ীর সঙ্গে অনঙ্গ ডাক্তারের যে ঘনিষ্ঠতা চলিতেছিল অঘোরময়ী তাহা লক্ষ্য করেন নাই এমন নয়। কিরণময়ী ভ্রষ্টা হইয়া যাওয়া মানে তাঁহার পারিবারিক মর্যাদা ধূলায় লুটাইয়া যাওয়া। বিশেষ করিয়া হারাণ যখন মরণাপন্ন, তখন পুত্রবধূর এই পরপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতার ক্লেদাক্ত দিক আরও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। তবু সব জানিয়া শুনিয়াও অঘোরময়ী প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। শুধু প্রতিবাদ করিতে পারা নয়, যেহেতু অনঙ্গ ডাক্তারের কামনা-পরিপূরণের একটা আর্থিক

* অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিবাহ সমস্যায় ক্লিষ্টা দুর্গামণির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—হিন্দু সমাজে অনূঢ়া কন্যা অসহায় মাতার উপর এমন নিদারুণ বোঝা যে অপত্যস্নেহের সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। দুর্গামণির দারিদ্র্য, সমাজের কলঙ্কভীতি, পরলোকে শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি সমস্ত জায়গায় বিফল হইয়া শুধু পরলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একমাত্র কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তাহাকে দুঃসহ অপমান পর্যন্ত করিয়াছেন। সমাজ ও সংসারের উৎপীড়ন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিকৃত করিয়া ফেলে—এই চিত্র তাহার জলন্ত নিদর্শন।"—(শরৎচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২।)

দিক আছে এবং ডাক্তারের দেওয়া সেই টাকায় অঘোরময়ীর সংসার বহুলাংশে চলে, নিরুপায় অসহায়তায় মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিয়া অঘোরময়ী পুত্রবধূকে এই নোংরা কাজে উৎসাহই দিয়াছেন। স্বামী তাহার কঠিন রোগগ্রস্ত, তাহার পক্ষে পরপুরুষের মনোরঞ্জন কিরূপ হীনতার তাহা বিদুষী কিরণময়ীর অজানা নয়। কিরণময়ী স্বামীকে যত কমই ভালবাসুক এবং তাহার দেহের ক্ষুধা যত তীব্রই হউক, এই করুণ পরিস্থিতিতে সাজিয়া গুজিয়া অনঙ্গ ডাক্তারের মনোরঞ্জনে সে এক সময় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়াই উঠিয়াছিল। কিন্তু অঘোরময়ী তাহাকে পাঁক হইতে উঠিয়া আসিতে দিলেন না। সামাজিক মূল্যবোধের দিক হইতে অঘোরময়ীর এ আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক হইতে চরম আর্থিক অনটনের ক্ষেত্রে মানুষ সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে তাহার সমস্ত মূল্যবোধ কিভাবে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, অঘোরময়ীর এই ব্যবহার তাহার কঠিন দৃষ্টান্ত।* আলোচ্য প্রবন্ধের গোড়ার দিকে দুর্ভিক্ষের সময় সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া মায়ের আপন প্রাণ বাঁচাইতে দুধে চুমুক দিবার যে ছবির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার সাহিত্যে জমিদার জোতদার শ্রেণীর ক্ষমতাবানদের ছবি আছে। ইহারা শুধু যে জমির মুনাফা ভোগ করিয়া স্ফীত হয় তাহা নহে, ভূমির উপর সেই অধিকারের জোরে তাহারা সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা তাহাদের

*'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পীড়িত পুত্রের জন্য উদ্বিগ্না অভাবগ্রস্ত সংসারের গৃহিণী অঘোরময়ীর এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন: "অঘোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাহার রূপসী বধূ যে ইদানীং সতী-ধর্মেরও সম্পূর্ণ মর্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু পুত্র মৃতকল্প, অসহ্য দুঃখের দিন আগতপ্রায়, এই মনে করিয়াই বোধ করি বধূর আচার ব্যবহারও উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যে ডাক্তার হারাণের চিকিৎসা করিতেছিল, সে যে কি অবস্থায় বিনা ব্যয়ে ঔষধপথ্য যোগাইতেছে, কেন সংসারের অর্ধেক ব্যয়ভারও বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না।"

দ্বারা অবিরাম শোষিত হয়, কিছুটা অভ্যাস বশে ও কিছুটা নিরুপায় বশ্যতায় এই দরিদ্রেরা তাহাদের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ পূরণ করে। আগেই বলা হইয়াছে, শরৎসাহিত্যে এই জমিদার শ্রেণীর লোকেরা যে অর্থ প্রাচুর্য ভোগ করে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারীর আয়ের মত অনুপার্জিত মুনাফা এবং এই টাকা তাহাদের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক না হইয়া স্বার্থসাধনের বা অপরের শ্রমশোষণের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই জমিদার জোতদারেরা ছাড়া শরৎসাহিত্যে এমন অনেক চরিত্র আছে যাহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প উপন্যাস সামাজিক সমস্যাদির উপর লিখিত, এই মধ্যবিত্ত নরনারী সেইসব সমস্যার সহিত প্রায় বিজড়িত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি আছে, মানবিক গুণের মর্যাদাবোধ আছে, স্নেহমমতা উদারতা আছে, আবার লোভ স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষত্রুটিও আছে। ইহারা জীবন সম্বন্ধে সচেতন, তাই একদিকে যেমন মানবিক স্পর্শকাতর অন্যদিকে তেমনি আপন অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন। সমাজের নানা বিচিত্র সমস্যা, মানুষের নানা সুখ-দুঃখময় পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শরৎচন্দ্র যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন, এই চিত্রে বিলাসী রুচিমান নাগরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষেরা বিশেষ ভীড় করে নাই, আবার সমস্যা সম্পর্কে চেতনাহীন সাধারণ মানুষদের ভিড়ও সেখানে কম। যে ধনী ব্যক্তি সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সামাজিক সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করে এবং যে দরিদ্র সেই সামাজিক সমস্যায় জড়াইয়া পড়িয়া কিছুটা সংগ্রাম প্রয়াস সত্বেও পরাজয়ের দুঃখবরণ করে, তাহাদের কিছু কিছু ছবি শরৎসাহিত্যে আছে, ইহা ব্যতীত শরৎচন্দ্রের লেখায় মধ্যবিত্তদের ছবিই বেশি। শিল্পতন্ত্রের পটভূমিকা শরৎসাহিত্যে বিধৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহার লেখায় ধনী শিল্পপতি বা শ্রমিকদের কথা বিশেষ বলা হয় নাই এবং শিল্পতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী ধনতন্ত্রের সমস্যাসমূহও শরৎসাহিত্যে অপেক্ষাকৃত কম। মধ্যবিত্তদের সুখদুঃখবোধে ঔদার্য ও সরলতার স্পর্শ কোথাও কোথাও থাকিলেও তাহাতে বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষের একটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব থাকে, তাহাদের মন এজন্য অস্থির বলিয়া তাহারা সহজভাবে ঘটনা বা সম্ভাবনাকে গ্রহণ করিতে পারে না। আদর্শের জন্য তাহাদের উৎসাহ যেমন অনেক ক্ষেত্রে মহত্ত্বের পরিচায়ক, স্বার্থপরতার জন্য তাহাদের হীনবৃত্তিও তেমনি অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়। শরৎসাহিত্যে এই মধ্যবিত্তদের সামগ্রিক রূপ সাফল্যের সঙ্গে

চিত্রিত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কৌলীন্য সমস্যা, 'দত্তা' 'পরিণীতায়' ব্রাহ্ম-হিন্দু সাম্প্রদায়িক সমস্যা, 'পল্লীসমাজ'-এ প্রাচীন সমাজের ও সমাজপতিদের অত্যাচারের সমস্যা, 'দেনাপাওনা' 'পল্লীসমাজ' 'মহেশ'-এ জমিদারের জুলুমের সমস্যা, 'শ্রীকান্ত' 'আঁধারে আলো' 'পথনির্দেশ' 'চরিত্রহীন' 'দেবদাস' 'বড়দিদি', 'পল্লীসমাজ' 'মন্দির' 'আলো ও ছায়া' 'বিলাসী' প্রভৃতিতে প্রেমের সামাজিক সমস্যা, 'বৈকুণ্ঠের উইল' 'বিন্দুর ছেলে' 'নিষ্কৃতি'-তে যৌথ পরিবারের সমস্যা, 'বিরাজবৌ' 'স্বামী' 'কাশীনাথ' 'দর্পচূর্ণ' 'সতী'-তে বিবাহিত নারীর বিচিত্র মানসিক অশান্তির সমস্যা, 'চন্দ্রনাথ'-উপন্যাসে অসামাজিক বিবাহের সামাজিক সমস্যা,—এইরূপ শরৎসাহিত্যে রূপায়িত সমস্যাগুলির সহিত মধ্যবিত্ত সমাজের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। মধ্যবিত্ত সমাজে এই সব সমস্যার চাপ যথেষ্ট ছিল এবং শরৎসাহিত্যে সেই সমস্যাপিষ্ট মানুষের যে ছবি আঁকা হইয়াছে, উত্তর কালের পরিবর্তিত অবস্থায় হয়তো তাহার গুরুত্ব ঠিক বুঝা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'তে আঁকা কৌলীন্য সমস্যার ভয়ঙ্কর রূপ আজ সমস্যা বিদূরিত হইবার পর ইতিহাসের বিষয় হইয়া গিয়াছে, তাহার বাস্তব কাঠিন্য পাঠকের অন্তর তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারে না। তবু এই সব ছবিতে শরৎচন্দ্রের নিষ্ঠা এবং মানব-দরদী মনোভাব চিরকালই সহৃদয় পাঠকের চোখে পড়িবে।

সামাজিক সমস্যার উপর জোর দিয়া শিল্পসৃষ্টি শরৎসাহিত্যের প্রধান দিক, অর্থ নৈতিক চেতনার হিসাবে তাঁহার মধ্যে একটু এলোমেলো ভাব লক্ষ্য করা যায় একথা মিথ্যা নয়। তবে অর্থ নৈতিক চেতনার এই অবিন্যস্ততা বা বলিষ্ঠতার অভাব সত্ত্বেও তাঁহার সামাজিক উপন্যাস-গল্পে অর্থ নৈতিক চেতনার সক্রিয়তা যে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। বিদেশী রাজশক্তির শোষণের ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক দৈন্যের কথা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, গ্রামের স্বার্থ না দেখিয়া রাজশক্তির স্বার্থ ও সুবিধামত রেললাইন বসাইবার ফলে গ্রামের পণ্য স্বচ্ছলতা হ্রাস এবং নদী ও জল নিকাশের খাল, নালা প্রভৃতির উপর সেতু নির্মাণের ফলে নদীর বহতা শক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া ছাড়াও জল নিকাশ ব্যবস্থা বানচাল হইয়া গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ও কৃষি-সম্পদ হানির কথা তাঁহার লেখায় একাধিক জায়গায় স্থান পাইয়াছে। দেশের বেকার সমস্যা এবং জনবাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি-আত্যন্তিকতা জন্য গ্রামের অর্থনীতির দুর্বলতা তাঁহার চোখে

ধরা পড়িয়াছে। কৃষি এদেশের অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা, অথচ চাষের অনুন্নতি এদেশের সর্বত্র দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে দেশের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি লোক বাস করে, কৃষি এবং সামান্য কুটীর শিল্প ছাড়া উপজীবিকা সেখানে আর কিছু না থাকায় বর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বৃহৎ এক অংশ বেকার থাকিয়া যাইতেছে। কাজেই চাষ যদি ভাল না হয় গ্রামবাসীর সপরিবারে জীবনধারণ অনিশ্চিত হইয়া পড়িবেই। শরৎচন্দ্র নিজে বিশেষজ্ঞ নন, তবু সুবিধা পাইলেই তিনি কৃষির উন্নতির জন্য তাঁহার মোটামুটি যেটুকু জানা আছে তাহা সাধারণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'দত্তা' চমৎকার হৃদয়-প্রধান উপন্যাস, ইহাতে কৃষির মত অর্থ নৈতিক সমস্যা আশা করা যায় না। কিন্তু এই উপন্যাসেই এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র চমৎকার মন্তব্য রাখিয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে নরেন যেখানে নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়া বিজয়ার কাছে নরেনের বন্ধু সাজিয়া তাহার পরিচয় দিতেছে সেখানে আছে :"আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈতৃক পেশা ; তাই সময়ে অসময়ে জমিতে দুবার লাঙল দিয়ে বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারি খেলা বলে। কোন জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকারের চাষ করা বলে—এ-সব জানে না।"

মোটের উপর সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য কম রাখিতে পারিলেও শরৎচন্দ্র স্বাভাবিক অর্থনৈতিক চেতনাবশে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে যে পটভূমিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহাতে তাঁহার শক্তির পরিচয় ফুটিয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শেষদিকে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে জীবিকার ক্ষেত্র তো বটেই, সমগ্রভাবে জীবনের ক্ষেত্রে যে ভাঙন শুরু হইয়াছিল এবং যাহাদের শোষণ করিয়া এই অভিজাতশ্রেণী অস্তিত্ব রক্ষা করে সেই তলার শ্রেণীর মানুষ যে ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছিল, সে ছবি শরৎ-সাহিত্যে আঁকা হইয়াছে। বঞ্চিত, রিক্ত, শোষিত, অসহায় মানুষদের প্রতি গভীর সহানুভূতিবশে তাহাদের ন্যায্য পাওনা দিবার যে আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্র তাঁহার কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধাবলীতে ও চিঠিপত্রে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশ তখন জেলে গিয়াছে, রমেশকে যাহারা দেবতার মত ভক্তি করিত এবং পরমাত্মীয়ের মত ভালবাসিত, সেই চাষী-কৈবর্ত্ত শ্রেণীর মানুষ-

গুলি ক্ষেপিয়া আগুন হইয়া আছে। রমেশকে যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া জেলে পাঠাইয়াছে, তাহাদের ইহারা ঘৃণা করে। রমা এই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন—এই তাহাদের ধারণা, কারণ রমা রমেশের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিল। রমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ী. প্রজারা বরাবরই এ পূজার প্রসাদ উৎসাহ করিয়া লইতে আসে, রমেশের কারাবরণের পর এবৎসর কিন্তু একজন চাষী প্রজাও প্রসাদ লইতে রমার বাড়ী মাড়াইল না। বেণীর প্রবল হুঙ্কার সত্ত্বেও রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জন শুকাইয়া গেল, চাষীদের মোড়ল সনাতন বেণী ও রমার মুখের উপর বলিয়া গেল, রমেশকে যাহারা জেলে দিয়াছে তাহাদের বাড়ী তাহারা কেহই খাইতে আসিবে না। সনাতনই বলিল পীরপুরের মুসলমান প্রজারা রমেশকে হিন্দুদের পয়গম্বর মনে করে, সেখানকার ছেলেরা বলে, "জমিদার তো ছোটবাবু (রমেশ)। আর সব চোর-ডাকাত। তাছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব -ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা তারাও তাই।" বলা বাহুল্য, পল্লী সমাজের এই দৃশ্য সমাজ-কাঠামোর গুরুতর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করিতেছে, তলার শ্রেণীর মাথা নিচু করিয়া বাঁচিতে অভ্যস্ত মানুষেরা মালিকত্বের মায়াবাদী দাবীকে অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছে; প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র এখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্বাভাস রাখিয়াছেন বলা যায়।

শরৎচন্দ্র সমাজের তলার শ্রেণীর মানুষের এবং সমাজের বৃহৎ এক অংশ হইয়াও পুরুষ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থায় অবহেলিত মেয়েদের মুক্তি চাহিতেন বলিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এইসব তলার শ্রেণীর মানুষ ও মেয়েরা কঠিন দুঃখবরণের ঝুঁকি লইয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী জানাক। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অধিকার অনেকটা আপনিই প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। অভাববোধ খারাপ জিনিস নয়, মানুষ যদি তাহার সত্যকার অভাব ঘুচাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য বা সম্পদ আয়ত্তে আনিবার দাবী জানায় অথব আন্দোলন করে, তাহাতে অন্যায় তো নাই-ই, বরং ইহার ফল ভালই, এই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত। এইজন্যই তিনি নিজে একবার হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের কাছে গোবিন্দপুরে জমিদার মোহিনী ঘোষালের অন্যায় জলক বিলির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয় তাহাদিগকে জিতাইয়া দিয়াছিলেন। (শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের শরৎচন্দ্রে

জীবনী 'শরৎচন্দ্র'-এর 'মামলায় জড়িত' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে সত্যসন্ধী রমেশের নেতৃত্বে জমিদারদের অন্যায়ভাবে বাঁধা জলকরের বাঁধ প্রজারা কাটিয়া দিয়া তাহাদের ধানক্ষেতগুলি বাঁচাইয়াছে, এ ছবি শরৎচন্দ্র যত্নের সহিত আঁকিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল ন্যায্যবস্তু পাইবার অধিকারবোধ হইতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রয়াস দেখা দেয়, উপাদান সংগৃহীত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিতবস্তু করায়ত্ত হয়। 'অভাববোধ সৃষ্টির জননীস্বরূপ' এই অর্থনৈতিক তত্ত্বে তাঁহার আস্থা ছিল। আমাদের দেশে মানুষের প্রয়োজনবোধ অত্যন্ত কম বলিয়া এদেশের সম্পদ বাড়িতেছে না, নতুবা সম্ভাবনার হিসাবে ভারতবর্ষ এত দরিদ্র থাকিত না, রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্রের এই অর্থনৈতিক ধারণা ছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র যেসব কথা বলেন ('তরুণের বিদ্রোহ', শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভার) তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তি কয়টিতেই মানুষের পণ্যভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কতটা আশাবাদী দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে: "একটা কথা পুরাণো-পন্থীদের দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না। এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাঁবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল, প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয়ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্ন না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা—তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না, তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।"

শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে খেয়াল খুশী মত টুকরা টুকরা ভাবে যাহা মনে আসিত, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ কয়েকটি টুকরা অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত 'বাতায়ন' পত্রিকায় (১৩৪৫ সালের ১৬ই বৈশাখ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনার পরিচিতিসূচক কয়েকটি খণ্ড-রচনা আছে, আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য পরিস্ফুটনে সাহায্য করিবে বলিয়া এইরূপ চারিটি লেখা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) বিদ্যা বা লেখাপড়া শেখার ফলে standard of living-এর

standard বাড়বেই এবং economic condition ভালো না হলে পারিবারিক অসন্তোষ বাড়বেই।

(২) Economic অবস্থা বাড়াবার উপায় একমাত্র শিক্ষিত পুরুষদের Industry গড়ে তোলা। ছোট দোকান করবার শিক্ষা ছোটবেলা থেকে শিখতে হয়। বি. এ. পাশ করবার পরে ও জিনিষ চলে না, ওখানে অশিক্ষা বরং কাজের।

(৩) জাতের ছোট বড় ভাঙার চেষ্টা করতে হবে।

(৪) Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middleman সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়েথেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ওদেশে Industryর উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নী কারবার করা হচ্ছে বাঙ্গলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"

উপরোক্ত 'টুকরো কথা' উদ্ধৃতির চতুর্থ টুকরোটি হইতে বুঝা যাইবে শরৎচন্দ্র জমিদারীতে টাকা লগ্নী করা অপেক্ষা শিল্পে টাকা লগ্নীর অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচনার পটভূমিকা ভূমিকেন্দ্রিক সমাজ; কিন্তু পরিবর্তনশীল যুগে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনের প্রতি শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন। দেশে ক্রমাগত লোক বাড়িতেছে, কৃষি অত্যধিক ভারগ্রস্ত, এ অবস্থায় শিল্প-প্রসার ছাড়া বেকার সমস্যার তথা জনবাহুল্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তাছাড়া শিল্পপ্রসারের ফলে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় সম্পদ বাড়িবে। জমিদারীর মোহ আছে,—সম্মানের মোহ, লগ্নী অর্থের নিশ্চয়তার মোহ, নিশ্চিত মুনাফার মোহ; কিন্তু এইভাবে সঞ্চিত টাকা জমিদারীতে আটকাইলে জাতীয় সম্পদ বা জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে সত্যকার লাভ খুবই কম। তাছাড়া 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দের মত জমিদারী হাতে আসিলে মানুষের নিষ্কর্মা অবস্থায় কাঁচা টাকা পাইয়া নষ্ট হইয়া যাইবারও সম্ভাবনা যথেষ্ট। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী কথাসাহিত্যিক বলিয়া ভারতের সাধারণ এই অর্থনৈতিক সমস্যাটির দিকে তিনি বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

ধর্ম-চেতনা

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে পাষণ্ড স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া অভয়া যখন রেঙ্গুণে রোহিণীকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে, শ্রীকান্তর সহিত তাহার একদিন নিম্নরূপ কথোপকথন হইয়াছিল :—

"আমি (শ্রীকান্ত) বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—, অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল যে, বিধবার আচরণ বলুন—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দু বিসর্গ সম্পর্ক নাই। বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায় তাহা মানি না। বস্তুত ওটা কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা যে কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ না হয় তাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায় ?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু।...ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে সকল কালে সকল যুগে বিধবার চালচলনটা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু, একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পশু করিয়া দিবার এতবড় ছায়াবাজি আর নেই।"

অভয়ার এই উক্তির মধ্যে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তাঁহার কাছে ধর্ম সাম্প্রদায়িক রূপে নয়, আচার-অনুষ্ঠানে নয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই বিশেষভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা (মানুষকে) ধারণ করে বা পোষণ করে। শরৎচন্দ্র মানবতাবাদী সাহিত্যিক, মানুষের জীবন লইয়াই তিনি গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় তাহাই ধর্ম, এই বহু-প্রচলিত সংজ্ঞা শরৎচন্দ্র অবজ্ঞা করেন নাই, কিন্তু সামাজিক কথাসাহিত্যিক বলিয়া "কর্তব্যপালনই ধর্মপালন"—এই যুক্তিবাদী সংজ্ঞাকেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বা বিকাশক যে বৃত্তি-আচরণ, শরৎচন্দ্রের কাছে তাহাই মূলতঃ ধর্মের স্বরূপ। আচার, সংস্কার, অভ্যাস, প্রথা মানুষের জীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করে,

শরৎসাহিত্যে ইহাদের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া শরৎচন্দ্র ইহাদের ধর্মের সহিত এক করিয়া দেখেন নাই। বরং যখনই মানুষের সুস্থ বিকাশলাভের পথে এগুলি বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শরৎচন্দ্র আপেক্ষিক মূল্যহীনতা স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়াছেন। উপরের উদ্ধৃতিটিতে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বিধবার ধর্মগত পুণ্য লাভ তাহার কৃচ্ছ্রসাধন-নিরপেক্ষ। বিধবা স্বামী হারাইয়াছে বলিয়াই তাহার উপর আচার, অনুষ্ঠান, ত্যাগ স্বীকারের বোঝা চাপাইয়া তাহার স্বাভাবিক জীবনায়নের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে, এজন্য তাহার মানুষী বিকাশলাভ ব্যাহত হইবে, এ সংস্কারে শরৎচন্দ্রের মানবতাবাদী মন সায় দেয় নাই। এই সব ভার না থাকিয়া কোন মানুষের মনের মধ্যে যদি শুধুমাত্র অধ্যাত্ম-পিপাসা থাকে, শরৎচন্দ্র তাহাকে ধার্মিক বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-কৃতিতে এই ধর্মবোধের ছবি খুবই কম। ইহার তুলনায় তিনি মনের বিকাশমূলক ভাব-আচরণকে ধর্মরূপে অধিকক্ষেত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। মানুষ তাহার কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করিবে, নিজেকে পরিবারকে সংসারকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করিবে, হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করিয়া কল্যাণব্রতী হইবে, এই যুক্তিবাদী ধর্মাচরণে শরৎচন্দ্র তাঁহার অনেকগুলি চরিত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই পথে চলিলে স্বর্গলাভ হয় কি না সেকথা শরৎচন্দ্র ভাবেন নাই। এইরূপ মহৎ জীবনযাপনের ফল যে শান্তি, আনন্দ ও কল্যাণ, এই তৃপ্তিকর অনুভূতিই আলোচ্য ধর্মাচরণের প্রধান লাভ। মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে, মানুষের প্রতি নির্মল প্রেমে এই ধর্মাচরণ হইতে পারে। ধার্মিক মানুষের অন্তরে যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, জগৎ ও জগতের মানুষকে ভালবাসায় তাহার সর্বোত্তম স্বাক্ষর। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের এক অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টি। এই চরিত্রাঙ্কনে তিনি আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে অমলিন প্রেমকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে সুনন্দার প্রভাবে রাজলক্ষ্মী এই আচারগত ধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া শ্রীকান্তকে এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিল ইহাতে তাহার শান্তি নাই, আনন্দ নাই, কল্যাণ নাই। শুধু আচারগত ধর্মকে নয়, জগতের মানুষ রাজলক্ষ্মী আর একজন জগতের মানুষকে নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার গৌরবে ভগবানকেও যেন ভাল করিয়া পূজা করিবার অবকাশ পায় না, কিন্তু এজন্য তাহার ভয় নাই, ভগবান তাহার এই মানুষী

ভালবাসার নিষ্ঠায় প্রসন্ন হইবেন বলিয়াই সে আশা রাখে। 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বে শ্রীকান্তর প্রতি রাজলক্ষ্মীর গভীর ভালবাসা মুরারীপুর আখড়ার প্রধান বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দ্বারিকাদাস বাবাজীর চোখে পড়িয়াছিল। দ্বারিকাদাস এই প্রগাঢ় ভালবাসাকে ভগবৎমুখী করিবার শুভেচ্ছায় রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন: "তুমি যেদিন এ প্রেম ঈশ্বরকে অর্পণ করবে আনন্দময়ী।" রাজলক্ষ্মী কিন্তু কথাটা শুনিবামাত্রই শিহরিয়া উঠিল। ইহার অর্থ শ্রীকান্তকে ভাসাইয়া দেওয়া। সে কাজ তাহার অসাধ্য। দ্বারিকাদাসকে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল: "এমন আশীর্বাদ করোনা গোঁসাই, এ যেন কপালে না ঘটে। বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসে খেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।"

শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব আরও স্পষ্ট হইয়াছে শ্রীকান্ত তৃতীয় খণ্ডে সন্ন্যাসী আনন্দর উপস্থিতিতে। আনন্দ সন্ন্যাসী, সে গৈরিকবাসধারী, ঘর ছাড়িয়া সে পথকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীকান্ত নিজে সন্ন্যাসের সঙ্গে অপরিচিত নয়, সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাহার আছে। কিন্তু আনন্দ এক নূতন অভিজ্ঞতা। ২৪ ঘণ্টারও কম ঘনিষ্ঠতায় আনন্দ যখন রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর সংসারে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাইয়া গেল, তাহার জন্য বিষণ্ণ রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আনন্দ সত্যকার সন্ন্যাসী কি না। শ্রীকান্ত নিজে বিস্মিত, সরাসরি উত্তর সে দিতে পারিল না। কিন্তু সে প্রথমে যদিও হাল্কাভাবে প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার মত করিয়া বলিল, "আমি সত্যকার সন্ন্যাসী হইনি, তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটি তোমাকে দিতে পারবো না," তথাপি শেষ অবধি সন্ন্যাসী-আনন্দকে সে কি চোখে দেখিয়াছে তাহা অকপটভাবে বর্ণনা করিল। সন্ন্যাসীর এই নব মূল্যায়ন শরৎচন্দ্রের বিচিত্র ধর্ম-চেতনার অবদান তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকান্ত বলিল, "সে ভগবানের সন্ধানে বার না হলেও মনে হয় যার জন্য পথে বেরিয়েছে সে তারই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনার দেশ।" এখানে দুর্গত দেশ এবং দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা ধার্মিক সন্ন্যাসীর ভগবদ্ভক্তির সহিত এক হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা, তাহা ত্রুটি বিচ্যুতিমুক্ত করিয়া সুন্দর করিয়া তোলা ভগবানেরই পূজা। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত যে সাধুর আশ্রয় লইয়াছিল এবং যাহার কাছে অনেকদিন মোটামুটি ভালভাবেই কাটাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রতি শ্রীকান্তর প্রসন্নভাব ফুটে নাই, সে সাধু ভগবানের

বা জগৎ ও জীবনের—কিছুর প্রতিই নির্মল গভীর ভালবাসায় আত্মনিয়োগ করে নাই। এখানে আনন্দ গেরুয়া কাপড় পরিয়া ঘর ছাড়িয়াছে, তাহার ভগবানে আত্মসমর্পণ ভগবানের সৃষ্টির কল্যাণে আত্মসমর্পণে সার্থক হইয়াছে। শ্রীকান্ত স্নেহকাতরা রাজলক্ষ্মীর কাছে আনন্দ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে সন্ন্যাসী আনন্দকে দেশপ্রেমিক আনন্দরূপেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে :—

"ম্লান মুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক ভুলিয়া যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে, তাই বটে। সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজে এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না। জানি অনেক দিনের অনেক ত্রুটি, অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পঙ্ক লেপিয়াছে, তবু এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে সে-ই জানে ইহা কতবড় সত্য।"

এই 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের শেষদিকে আছে শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী একরূপ ঘনিষ্ঠতা এড়াইবার জন্য বিদায় দিল। এখানে তাহার নিজের কাছে যে আত্মপরিচয় মুখ্য হইয়া উঠিল তাহা হইতেছে সে বাইজী নয়, শ্রীকান্ত তাহার স্বামী নয়, সেই বন্ধুর মা। সে বিধবা, শ্রীকান্ত পরপুরুষ, শ্রীকান্তকে গ্রহণ করিলে সে ধর্মে পতিত হইবে। ধর্মের সংস্কারই তাহার কাছে বড় হইল। সুনন্দার সংস্পর্শে আসিবার পর ধর্মসম্পর্কে তাহার যে ধারণা-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এবার সে তার সক্রিয় রূপ দিতে চাহিল। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বাড়ী হইতে কাশী স্টেশনে ফিরিবার পথে ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল রাজলক্ষ্মীর কথা, সে বেদনাবোধ করিল রাজলক্ষ্মীর মোহাতিশয্যে। মানুষ রাজলক্ষ্মী আত্মহত্যা করিয়া সংস্কারকে জয়ী করিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। এই সময় শ্রীকান্ত রেঙ্গুণ হইতে অভয়ার চিঠি পাইয়াছিল। অভয়া বিদ্রোহিণী, কিন্তু অভয়ার মানবিক চেতনার তুলনায় রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তর ছোট মনে হইল। রাজলক্ষ্মী ধর্মচেতনায় মানবিক দাবী অস্বীকার করিতে চলিয়াছে, শ্রীকান্তর এইখানেই ব্যথা। বিপরীতে সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি মারফৎ অভয়া তাহার মনের দুয়ারে উপস্থিত হওয়ায় শ্রীকান্তর বিষন্ন মন যেন আশ্রয় পাইল। উপন্যাসে এইখানে আছে : "মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তোমার পুণ্যজীবন উন্নত হইতে

উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। স্নেহে, প্রেমে করুণায় অটলা অভয়া, ভগিনীর অধিক বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আসিবার কালে ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত বর্তমান ইতিহাস। চিত্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভরতায় ও আত্মার স্বাধীনতায় কে যেন আমার সমস্ত দুঃখ এক নিমিষে আবৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।”

অবশ্য রাজলক্ষ্মীর সংস্কার এখানে প্রবল হইয়াছে বলিয়া শ্রীকান্তর তাহার সম্পর্কে এই হতাশা। এ বেদনা নিতান্তই সাময়িক এবং পরে রাজলক্ষ্মী আপন জীবনবোধে পুনরায় শ্রীকান্তকে আগের মতই আকর্ষণ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রীকান্তর যে অনুরাগ এখানে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহা সাময়িক আবেগ সন্দেহ নাই, কারণ রাজলক্ষ্মীর স্বরূপ ফিরিলে অভয়া শ্রীকান্তর স্মৃতিতে আপনাই অনেকখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। অভয়ার ব্যক্তিত্বধর্মী বিদ্রোহভাব মনে চমক লাগায়, ইহাতে মশালের চোখ-ঝলসানো অত্যুজ্জ্বলতা, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দুঃখজয়ী প্রেমের স্নিগ্ধ প্রদীপালোক শ্রীকান্তকে অভিভূত করিয়াছে। এইজন্যই অভয়া ‘শ্রীকান্ত’ দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিলেও তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে দু’এক জায়গায় মাত্র তাহার কথা স্মরণ করা হইয়াছে এবং সমগ্রভাবে তাহার চরিত্রের গুরুত্ব উপন্যাসে খুব বেশি নয়, নায়িকা রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-বিন্যাসে অভয়া সহায়িকা চরিত্র মাত্র। অসামাজিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাজলক্ষ্মীর সুগভীর প্রেমকে শ্রীকান্ত একান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছে, তাই বারবার পাওয়ার সীমান্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেও রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণ বারবার তাহাকে রাজলক্ষ্মীর সান্নিধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। রাজলক্ষ্মীও আপন মানসিক দ্বন্দ্বের কথা লুকায় নাই। সে তাহার সংস্কার, সামাজিক বোধ ও বুদ্ধির চাপে শ্রীকান্ত হইতে অনেকবার আপনাকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু ভালবাসার টানে, অন্তরের আকর্ষণে সে এইভাবে দূরে থাকিতে পারে নাই, কোন না কোন উপলক্ষ্য করিয়া কাছে আসিয়াছে। তাহার এই অসহায় অবস্থা রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে ‘শ্রীকান্ত’ তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তর সহিত সুনন্দা প্রসঙ্গে কথোপকথনে। সুনন্দার দৃঢ় ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রের জন্য রাজলক্ষ্মী সুনন্দার দ্বারা অপরিসীম প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সে প্রভাব তাহার মনকে সমস্ত অন্তর-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া

চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মগত আচারের অনুগামিনী হইবার প্রেরণা দিয়াছিল, এই প্রভাব রাজলক্ষ্মীর আপন মনের গোপন সংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া দুর্দম হইয়া উঠিলেও তাহার প্রেমিকা সত্তার দাবীর কাছে শেষপর্যন্ত পরাজয় মানিয়াছে। দীর্ঘ চার পর্ব শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মহিমাই শুধু প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, জাগতিকভাবে প্রেমকে জয়ের পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। চতুর্থ পর্বের শেষেও উপন্যাসের পরিণতি আসে নাই, কাজেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সাংসারিক অর্থে স্থায়ী সম্পর্ক কি দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যেপর্যন্ত উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহাতে অসামাজিক পটভূমি হইলেও মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রের হাতে রাজলক্ষ্মীর প্রেম জয়ের দিকেই ঝুঁকিয়াছে বলা চলে। রাজলক্ষ্মীর উপর সুনন্দার প্রভাব ব্যর্থ হইয়াছে, ধর্মগত সংস্কার রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত-প্রেমের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, পুঁটুর বিবাহের পর শ্রীকান্তর নিজের বিবাহের আর কোন কথা উঠে নাই, অভয়ার আকর্ষণে শ্রীকান্ত রেঙ্গুনে যায় নাই, এমনকি শেষ প্রতিযোগিনী কমললতাও দেশান্তরী হইয়াছে, সর্বোপরি রাজলক্ষ্মীর বঞ্চিত মাতৃত্বের আশ্রয়ে সপত্নী-পুত্র বঙ্কু স্বার্থসিদ্ধির পর আপনাকে রাজলক্ষ্মীর আয়ত্ত হইতে একেবারে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু শেষ অবধি শ্রীকান্ত বেকার অবস্থায় রাজলক্ষ্মীর প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি লইয়া অধিগম্য অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে। যদিও সামাজিক সংস্কার এ কাহিনীতে ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর প্রেম মিলনে সার্থক হয় নাই, কিন্তু সমাজের অননুমোদিত তাহাদের ভালবাসা উপন্যাসে যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহা মানবদরদী শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনার বৈশিষ্ট্যসূচক অবদান। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ছবিতে সমাজচেতনার কাছে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার পরাজয় ঘটে নাই, ধর্মচেতনার গৌরব এখানে নিহিত মূল্যেই উদ্ভাসিত, কিন্তু মানুষের যে বিচিত্র মন লইয়া ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কারবার, সেই মনের সর্বপ্রধান বৃত্তিরূপে প্রেমের সার্থক আভাস রাজলক্ষ্মীর কথাতেই পাওয়া যায়। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলিয়াছে, "ত্যাখো এই সুনন্দা মেয়েটির মত এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি।" কিন্তু সুনন্দা যে বিদ্যার আড়ম্বরে নিজেকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল একথা রাজলক্ষ্মী আবেগের সহিতই উল্লেখ করিয়াছে। শ্রীকান্ত যখন সুনন্দার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া বলিল যে, সুনন্দার বিদ্যার দর্প নাই, রাজলক্ষ্মী সে

সঙ্গে সে কথা বিশ্লেষণ করিয়া আপন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে- "না, ইতরের মত নেই—আর সে কথাও আমি বলিনি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্রকথা, কত গল্প-উপন্যাস জানে, ওর মুখে শুনেই ত ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাইত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই।"

শরৎচন্দ্রের লেখায় ধর্মের শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের দিকটি বারবার নিন্দিত হইয়াছে এবং ভগবানের মহিমা লইয়া তিনি কমই লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখায় ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বহু মন্তব্য আছে। এই সকল দেখিয়া অনেকের মনে হইতে পারে যে শরৎচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সেকথা একেবারেই সত্য নয়। শরৎচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন, ভগবৎ-বিশ্বাসী ছিলেন।* তবে তাঁহার মতে ধর্ম অন্তরের জিনিষ, ধর্ম সত্যকে সন্ধান করে, সুতরাং সত্য-নিরপেক্ষ ধর্ম লইয়া মাথা ঘামান নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ভগবৎ-অনুভূতি সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতির সহিত প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল।

*শরৎচন্দ্রের ভগবদ্বিশ্বাস কিরূপ সুদৃঢ় ছিল তাহার প্রমাণ শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের শেষ দৃশ্যটি। কমললতা এখানে শূন্যহস্তে চিরবিদায় লইতেছে শুধু ভগবানের উপর একান্ত ভরসা রাখিয়া। শ্রীকান্ত কমললতাকে টাকা দিতে চাহিয়াছিল, ভগবানের চরণে আশ্রয় লইয়া কমললতা সে টাকা লয় নাই, শান্ত মনে নিঃস্ব অবস্থায় সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াইয়াছে। কমললতা শ্রীকান্তকে বলিয়াছে, "না গোঁসাই, টাকা আমার চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পন করেচি তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনি পূর্ণ করে দেবেন।"

কমললতার এই স্নিগ্ধ প্রত্যয় শ্রীকান্তকে অভিভূত করিয়াছে। পরম প্রিয়জনকে শুধুমাত্র ভগবানের ভরসায় অজানা পথে ছাড়িয়া দিয়া 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের শেষে শ্রীকান্ত বলিয়াছে: "গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।"

প্রায় বলা এইজন্য যে, ভগবানকে পাওয়া সর্বোত্তম পাওয়া একথা শরৎচন্দ্র জানিতেন, কিন্তু জগতের মানুষ জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া ভগবানের জন্য আকুলতা দেখাইলে তাহার মনুষ্য-জন্ম সফল হইবে না, ভগবানকে লাভ করা একরূপ অসম্ভব, পক্ষান্তরে মানুষ সত্য ও সুন্দর, স্নেহ ও প্রেম অবলম্বন করিয়া আপন জীবনকে সুরভিত ও সার্থক করিতে পারে, জীবনধর্মী কথাসাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র এই দিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহার ধর্মচেতনার এই জগৎমুখিতার চমৎকার পরিচয় মিলিবে শ্রীকান্ত তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের রাজলক্ষ্মীর ভগবদ্‌ভক্তির সহিত শ্রীকান্তকে ভালবাসার সমন্বিত অভিব্যক্তিতে। তৃতীয় পর্বে তাহার মন সাধারণ ভক্ত মানুষের, ভগবান তাহার কাছে সর্বোত্তম পাওয়া। কিন্তু অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ৪র্থ পর্বের রাজলক্ষ্মীর আকুতি শ্রীকান্ততে অধিকতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে মুরারিপুর আখড়ায় রাজলক্ষ্মী দ্বারিকাদাস বাবাজীর "তুমি যেদিন এ প্রেম ঈশ্বরকে অর্পণ করবে আনন্দময়ী"—এই শুভেচ্ছার উত্তরে আবেগের সঙ্গে এ আশীর্বাদের চেয়ে শ্রীকান্তকে রাখিয়া খুশীমনে পৃথিবীর দিনগুলি কাটাইয়া এখান হইতে বিদায়ের সুযোগলাভের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু এই রাজলক্ষ্মীই তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তর বিনিময়ে ভগবানকে পাওয়ার আশীর্বাদ শ্রীকান্তর কাছেই প্রার্থনা করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর সহিত সেদিন গঙ্গামাটিতে গোমস্তা কাশীরাম কুশারীর বাড়ী যাইতেছিল। রাজলক্ষ্মীর গায়ে গহনা সামান্য, পরণের সাড়ীখানিও সাদাসিদে। অথচ রাজলক্ষ্মীর সাড়ী গহনার অভাব নাই। শ্রীকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "একে একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখচি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।"

ইহার উত্তরে রাজলক্ষ্মী প্রত্যাশিত জবাবই দিল, "এমন ত হতে পারে, এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়তি ছিল সেইগুলোই একে একে ঝরে যাচ্ছে।"

—তারপরই শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর মুখে যেকথা রাখিয়াছেন তাহা তাহার তৎকালীন ধর্ম আকুতির পরম প্রার্থনা। গাড়োয়ান শুনিতে না পায় এমন মৃদুস্বরে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলিল, "বেশ ত, সেই আশীর্বাদই করনা তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যাঁর বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই কর তুমি।"

যাহা হউক, সমগ্রভাবে দেখিলে ইহাই উপলব্ধি করা যায় যে, অন্যায় ও অসত্য ন্যায় ও সত্যের স্বাভাবিক বিকাশে যেখানে পরাজিত হইয়াছে, পাপ এবং মিথ্যাচার বিবেক ও মহত্ত্বের অভ্যুদয়ে যেখানে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই ভগবানের আত্মপ্রকাশ, এই শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়। 'কাশীনাথ' হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। কাশীনাথ'-এ ধনীকন্যা কমলা পিতৃদত্ত ঐশ্বর্যের দম্ভে স্বামীকে একেবারে হাতের মুঠোয় রাখিবার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়ায় যে দুর্বল মনোভাব দেখাইল, তাহার ফলে তাহার ম্যানেজার বিজয়বাবু কমলার স্বামী কাশীনাথ সম্বন্ধে মাত্রাধিক ধৃষ্টতা প্রকাশের সাহস করিল। শেষপর্যন্ত এই শোচনীয় পরিস্থিতির পরিণতিতে কাশীনাথ গুরুতর আহত হইল। স্বামী এইভাবে সাংঘাতিক আহত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কমলার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল এবং তাহার অন্তরে যে সাধ্বী পতিব্রতা রমণী সুপ্ত ছিল, তাহারই অবিমৃষ্যকারিতায় স্বামীর এই প্রাণান্তকর সঙ্কটের মুহূর্তে তাহা সমস্ত দৈন্য ও হীনতা অতিক্রম করিয়া ভাস্বর হইয়া উঠিল। কমলার এই পরিবর্তন যেন ভগবানের কল্যাণময় রূপের প্রকাশ,—এমনি করিয়াই শরৎচন্দ্র দৃশ্যটিকে আঁকিয়াছেন। মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া কাশীনাথের যখন জ্ঞান হইল, কমলা তখন তাহার পায়ের তলায় পড়িয়াছিল। ভগ্নী বিন্দুর মুখে তাহার রোগশয্যায় কমলার আসিবার কথা শুনিয়া কাশীনাথ পূর্বের ব্যথাম্লান স্মৃতিতে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল এবং বলিয়া ফেলিল যে, কমলা না আসিলেই ভাল হইত। বিন্দু কিন্তু স্বচক্ষে কমলার পরিবর্তন দেখিয়াছে, সে বলিল কাশীনাথের অজ্ঞান থাকার দুটো দিন কমলার কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে কথা বিন্দু আর ভগবান ছাড়া আর কেহ জানে না। ভগবানের নাম উল্লেখেই সমগ্র আবহাওয়া একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। এই পবিত্র পরিবেশ বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রেরণ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নরনারীর অন্তর্যামী চিরদিন অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শ্রীচরণে যেন এই প্রশ্ন নিবেদন করিয়া দিয়া সে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ চাহিয়া কহিল, আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা, উঠে ব'সো—"

এই কল্যাণময় ভগবানকে শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এর মিঃ রে অনুরূপ এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে স্মরণ করিয়াছেন। মিঃ রে জমিদার কিন্তু তাঁহার কন্যা আলেখ্য তাঁহার জমিদারী চালায়। আলেখ্য নয়ান গাঙ্গুলী নামে এক বৃদ্ধ কর্মচারীকে অকর্মণ্যতার অজুহাতে ছাঁটাই করে। নয়ান গাঙ্গুলী বৃদ্ধ বয়সে বেকারীর ফলে, অসহনীয় দুরবস্থার কল্পনায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহত্যা করে। নয়ান সেরেস্তায় মাসে মাত্র ১৩ টাকা মাহিনা পাইত, আলেখ্য নিজের বিলাসিতার নিরিখে এই অল্প বেতনের কর্মচারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবার আপন হৃদয়হীন নির্দেশের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। তাহার মুখের কথায় একজন জলজ্যান্ত মানুষ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল, সংবাদটি শুনিয়া আলেখ্যর বুকে ঝড় বহিতে লাগিল। আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া প্রতিকারের আশায় আলেখ্য গেল পিতা মিঃ রে'র কাছে। মিঃ রে এই করুণ পরিবেশে প্রশান্ত ধৈর্যে স্মরণ করিলেন ভগবানকে, আলেখ্যর কাজ ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার ভগবান অবশ্যই করিবেন এই অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রশান্ত বৃদ্ধ সান্ত্বনা খুঁজিলেন। মিঃ রে কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহাকে কখনও কঠিন কথা বলিতেন না, সবসময় চেষ্টা করিতেন তাহার আবদার পূরণ করিতে। কিন্তু তাহার পরম দুঃখের সময় তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষার প্রয়াস না করিয়া ভগবানের উপরই তাহার কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। তিনি নিজে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার, কিন্তু এইভাবে সঙ্কট-মুহূর্তে তিনি উজ্জ্বল আস্তিক্যভাব দেখাইলেন। পিতার ভগবদ্বিশ্বাস কন্যার চঞ্চল হৃদয়েও সঞ্চারিত হইল, আলেখ্যও যেন আশ্বাসলাভ করিল পিতার কথায়। এইখানে আছে—(মিঃ রে বলিলেন) "আমি কি বড় বুদ্ধিমান? অন্তত সংসারে সে প্রমাণ ত আজও দিতে পারিনি মা। আর, না বুঝে অন্যায় যদি করেই থাক, যিনি বুদ্ধি দেবার মালিক, তিনিই তোমাকে তার নিবারণের কথা বলে দেবেন।—এই বলিয়া বৃদ্ধের সজল দৃষ্টি এক মুহূর্তে খোলা জানালার বাহিরে গিয়া অকস্মাৎ কোন অনির্দেশ্য শূন্যতায় স্থিতিলাভ করিল। পিতার এই ভাবটি আলেখ্য কখনও লক্ষ্য করে নাই—সে অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে সে ষোল আনা সাহেব বলিয়াই জানে। ধর্ম্মমত লইয়া তিনি আলোচনা করিতেন না, ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস আছে কি নাই, একথাও তিনি কোনদিন প্রকাশ করিতেন না এবং করিতেন না বলিয়াই

ঘরে বাহিরে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ধারণা ছিল। অথচ সাবেক দিনের ক্রিয়া-কর্ম ঠাকুর-দেবতার পূজা অর্চনা সমস্তই অব্যাহত ছিল। এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে আলেখ্যর জননী ইহাকে ভয় এবং দুর্বলতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, আলেখ্যর নিজেরও তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার আজ এই অদৃষ্টপূর্ব চেহারা চক্ষের পলকে যেন তাহাকে আর একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।"

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী প্রথম দিকে নাস্তিক গোছের ছিল। দিবাকরকে একদিন উপেন্দ্রের কাছে কঠোপনিষদের সুখ্যাতি করিতে শুনিয়া কিরণময়ী তাচ্ছিল্যভরে বলিয়াছিল, "যা মনে করেচ ঠাকুরপো, তা নয়। এমন ক'রে চেষ্টা করবার কোন মূল্য এর নেই। তবে স্থানে স্থানে মন্দ লাগেনা বটে। হাতে কাজকর্ম না থাকলে আত্মা-টাত্মার নানারূপ আজগুবি গল্প পড়লে সময়টা কেটে যায় এই পর্যন্ত।" কিন্তু এই কিরণময়ীই গ্রন্থের শেষদিকে উপেন্দ্রের অসুখের বাড়াবাড়িতে আকুল হইয়া সাবিত্রীর কাছে বলিয়াছে: "আমি ভগবানকে দিনরাত জানাচ্চি, তাঁর পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেচি, তাই তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও।" বলা বাহুল্য, উপন্যাসের পরিণতিতে কিরণময়ীর ভগবৎ-নির্ভরতার দিকে এ মানস-পরিবর্তন লেখক শরৎচন্দ্রের আস্তিক্যতারই ফল।* 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অতি যত্নে আঁকা চরিত্র। এই ইন্দ্রনাথ

*সুখের দিনে নয় দুঃখের দিনে মানুষের ভগবানকে বেশি করিয়া মনে পড়ে, এই সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ধারণা শরৎসাহিত্যে বেদনা ম্লান বাঙ্গালী নায়িকাদের মধ্যে বারবার দেখা যায়। 'স্বামী' গল্পে সৌদামিনী গৃহত্যাগের পর নিজের দুষ্কৃতির অনুশোচনায় স্বীকার করিয়াছে, "যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে রেহাই দিলেন না।" 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা সুরেশের মৃত্যুর পর মহিমের সাক্ষাৎ পাইয়াও তাহার আশ্রয় যখন পাইল না, তখন ভগবানের কাছে তাহার আর্তি নিবেদনের কথার উল্লেখ করিয়া মহিমকে বলিয়াছে: "তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর, আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও। কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!"

পরম আস্তিক কিশোর। সে রাম নামে ভূতের দৌরাত্ম্য দূর হয় বিশ্বাস করে, মা কালীর উপর তাহার অখণ্ড আস্থা। শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ বলে: "কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাক্‌লে কখনো কেউ মারতে পারে না।" শরৎচন্দ্রের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। একবার শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময় হরিদাসবাবুকে তিনি যে চিঠি লেখেন তাহাতে তাঁহার ভগবতভক্তি যেমন গভীর, তেমনি স্পষ্ট। আপন স্বাস্থ্যের অবস্থা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি জানিতে পারি—তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিব এবং স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব।"—(শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, জীবনী, ১৯৬৫, পৃঃ—৪৪৮ হইতে উদ্ধৃত।) *

* শরৎচন্দ্রের আস্তিক্যবোধ সম্পর্কে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁহার সুহৃদ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎকথা' নামে সুন্দর স্মৃতিচারণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়ে শরৎচন্দ্রকে সম্যক-ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে বলিয়া ইহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কথা প্রসঙ্গে বললেন—মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন?

বললুম—সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অ-লাভ নেই তো। তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি না পাই—তাও নয়…

এইটে ঠিক বলেছেন—বলে হাসলেন। বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়?

বললুম—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক।

—কে বললে, কোথায়? ভুল কথা—

—যা নিয়ে কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারেনি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য

শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। হিন্দু ধর্ম-সংস্কার তাঁহার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যুক্তি দিয়া তিনি সংস্কারকে এড়াইতে চাহিয়াছেন ; যেখানে সংস্কারের দৈন্য, সেখানে মোটামুটি সফলকামও হইয়াছেন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁহার মনে ধর্মসংস্কারের স্থান ছিল। গঙ্গা পবিত্র নদী, গঙ্গার তীরে বসিয়া 'চরিত্রহীন'-এর সতীশ সাবিত্রীর চিন্তায় উত্তেজনা প্রশমিত করিল। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চণ্ডী জাগ্রত দেবী এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একথা তিনি যেন বিশ্বাস করিয়াই লিখিয়াছেন। সেদিন চণ্ডীগড়ের জনার্দন রায়ের কন্যা তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য মন্দিরে আসিয়াছে। এইখানে ষোড়শীর আত্মচিন্তায় শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন : "কিন্তু

সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরে আসতে পারেনি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতি হত না। আপনি পারেন নি···

—ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবাস্তরের সাহায্য নিতে হয়, ঐ একটাই তো ?

—বহুৎ আছে। জগতে অবাস্তরও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি :—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি ইন্‌টেলেকচুয়াল জায়েণ্ট বানিয়েছেন, আবার সুরবালাকে হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী শুদ্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল। এটা করলেন কেনো ?

—আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না, তাহলে সাবধান হতুম।......

একটু হাল্‌কা কথার মধ্যে হলেও চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়কে ২৭।১।১৩৪১-এ লেখা একখানি চিঠিতেও শরৎচন্দ্রের এই ভগবদ্বিশ্বাসের উজ্জ্বল পরিচয় মিলে : "কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করব না, কারণ সন্ন্যাসীর শারীরিক কুশলাদির প্রশ্ন অবাস্তর। নিশ্চয় জানি ভগবান নিজের গরজে কাজের জন্য যতদিন ভালো রাখা আবশ্যক মনে করবেন। তারপর হিসেব দাখিল করতে ডেকে পাঠাবেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫২ হইতে উদ্ধৃত।)

এমন একদিন ছিল না। সেদিন তাহার (হৈমর) রূপ ও বয়স কোনটাই বেশি ছিল না ; তবু যে এতবড় ঘরে পড়িয়াছে সে কেবল এই দেবীর মাহাত্ম্যে। কোন এক অমাবস্যায় নাকি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী দর্শনে আসিয়াছিলেন ; রায় মহাশয় গোপনে এই কন্যার কল্যাণেই কি সব যাগযজ্ঞ করাইয়া লইয়াছিলেন। এই পুত্রটিও নাকি তাঁহারই করুণায়। হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীরই মানত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে।") শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি যে বারবার কাশী বৃন্দাবনের মত পবিত্র তীর্থে গিয়া জীবনে শান্তি খুঁজিয়াছে, সমকালীন সামাজিক মানুষের জীবন-অনুভূতি হইলেও ইহার পিছনে শরৎচন্দ্রের এই তীর্থস্থানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 'পল্লীসমাজ'-এ বিশ্বেশ্বরী অভাগিনী রমাকে লইয়া কাশী গিয়াছে। 'পরিণীতা'য় বিধবা হওয়ার পর শান্তি পাইতে ভুবনেশ্বরী কাশীবাস করিয়াছেন, 'বড়দিদি'তে মাধবী কাশী গিয়াছে, 'পথনির্দেশ'-এ হেম-গুণীন কাশীতে শান্তি পাইবার আশা করিয়াছে (গুণীন যদিও ব্রাহ্ম), 'পরেশ' গল্পে পরেশ বিপর্যস্ত জ্যাঠামশাই গুরুচরণকে লইয়া কাশীযাত্রা করিয়াছে। এছাড়া 'চন্দ্রনাথ'-এ সরযূর কলঙ্কিনী মাকে আশ্রয় দিয়াছে কাশী, সেখান হইতে চন্দ্রনাথ তাহাকে লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পাটনায় বাড়ী, কিন্তু কাশীতেও সে বাড়ী রাখিয়াছে। শরৎসাহিত্যে বৃন্দাবনও অনুরূপভাবে সন্তপ্তদের আশ্রয়স্থল। 'পণ্ডিত মশাই'-এ চরণ ও মাকে হারাইয়া বৃন্দাবন কুসুমকে লইয়া বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াইয়াছে, 'বামুনের মেয়ে'তে অভাগিনী সন্ধ্যা নিরীহ ভাগ্যহীন পিতা প্রিয়বাবুকে লইয়া বৃন্দাবনের জন্য ট্রেন ধরিয়াছে, তাহাদের সঙ্গী হিসাবে স্টেশনে জুটিয়া গিয়াছে আর এক দুর্ভাগিনী, দুর্বৃত্ত গোলক চাটুয্যের পদস্খলিতা শ্যালিকা জ্ঞানদা। 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বে বৈষ্ণবী কমললতা সব ছাড়িয়া রাধামাধবের চরণে আশ্রয় লইতে মুরারিপুর আখড়া হইতে বৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশের চার বৎসর পরে বিপ্রদাস ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষপ্রশ্নে কমলের মাধ্যমে ধর্মাচরণের প্রতি যে আঘাত ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে, বিপ্রদাস উপন্যাসে যেন অনুতপ্ত লেখক সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মাচরণের এবং নৈতিক পবিত্রতাবোধ স্বীকৃতির দিক হইতে শেষপ্রশ্নের কমলের বিপরীত চরিত্র 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিপ্রদাস। ঠাকুরঘরে পূজারত বিপ্রদাসকে দেখিয়া আধুনিক শিক্ষিত

মেয়ে বন্দনাই শুধু মুগ্ধ হয় নাই, শেষপ্রশ্নের প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই মুগ্ধ হইয়া ভাবে শরৎচন্দ্রের অন্তরে ধর্মসংস্কার তীব্রভাবে জাগিয়া না উঠিলে শেষপ্রশ্নের পরে এই উপন্যাস রচনা বোধ হয় সম্ভব হইত না। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এর 'মৃণাল' চরিত্রটিও শরৎচন্দ্রের এইরূপ ধর্মসংস্কারের ফল বলিয়াই মনে হয়। মৃণালকে তিনি আচারনিষ্ঠা হিন্দু কুলমহিলা করিয়া গড়িয়াছেন এবং জটিল মনস্তত্ত্বমূলক 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা শিক্ষিতা ব্রাহ্মনারী অচলার বিপরীতে তিনি এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটিকে শুধু তাঁহার ধার্মিক হৃদয়বোধের ঐশ্বর্যে সাফল্যের সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মৃণাল শেষপর্যন্ত অচলার ব্রাহ্ম পিতা কেদারবাবুর বার্ধক্যের আশ্রয় হইয়াছে, জননীর মত কেদারবাবুর সেবা-যত্নের ভার আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র তাহাকে পরম মর্যাদা দিয়াছেন গ্রন্থশেষে যেখানে কুলত্যাগিনী অচলাকে নিষ্ঠুরভাবে ফিরাইয়া দিবার পর মহিমের সম্মুখে মৃণাল তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ আবেদন রাখিয়া বলিয়াছে অচলার ভবিষ্যতের পথ এখন মহিমকেই ত দেখাইতে হইবে, মহিম তাহাকে অস্বীকার করিবে কেন?

শরৎচন্দ্র গলায় সবসময় উপবীত রাখিতেন। ব্রাহ্মণসন্তানের উপবীত ধারণ কর্তব্য বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। পৈতা গলায় রাখার উপকারিতা আলোচনা না করিয়াও শরৎচন্দ্র হিন্দুর ধর্মসংস্কারবশত এই প্রথা অকল্যাণকর নহে ভাবিয়াই ব্রাহ্মণসন্তানের উপবীত ধারণের উপর জোর দিতেন। শরৎ-চন্দ্রের বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ-৮) শরৎচন্দ্রের এই পৈতা সম্পর্কে দুর্বলতার নিম্নোক্ত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "ভারতীর আসরে একদিন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পৈতা নাই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'ও কি হে চারু, তোমার পৈতে নেই?' চারুবাবু হেসে বললেন, 'শরৎ পৈতের ওপর ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।' শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠেই বললেন, 'না, না, বামুন হয়ে পৈতে ফেলা অন্যায়।'

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের গলায় পৈতা দেখিতে পান নাই বলিয়া শরৎচন্দ্র বিরক্ত হইয়াছিলেন—একথা অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজেই শরৎ স্মরণিকা'য় 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন: "একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের যে বৎসর তিরোভাব হয়, সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে একদিন খালি গায়ে আমি বাগানের কাজে লিপ্ত আছি; হঠাৎ শরৎচন্দ্র আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এমন মাঝে মাঝে আসিতেন। আমার গলদেশে যজ্ঞোপবীত

ছিল না লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার পৈতে কোথায়; কোমরে নাকি?' তখন আমার সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ছিল না। আমি শরৎচন্দ্রকে তাহাই শুনাইলাম। আমার উত্তরে শরৎচন্দ্র সত্যই ব্যথিত হইলেন এবং রংপুরের ভাষণে (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে) যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে পিতৃপুরুষকে অপমান করা হয়।"

ভগবান ভক্তির পাত্র সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি করিবার কথা আড়ম্বর করিয়া প্রচার করা অনেক ব্যক্তির ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ কার্যসূচী শরৎচন্দ্র ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তাঁহার সামাজিক সমস্যা বিড়ম্বিত চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এই ভগবদ্‌ভক্তি লইয়া ভাবিবার অবকাশ বা সুযোগ পায় নাই; যেগুলি ইহারই মধ্যে পাইয়াছে, সেগুলিও ভগবানকে কল্যাণ ও সত্যের প্রতীক জানিয়া তাঁহার উপর ভরসা রাখিতে চাহিয়াছে; ভক্তির প্রচার বা ভক্তিবাদের প্রচার কোনটিতেই তাহারা বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই।* এই কল্যাণ ও সত্য নিরপেক্ষভাবে ভগবানের কথা চিন্তা বা ভগবৎ-সাধনা শরৎসাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। 'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেব ফকির হিসাবে ভগবৎ-চিন্তার জন্য কতখানি সময় দিতেন, সেকথা উপন্যাসে পরিষ্কার করিয়া বলা নাই, মসজিদে তাঁহার কিরূপ যাতায়াত ছিল অথবা শিষ্যদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে তিনি কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন

*মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ধর্মকে মানবতাবাদের সহিত কিরূপ চমৎকার মিশাইয়া লইয়াছেন তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহার প্রথম দিকের সাহিত্যপ্রয়াস ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পে মিলিবে। "অপর্ণা শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল, পথে সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে নিজেদের গৃহদেবতার মন্দিরচূড়া কল্পনা করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়টিতে মন্দিরের ভিতরে দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপধূনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।"

শরৎচন্দ্র সেকথা আলোচনা করেন নাই, কিন্তু জীবনায়নে পবিত্রতা-সুরভিত এই চরিত্রটির কল্যাণ-রূপ ফুটাইতে তিনি যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন। 'শ্রীকান্ত'র সন্ন্যাসী আনন্দর কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। আনন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু তাহার ধর্মাচরণ অনেকখানি কর্তব্যতন্ত্রের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, ভগবদ্‌ভক্তি ভগবানের সৃষ্টির সেবায় এবং আপন জীবনের নিঃস্বার্থ পবিত্র কল্যাণধর্মে মিশিয়া গিয়াছে। বিপরীত দিকে যাহারা আচারে অনুষ্ঠানে ধার্মিক ভাব দেখায়, অথচ যাহারা জীবনায়নে হীন, তাহাদের শরৎচন্দ্র ধিক্কার জানাইয়াছেন। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে আচার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণরা শ্রীকান্তদের এক একঘরে বিলাত-ফেরতের বাড়ীতে অতিথি ব্রাহ্মণীর মৃতদেহ দাহ করিবার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াও শেষপর্যন্ত সহরের নির্ভরস্থল ডাক্তারবাবুর হুমকিতে কিভাবে নাজেহাল হইয়া সমস্ত শাস্তির ধারা তুলিয়া লইয়া শেষপর্যন্ত ছেলেদের বৃথা কষ্ট দেওয়ার জন্য নিজেরাই ক্ষমা স্বীকারে বাধ্য হইলেন, সে চিত্র ফুটাইয়া শরৎচন্দ্র নীতিহীন আচারসর্বস্বতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এইরূপ অন্যায় যাহারা করে তাহাদের সৎসাহস নাই, কাজেই চাপিয়া ধরিলে ইহারা আত্মসম্মানটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া পলাইয়া বাঁচে। সমাজপতি ব্রাহ্মণরা প্রথমে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্মের জন্য শ্রীকান্ত প্রভৃতি কুলাঙ্গারকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে ও গোবর খাইতে হইবে। ডাক্তার-বাবুর অসহযোগিতার হুমকিতে তাঁহাদের শুধু ছেলেদের শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিতে হইল না ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যাইতে হইল।

শরৎচন্দ্রের এই যুক্তি-নির্ভর উদার মনোভাবের জন্যই 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে শরৎচন্দ্রের ঘৃণার পাত্র। গোলক চাটুয্যে চরিত্রহীন ব্যক্তি, নারীলোভী পাষণ্ড সে, আচার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ হইবার জন্য যত গর্ব সে করুক, গোলক অধার্মিক ব্যক্তি, সে শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। তাই যখন আমরা দেখি যে, শ্যালিকা জ্ঞানদার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া সেদিন না খাইবার প্রসঙ্গে সে বলিতেছে, "প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্বদিন। ছোটগিন্নি, আমাদের সব সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্রসূর্য আকাশে উঠচে, জোয়ারভাটা নদীতে

খেলচে। মধুসূদন! তোমারি ইচ্ছা!”—এবং ইহার পর বিষ্ণু চোঙদারকে লইয়া জাহাজে ছাগল চালান দিয়া ও আহম্মদ সাহেবকে জাহাজে গরু চালানের মূলধন যোগাইয়া যুদ্ধের বাজারে লাল হইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছে, তখন গোলক চাটুয্যের আচারনিষ্ঠতার মূল্য পাঠকের কাছে অবশ্যই কমিয়া যায়; আর তারপর বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদার ধর্মনাশ করিয়া বৃদ্ধবয়সে গোলক যখন তরুণী সংগ্রহের ব্যবস্থা করে তখন পাঠক অবশ্যই তাহাকে ঘৃণা করে। তখন পাঠকের মনে হয় শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই গোলক চাটুয্যের হীনতা স্পষ্টতর করিবার জন্যই তাহার মুখে প্রভু গোকুলের জন্মদিনে উপবাসের পুণ্য সম্পর্কে বড় কথা বসাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ‘সতী’ গল্পে ব্রাহ্ম হরকুমারবাবু নিরীহ, নিরহঙ্কার পণ্ডিত; অথচ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সাবজজ রায়বাহাদুর রামমোহন বাবু এ স্বধর্মত্যাগীর পাণ্ডিত্যসম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিলেন: “ভূতের মুখে রামনাম আর কি! ও জানার মুখে আগুন। এরাই হ’ল জ্ঞানপাপী, এদের মুক্তি নেই।” শরৎচন্দ্র কিন্তু এই গোঁড়া হিন্দুয়ানী বরদাস্ত করেন নাই এবং রামমোহনবাবুকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে হীন প্রমাণ করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, পুত্রের বিবাহের জন্য বৈবাহিক স্থিরীকরণে তাঁহার পছন্দ হইল দিনাজপুরের এক প্রাচীন উকিলকে যাহার “সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্মার্থ ও পেন্সনান্তে কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল।” আশীর্বাদের দিন সমবেত ভদ্রলোকদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ বর্ণনা করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকুরী দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোন গুণ নাই। “আজকাল দিনক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজী না পড়াইলে চলে না। কিন্তু যে মূর্খ (সভায় উপস্থিত হরকুমারবাবুকে ইঙ্গিত করিয়া) এই ম্লেচ্ছ বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।” ‘মহেশ’ গল্পে জমিদারের পুরোহিত তর্করত্ন গোরু মহেশের প্রতি গোফুরের অযত্নে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, “সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে সে যে সে বামুন নয়।” কিন্তু তর্করত্নের এই নীতিবাক্য শুনিয়াও শরৎচন্দ্রে

কাহিনীর ফলশ্রুতিতে একথা মনে করার কোন সুযোগই আমাদের হইবে না যে, তর্করত্ন বা তাঁহার মনিব জমিদার মহাশয়ই ধার্মিক ব্যক্তি এবং গোরুকে খাইতে না দিতে পারায় ও গোরু কষ্ট পাওয়ায় গোফুরের পাপ হইয়াছে। 'দেনা-পাওনা'র জনার্দন রায় বা শিরোমণি মশাইএর বহিরঙ্গ ধর্মাচরণে উৎসাহের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের কার্যকলাপ হীনতা-জড়িত বলিয়াই পাঠকের শ্রদ্ধা তাঁহারা দাবী করিতে পারেন না। 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবন তারিণী মুখুয্যের চেয়ে জাতি কৌলীন্যে অনেক ছোট, সে নীচু জাত, কিন্তু আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যে তারিণী মুখুয্যে তাহার বিপরীতে ম্লান হইয়া গিয়াছে, সে বৃন্দাবনের উন্নত জীবনবোধের জন্য। গ্রামে কলেরা মহামারী শুরু হইয়াছে, তারিণী মুখুয্যের স্ত্রী মৃত পুত্রের জামা-কাপড়-বিছানা বৃন্দাবনের পুকুরে কাচিতে আসিয়াছে। এই পুকুরটি সারা গ্রামের পানীয় জলের একমাত্র আধার। বৃন্দাবন দৃঢ়তার সহিত তারিণী মুখুয্যের স্ত্রীকে কলেরা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি তাহার পুকুরে কাচিতে দিল না। তারিণী মুখুয্যে খবর পাইয়া আসিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবনকে অভিশাপ দিলেন নির্বংশ হইবার। তারপর বৃন্দাবনের একমাত্র পুত্র চরণের কলেরা হইল। গ্রামে গোপাল ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসক ছিল না, বৃন্দাবন তাহার কাছে ছুটিয়া গেল চরণকে বাঁচাইতে। গোপাল ডাক্তারের সাহায্য কিন্তু মিলিল না, কারণ গোপাল ডাক্তার তারিণী মুখুয্যের ভাগিনেয়; তাহার মামাকে অপমান করিয়াছে বৃন্দাবন। তারিণী মুখুয্যের সমর্থনে দাঁড়াইলেন ব্রাহ্মণ ঘোষাল মহাশয়। বৃন্দাবন পাঁচশত টাকা দক্ষিণা দিতে চাওয়ায় গোপাল ডাক্তারের মন গলিয়াছিল, মাতৃত্বের আবেগে তারিণী মুখুয্যের স্ত্রীও স্বামীকে অনুরোধ করিলেন গোপালকে চিকিৎসায় অনুমতি দিতে, বৃন্দাবন তারিণীর পায়ে ধরিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণের মন গলিল না। শেষপর্যন্ত চরণ একরূপ বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইল। বৃন্দাবনের ডাক্তার সংগ্রহের চেষ্টার নিষ্ঠুর দৃশ্যটি ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র অসাধারণ সংযমের সঙ্গে আঁকিয়াছেন এবং এদৃশ্যে তারিণী মুখুয্যে ঘোষাল মশাইয়ের বিপরীতে বৃন্দাবনকে আঁকিয়া হীন ব্রাহ্মণ ও মহৎ শূদ্রের পার্থক্য দেখাইয়াছেন,

প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দৈন্য পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।*
'পণ্ডিত মশাই'-এ এই দৃশ্যে আছে: "বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্রবিয়োগ বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল কামনার ফলে এই দুই অধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতণ্ডার শেষ মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।"

সত্য ও মঙ্গলকেন্দ্রিক ধর্মচেতনা সম্পন্ন শরৎচন্দ্র অসত্য ও মিথ্যাচারকে ঘৃণা করিতেন, বলিয়া যাহারা ধর্মের নামে অধর্মাচরণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই খড়্গহস্ত ছিলেন, একথা 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের গোলক চাটুয্যের মত বাহিরে ধর্মভাব দেখাইয়া ভিতরে দুর্বৃত্তের পক্ষে যেমন সত্য, ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কেও তেমনি সত্য। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল, সাধু-সন্ন্যাসী সাজিয়া যাহারা লোকালয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশই সৎ নয়। এই জন্যই সাধারণভাবে তিনি সাধু-সন্ন্যাসী, আশ্রম প্রভৃতির সততা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইলে সেগুলির প্রতি সরাসরি প্রসন্ন মনোভাব দেখাইতেন না। ১৩৩৭ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের এক সভায় (১৩৩৭, কার্তিক সংখ্যা প্রবর্তক পত্রিকায় বিবরণ প্রকাশিত) শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে হালকা ভাবে বিরাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "এমন কি চার পাঁচবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ গঞ্জিকা সেবনাদি—তা অনেক করেছি।" দিলীপ কুমার রায় শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রীতিভাজন, দিলীপকুমার নিজে আশ্রমবাসী। তবু তাঁহার কাছে ১৩।৬।১৯২৯ তারিখে লেখা একপত্রে শরৎচন্দ্র আশ্রম সম্পর্কে বিরূপতা দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন: "কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন

*এখানে তারিণী মুখুজ্যের স্ত্রীকে স্বামীর অনমনীয় হীন প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া শরৎচন্দ্র নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান, সবই ভুয়ো।"—(গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১৯৫৪ হইতে উদ্ধৃত।) বলা বাহুল্য, বহু আশ্রমে মিথ্যাচার চলে মনে করিয়াই শরৎচন্দ্রের এইরূপ মন্তব্য। সাধু-সন্ন্যাসী ও আশ্রম সম্পর্কে তাঁহার এই বিরূপ ধারণা অভিজ্ঞতাজাত। শরৎচন্দ্র নিজের জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বহু সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তা তাঁহার ভাল লাগে নাই বলিয়াই এই কঠোর মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। নহিলে ধর্মীয় আচার-বিচারের মত যে সন্ন্যাসীর বা যে আশ্রমের নীতিবোধ, সততা ও কল্যাণবোধের সহিত বিরোধ নাই, যেক্ষেত্রে অন্যায় প্রশ্রয় পায় না, শরৎচন্দ্র অবশ্যই তাহাদের বিরোধী ছিলেন না। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের মুরারীপুর আখড়া দ্বারিকা দাস বাবাজীর মত সৎ পরিচালকের নেতৃত্বে যেভাবে চলিতেছিল, শ্রীকান্তের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। কমললতাকে আশ্রম হইতে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়া দ্বারিকা দাস বাবাজী যখন ব্যথাভরে স্থির করিলেন নির্দোষকে তাড়াইয়া তিনি নিজে আশ্রমে আর থাকিবেন না, শ্রীকান্ত সে কথা স্মরণ করিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে কমললতার কাছে এমন সুন্দর আশ্রমটি নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে।* কিন্তু যেখানে অন্যায় বা অসত্য চলে সেখানে শরৎচন্দ্রের অনুরাগ নাই। যে সব চরিত্রে তাঁহার আপন মনোভাবের আলো পড়িয়াছে, সেগুলির মাধ্যমে তিনি এই হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে আছে, সতীশ যখন সাবিত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানসিক হতাশা ও অবসাদে দেশের বাড়ীতে থাকো বাবার সন্ন্যাসী দলে মিশিয়া মন্ত্রতন্ত্র তথা সুরার আশ্রয়ে

*সৎ সন্ন্যাসীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেব ও 'শ্রীকান্ত'র বজ্রানন্দ। সাধারণ ভাবে বলিলেও তাঁহার এই প্রসন্ন মনোভাবের পরিচয় প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়কে ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১ তারিখে লেখা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে মিলিবে: "আপনার সঙ্গে আমার না আছে দেখা সাক্ষাৎ না আছে পত্র ব্যবহার, তবু একথা সত্য যে আপনাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি কর্মী বলে, সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বলে।"

তান্ত্রিক সাধনারত, তখন এই সন্ন্যাসী-চক্র হইতে তাহাকে বাঁচাইয়াছে সাবিত্রী। সাবিত্রী সতীশের বাড়ীতে গিয়া সন্ন্যাসীদের তাড়াইয়াছে। অথচ থাকো বাবা এবং তাহার চেলারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং সাবিত্রী অতিসাধারণ এক স্ত্রীলোক। তাছাড়া নীতির দিক হইতে সাবিত্রীর জীবন-ইতিহাস কলঙ্ক-মুক্ত নয়। অর্থাৎ এখানে শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে শুভবুদ্ধি ও মানবতাবোধের দিক হইতেই জিতাইয়া দিয়াছেন, সন্ন্যাসীদের সততাহীন, কল্যাণবোধহীন ধরিয়া লইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের 'নববিধান' উপন্যাসে অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। উষা স্বামীর গৃহে টিকিতে না পারিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার পর শৈলেশ যখন গুরু ও গুরুভাইদের লইয়া বাড়িতে মোচ্ছব সুরু করিয়া দিল এবং শিশুপুত্র সোমেনের পর্যন্ত মাথায় টিকি, পরণে সাদা থান ও গলায় তুলসীর মালা চাপাইয়া দিল, শরৎচন্দ্র উষাকে তাহার পিত্রালয় হইতে শৈলেশের বাড়ীতে আনিয়া সম্মার্জনীর সাহায্যে জঞ্জাল সাফ করিবার মত গুরু ও গুরুভাইদের সেখান হইতে তাড়াইলেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, শরৎচন্দ্রের নিজের ভগবদ্-ভক্তি থাকিলেও এবং তাঁহার নিকট নির্দোষ মনে হইয়াছে এমন হিন্দু-সংস্কার কিছু কিছু মানিলেও হীনতা বা ভণ্ডামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং যেখানে এইরূপ ধারণা তাঁহার জাগিত সেখানেই তিনি প্রতিবাদ জানাইতেন। ধর্মে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা বা সংস্কারের স্থান গৌণ, একথা শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন। নির্দোষ ঐতিহ্যপন্থী সংস্কার সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সামান্য দুর্বলতা ছিল, কিন্তু যেখানে সংস্কার প্রকৃতই অকল্যাণ সাধন করে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, সেখানে তিনি এই দুর্বলতা পরিহার করিয়াছেন। সাহিত্যিকা নিরুপমা দেবীকে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কিন্তু নিরুপমা দেবীর বারব্রত, জপতপের মাত্রাধিক্য তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা নষ্ট করিয়া দিতেছে লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মন্তব্য করেন: "বারব্রত জপতপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে তার যা কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে শুকিয়ে গেল।" —(লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্র, গোপালচন্দ্র রায়ের শরৎচন্দ্রের জীবনী-গ্রন্থ 'শরৎচন্দ্র', ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৭৮ হইতে উদ্ধৃত।) দেনা-পাওনা উপন্যাসে জনার্দন রায়ের চরিত্রটি মসীলিপ্ত, কিন্তু জনার্দন ব্রাহ্মণের বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। একদিন তিনি দুর্দান্ত

জমিদার জীবানন্দের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে যাইতেছেন, ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিতেছে। ঠাকুর দেবতার নাম লইয়া জনার্দন যাত্রা করিয়াছেন, যে বিপদে তিনি পড়িয়াছেন, দেবতার দয়াই এখন তাঁহার সম্বল। এইখানে জনার্দন রায়ের ধর্মের বহিরঙ্গ আচার-প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: (জনার্দন) "সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপর লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন; এবং হাঁচি টিকটিকি, শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।" শরৎচন্দ্র ধর্ম হিসাবে বৈষ্ণব ধর্মকে ভালবাসিতেন; তিনি গলায় তুলসী মালা পরিতেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের বহিরঙ্গ আচার-আচরণ সবক্ষেত্রে তাঁহার ভাল লাগিত না। বৈষ্ণবদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রগত দুর্বলতা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহা না হইলে শুধু শুধু শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে মুরারীপুর আখড়ায় বিশিষ্ট গায়ক মনোহর দাস বাবাজীর নারী সম্পর্কে চিত্তচাঞ্চল্য লইয়া তিনি ব্যঙ্গ করিতেন না। মনোহর দাসের গানের আসরে রাজলক্ষ্মী গিয়া যখন কমললতার পাশে বসিল, মনোহর দাসের মন তখন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: "মনোহর দাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি এক সময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার পাশে বসিল। হঠাৎ, বাবাজী-মশায়ের গলা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল, এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের ঘটনা।*

*কিন্তু সত্যকার সাধু বৈষ্ণব বলিয়া তিনি যাঁহাকে মনে করিয়াছেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন অকুণ্ঠভাবে। মুরারীপুর আখড়ার এই আসরে রাজলক্ষ্মী উপস্থিত হইলে তিনি যখন মনোহর দাসের চিত্তচাঞ্চল্য দেখাইয়াছেন, দ্বারিকা দাস বাবাজীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি তখন সশ্রদ্ধভাবে বলিয়াছেন: "শুধু দ্বারিকা দাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।"

ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কার বস্তুটির কত ক্ষমতা সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই আদর্শ ও চেতনার সহিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব তাঁহার চরিত্রে তিনি বারবার দেখাইয়াছেন এবং এই দ্বন্দ্বে মানুষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ষোড়শীর, রাজলক্ষ্মীর, রমার। এই সংস্কারের জোর কত বেশি এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ইহার প্রভাবে কিরূপ আহত হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গৃহদাহ'-এর রামবাবু। রামবাবু সৎ, উদার, তাঁহার স্নেহ আছে দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, ভগবদ্‌ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা আছে। অচলাকে (তাঁহার কাছে সুরমা) তিনি আপন কন্যার মতই স্নেহ করিয়াছেন, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইয়াও বিনা দ্বিধায় ভাত খাইয়াছেন তাহার হাতে। কিন্তু সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা যখন অন্তরের তাগিদে সত্য কথা বলিয়া ফেলিল, বলিল সে সুরেশের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, এক মুহূর্তে রামবাবুর ভিতরকার সংস্কার-দানব হিংস্র বন্যতায় দুর্দম হইয়া উঠিল। সুরমার প্রতি তাঁহার বিপুল স্নেহ চকিতে উবিয়া গিয়া এমনভাবে অচলার প্রতি বিপুল ঘৃণায় রূপান্তরিত হইল যে, যে মহিম ভ্রষ্টা স্ত্রী অচলার প্রতি অপ্রসন্ন সেও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল, মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল এই ব্রাহ্মণের সংস্কার লক্ষ্য করিয়া। 'গৃহদাহ'-এ এই জায়গায় রামবাবুর সংস্কার প্রত্যক্ষভাবে ধিকৃত হইয়াছে এবং পরোক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে শরৎচন্দ্রের আচার-নিরপেক্ষ উদার পবিত্র ধর্মবিশ্বাস। এইখানে মহিম যাহা ভাবিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা শরৎচন্দ্রেরই ভাবনা: "এখন এই কথাটিই সে (মহিম) মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিবে, কিন্তু এই আচার পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল? যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম এবং মানব-জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্তনারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এত বড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন্ সত্যবস্তু বহন করিতেছে?"

এইভাবে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব মানুষের স্বরূপ প্রকাশ করিলেও এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অন্তরে হীন তাহাদের অধার্মিক বলিয়া ধিক্কৃত করিলেও যাহারা আচার-নিষ্ঠ অথচ অন্তরে মহৎ তাহাদের শরৎচন্দ্র ধর্ম ও জীবনবোধ উভয় দিক হইতেই মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত'র ৪র্থ পর্বে কমললতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শ্রীকান্তর মনে যে ভাব জাগিল তাহা শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনার স্মারক। এই ভক্তিমতী, হৃদয়বতী, আচার-পরায়ণা দেবসেবিকা মেয়েটি নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করিয়া যায়, বৈষ্ণব আখড়ায় থাকিলেও সাধন ভজন সে বিশেষ করে না। এই দেবসেবাকেই সে বলে সাধনা, দাসীভাবে এই মহতী সাধনায় সে আত্মবিহ্বল। প্রথমে বিস্মিত হইলেও কমললতার মুখে এই আত্মনিবেদনের সরল স্বীকৃতি শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করে। উপন্যাস হইতে শ্রীকান্ত-কমললতার এখানকার কথোপকথনের কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে কমললতার ধর্মচেতনার পরিচিতি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনারও অনেকখানি পরিচয় মিলিবে। শ্রীকান্ত কমললতাকে ঘরোয়া সাধারণ সব কাজ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "কিন্তু এসব ত কেবল গৃহস্থলীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুট্‌নো-বাট্‌না, মালা-গাঁথা, কাপড় ছোপানো—একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল এই পরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনও দেখি নাই।"*

এই সঙ্গে 'গৃহদাহ'-এর মৃণালের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

*অথচ এই কমললতার আচার বিচার ত্রুটি নাই। সে কথায় কথায় দেবতার দিকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানায়। মুখে বলে গৌর গৌর। শ্রীকান্তকে সাধারণ কাপড়ে নয়, তসরের কাপড় পরাইয়া তবে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া যায়।

মৃণাল মেয়েটি আচারনিষ্ঠা, অথচ সে ধর্মচেতনাসম্পন্না। তাহাকে শরৎচন্দ্র নায়িকা অচলা চরিত্রের বিপরীতে ফুটাইয়া অচলার চরিত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অচলা স্বামী মহিম থাকিতেও সুরেশের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। মহিম তরুণ, মহিমের সহিত তাহার ভালবাসার দীর্ঘ সম্পর্ক, নিজের অবস্থা মধ্যবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও মহিম অচলার নিকট নিজেকে দরিদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়া তারপর তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, টাকার ব্যাপারে সে কোন ফাঁকা কথা বলে নাই। কাজেই মহিম অচলাকে প্রতারণা করে নাই। কিন্তু সুরেশ যখন ধূমকেতুর মত তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, অচলা তাহার অদম্য আকর্ষণকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অস্বীকার করিতে পারে নাই। ঔপন্যাসিক-সুলভ নিষ্ঠার সহিত বাস্তবসম্মত করিয়াই শরৎচন্দ্র অচলার চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার বিপরীতে মৃণাল বৃদ্ধ স্বামীকে আঁকড়াইয়া আছে, অতি বৃদ্ধা শাশুড়ীকে সে সেবা করে, মহিমকে নিজের বিবাহের আগে সে যে চোখেই দেখিয়া থাকুক, বিবাহের পর মহিমের সহিত তাহার নিষ্কলুষ ভগ্নীর, শিষ্যার, বান্ধবীর সম্পর্ক। মৃণাল আপন বিষণ্ণ পারিপার্শ্বিক হইতে উত্তরণ করিয়া আশ্চর্য প্রাণোৎসাহ দেখাইয়াছে। সে হিন্দুর আচার নিষ্ঠার সহিত মানে, বিধবা হইবার পর ইহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই, কিন্তু এই আচার-নিষ্ঠার বলিতে গেলে, কিছুটা বাহুল্য সত্ত্বেও ইহা তাহার মানবতাবোধকে কোনদিক হইতে আচ্ছন্ন করে নাই। এই সমন্বয়ে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার স্পর্শ আছে। অচলা কুলত্যাগ করিবার পর অচলার পিতা কেদারবাবুর অত্যন্ত দুর্দিনে এই অসহায় বৃদ্ধ মানুষটির সব ভার মৃণাল হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছে। অচলার মনের তির্যক গতি শরৎচন্দ্র যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন, মৃণালের অনাড়ম্বর প্রাণোচ্ছল রূপটি আঁকিতেও তাঁহাকে কম যত্ন করিতে হয় নাই। 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এমন কথা অনেকেই বলেন, অচলার বিচিত্র চরিত্র গৃহদাহের কেন্দ্রবিন্দু, এমন জটিল নারীচরিত্রটি অঙ্কনে শরৎচন্দ্র খুবই মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অচলাকে সহানুভূতি দেখাইলেও তাহার চরিত্রে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ভাবদৃষ্টি ততটা বাঙ্ময় হইয়া উঠিতে পারে নাই যতটা হইয়াছে মৃণাল চরিত্রে। সহরের শিক্ষিতা মেয়ে নায়িকা অচলার বিপরীতে অশিক্ষিতা গ্রাম্যবধূ মৃণাল অন্তরে বাহিরে মহীয়সী বলিয়াই শরৎচন্দ্রের ধর্ম-চেতনার নৈতিক সমর্থন আচার-

পরায়ণা হইলেও মৃণালের উপর গিয়া পড়িয়াছে এবং ফলে সামান্যা মৃণাল অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছে। মৃণালের মহিমা চরমে উঠিয়াছে যখন মোটামুটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম কেদারবাবু মৃণালকে বলিয়াছেন: "আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্রে তন্ত্রে কানাকড়ির বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তবু যখনই মাকে (মৃণালকে) দেখি, স্নানান্তে সেই পাঁশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমনি করে কোশা-কুশি নিয়ে বসে যাই।" বলা বাহুল্য, মৃণালের এই আচারপরায়ণ রূপের প্রতি ব্রাহ্ম কেদারবাবুর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে মহীয়সী নারী মৃণালের আচার-নিষ্ঠ-ধর্ম-চেতনার প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ও সমর্থনই প্রকাশ পাইয়াছে।

নৈতিক ধর্মচেতনাসম্পন্না নারী চরিত্র হিসাবে 'পল্লীসমাজ'-এর বিশ্বেশ্বরী শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই মহিমময়ী জননীরূপিণী জমিদার-গৃহিণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র আনন্দময়ীর প্রভাব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু স্নেহে, নিষ্ঠায়, সত্যবরণে ও সত্যাচরণে বিশ্বেশ্বরীর তুলনা নাই। বেণী তাঁহার পুত্র, বেণীকে প্রাপ্য মর্যাদা পাওয়াইয়া দিতে তিনি ইচ্ছুক, সেজন্য একবার রমেশকে তিনি মনঃক্ষুণ্ণও করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র বেণীর হীনতার জীবন্ত প্রতিবাদ রূপে ও রমেশের সংগ্রামী মহত্ত্বের সক্রিয় সহায়িকারূপে বিশ্বেশ্বরীর ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। রমার অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিকতাকে তিনি হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু রমেশের প্রতি আকর্ষণের ফলে রমার অতলান্ত নিমজ্জন হইতে তিনি সাবধানী মমতাময়ী দৃষ্টি রাখিয়া রমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নিজের গর্ভজাত একমাত্র সন্তান বেণী মাথায় লাঠির আঘাত পাইয়াছে, তিনি বেদনাবোধ করিলেও তাহার ন্যায্যতা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। কুপুত্র বেণীর হাতের মুখাগ্নি এড়াইবার জন্য তিনি দেশ ত্যাগ করিলেন, এ শুধু তাঁহার মুখের কথা নয়, ধর্মশীলা নারীর অন্তরের কথা।* শরৎচন্দ্রের ধর্ম-চেতনার আনুকূল্যেই বিশ্বেশ্বরীর এই মহান্ রূপ সম্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই।

*'পল্লীসমাজ'-এর শেষ দৃশ্যে বিশ্বেশ্বরীর ধর্ম-সংস্কার ও নীতিবোধ অপূর্ব ফুটিয়াছে। রমেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এত শীঘ্র তিনি তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন কেন? বিশ্বেশ্বরী রমেশের

'দেনা-পাওনার' ষোড়শীর কথাও এই সূত্রে বিচার্য। ষোড়শী চণ্ডীগড়ের দেবী চণ্ডীর ভৈরবী, তাহার ধর্মগত জীবনের উজ্জ্বল একটা পরিচয় উপন্যাসে দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে ষোড়শীর সুমহান কর্মজীবনকে শরৎচন্দ্র সযত্নে আঁকিয়াছেন। দেবীর পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে, দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে ষোড়শীর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ, ইহার বিরুদ্ধতা যদি কেউ করে, তাহার সঙ্গে লড়াই করিতে ষোড়শী সদাই প্রস্তুত। সে জপতপ করে, সন্ন্যাসিনীর বিলাসবিহীন জীবন যাপন করে। কিন্তু এই ভৈরবীত্ব ছাড়াও ষোড়শীর আর একটি পরিচয় আছে। মনুষ্যত্বের মহান্ আবেগে তাহার হৃদয় সর্বদাই তরঙ্গিত। সাগর সর্দার প্রমুখ দরিদ্র, অসহায়, অন্ত্যজদের ষোড়শী জননীস্বরূপা। সততা ও মানবকল্যাণে সব সময়ে তাহার আগ্রহ। তারপর তাহার জীবনে আসিল প্রেম এবং সেই প্রেম যে পুরুষকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইল সে তাহার স্বামী। এবার সুরু হইল ষোড়শীর অন্তরে কঠিন সংগ্রাম। ধর্মবোধ, কর্তব্যবোধ, সংস্কার ও প্রেমের প্রচণ্ড লড়াইয়ে ষোড়শীর অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য সংযমের সহিত সে সবদিক রক্ষা করিয়া জীবানন্দকে মনুষ্যত্বে ফিরিয়া আসিবার মহৎ প্রেরণা দিয়া চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘির কুষ্ঠাশ্রমে দুঃস্থ মানুষের সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র ষোড়শীর হৃদয়-ধর্মকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই হৃদয়-ধর্মের প্রতি আপাত-বিরূপতা সত্ত্বেও তাহাকে জিতাইয়া দিয়াছেন। ষোড়শীকে অলকায় ফিরিয়া যাইতে দিতে শরৎচন্দ্রের দ্বিধা তো প্রকাশ পায়ই নাই, বরং সমর্থন দেখা গিয়াছে। প্রজাদের কল্যাণ-সাধনে, সততা ও মানবতাবোধের এবং সুগভীর প্রেমের মর্যাদায় ষোড়শী নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল চরিত্র, কিন্তু দেবী চণ্ডীর একান্ত সেবিকা, নিষ্ঠাবতী আচারনিষ্ঠা হিসাবে তাহার পরিচয় কম উজ্জ্বল নয়। উভয় দিক হইতেই ষোড়শীর চরিত্র-গৌরবকে শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত আঁকিয়াছেন, পরস্পরকে পরিপূরক মনে

মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হ'লে ত কোন মতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে পুড়ে মরি আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ।"

না করিলেও দুই প্রান্তের মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলিয়া তিনি ভাবেন নাই। যে ষোড়শী সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করে না, সেই ষোড়শী রাত্রিকালে নিরালা ঘরে অসংকোচে স্বামী সংস্কারের আবেগে অত্যাচারী মাতাল জীবানন্দকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া নিজের আঁচলখানি তাহাকে হাত মুছাইবার জন্য আগাইয়া দেয়, আবার এই জীবানন্দকে ভাল হইবার অনুপ্রাণনা যোগাইয়া তাহার মর্যাদা রক্ষার জন্য বড় প্রেমের গৌরবে নিজেকে জীবানন্দের সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া যায়।

'দত্তা' উপন্যাসের দয়াল চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনা-সিঞ্চিত। 'দত্তা'য় দয়াল ও রাসবিহারী উভয়েই বহিরঙ্গভাবে ধর্মপ্রাণ। দয়াল ব্রাহ্মমন্দিরের পুরোহিত, রাসবিহারী ব্রাহ্মধর্ম প্রসারের উদ্যোক্তা। কিন্তু দয়ালের চরিত্র মহৎ বলিয়া তাহা শরৎচন্দ্রের যতখানি সহানুভূতি পাইয়াছে, রাসবিহারী খল চরিত্ররূপে যেন তদনুপাতেই লাঞ্ছিত হইয়াছে। দয়াল হিন্দুমতে বিজয়ার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বিজয়াকে কিছু জানিতে না দিয়া সারাদিন উপবাসী রাখিয়াছেন, নরেনদের কুলপুরোহিতকে খুঁজিয়া আনিয়াছেন। ব্রাহ্মমন্দিরের পুরোহিত দয়ালের পক্ষে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের এই খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে বলিয়া হয়তো কাহিনীর এই অংশে একটু বাড়াবাড়ির ছাপ পড়িয়াছে, কিন্তু ধর্ম ন্যায়, কল্যাণ ও সত্যের সহিত একসূত্রে গাঁথা, শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনা উদার-হৃদয় ধার্মিক ব্রাহ্ম আচার্য দয়ালের চরিত্রে সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের বিপ্রদাসকেও শরৎচন্দ্র অনুরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিপ্রদাস আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পূজার ঘরে তাহার ধ্যানরত মূর্তি দেখিয়া বন্দনা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শান্ত সমাহিত সুন্দর রূপ প্রকৃতপক্ষে আধুনিকা বন্দনার মনে বিপ্রদাসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগাইয়াছে। কিন্তু সেই পূজার্চনা, নীতি-নিয়ম পালনকারী বিপ্রদাসই আবার বোম্বাই প্রবাসিনী আলোকপ্রাপ্তা বন্দনার ব্যক্তিগত জীবনের আপাত-অসামাজিক রূপকে বন্দনার নিজের দিক হইতে উপলব্ধি করিয়া সহানুভূতির সহিত সেই আধুনিকাকে সমর্থন করিয়াছে। অব্রাহ্মণ সুধীরকে ব্রাহ্মকন্যা হইয়াও বন্দনা ভালবাসিয়াছে, সুধীরের সহিত বন্দনার বিবাহ স্থির হইয়াছে, একথা শুনিয়া আচার-বিচারে নিষ্ঠাবতী দয়াময়ী হতাশ হইয়া পড়িলেন।

এ পর্যন্ত তিনি বন্দনার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহময়ী ছিলেন, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর ভরসা করিতে সুরু করিয়াছিলেন, সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া লজ্জাবতী না হইলেও এই সপ্রতিভ মেয়েটিকে আপন কনিষ্ঠা পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিবার কথাও তাঁহার মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে আঘাত পড়িল, অর্থাৎ যে মুহূর্তে তিনি শুনিলেন যে, ব্রাহ্মণকন্যা হইয়াও বন্দনা কায়স্থ সুধীরকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ীর বন্দনার প্রতি সমস্ত প্রীতিভাব লোপ পাইল। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এইভাবেই অচলা সুরেশের বিবাহিতা স্ত্রী নয় একথা জানামাত্র ধর্ম-সংস্কার আহত হইবার ফলে অচলার উপর হইতে রামবাবুর ইতিপূর্বে সঞ্চিত সমস্ত প্রীতিভাব নিঃশেষিত হইয়াছিল। 'বিপ্রদাস'-এ আলোচ্য সময়ে বন্দনা সম্পর্কে দয়াময়ীর ব্যবহারে যে রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যে শুধু বন্দনা অপরের বাগ্‌দত্তা এই সংবাদে বন্দনাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিবার আশা চূর্ণ হইবার জন্যই হইয়াছে এমন নয়, ব্রাহ্মণ্য-আচার-পরায়ণা দয়াময়ীর কাছে ব্রাহ্মণ-কন্যার এই অব্রাহ্মণকে পতিরূপে বরণ অমার্জনীয় অপরাধ। এই অনাচার দয়াময়ীর কাছে অধর্ম। কিন্তু 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের নায়ক বিপ্রদাস, দয়াময়ী সেখানে সহায়ক চরিত্র মাত্র। বিপ্রদাসের মনোভাবের সঙ্গে লেখক-মানসের ঘনিষ্ঠ সংশ্লেষ আছে। বিপ্রদাস এমনই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কিন্তু বন্দনার ব্যাপারে বিচক্ষণ বিপ্রদাস উদারতা দেখাইল। বন্দনাকে বিপ্রদাস মানুষ হিসাবে বিচার করিল, ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কারের দিক হইতে নয়। বন্দনা যে পরিবেশের মানুষ, প্রবাসে বোম্বাইয়ের মত জায়গায় যেভাবে জাতিকুল-সংস্কারহীন জীবনযাপনে সে অভ্যস্ত, তাহার যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা, বিপ্রদাস তাহা সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সহানুভূতির সহিত তাহার অবস্থা বুঝিল। বলা বাহুল্য, বন্দনাকে আচার-নিরপেক্ষ এই উদার দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রই দেখিয়াছেন। বিপ্রদাস বন্দনা সম্পর্কে বিষণ্ণা দয়াময়ীকে সান্ত্বনাসূচক সমর্থনও করে নাই, বরং মানবতামূলক দৃষ্টিকোণ হইতে বন্দনাকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার ব্রাহ্মণ্য লোকাচারের বিপরীত আচরণকে সহানুভূতির সহিত বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং দয়াময়ীকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছে যে, বন্দনারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে সে কাজ প্রকাশ্যেই করে, ইহাতে কোন অপরাধ নাই। প্রসঙ্গ-ক্রমে বিপ্রদাস তুলনামূলকভাবে নিজের ভাই দ্বিজদাস সম্পর্কে মায়ের কাছে

বিরূপ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছে যে, দ্বিজদাসের কথায় ও কাজে যে সামঞ্জস্য নাই তাহাই অন্যায়।*

শরৎচন্দ্র বিপ্রদাসের মাধ্যমে মানুষ হিসাবে বন্দনায় অধিকার স্বীকার করিয়া এই যে মানবতামূলক মনোভাব দেখাইলেন তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ ধর্মবোধাত্মক। প্রকৃতপক্ষে যে ধর্মাচরণে বহিরঙ্গতাই সব, যাহার মূলে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণবোধ সন্নিবিষ্ট নাই, যাহা আপন ক্ষুদ্র পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অতিক্রম করিয়া মহৎ ও বৃহৎ জীবনধর্ম স্পর্শ করিতে সচেষ্ট নয়, শরৎচন্দ্র তাহার সমর্থক ছিলেন না। এইজন্যই 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাসের মধ্যে শরৎমানস যতটা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, দয়াময়ীর মধ্যে ততটা হয় নাই। অথচ মানবধর্মী ছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্র দয়াময়ীর শুচিবায়ুগ্রস্ততা ও সংস্কার সত্ত্বেও তাঁহাকে যথাযথভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং দয়াময়ীর দুর্বলতার কালি তাঁহার উদারতা ও গৃহিণীত্বের এবং শ্রদ্ধেয় চরিত্র বিপ্রদাসের মায়ের গুণ-বর্ণনাত্মক উক্তিসমূহের দ্বারা বারবার লঘু করিয়া দিয়াছেন। 'গৃহদাহ'-এর রামবাবুর কথা আগেই

*এই উদার মানবোচিত মনোভাব 'গৃহদাহ'-এর সুরেশের পিসিমার এবং অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এ অমরনাথের মায়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন। 'গৃহদাহ'-এ অচলা যখন সুরেশের পিসিমার অভ্যর্থনায় অবাক হইয়া বলিল যে, সে ব্রাহ্ম মেয়ে বলিয়া তো তিনি তাহাকে ঘৃণা করিলেন না, পিসিমা তাড়াতাড়ি আপনার আঙ্গুলি প্রান্ত দ্বারা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন: "তোমাকে ঘৃণা করব কেন মা?···আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলে কি এমন নির্বোধ এত হীন বৌমা যে শুধু ধর্মমত আলাদা বলে তোমার মত মেয়েকে কাছে বসাতে সঙ্কোচ বোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা মা।"

'জাগরণ'-এ আছে কায়স্থ-কন্যা ইন্দু যখন বান্ধবী আলেখ্যদের দেশের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া একদিন সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ অমরনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, অমরনাথের মাতা ও ভগিনী তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অমরনাথের মাতা বলিলেন, গরীবের ঘরে সন্ধ্যার সময় কমলা এলেন। ইন্দু নিজেকে কায়স্থ-কন্যা বলিলে পুরোহিত-পত্নী ও পুরোহিত-জননী অমরনাথের মা স্নিগ্ধহাস্যে বলিলেন: "তুমি যে সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে লক্ষ্মী এলে। দেবতার কি জাত থাকে মা?"

উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণ অবস্থায় রামবাবু খুবই সহৃদয় সৎ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার অতি-প্রবল হিন্দুসংস্কার মানবিকতার স্পর্শশূন্য বলিয়া এবং তাহার মন সম্পূর্ণভাবে সেই সংস্কারে আচ্ছন্ন বলিয়া শেষ পর্যন্ত রামবাবু জীবনের পরীক্ষায় পরাজিত হইয়াছেন। তিনি শুধু মহিমের শ্রদ্ধা হারান নাই, লেখক, পাঠক সকলের শ্রদ্ধাই হারাইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হইয়াছে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের রাজেন চরিত্রটির রূপায়ণ প্রসঙ্গে। রাজেন 'শেষপ্রশ্ন'-এ সংক্ষিপ্ত চরিত্র, সে উপন্যাসের নায়ক নয়, উপন্যাসে প্রেমের পটভূমিতে তাহার বড় আসন নাই। কিন্তু ইস্পাতের মত দৃঢ় পুরুষচরিত্র হিসাবে রাজেন অনন্যা কমলকেও মুগ্ধ করিয়াছে। পুরুষ চরিত্র হিসাবে রাজেন শরৎচন্দ্রের এক আশ্চর্য বলিষ্ঠ সৃষ্টি। রাজেন দেশপ্রেমিক, মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে সে একজন সৈনিক। ব্যক্তিগত সুখ তাহার নিকট তুচ্ছ, নারীর নিছক রূপ তাঁহার মনকে একটুও আকর্ষণ করিতে পারে না। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে শরৎচন্দ্র রাজেন চরিত্র খুবই যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু সেই রাজেনের পরিণতিতে শরৎচন্দ্রের মনোভাবের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। রাজেন আদর্শবান দেশাত্মবোধী, নৈতিক চরিত্রবান তরুণ কর্মী সে। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি এই উজ্জ্বল চরিত্রটি পাইয়াছে। কিন্তু এই রাজেন যখন সামান্যের গণ্ডিতে আপন অসামান্যত্বের সম্ভাবনা খণ্ডিত করিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিল, সেই খণ্ডিত রূপের উজ্জ্বলতা বা গৌরব যাহাই থাকুক, রাজেনের বাস্তব সম্ভাবনার নিরিখে সেই পরিণতি শরৎচন্দ্রকে বিষণ্ন করিয়াছে। রাজেন মথুরা জেলার এক সরকারী ডাক্তারখানায় অসহায়ভাবে মারা গেল। গ্রামের এক মন্দিরে আগুন লাগিয়াছিল। রাজেন বিগ্রহকে বাঁচাইতে গিয়া নিজের জীবন বিসর্জন দিল। সাধারণ মানুষের কাছে দেবতার জন্য এই জীবন-বিসর্জন মহপুণ্যাত্মক, দশ হাজার লোক কীর্তন করিয়া যমুনার ঘাটে সাড়ম্বরে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিল। ঘটনাটি মর্মস্পর্শী এবং সকলের মনেই রাজেনের মর্যাদার আসন ছিল। আশুবাবু খবরটি শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বয়সে অনেক ছোট হইলে এই মহৎ প্রাণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় আশুবাবু মাথায় নত করিলেন। ভাবাবেগে দুটি হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধু দেশ —এই ভারতবর্ষটা। তবু ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো।

তুমি আর যাই করো এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত কোরো না।" কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আশুবাবুর এই বেদনার্ত ভাবোচ্ছ্বাসে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয় নাই, যদিও আশুবাবুর স্নিগ্ধ চরিত্রটি শরৎচন্দ্র সশ্রদ্ধভাবেই আঁকিয়াছেন এবং বহুবার বহু বিতর্কে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উপস্থিত সকলেই সে যুক্তি স্বীকার করিয়াছে। এখানে কিন্তু আশুবাবুর রাজেন সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তি কিছুটা সুলভ হৃদয়-দৌর্বল্যজাত; কথাটা আশুবাবুর মত সহৃদয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হিসাবে কতকটা রূঢ় শুধাইলেও শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে এইরূপ মনোভাবই দেখাইয়াছেন। রাজেনের চরিত্র মহান; সে দেশকে, মানুষকে ভালবাসে, কাজের লোক সে, অজস্র সমস্যা পীড়িত আমাদের দরিদ্র দেশে রাজেনের মত কর্মীর প্রয়োজন সীমাহীন। এমন মূল্যবান দুর্লভ প্রাণটি আগুন হইতে দেবতার বিগ্রহ বাঁচাইতে পুড়িয়া মরিয়া গেল। দেবতার বিগ্রহ ভক্তির জিনিষ, তাহা সযত্নে রক্ষা করাই কর্তব্য। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় বা ঘটনাচক্রে যদি সে বিগ্রহের মন্দিরে এমন আগুন লাগে যাহাতে বিগ্রহ রক্ষা করিতে রক্ষাকারীর জীবন-সংশয় হয় এবং যদি সেই রক্ষাকারীর জন্য মানুষ, সমাজ তথা দেশ অপেক্ষা করে, তাহা হইলে দেবমূর্তি রক্ষার জন্য এমন কর্মীর আত্মাহুতি কি বাঞ্ছনীয়! দেবতার বিগ্রহ পুড়িতে না দেওয়ার পিছনে ভক্তি ও ভাবাবেগের যতটা স্থান, প্রয়োজন ও যুক্তির গুরুত্ব সে হিসাবে কতখানি? দেবতার বিগ্রহ পুড়িলে বাস্তব হিসাবে যে সম্পদ হানি হইবে, রাজেনের মত মহৎ প্রাণকে হারাইবার ক্ষতির সহিত তাহার তুলনা হয়? তাছাড়া তত্ত্বের দিক হইতে দেবতা যদি বিশ্বেশ্বর হন, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তাঁহার আত্মরক্ষার চেষ্টা রাজেনের মত মহৎ কর্মীকে আপন জীবন-বিনিময়ে করিতে হইবে কেন? রাজেন অকালে চলিয়া গেলে তাহার আরব্ধ কার্য কে চালাইবে? জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচনের, শোষক বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত বিরামহীন সুকঠিন সংগ্রামের একজন দক্ষ সৈনিক তো এভাবে চলিয়া গেল। দেশ এবং দেশের অসংখ্য শোষিত মানুষ রাজেনের মত সংগ্রামী বীরের কাছে অনেক কিছু আশা করিয়াছিল। সে আশা যে কারণে নিষ্ফল হইল তাহার আপেক্ষিক মূল্য কতটুকু? মূল্যবোধের নিরিখে ইহা কি এক ধরণের মহৎশক্তির অপচয় নয়? শরৎচন্দ্রের এই হৃদয়-বেদনাই কমলের

কথায় ফুটিয়াছে। কমল রাজেনকে আন্তরিক ভালবাসিত, রাজেনের দৃপ্ত পৌরুষ ও পবিত্র চরিত্রে তাহার শ্রদ্ধা ছিল। রাজেনের মৃত্যুতে তাহার গভীর ব্যথাবোধ স্বাভাবিক। কিন্তু রাজেনের এইভাবে প্রাণত্যাগ কমল আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়াই মনে করিল। তাহার মনে হইল, রাজেন সাময়িক আবেগবশে যে কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য অজস্র উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিলেও তাহা কার্য-কারণ-সম্পর্কে অবিবেচনা-প্রসূত। মহৎ সংকল্প লইয়া, মহান্ প্রস্তুতি লইয়া, কঠোর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রাজেন যেন আপাত-উচ্ছল তুচ্ছ এক অজুহাতে সংগ্রামের চ্যালেঞ্জকে পাশ কাটাইয়া গেল। ইহাতে আর যাহাই থাক কর্মী বা সৈনিকের বীরত্ব কম, মনুষ্যত্বের পরিচয়ও বেশি নয়। কমল প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায় অশ্রুসজল হইল না, মহৎ বন্ধুর মহান্ প্রাণের অপচয়ে ক্ষোভে দুঃখে কঠিন হইয়া উঠিল। 'শেষ প্রশ্ন'-এর এইখানে কমলের মনোভাব শরৎচন্দ্র বলিষ্ঠভাবে ফুটাইয়াছেন, ইহার পিছনে তাঁহার নিজের মনের সমর্থন রহিয়াছে: "এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন হইতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল; দুঃখ কিসের, সে বৈকুণ্ঠে গেছে!" হরেন্দ্রকে বলিল, "কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।"

শুধু কল্যাণবোধের দিক হইতে নয়, সারল্য ও সততার দিক হইতেও শরৎচন্দ্র ধর্মকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেন।* সামাজিক কথাসাহিত্যিক বলিয়া মানবমনের গ্রন্থিমোচন তাঁহার প্রধান কাজ ছিল সন্দেহ নাই,

* 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে শিরোমণি মহাশয়, জনার্দন রায় প্রভৃতি ষোড়শীর বিরুদ্ধে জীবানন্দের কাছে নালিশ জানাইতে গিয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় জীবানন্দের নিকট হইতে বক্তব্য পেশের তাড়া খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া ফেলিলেন তিনি 'যথাধর্ম' বলিবেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ তাঁহাকে যাহা বলিয়া নিরস্ত করিল তাহা ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যা নয়, শরৎচন্দ্রের নৈতিকতা-সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা। জীবানন্দ বলিল: "আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু, একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তাঁর অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্মের যথাটা যদিবা থাকে, ধর্মটা থাকবে কি?"

কিন্তু সেইসঙ্গে যাহা সহজ, সরল, সত্য ও সুন্দর, তাহার প্রতি শরৎচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। এইজন্য 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বে সংসার-বুদ্ধিহীন গহর কবি তাঁহার প্রীতিধন্য, বৈকুণ্ঠের উইল-এ মূর্খ গোকুলকে তিনি শিক্ষিত বিনোদের হিসাবে জিতাইয়া দিয়াছেন, 'নিষ্কৃতি'তে সরল হৃদয়বান দম্পতি গিরিশ-সিদ্ধেশ্বরী পাঠকের মন কাড়িয়া লয়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সরলতার প্রতিমূর্তি উপেন্দ্রের স্ত্রী সুরবালা এ হিসাবে শরৎচন্দ্রের অনুপম সৃষ্টি। বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া সুরবালা চরিত্রহীনের অত্যুজ্জ্বল নারী চরিত্র কিরণময়ীর পাশে দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু কিরণময়ী আপন বুদ্ধির ভার দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া যুক্তিতর্কের মধ্যে না ঢুকিয়াই সুরবালার সারল্যের কাছে নতিস্বীকার করিয়াছে। একদিন মহাভারতে শরশয্যাশায়ী তৃষ্ণার্ত ভীষ্মের জন্য জলের ব্যবস্থা লইয়া কথা হইতেছিল। সরোজিনীর বিতর্কের উত্তরে সুরবালা দৃঢ় প্রত্যয়ে অসাধারণ সারল্যের সঙ্গে যখন বলিল শরশয্যাশায়ী তৃষ্ণার্ত ভীষ্ম কিভাবে দুর্যোধনের স্বর্ণভৃঙ্গারে আনা জল না খাইয়া অর্জুনের শরাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া আনা জল পান করিলেন, যুক্তির হিসাবে দুর্বল হৃদয়সঞ্জাত এই সরল উক্তি বিদুষী কিরণময়ীকে তাহার বিদ্যার দম্ভ ভুলাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিল। কিরণময়ী আবেগে সুরবালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। অভিভূতা কিরণময়ীর চোখ জলে ভরিয়া গেল, উদাসভরে সে ধীরে ধীরে বলিলঃ "বোন, যারা অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছে তারা জানে আজ তুমি যেমন বিচার করে দিলে এর চেয়ে বেশী বিচার কোন ধর্মগ্রন্থে কোনদিন কোন পণ্ডিত করতে পারেননি।"

বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা সত্য ও সুন্দরের জন্য আকুতির সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। এই ধর্মচেতনা বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষভাবেই অন্তরের মহিমাব্যঞ্জক।* শরৎসাহিত্যে লেখকের ধর্মবোধ একদিকে যেমন

*'দত্তা' উপন্যাসের ২৬তম পরিচ্ছেদে নরেনের যে উক্তিটি নলিনী দয়ালের কাছে উদ্ধৃত করিয়াছে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার স্বরূপ। নরেন বলিয়াছে 'সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের উর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্য প্রকাশের দম্ভকে ভালবাসে বলেই করে।"

অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের অস্বীকৃতিমূলক চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যদিকে আবার ইহা উজ্জ্বলভাবেই নিষ্ঠা ও সত্যাদর্শের মহিমান্বিত চরিত্রে আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের ছবিতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেই এই দুই বিপরীত প্রান্তীয় ধর্ম-চেতনার দৃষ্টান্ত আছে, প্রথমটি দ্বিতীয় পর্বের অভয়া চরিত্রে এবং দ্বিতীয়টি প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি চরিত্রে। উভয় ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি সহানুভূতিশীল; তাঁহার নিজের সংস্কারের জন্যই হউক বা অন্নদাদিদির মহিমার জন্যই হউক, অন্নদাদিদির প্রতি শরৎচন্দ্রের অধিকতর আকর্ষণ হইলেও দুজনকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন। অভয়া পরপুরুষ রোহিণীবাবুর সহিত ঘর বাঁধিবার পরও মুগ্ধ শ্রীকান্ত তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছে: "আমার মনে হয় না এতবড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষ মানুষের মধ্যেও বেশী আছে।" আবার স্বামীর একান্ত অনুগামিনী সতীসাধ্বী অন্নদাদিদিকে অভয়ার বিপরীতে রাখিয়া এই শ্রীকান্তই বলিয়াছে: "আমার অন্নদাদিদি একাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়া বরঞ্চ তাঁহার বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শরৎচন্দ্রের ধর্ম-চেতনা আচার-কেন্দ্রিক না হইয়া পবিত্রতাধর্মী ছিল, তিনি সব সময় তাহার সঙ্গে জগৎ ও জগতের মানুষের মঙ্গল কতটুকু জড়িত আছে তাহা লক্ষ্য করিতেন। এইজন্য আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণে তাঁহার আপত্তি ছিল না, যদি সেই আচার আচরণ সততা ও মঙ্গলবোধের পরিপন্থী না হয়। পক্ষান্তরে সমাজে যাহা বিধিবিধান-বহির্ভূত বলিয়া নিন্দিত হইতে হইতে অনাচরণীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যেও এই কল্যাণধর্মিতা নিহিতমূল্যে কতটুকু আছে তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র অনেক অসামাজিক প্রেমের ছবি আঁকিয়াছেন, সেই অঙ্কনে তিনি কোনরূপ সঙ্কোচ দেখান নাই। মানুষের মনের গোপন ক্ষুধা এবং বিচিত্র চরিত্র-রহস্য উপন্যাসে শিল্পী হিসাবে উন্মোচিত করা ছিল তাঁহার

কাজ। এই কাজে সমাজের প্রচলিত নীতি বা বিধানের সহিত সামঞ্জস্য নাই, এমনকি এই নীতি বা বিধানের প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী ছবিও তিনি সযত্নে আঁকিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা নিষ্ঠার সহিত আঁকিয়াছেন বলিয়াই শরৎচন্দ্র সমাজের অস্তিত্ব বা মূল্য অস্বীকার করিয়াছেন অথবা সমাজকে ভাঙিয়া দিতে চাহিয়াছেন এমন নয়।* বরং ইহার বিপরীতে দেখা যায়, ধর্মভিত্তিক সমাজের কাঠামো যাহাতে ভাঙিয়া না পড়ে, সেদিকে শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এজন্য শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে পলায়নপর মনোভাবেরও আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কাহিনীর গতিপ্রকৃতির স্বাভাবিকতায় অথবা চরিত্রের অগ্রগতির স্বাভাবিকতায় যে ঘটনা ঘটার কথা, শরৎসাহিত্যে লেখকের আলোচ্য সমাজ-চেতনার চাপে কখনও কখনও তাহা ঘটিতে পারে নাই। অবশ্য বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র যে এ হিসাবে অনেক আধুনিকতা দেখাইয়াছেন তাহা গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও জটিল মনের বিস্তৃততর রূপায়ণে তাহার অগ্রগতি সকলেরই চোখে পড়িবে। কিন্তু সমাজের ব্যবস্থা যেক্ষেত্রে পুরাতন অথচ যেক্ষেত্রে মানুষের মন পরিবর্তিত নূতন চেতনায় অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয়, সেক্ষেত্রে পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধ আঁকড়াইয়া থাকা হাস্যকর, এ ধরণের যে মনোভাব মনীষী বার্নার্ড-শ' দেখাইয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহা পুরোপুরি দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমাজ-চেতনা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, এইভাবে প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধের ধ্বংসাত্মক মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—কাহারও নাই। এইজন্য আর্টের দিকটি বড় করিয়া না দেখিলে ধর্ম-চেতনা-সম্পৃক্ত লেখকের সমাজ-চেতনার হিসাবে শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরীর ও রমার কুঁয়াপুর ছাড়িয়া কাশীতে আশ্রয় গ্রহণ, 'দত্তা'য় নরেনের হিন্দুমতে বিজয়ার সহিত বিবাহ, 'মন্দির' গল্পে শক্তিনাথের স্মৃতি-বিজড়িত দেলখোসের শিশি আবর্জনা হইতে তুলিয়া অপর্ণার মদনমোহনের পদতলে চোখের জলে ভিজাইয়া সমর্পণ প্রভৃতির চমৎকার ব্যাখ্যা করা যায়। শরৎচন্দ্রের এই ধর্মচেতনা-নিয়ন্ত্রিত শিল্পীমনের পরিচয় দিতে গিয়া তাই মনে হয় যে, এইভাবে কিছুটা রক্ষণশীল হওয়ার জন্যই প্রত্যক্ষ সামাজিক

* এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দুর্নীতি ও মানুষের পারিবেশিক হীনতা-ক্লিষ্ট শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী মন সংযত ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারিয়াছে। প্রবীণ সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায় শরৎসাহিত্য যে বিদ্রোহভাবের চাপে ধ্বংসাত্মক উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হইয়া শুচি সংযত ও কল্যাণশ্রীমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে স্বস্তিপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "বাঁধনের মাঝে যে মুক্তি সেই মুক্তিই আর্টের মুক্তি।" (শরৎসাহিত্য, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৩০) অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন যে, এই বিচিত্র ধর্মচেতনা প্রভাবিত সমাজচেতনার ফলে আর্টের ক্ষতি হওয়া ছাড়াও শরৎচন্দ্রের মনে সংস্কারের প্রভাব দেখা দিয়াছিল, পূর্বোল্লিখিত যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শরৎচন্দ্রের দৃঢ়বিশ্বাস এবং তাহার ব্যতিক্রমে তাঁহার স্পষ্টতঃ ক্ষুব্ধ হওয়া এই সংস্কার-প্রভাবের নমুনা।

বাস্তবিক শরৎচন্দ্রের মধ্যে সমাজের হীনতা অপনোদনের আগ্রহের সহিত ধর্মাচরণের নামে প্রচলিত আচারাদির প্রতি সংস্কারগত আনুকূল্য-প্রবণতা কিরূপ জড়াইয়াছিল 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের দয়াময়ীর 'আচার-বিচার এবং মানসিক উদারতা এক সঙ্গে লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। বিপ্রদাস যুক্তিপ্রবণ ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু জননী দয়াময়ীর সংস্কার, বলিতে গেলে তাঁহার শুচিবায়ু-গ্রস্ততাকেও বিপ্রদাস তাচ্ছিল্য তো করেই নাই, বিতর্কের মুখে বরং সমর্থনই করিয়াছে। বিপ্রদাস না হয় দয়াময়ীর পুত্রাধিক স্নেহভাজন সপত্নী-পুত্র, আধুনিকা, শিক্ষিতা, প্রবাসিনী, বন্দনার মন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের মানসিকতার স্পর্শে দয়াময়ীর এই সংস্কারবোধকে সমর্থনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। দয়াময়ীর সহিত বন্দনার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি দয়াময়ীর সংস্কারবোধের পেষণে বিষণ্ণ, বন্দনা বেদনার্ত স্মৃতি লইয়া বলরামপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। বলরামপুরে বন্দনা স্বচক্ষে দয়াময়ীর যে সংস্কারের দাপট দেখিয়া আসিয়াছে, বিপ্রদাসদের কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়াও সেই দাপটের অব্যাহত প্রভাব তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপ্রদাসের মাতৃস্তুতিতে এবং এখন অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন পরিবেশ রচিত হইবার জন্য বন্দনার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইল। দয়াময়ী কলিকাতার বাড়ীতে যে কোন সময়ে আসিয়া পড়িলে শুচিতার হিসাবে তাঁহার কোন অসুবিধা যাহাতে না হয় তজ্জন্য গোটা তিনেক তামার হাঁড়া নিত্য ঘষিয়া মাজিয়া ঝকঝক করিয়া রাখা হইত, ইহা দেখিয়া বন্দনার মনে হইল নিত্যনিয়ত এই ব্যাপক পরিচ্ছন্নতার অব্যাহত ব্যবস্থা, ইহা যাহারা করিয়া রাখে, তাহাদের উপর শাসনের নয়, স্নেহের প্রভাবই বেশি।

এসব কাজে তাহাদের বিশ্বাস আছে কি না সে কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ইহাতে যে তাহাদের শ্রদ্ধা আছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। 'বিপ্রদাস'-এ এইখানে আছে; (মা) "যেন এইখানে বাস করিয়া আছেন এমনি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এযে কেবল হুকুম করিয়া শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার চেয়ে বড় কিছু একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, একথা বন্দনা চাহিবা-মাত্রই অনুভব করিল।" মোটের উপর কিছু দোষ থাকিলেও সমগ্রভাবে দয়াময়ী অন্তরে ভাল বলিয়াই শরৎচন্দ্র তাঁহাকে পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতা হইতে এইভাবে রক্ষা করিয়াছেন।*

শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার কাছে বলা সুরেশের পিসিমার উক্তিতে চমৎকার প্রতিফলিত হইয়াছে। অচলা তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দু সমাজের মহিলারা ব্রাহ্ম মেয়েদের খুব ঘৃণা করেন বলিয়া সে শুনিয়াছে, এমনকি এক সঙ্গে বসিলে দাঁড়াইলেও নাকি তাঁহাদের স্নান করিতে হয়, তাহার উত্তরে সুরেশের পিসিমা হিন্দু মহিলাদের এরূপ ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয়তো তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে, কিন্তু সত্যি বলচি মা, সত্যিকারের ঘৃণা আমরা কাউকে করিনে।"**

* এই সমগ্রতার বিচারে অনুরূপভাবেই তিনি বাঁচাইয়াছেন রাজলক্ষ্মীকে। রাজলক্ষ্মী নিজে বাঈজী, তবু ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং ব্রাহ্মণের বধূত্বের স্মৃতিতেই বোধ হয় সে কিছুটা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল। কমললতাদের আশ্রমে যেভাবে সে কমললতাদের ছোঁয়া ভাত খাইতে অসম্মত হইয়াছে তাহা আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজলক্ষ্মীর পক্ষে খুবই অশোভন, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সবই মানাইয়া গিয়াছে। বহুদিক হইতে রাজলক্ষ্মী চরিত্র ঐশ্বর্যমণ্ডিত বলিয়াই শরৎচন্দ্র বোধহয় তাহার এ দুর্বলতা উপেক্ষা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, 'গৃহদাহ'-এ অচলার হাতে মৃণালের ভাত না খাওয়া আর 'শ্রীকান্ত'-এ কমললতার হাতে রাজলক্ষ্মীর ভাত না খাওয়া এক বস্তু নয়।

**সুরেশের পিসিমা এই কথার পরই বলিয়াছেন: "আমাদের দেশের বাড়িতে আজও আমাদের বাগ্দী জ্যাঠাইমা বেঁচে আচে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বলতে পারিনে।" বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে হিন্দু মহিলাদের

মোটের উপর শরৎচন্দ্রের ধর্ম চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার নৈতিক দিকটাই প্রধান।* ধর্মের বহিরঙ্গ আচার-আচরণের প্রতি তাহার বীতরাগ না থাকিলেও তিনি মনে করিতেন এই আচার আচরণের সহিত নৈতিকতার যোগ অবশ্যই থাকা চাই। ইহা না থাকিলে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা তাহা স্বীকার করে না এবং শরৎসাহিত্যে সে আচার-আচরণ ধিক্কৃত হয়। মানুষের মনকে যাহা মানবিক মানরক্ষায় সহায়তা করে এবং সম্ভব ক্ষেত্রে তাহা সমুন্নীত করিতে সাহায্য করে তাহাই ধর্ম। যাহা তাহার অধঃ-পতন ঘটায় তাহা ধর্ম হইতে পারে না। এ হিসাবে নৈতিক উৎকর্ষ লাভের উপযোগী বা সহায়ক চিন্তা-ক্রিয়াদি ধর্ম। মধ্যযুগে পৃথিবীতে যে ধর্মধারা প্রচলিত ছিল, তাহাতে এই ব্যক্তিগত মানুষের বিশেষ স্থান ছিল না, সমষ্টিগত মানুষের উপর ধর্মধারা প্রভাব বিস্তার করিত। ইউরোপের তুলনায় নবজাগৃতির স্পন্দন আমাদের দেশে আসিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। পরাধীনতার জন্য আমাদের মানস-গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ ছিল বলিয়া এই নব-

সার্বজনীন মানবপ্রীতির পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় অর্থাৎ এই সার্বজনীন মানব-প্রীতির উপর গুরুত্ব লেখক শরৎচন্দ্র আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েদের প্রসঙ্গে বাগ্দী জ্যাঠাইমার উল্লেখে মনে হয় বাগ্দী অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উচ্চস্থানের যে ইঙ্গিত এখানে আছে, তদনুসারে ব্রাহ্ম ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম বড় হওয়ার ধারণা শরৎচন্দ্রের মনে ছিল এবং এখানে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

* শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে মুসলমান গহরকে রোগশয্যায় সেবা করিয়া কমললতা গহরের সহিত ঘনিষ্ঠতার অপরাধ মাথায় লইয়া মুরারীপুর আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লোকনিন্দায় চঞ্চল হইয়া আশ্রমের অধিনায়ক দ্বারিকা দাস বাবাজীর গুরু নিজে এই আদেশ দেন, কাজেই হৃদয়বান বৈষ্ণব দ্বারিকা দাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়েন। শ্রীকান্ত দ্বারিকা দাসের মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই আদেশ কার্যকরী হইবার পরও তিনি আশ্রমে থাকিবেন কি না? তাহার উত্তরে শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার প্রতীকস্বরূপ দ্বারিকা দাস বাবাজী বলিলেন: "আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষকে দূর করে যদি নিজে থাকি তবে মিথ্যে এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম করেছি।"

জাগৃতির আবেগে আমাদের চিত্তলোক অনেক বিলম্বে চঞ্চল হইয়া উঠে। ইহার ফলে নবযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে বিস্ময়কর সম্ভাবনাময় নূতন ফসল যে উপন্যাস, যাহাতে ব্যক্তির আত্মচেতনার বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বীকৃতি সাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল দিগন্তের সন্ধান দিল, তাহার আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যে বেশ কিছুটা বিলম্বে হয়। যাহা হউক, এই নবযুগের সাহিত্যকীর্তি উপন্যাসে ব্যক্তির জগৎ ও জীবনকে যাচাই করিবার অধিকার অর্জিত হইয়াছে, ব্যক্তি এখন ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তার নিরিখে জগতের প্রচলিত রূপকে পরীক্ষা করিয়া আপন কর্তব্য স্থির করিবার অনেকখানি শক্তি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ হিসাবে বাংলা উপন্যাসের প্রথম অরুণোদয় আনিলেও শরৎচন্দ্রেই এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্মের মোহসঞ্চারী সর্বাত্মক প্রভাবের পরিবর্তে ধর্মের কল্যাণধর্মী এমনকি যুগোপোযোগী রূপের উপর শরৎসাহিত্যে একটা জোর পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সিদ্ধান্তমূলক চিন্তাশক্তির হিসাবে যথেষ্ট শক্তিমান নয় একথা ঠিক, কিন্তু মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারের গড্ডলিকাপ্রবাহ হইতে ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া নূতন যুগের যে গণতান্ত্রিক সাহিত্য ব্যক্তিকে আত্মদীপ করিয়া তুলিল, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাহারই অংশ হিসাবে ধর্মের ক্ষেত্রে সমাজ-নিরপেক্ষভাবে মানবতার প্রতিষ্ঠায় প্রবণতা দেখাইয়াছে। ন্যায় এবং নৈতিকতা ধর্মের মূলদিক, তাহা সব ধর্মেই এক। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কারের আধিক্যে সেই মূলতত্ত্ব আচ্ছন্ন হইয়া আচার-আচরণের উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ফলে ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য ফুটিবার সুযোগ পাইতেছিল না। নৈতিকতা ও সততা বিবর্জিত আচার-আচরণের সংস্কার শরৎচন্দ্র মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্দীপনের প্রতিকূল মনে করিয়া ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন এবং মানুষকে তাহার নিজের সাহসে ও চেষ্টায় এই প্রতিকূলতা জয় করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার প্রেরণা দিয়াছেন। শুধু গল্প উপন্যাসে নয়, তাঁহার এ মনোভাব প্রবন্ধ-চিঠিপত্রেও বহুবার প্রতিফলিত হইয়াছে। এইভাবে মানুষকে প্রচলিত ধর্মসংস্কার-নিরপেক্ষ, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ করাইবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনেক সময় ধর্মদ্রোহী বা সমাজদ্রোহী মনে হয়।

পুরাণ-মতে লোকস্থিতি যাহার দ্বারা বিহিত হয় তাহাই ধর্ম। ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও চিন্তার আশ্রয়ে ধর্মের কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন আকৃতিতে যতটা প্রকৃতিতে ততটা নয়। হিন্দু

ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এইরূপ ধর্মের মধ্যেও আবার শাখা-প্রশাখা দেখা দিয়াছে। এইভাবে হিন্দুধর্ম হইতে প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এবং আধুনিক কালে ব্রাহ্ম ধর্মের উদ্ভব হয়। ধর্মের নৈতিক দিক দিয়া সব ধর্মই একইরূপ কথা বলে, সৎচিন্তা ও সদাচরণ ইহাদের সকলেরই মূলকথা। প্রাচীনকালে ধর্মের এই নীতিগত ভিত্তি মধ্যযুগে জড়তাপ্রাপ্ত হয়, রেনেসাঁসের পরে আবার তাহার আপন অধিকার ফিরিয়া পাইবার দিকে গতি পরিবর্তন দেখা দেয়। নবযুগে জগৎ ও জীবনের নব মূল্যায়ন সুরু হইয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, ইউরোপের তুলনায় আমাদের দেশে এই নবযুগের আন্দোলনের ঢেউ আসিতে দেরী হয়, কিন্তু ঢেউ এখানেও আসিয়াছে। এই নবচেতনায় মানুষের অস্তিত্ব স্বীকৃতিই শুধু নয়, মানুষের মূল্যায়নে অধিকার স্বীকৃতিও বড় কথা। এই নবচেতনা উপন্যাসের প্রাণ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এদিক হইতে দেখিলে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে খুবই আশ্বাসদায়ক। মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকারী যুক্তিবাদী ধ্যানধারণা বা ক্রিয়া-কর্মাত্মক এই চেতনাকে শরৎচন্দ্র সযত্নে লালন করিতেন। মানুষ মাত্রেরই মহৎ সম্ভাবনা আছে, স্বামী বিবেকানন্দের এই আশ্বাসবাণীতে শরৎচন্দ্রের সুদৃঢ় আস্থা ছিল। সেইজন্য মানুষ যখন প্রচলিত সামাজিক বা ধর্মগত বিধিবিধান অথবা আচার-বিচারের নিরিখে কোন কাজ করিয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহাকে সেই কাজের নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিচার করিতে চাহিতেন, আভিধানিক অর্থে বা প্রচলিত বিধানের মাপকাঠিতে নয়। এ হিসাবে যে মানুষ খারাপ কাজও করিয়াছে, তাহার ভিতরে এই খারাপ কাজের উৎসাহ বা ক্রিয়াশীলতা ছাড়া অন্যদিক হইতে বড় কিছু আছে কি না, শরৎচন্দ্র সহানুভূতির সহিত তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেন। শেষোক্ত কাজে শরৎচন্দ্র আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং সমগ্রভাবে মানব-সমাজের সম্মুখে পুরাতন মূল্যবোধের নবমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা ছাড়াও আপাত-হীনের মধ্যে ছোট বড় সদ্‌গুণ আবিষ্কার করিয়া মানুষকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিয়াছেন। এইজন্যই মাতাল, পতিতা প্রভৃতি সাধারণভাবে দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রগুলি তাঁহার গল্প-উপন্যাসে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। শরৎচন্দ্র এইসব চরিত্রকে যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন, এ জন্য আবার শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমাজদ্রোহিতারও বহু অভিযোগ আসিয়াছে। শরৎসাহিত্য পড়িলে লোক অধঃপাতে যাইবে,

সমাজ ভাঙিয়া পড়িবে, ধর্ম রসাতলে যাইবে, একথা বলার লোক শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেও কম ছিল না। কিন্তু যাহা পুরাতন তাহাই কল্যাণকর নাও হইতে পারে; যাহা একদিন মানুষের প্রয়োজনে মানুষের উপকার করিয়াছে, জীর্ণতার দোষে বা প্রয়োজন ফুরাইবার জন্য আজ তাহা পালটাইবার দরকার হইলে সেজন্য পুরাতনের প্রতি মোহবশে তাহা আঁকড়াইয়া থাকা নিরর্থক, মোহমুক্ত হৃদয়ে শরৎচন্দ্র একথা বারবার শুনাইয়াছেন।* পরিবর্তিত যুগের ও মানুষের প্রয়োজনে যে পুনর্মূল্যায়ন করিতেই হইবে, তাহা করিতে অকারণে বিলম্ব করা মূর্খতা, ইহাতে অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়, সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি থামিয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্র এইসব আপাত-পাপী চরিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই তিনি ধর্ম ও সমাজকে নস্যাৎ করিয়াছেন, একথা একেবারেই সত্য নয়। ইহাদের যত্ন করিয়া আঁকিবার অর্থ অবশ্যই ইহাদের যে বিশেষ দোষটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সমর্থন করা নয়। এই দোষ বা পাপের পিছনে কোন লুকানো কারণ যদি থাকে যাহা পাপীর পাপ করার জন্য মূলতঃ দায়ী, সেটিকে আবিষ্কার করিয়া পাপীর বাঁচিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা, অথবা এই বিশেষ পাপটি ছাড়াও তাহার বাকী যে সব দিক আছে সেগুলির সামগ্রিক বিন্যাসে তাহাকে মানুষ হিসাবে সমগ্রভাবে চিনিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া,—এজন্যই শরৎচন্দ্র পাপী বা হীন চরিত্র আঁকিয়াছেন বলা চলে। তাছাড়া জগৎ বিপুল, জীবন বিচিত্র এবং মন জটিল,—তাই ইহাদের চিন্তা বা ক্রিয়াকলাপ সামাজিক অথবা ধর্মগত রীতিনীতির প্রতিকূল হইলেও

* শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন: "আমাদের ধর্মজীবন যে কতকগুলি নিরর্থক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে,—শরৎচন্দ্র তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে আমরা আদর্শ গোষ্ঠীবন্ধনের ও একান্নবর্তিতার গৌরব করি এবং আমাদের সংসারগুলিকে হৃদয়তীর্থ বলিয়া অভিহিত করি—উহার অন্তরালে কত বড় ফাঁকি, কত বড় ভুয়ো ও মেকি যে ঐ তথাকথিত তীর্থকে আমাদের ধর্মতীর্থগুলির মতই পাপদূষিত ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া রাখিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের চোখে ধরা পড়িয়াছে।"—(শরৎসাহিত্য, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা—২।)

বাস্তব জীবনের পরিচিতিমূলক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রকাশক উপন্যাসে তাহা প্রকাশযোগ্য, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এ মতও পোষণ করিতেন।

শরৎচন্দ্রের আসল কাজ পাপীর পাপ প্রকাশ করা নয়, এইরূপ চরিত্রের দুর্বল দিক ফুটানো নয়, সামগ্রিকতার আলোকে ইহাদের মানুষ হিসাবে যতটা সম্ভব পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা। তাই তাঁহার রচনার ক্রমপরিণতিতে পাপাচারীর মনে বা কাজে এমন নবভাব বা নবরূপ প্রকাশিত হয় যাহা পূর্বোল্লিখিত চরিত্ররূপের সামাজিক অর্থে হয়তো বিপরীতাত্মক, কিন্তু প্রকৃতিতে অসমঞ্জস নয়। 'আঁধারে আলো'র বিজলী বাইজী সারারাত নৃত্যগীত-বিলাসের পর কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় প্রভাতে তাহারই খোঁজে আকুল-হৃদয় সত্যেন্দ্রকে আপন গৃহে পাইয়া তাহাকে লইয়া পুতুলখেলা করিতে চাহিল, কিন্তু প্রেমিক সত্যেন্দ্রের মোহমুক্ত মনের মুখোমুখি হইতেই লজ্জায়, নিজের প্রতি ঘৃণায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। তারপর এই পরিবর্তিত মানসক্ষেত্রের সুযোগ লইয়া দেহবিলাসিনী নর্তকী বিজলীর মধ্যে অঙ্কুরিত হইল পবিত্র প্রেম, সে প্রেম তাহাকে পার্থিব সম্পদে দরিদ্রা করিয়া অন্তরের সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া তুলিল। নারীসত্তার এই নিষ্কলঙ্ক বিকাশ এমন অদ্ভুত ও ইহার প্রভাব এমন অপ্রতিরোধ্য যে, তাহার বাড়ী হইতে সত্যেন্দ্র চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বারবধূ বিজলী তাহার পায়ের ঘুঙুর খুলিতে খুলিতে পৃষ্ঠপোষকদের স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল যে, অতঃপর তাহাদের বাইজী চিরকালের জন্য মরিয়া গেল। এইভাবে সত্য, সুন্দর ও মহৎভাবকে পঙ্কস্তূপ হইতে উদ্ধার করা, মানবিক মূল্যবোধের এইভাবে বাস্তব রূপায়ণ অবশ্যই সমাজদ্রোহিতা বা ধর্মদ্রোহিতা নয়। শরৎচন্দ্র কোনদিনই একথা বলেন নাই যে, দেবদাস মদ খাইয়া ভাল কাজ করিয়াছে, চন্দ্রমুখী, কাত্যায়নী, বিজলী, রাজলক্ষ্মীর পতিতা বা বাইজী জীবনে হীনতা কিছু নাই, সৌদামিনী, বিরাজের গৃহত্যাগ প্রশংসার কাজ অথবা কমললতার, সাবিত্রীর, সবিতার বা সরযূর মায়ের অতীত জীবনের পদস্খলন তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনপথ কলঙ্ক-কণ্টকাকীর্ণ করে নাই। বরং তিনি এইসব কাজের প্রায় অপরিহার্য ফল হিসাবে ইহাদিগকে দুঃসহ দুঃখবরণে এবং সম্ভাব্য হইলেও বাঞ্ছিত সুখের আশাত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। তবে এইসব মন্দ কাজ যাহারা করিয়াছে, সেই কাজের মধ্যেই তাহাদের সমগ্র জীবনের সমস্ত ভালমন্দ-সমন্বিত পরিচিতি সীমায়িত হইয়া গেল, ইহাও শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করেন নাই। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রের

প্রত্যয় ছিল যে, মানুষের কোন কাজ তাহার জীবনে দাগ কাটিলেও তাহা তাহার সমগ্র জীবনের এক খণ্ডিত অংশের পরিচয়, তাহার সমগ্র জীবন এই কাজের চেয়ে অবশ্যই অনেক বড়, সাময়িক বিপথে গমন অথবা কোন বিশেষ দিকের হীনতা অপেক্ষা মানুষের মনের গতি ও প্রসার অনেক ব্যাপক। শরৎচন্দ্র পাপকে অবশ্যই ঘৃণা করিতেন, কিন্তু পাপীর জীবনের পাপাচরণের খণ্ডিত অধ্যায়কে তাহার বহুবিস্তৃত জীবনের বিপুল সম্ভাবনা-গ্রাসী বলিয়া মনে করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার ধর্মচেতনায় নৈতিকতার স্থান ছিল সর্বোচ্চে, বহিরঙ্গ আচার-সংস্কারের সত্য ও নৈতিকতা আচ্ছন্নকারী শক্তি অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল বলিয়া এইভাবে খণ্ডিত মানুষের স্পষ্ট পরিচিতির অন্তরালে সমগ্র মানুষটিকে তিনি সন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেন। সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে শরৎচন্দ্র বড় একথা কম লোকই বলিবেন, কিন্তু উপন্যাসে যদি জগতের ও জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়, তাহা হইলে জীবনে যাহা ঘটে এবং পূর্ণ জীবনের যাহা প্রকৃত রূপ, তাহার নৈষ্ঠিক চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অধিক। বঙ্কিমচন্দ্র পাপের বিস্তারিত চিত্রায়ণ এড়াইতে চাহিতেন, তাঁহার সমকালীন সমাজের অবস্থা এবং সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার দায়িত্ববোধ তাঁহাকে এইরূপ সংযত থাকিবার প্রেরণা দিয়াছিল।* দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর গোবিন্দলালের সহিত কুলত্যাগের পর গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উপন্যাসে খুবই কম জায়গা লওয়া হইয়াছে, মধ্যবর্তীকালীন তাহাদের অসামাজিক জীবন বঙ্কিমচন্দ্র পারতপক্ষে অল্প কথায় শেষ করিয়াছেন। এরূপ যে ঘটিয়াছে তাহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনায় নৈতিকতার স্থান উচ্চে হইলেও সেখানে আচার-সংস্কারেরও উল্লেখযোগ্য প্রশ্রয় ছিল। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই একমুখী বা নির্দিষ্ট-ভাব-সীমায়িত হইয়াছে, সমগ্র জীবনরূপের পরিচায়ক হইতে পারে নাই। শরৎচন্দ্রের

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন: "পাপ-সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটা সহজ সঙ্কোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল, সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই।"—(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৫।)

উপন্যাসে কিন্তু সমগ্র মানুষটিকে ভালমন্দে মিশাইয়া ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জগতে যে জীবন পরিদৃশ্যমান, তাহার হুবহু বাস্তবরূপ অবশ্য শরৎচন্দ্রও ফোটান নাই; কিন্তু শরৎচন্দ্র আধুনিক এই অর্থে যে, বাস্তব জীবনের বিস্তারিত পটভূমিকে আশ্রয় করিয়া তিনি জটিল জীবনকে ফুটাইবার এবং জীবনের জটিলতার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই উপন্যাসের ধর্ম। শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনায়, যেকথা আগেই বলা হইয়াছে, নৈতিকতার ও মানবতাবোধের স্থান আচার-সংস্কারের চেয়ে অনেক উপরে ছিল বলিয়াই মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকের বিপরীতে আলোক-সম্ভাবনার জন্য তিনি সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেন। শরৎচন্দ্র প্রধানত সামাজিক সমস্যাবলী লইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া সমস্যাদির চাপে ক্লিষ্ট মানুষের এই অন্ধকার দিকটি তাঁহার চরিত্রগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সে দিক হইতে মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক হিসাবে ধর্মকে যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির সামগ্রিক গঠনে তাঁহার ধর্মচেতনার সক্রিয়তা সহজেই চোখে পড়িবে। ঔপন্যাসিক এক হিসাবে অনুসন্ধানরত দার্শনিক, সমাজের বিশেষ পরিবেশে মানুষের হৃদয়বৃত্তি কিভাবে কাজ করে তাহা লক্ষ্য করা ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এইসঙ্গে একথাও ঠিক যে, শুধু বিশেষ সামাজিক পরিবেশে মানুষের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ক্রিয়াশীল হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব ফুরায় না, এই চিত্তবৃত্তির আশ্রয় মানুষের যে মন, সেই মনকে স্বধর্মে এবং স্বরূপে ফুটাইয়া তোলাও তাঁহার কাজ।* এইভাবে খণ্ডতা হইতে পূর্ণতার দিকে উপন্যাসের চরিত্র গতিলাভ করে। নিছক বাস্তবপন্থী সাহিত্যিক এই দিকটা গ্রাহ্য না করিতে পারেন, কিন্তু এইরূপ সৃষ্টিধর্মিতা ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নৈতিক ধর্মচেতনা এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করে। শরৎচন্দ্র এই হিসাবে একজন ভাল ঔপন্যাসিক।

* এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "Generally realists try to give a photographic picture of manners or of economic conditions. The picture can never be absotutely photographic, because art is always critical and creative."—(The Art of Bernard Shaw, First edition, Page-6.)

কোন ধর্ম-সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের অনুদার ধারণা ছিল না এবং তিনি মনে করিতেন যে ঔপন্যাসিক হিসাবে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াই তাঁহার কর্তব্য।* আপনার হিন্দু ধর্মের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও এবং হিন্দুধর্মের প্রচলিত বহু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি কিছুটা যুক্তি-নিরপেক্ষ দুবলতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র অন্যান্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। তবে ধর্মপ্রচারক-দের যে কোন উপায়ে স্বধর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। খ্রীষ্টান মিশনারী বা ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকদের এই ধরণের কাজ তাই তাঁহার পছন্দ হইত না। বিশ্বাস করিয়া, ভালবাসিয়া যদি কেহ ধর্মান্তরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ ছিল না, বরং মানুষ ভাল হইলে তাহাকে শরৎচন্দ্র মর্যাদাই দিয়াছেন। 'সতী' গল্পের ব্রাহ্ম হরকুমারবাবু প্রতিকূল পরিবেশেও শরৎচন্দ্রের প্রভূত সহানুভূতিলাভ করিয়াছেন। নিরুপায় হইয়া, দায়ে পড়িয়া বা অসহায়তার উত্তেজনায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া যদি কেহ ধর্মান্তরিত হয়, তাহাকে শরৎচন্দ্র সম্মান না জানাইলেও এরূপ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তাহার পীড়িত-অবস্থার জন্যই মানবদরদী শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিলাভ করিয়াছে। 'বিলাসী'র মৃত্যুঞ্জয় এবং 'পরিণীতা'র গুরুচরণবাবু এই ধরণের চরিত্র। কিন্তু যে ধর্মান্তরের পিছনে নৈতিকতার সমর্থন নাই অথচ যেখানে ধর্মান্তরিত চরিত্র হীনতা-ক্লিষ্ট, শরৎচন্দ্র সেখানে একান্ত অনুদার। 'শ্রীকান্ত'র অন্নদার স্বামী শাহজী এইরূপ চরিত্র এবং অন্নদা নানাভাবে শরৎচন্দ্রের হাতে সম্মান লাভ করিলেও শাহজীকে সবসময়েই অবহেলা ও অসম্মানের বোঝা বহিতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ব্যতিরেকেই আপন পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন কোন ধর্ম গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিকে

* কাজী আবদুল ওদুদকে ২০. ৩. ১৯১৮ তারিখে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: "সকল জাতির মধ্যেই ভালোমন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই। (গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১৩৬১, হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎচন্দ্র হতভাগ্য মনে করিতেন, তবে 'পরিণীতা'র গুরুচরণের মত যদি অসহায়তায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যতা এই ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ হয়, সেক্ষেত্রে মানবদরদী শরৎচন্দ্র চরিত্রটির নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি তো দেখাইয়াছেনই, এমনকি সম্ভাব্যক্ষেত্রে এই ধর্মান্তর বাতিল হইয়া সে যদি তাহার পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসে তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। তাঁহার এই মনোভাব গুরুচরণের নিজের মুখে এবং শেখরের মা ভুবনেশ্বরীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ম হইবার পর প্রতিবেশী ও পাওনাদার নবীন রায়ের বাড়ীতে আসিয়া গুরুচরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন: 'জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেব, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হব, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।" ইহার পরে গুরুচরণেব দুরবস্থায় ব্যথিতা ভুবনেশ্বরী শেখরকে বলিয়াছেন: "ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেছেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পেড়াপেড়ীতেই সে জাত দিয়ে ফেলেচে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে।"

ধর্মের নৈতিক দিকটি শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নৈতিকতা-বর্জিত হইলে ধর্মের সাম্প্রদায়িক বা আচারগত দিকে তাঁহার অনুরাগ ছিল না।* শরৎচন্দ্র আবেগপ্রবণ লেখক ছিলেন বলিয়া কোনো কোনো সময় ভাবাবেগ বশে তিনি এই আচারের দিকটির জন্য হয়তো আগ্রহ দেখাইয়াছেন, ইতিপূর্বে তাঁহার ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের প্রতি দুর্বলতার কাহিনীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; অথবা বিপ্রদাসের মত কোন

*শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার এই বৈশিষ্ট্যের একটি নজির মিলিবে 'দত্তা' উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে। এখানে ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য দয়াল সম্পর্কে নরেনের ধারণা বিবৃত হইয়াছে। সেদিন নরেনের মন খুবই খারাপ, অসুস্থা বিজয়ার বাড়ীতে সে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর দ্বারা অপমানিত হইয়া বিজয়ার অনুরোধে অসুস্থ দয়ালকে দেখিতে আসিয়াছে। দয়ালের সহিত আলাপের পর তাঁহার সহৃদয়তায় ও

চরিত্রের এই আচারগত দিকটির উজ্জ্বলতাও হয়তো তিনি আঁকিয়াছেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, নৈতিকতার সহিত এইরূপ আচারের কোন বিরোধের কল্পনাই প্রশ্রয় পায় নাই। আগেই বলা হইয়াছে, শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীদের আশ্রম বিশেষ পছন্দ করিতেন না এবং সন্ন্যাসীদের প্রতিও তাঁহার সরাসরি অনুরাগ ছিল না। তবে নৈতিকতা-সম্পৃক্ত আশ্রম ও সন্ন্যাসী দুই-ই যে তাঁহার কাছে মর্যাদা পাইত তাহার প্রমাণ দ্বারিকা দাস বাবাজী পরিচালিত মুরারীপুর আশ্রমের চিত্র। 'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেবও দ্বারিকা দাসের মতই শরৎচন্দ্রের সম্মানলাভ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই দুই হিসাবেই তাঁহার প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল এবং সম্ভবতঃ অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহাদের মেকীভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এইরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মগত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সম্পর্কেও তাঁহার কঠোর মনোভাব ছিল। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান, কোন ধর্মাবলম্বীই নীচতা দেখাইয়া বা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সুযোগ লইতে গিয়া তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পায় নাই। পক্ষান্তরে মহৎ মানুষকে তিনি তাহার অবলম্বিত ধর্মনিরপেক্ষভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁহার আমলের মোল্লা পরিচালিত এক শ্রেণীর মুসলমানের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির তীব্র বিরোধিতা করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরোধী ছিলেন না, বরং এই ধর্মকে নীতি-

---

অন্তরের শুচিতায় নরেনের মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল। এইখানে আছে: "কথায় কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্মসম্বন্ধীয় পড়াশুনা যদিও যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসে, এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন ধর্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্য স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই, এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকল ধর্মই তাঁহাকে খাঁটি জিনিষটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন।" এইখানে শরৎচন্দ্র এই সরল ধর্মাদর্শসম্পন্ন দয়ালের সহিত তুলনায় আচারপরায়ণ ব্রাহ্ম যুবক বিলাসবিহারীকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "এইরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ ব্রাহ্ম বিলাসবিহারীর কানে গেলে তাঁহার আচার্যপদ বহাল থাকিত কি না ঘোর সন্দেহ।"

গতভাবে শ্রদ্ধাই করিতেন। 'মহেশ' গল্পের শেষে গোফুরের মুখ দিয়া আল্লার কাছে তিনি যে আরজি পেশ করিয়াছেন তাহা নিপীড়িত মানবাত্মার ভগবানের কাছে বেদনার্ত অভিযোগ, কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সমব্যথী মানুষই এই আর্জি এবং আল্লার সহিত নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবিতে পারে না। শরৎচন্দ্র মুসলমানদের সুস্থ-সুন্দর মানবিক রূপ বা জীবনবোধকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের আকবর সর্দারের ছবিটি তুলিয়া ধরিলেই তাহা সম্যক বুঝা যাইবে। দরিদ্র লাঠিয়াল আকবর তাহার ছেলেদের লইয়া সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লাঠি চালায়, দাঙ্গা করে। জমিদার বেণী ঘোষালের পাশে তাহার জীবন বিবর্ণ, কিন্তু শরৎচন্দ্র একই দৃশ্যে বেণী ঘোষাল ও এই দরিদ্র মুসলমান লাঠিয়ালকে আনিয়া মনের ঐশ্বর্যের হিসাবে তুলনামূলকভাবে আকবর সর্দারকে বেণী ঘোষালের চেয়ে অনেক উপরে উঠাইয়া দিয়াছেন। বিলের আলকাটা লইয়া রমেশের সহিত মারামারিতে আকবর ও তাহার পুত্রেরা আহত হইয়া রক্তাক্ত অবস্থায় রমার বাড়ীতে আসিয়াছে, বেণী আকবরকে পরামর্শ দিল, থানায় গিয়া রমেশ তাহাকে চড়াও হইয়া জখম করিয়াছে একথা বলিয়া রমেশের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে। আকবর সর্দার সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করিয়া বেণীর এ পরামর্শের প্রতিবাদ জানাইল। মনিবের স্বার্থের জন্য সে আসামী হইয়া জেলে যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু দশখানা গ্রামের লোক তাহাকে সর্দার বলিয়া মান্য করে, সে ফরিয়াদী সাজিয়া থানায় গিয়া গায়ের চোট দেখাইতে পারে না। আকবর স্পষ্ট বলিয়া দিল রমেশের বিরুদ্ধে বেণীর কথায় থানায় গিয়া সে মিথ্যা নালিশ করিতে পারিবে না। আকবর বেণী ও রমার মুখের উপর রমেশের নামে নালিশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া পুত্রদের লইয়া উন্নত মস্তকে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। শুধু এই নয়, সে যে মুসলমান একথা গর্বের সহিত মনে রাখিয়া আকবর আপন মর্যাদা রক্ষায় উদ্‌গ্রীব। শরৎচন্দ্র ইসলাম ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলে বেণী যখন আকবর সর্দারকে রমেশের লাঠির ঘা খাইয়া ফিরিয়া আসার জন্য 'বেইমান' বলিল, আকবর কখনই সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙাইয়া বেণীকে বলিতে পারিত না:—"খবরদার বড়বাবু! বেইমান কোয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি, ও পারিনি।"

নিন্দার পাত্রকে নিন্দা করাই কর্তব্য, এই মনোভাব লইয়া শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ মুসলমানদের নিন্দা করিয়াছিলেন; তিনি জানিতেন ইহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একাংশমাত্র। অনুরূপভাবে তিনি হিন্দুদের একাংশকে, ব্রাহ্মদের একাংশকে, এমনকি খ্রীষ্টানদের একাংশকেও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি-জনিত হীন সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য কোথাও কোথাও ধিক্কৃত করিয়াছেন। ধিক্কার দিয়াই হোক আর উপদেশ দিয়াই হোক, এইরূপ সকলকেই যে শরৎচন্দ্র সুস্থ নীতিবোধ, তথা জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেকথা না বলিলেও চলিবে। যে হিন্দু নোংরা জীবন যাপন করে, যাহার দৃষ্টি পঙ্কিল, অন্যায় করে যে, শরৎচন্দ্র তাহাকে নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া ক্ষমা করেন নাই। 'মহেশ' গল্পের গরীব মুসলমান চাষী গোফুরের বিপরীতে প্রবলপ্রতাপ জমিদারের ব্রাহ্মণ পুরোহিত তর্করত্নকে তিনি পাঠকচক্ষে হীন করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে ব্রাহ্মণ, জপতপ পূজা আহ্নিক করে, কিন্তু অতি নোংরা তাহার জীবন, তাহাকে শরৎচন্দ্র হীন করিয়াই আঁকিয়াছেন, আচারনিষ্ঠার জন্য বিন্দুমাত্র রেহাই দেন নাই। ('দেনা-পাওনা'য় জনার্দন রায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দু কিন্তু মানুষ তিনি সুবিধার নন। শরৎচন্দ্র এই স্বার্থপর নীতিহীন জনার্দন রায়ের হিন্দুয়ানীর বড়াই সত্ত্বেও মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জনার্দন রায়ের বিপরীতে তিনি দেনা-পাওনা উপন্যাসের মুসলমান চরিত্র ফকির সাহেবকে কত উজ্জ্বল, কত মহৎ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। ধর্মচেতনায়, সাহসে, মানবতাবোধে অনুপম চরিত্র ফকির সাহেব। সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার জন্য অপছন্দ করিলে শরৎচন্দ্র কখনই ফকির সাহেবকে এত মহান্ করিয়া আঁকিতে পারিতেন না। সেদিন ষোড়শীকে ভৈরবী পদ হইতে অপসারণের সভা চলিতেছে জনার্দন রায়ের বাড়ীতে, জনার্দন রায়ের কন্যা জামাতাও সেখানে উপস্থিত। ষোড়শী দুশ্চরিত্রা, সুতরাং তাহাকে চণ্ডীদেবীর ভৈরবী পদ ছাড়িয়া দিতে হইবে,—এই ধরণের দাবীতে সভা মুখর। এমন সময় ফকির সাহেব ষোড়শীর পক্ষাবলম্বনে দাঁড়াইলেন। এই অসহায়া রমণীকে নানা স্বার্থে একদল পুরুষ লজ্জাকর অভিযোগ তুলিয়া অপদস্থ করিতেছে, ষোড়শীকে তিনি মা বলিয়া জানেন, ফকির সাহেব চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শুধু মাত্র যুক্তি-নির্ভর হইয়া সহজভাবে হাসিমুখে ফকির

সাহেব সভায় আপন বক্তব্য রাখিলেন। সভায় উপস্থিত প্রাচীন মাতব্বর-দের, বিশেষ করিয়া জনার্দন রায়কে উদ্দেশ করিয়া ফকির সাহেব নির্ভীক ভাবে ষোড়শীকে সমর্থন করিয়া বলিলেন : "পাকা বীজও পাথরের উপর পড়ে বাজে হয়ে যায়, আমার এতটা বয়সে সে আমি জানতুম। আমি কাজের কথাও বলছি। এই মহাপাপিষ্ঠ জমিদারটাকে কেন যে মা আমার বাঁচাতে গেলেন, সে আমিও জানিনে, জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনে। আমার বিশ্বাস কারণ ছিল—আপনাদের বিশ্বাস সেই হেতুটা মন্দ। এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করবার জন্যেও অন্যের গ্লানি করা আমাদের ধর্মে নিষেধ তাই আমি সে নজির দেবনা; কিন্তু আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রায়মশাই। এ যদি কেবল তারাদাসের সঙ্গেই হ'তো, হয়ত আমি মাঝে পড়তে যেতাম না, ও বেচারা তার বুদ্ধি এবং সাধ্যমত কর্তব্য করবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন কিসের জন্যে শুনি! ষোড়শী ত একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান ইজ্জত অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমিজমা বাড়ি ঘর-দ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি? কিন্তু রায়মশায়, আপনার মেয়ে জামাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের চোখের সুমুখে আর আপনার মহাপাপের ভার উন্মুক্ত ক'রে ধরব না।"

শুধু এই দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ফকির সাহেবের মুখে বসাইয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাকে জনার্দন রায়ের বিপরীতে উজ্জ্বল করিয়া আঁকিলেন না, সমবেত সকলের উপর এই ভাষণের যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হইল তাহাতে জনার্দন রায় প্রভৃতির ষড়যন্ত্র এবং হীনতা আরও উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, ইহাই শরৎচন্দ্র দেখাইলেন; "এই বলিয়া মুসলমান ফকির নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিদারুণ অভিযোগের শেষ বাক্যটা যেন শেষ হইয়াও নিঃশেষ হইল না। কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেবল একটা তীব্র কণ্ঠের রেশ যেন চারিদিকের প্রাচীর হইতে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেবল 'ধিক্! ধিক্!' করিতে লাগিল।"

ফকির সাহেব ষোড়শীকে কন্যার মত ভালবাসিতেন, তাহাকে এইভাবে তিনি সভাস্থলে রক্ষা করিলেন। তবু ফকির সাহেব স্নেহ করেন বলিয়াই ষোড়শীর যে কাজ তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন, সোজাসুজি তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন এই ত্রুটি সংশোধন করিতে। ষোড়শীর জীবানন্দের ঘরে একরাত্রি কাটানোর ঘটনাটি মুখে মুখে বহু-প্রচারিত হইয়াছিল। সকলে নিন্দা করিতেছিল। ষোড়শীর চরিত্র সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও লোকাচারের দিক হইতে এভাবে জমিদারের ঘরে রাত্রি কাটানো ষোড়শীর ঠিক হয় নাই বলিয়া ফকির সাহেব মতপ্রকাশ করিলেন। ষোড়শী ফকির সাহেবের প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়াই বলিল: "ফকির সাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হ'তো?

'ফকির বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বোধ করি একটু বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, সে বিবেচনার ভার তো তোমার নয় মা, সে রাজার। তাই তাঁর জেলেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করেন; এই যদি হয়ে থাকে, তুমি অন্যায় করেছ বলতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, ফকির বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তার অর্থ?

ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ ত তুমি জানো। তার শাস্তি হওয়া উচিত।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মুসলমান খুব কম সংখ্যাতেই আসিয়াছে, কিন্তু যেখানেই আসিয়াছে সেখানেই চরিত্রে একটা ভালো দিক, একটা আদর্শবোধের সঞ্চার তিনি করিতে চাহিয়াছেন।* প্রবন্ধে বা চিঠিপত্রে মুসলমানদের শিক্ষার

* তবে একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্প উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র যেমন কম আনিয়াছেন, সেইরূপ আবার যতটুকু আনিয়াছেন তাহারও প্রায় সবই দরিদ্র সাধারণ মুসলমানের চরিত্র, উচ্চ-মধ্যবিত্ত-সমাজের হিন্দুদের যেমন তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান দিয়াছেন, তেমনি উচ্চ-মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মুসলমানদের লইয়া তিনি লিখেন নাই। তাঁহার 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বের গহর জমিদার-পুত্র, 'দেনা-পাওনা'র ফকির সাহেব সংসার-জীবনে উকিল

পশ্চাৎপদতা বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির নিন্দা করিলেও গল্প-উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট মুসলমান চরিত্রগুলিকে তিনি প্রায় স্নিগ্ধ সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার উদ্দেশ্য মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধন। দেশের অধিবাসীদের একটি বড় অংশ যে ধর্মসম্প্রদায়, দৈন্যে, অশিক্ষায়, গোঁড়ামিতে ও স্বার্থপরতায় তাহাদের অধিকাংশ যদি ছোট হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতি হইতেই পারে না, এই ছিল শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস। অবশ্য দু এক জায়গায় এই সম্ভাবনাপূর্ণ সম্প্রদায়ের লোকদের সংকীর্ণতা-প্রবণতায় হতাশ হইয়া শরৎচন্দ্র কঠোর মন্তব্যও যে করেন নাই এমন নয়।* বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য বিদ্বেষজাত নয় বেদনাজাত। মুসলমানদের কাছে জাতি অনেক আশা রাখে, ক্ষুদ্রতার অভিশাপে সে আশা ব্যর্থ

ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা জীবনায়নের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। সম্ভবত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান পরিবারের সহিত মেলামেশার অভাবে তাঁহাদের জীবনের বাস্তব পরিচয় ভাল জানা না থাকায় জীবন-শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহাদের লইয়া লিখিতে উৎসাহবোধ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে মীজানুর রহমান ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "শরৎচন্দ্র তাঁহার রাশীকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান-সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচুদরের লোকের না। ...হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যেসকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁর সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছা প্রণোদিত এমন নির্মম কশাঘাত মুসলিম সমাজও অম্লান বদনে গ্রহণ করবে তা জোর ক'রে বলতে পারি। বাঙ্গালার কথাসাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

* খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া মহাত্মা গান্ধী ঝাঁপাইয়া পড়েন। পরিণামে কিন্তু মুসলমান নেতারা তাঁহার এই সহযোগিতার মূল্য দিলেন না। ক্রমে দেশময় হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ব্যাপক হইয়া উঠিল, পরিস্থিতির ক্রম-অবনতিতে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত বেদনাবোধ করিলেন। তিনি দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের

হইয়া যাইতেছে, মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রের পক্ষে ইহাই ক্ষোভের কারণ। শোনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার প্রাণপ্রিয় বাঙালীদের সম্বন্ধে অনুরূপভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শেষজীবনে একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, বৃথাই তিনি ইহাদের জন্য সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া মরিলেন। সত্য হইলেও ইহা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশা-অপূরণের ব্যথার প্রকাশমাত্র সেকথা না বলিলেও চলিবে। ইহার জন্য পরবর্তীকালে জীবনের অবশিষ্ট সময় বাঙালীদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে বিন্দুমাত্র কমে নাই, অথবা সুযোগ পাইলেই বাঙালীদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতে তিনি যে কাতর হন নাই, সেকথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র মনে করিতেন ভারতবর্ষ মুসলমানদেরও মাতৃভুমি, তাহারা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দেশের জন্য সংগ্রামে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রশ্নে পিছাইয়া থাকিবে কেন? তাহারা শিক্ষিত হয় নাই

মিলনের জন্য একুশ দিন উপবাস করিলেন। গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনে ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করিয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মুসলমান নেতা মহম্মদ আলির উপর। মহম্মদ আলিও শেষপর্যন্ত তাঁহার পাশে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। এ অবস্থায় গান্ধীজীর হতাশা স্বাভাবিক এবং সেই হতাশা গান্ধীজীর অনুগামী শরৎচন্দ্রকে এমন ব্যথিত করিয়া তোলে যে তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পর্কে এক কঠোর মন্তব্য করিয়া বসেন। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে খিলাফৎ আন্দোলনের পরে মহাত্মা গান্ধীর উপরোক্ত হতাশার কথা বলিয়া শরৎচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে মন্তব্য করেন: "বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন চাই, সে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।"

এই প্রবন্ধেরই পরবর্তী অংশে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সক্রিয়-সহযোগিতার অভাবে শরৎচন্দ্রের বিষণ্ণতা নিম্নোক্ত মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীনতার সৈনিক তিনি, মুসলমানেরা যদি প্রত্যাশিত সহায়তা না করে অথবা অসহযোগিতা করে, অগত্যা হিন্দুদেরই আরব্ধ কর্তব্য হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়ের পথে লইয়া যাইতে হইবে, এই তাঁহার বক্তব্য। যেহেতু মুসলমানরা যথোচিত সাহায্য করিতেছে না,

শুধুমাত্র এই দোহাই দিয়া তাহাদের মনোভাবকে কেন সহ্য করা হইবে, ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন। অশিক্ষিত সাধারণ হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা জাতীয় ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সহজে জড়াইয়া পড়িয়া বারবার বিপদ-সৃষ্টি করিলে দেশ সমগ্রভাবে বিপন্ন হইবে, দেশের মুক্তি-সংগ্রাম পিছাইয়া পড়িবে। তিক্ত অভিজ্ঞতার বেদনায় শরৎচন্দ্র তাই দুঃখ করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া আপন ব্যথা ও বক্তব্য প্রকাশ করিলেন: "পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে, নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘর-দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান ও অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে এইসব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।"—(শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভার, অপ্রকাশিত রচনাবলী, 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধ)*

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে একদল বাঙ্গালী মুসলমান লেখক বাংলার সহিত আরবী, ফারসী শব্দ মিশাইয়া বাংলা ভাষার অধঃপতন ঘটাইতেছিলেন। প্রথমে যখন এইরূপ অল্পস্বল্প মিশ্রভাষা চোখে পড়ে তখন শরৎচন্দ্র ইহার প্রতিক্রিয়া শেষপর্যন্ত কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা বোধহয়

"সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি…"

* শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে আছে, মুসলমানদের মধ্যে অশিক্ষার ব্যাপকতার সহিত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত নেতাও উদ্বিগ্নবোধ করিয়াছিলেন।

ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেজন্য তিনি ইহাতে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ আশাই পোষণ করিয়াছিলেন। পরে এই অপচেষ্টার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যের এই সঙ্কটে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করেন। বাংলা ভাষাকে মুসলমানেরা যদি মাতৃভাষা বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে বাংলা ভাষা যথাসম্ভব নির্ভেজাল রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা কেন করিবেন না? আগে পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ আমলে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলাভাষা যখন সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং শব্দভাণ্ডার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ইচ্ছা করিয়া নূতন আরবী, ফার্সী শব্দ যোজনার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হইতে পারে। বার্ষিক 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদিকা শ্রীমতী জাহানারা চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে এ সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "একথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করিবেন যে, সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।· (কিন্তু মুসলমান লেখকদের মধ্যে) রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নয়, এমনি চোখে ঠেকে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী,' ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫৭।)

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই ঢাকায় 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গেও শরৎচন্দ্র এই বাংলা ভাষার বিকৃতি সাধনের চেষ্টার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ভাষণটি ১৩৪৩ সালের ১৯শে ভাদ্র 'বাতায়ন' পত্রিকায় এবং পরে শরৎ সাহিত্য সংগ্রহের ষষ্ঠ সম্ভারে 'মুসলমান সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন: "আক্রাম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের spirit-এর একটা দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চাইতে গেছে, বলে 'বাংলা থোড়া বহুৎ সমঝেতে হেঁ, বোল্‌নে নেই সকতে।'

আমাদের আশঙ্কা ওরা প্রথম বাংলাকে নষ্ট করবে। ওরা যখন বাংলা মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেনা।"

শরৎচন্দ্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের গহর কবির ছবিতে মনোরম হইয়া ফুটিয়াছে। গহর মুসলমান, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাহাকে এমন সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন যে, গহর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত পাঠকেরই মনে স্থান পাইয়াছে। গহরের হিন্দু চাকর নবীন মনিবকে নিতান্ত আপনজনের মতই ভালবাসিয়াছে, গহরের মৃত্যুর পর শ্রীকান্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মনিবের কথা স্মরণ করিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। গহরের সহিত নবীনের এই যে সম্পর্ক শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন ইহা নিতান্তই প্রাণের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক, স্বার্থের সম্পর্ক ইহাতে কিছুটা জড়ানো থাকিলেও হৃদয়ের সম্পর্কের উজ্জ্বলতায় তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মুসলমান গহরের মৃত্যুর পর হিন্দু নবীন তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না, বরং গহর না থাকিলে তাহার বাড়ীর সহিত নবীনের সম্বন্ধ শেষ হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে সে চাকুরী হারাইয়া পরিণত বয়সে বেকার হইয়া পড়িবে। অবশ্য গ্রন্থে আছে যে, গহর তাহাকে আগেই কিছু দান করিয়াছে, কিন্তু সে কথা হৃদয়ের ছবি দেখাইতে শরৎচন্দ্র খুব বড় মনে করেন নাই। গহরকে শরৎচন্দ্র এমন হৃদয়বান পল্লীকবি করিয়া আঁকিয়াছেন যে তাহার মানবিক রূপ অনবধানী পাঠকেরও অন্তর স্পর্শ করে। শ্রীকান্ত নবীনের মুখে শুনিয়াছে যে গহর তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী নয়ন চক্রবর্তীর ছেলেমেয়েকে আম-জাম খাইবার সুবিধা করিয়া দিতে আপন ফলের বাগান ছাড়িয়া দিয়াছে, ইতিপূর্বে তাহার পিতা কর্তৃক দেনার দায়ে নিলাম করা নয়ন চক্রবর্তীর পুকুর ও ভিটা বদান্যতা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। এ হৃদয় মানবতা-সমৃদ্ধ হৃদয়, মুসলমান গহরের এই হৃদয়-রূপ দেখাইয়া শরৎচন্দ্র মুসলমানদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও প্রীতিভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। বরং গহরের এই মহৎ হৃদয়ের বিপরীতে তিনি গহর দ্বারা পরম উপকৃত ব্রাহ্মণ নয়ন চক্রবর্তীকে অনেক হীন ও স্বার্থপর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

ইহার পর গহর-কমললতার কাহিনী। কমললতা বৈষ্ণব আখড়ার অধিবাসিনী, আচারপরায়ণা বৈষ্ণবী। মুসলমান হইলেও গহর কবির চিত্তলোকের অমৃতধারা তাহার কোমল নারী-হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল বলিয়াই গহরকে সে অমন সোনার চোখে দেখিয়াছিল। গহরের অসুখের সময় কমললতা প্রাণপণে তাহার সেবা করিল, সে জানিত এভাবে পরপুরুষের, বিশেষ করিয়া অন্য ধর্মাবলম্বী পরপুরুষের সেবাশুশ্রূষা করিলে সামাজিক

ক্রোধের খড়্গ তাহার উপর না পড়িয়াই পারে না। কমললতাদের আশ্রমে কমললতার কাছে গহর প্রতিদিন আসিয়াছে, গহরকে কমললতা সম্যক চিনিয়াছে, অন্তরে নিঃসঙ্গ, এই শান্ত, ভাববিহ্বল, আপনভোলা মানুষটিকে তাহার কঠিন অসুখের সময় কমললতা রমণী হইয়া কেমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবে, অবহেলা করিয়া ঠেলিয়া দিবে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে! কমললতা প্রাণপণে গহরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা তাহার সার্থক হয় নাই। কমললতা এইভাবে মানবতাবোধ এবং হৃদয়বোধের ঐশ্বর্যে দুঃখের কঠিন পথ বাছিয়া লইল, আপন নির্বাসনের ব্যবস্থা করিল। গহর মুসলমান হইলে কি হইবে, সে এক অনুপম মানুষ; সেই সুন্দর মানুষটিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচাইবার জন্য কমললতা আপন নিশ্চিন্ত বর্তমানকে ভাসাইয়া দিয়া শঙ্কাপূর্ণ অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিজেকে ঠেলিয়া দিল। শরৎচন্দ্র যদি সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন, তাহা হইলে গহরের মত আশ্চর্য সুন্দর চরিত্র আঁকার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?

'দেনা-পাওনা'র মহৎ চরিত্র ফকির সাহেবের কথা আগেই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত ফকির সাহেব চরিত্র হিসাবে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি শ্রদ্ধার্হ। মুসলমানকে অপছন্দ করিলে ফকির সাহেবের মত চরিত্র শরৎচন্দ্রের কলম হইতে বাহির হইত না। এই সূত্রে 'মহেশ' গল্পের গরীব মুসলমান চাষী গোফুরের কথা ধরা যাক। গোফুর ফকির সাহেবের মত কর্মী বা সাধু নয়, গহরের মত মহৎপ্রাণ কবি নয়, সে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। এমনকি 'পল্লী সমাজ'-এর আকবর সর্দারের মত অপমানিত হইয়া আত্মসম্মানবোধের পরিচয়ও সে দিতে পারে নাই। গোফুর নিরীহ কৃষক, নিজের অসহায়তা সম্বন্ধে সে সচেতন। যখন জুলুম, অত্যাচার হয়, গোফুর মুখ বুজিয়াই তাহা সহ্য করে এবং একমাত্র খোদাতালাকে আপন মনে করিয়া তাঁহার কাছেই সে অন্তরের ব্যথা জানায়।* এই লাঞ্ছিত বেদনা-ম্লান চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র এমন

*শরৎচন্দ্রের মুসলমান দরিদ্র চাষী গোফুর ব্রাহ্মণ জমিদারকে অভিশপ্ত করিয়াছে, এ অভিশাপের প্রতিবাদ কোন দরদী পাঠকের অন্তরেই জাগিবে না। মহেশ মরিয়া যাইবার পর গোফুর কন্যা আমিনার হাত ধরিয়া

সহানুভূতি-মণ্ডিত করিয়া আঁকিয়াছেন যে, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তর্করত্ন বা ব্রাহ্মণ জমিদারের মত হিন্দু চরিত্রের চেয়ে পাঠকের সহানুভূতি অবশ্যই গোফুরের দিকে ঝুঁকিবে। শুধু মুসলমান করিয়া নয়, অসহায় শোষিত মানুষ করিয়া, বাংলার নিগৃহীত কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি করিয়াই শরৎচন্দ্র গোফুরকে আঁকিয়াছেন। যে মূক, দরিদ্র, অসহায়দের লাঞ্ছনার বেদনা, দুঃখের অশ্রু ফুটাইয়া তোলা তাঁহার সাহিত্যকৃতির বড় দিক, মুসলমান কৃষক গোফুরের কাহিনী যেন তাহার সার্থক স্মারক।

'পল্লীসমাজ'-এ শরৎচন্দ্রের আদর্শপ্রবণ চরিত্র রমেশ মানুষের মঙ্গল চায়, দীর্ঘদিন বিদেশে কাটাইয়া উচ্চশিক্ষিত রমেশ গ্রামে ফিরিয়াছে, সে চায় গ্রামের সর্বতোমুখী কল্যাণ করিতে। এজন্য সে কিছু অর্থব্যয়ও করে। শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রথমে রমেশ তাহার স্বগ্রাম কুঁয়াপুরের স্কুলে পড়াইতে সুরু করিল এবং স্কুলের উন্নতিমূলক দেখাশোনা, বাড়ীঘর সারানো ইত্যাদির জন্য পকেট হইতে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু স্বগ্রামে জাতিবিরোধ এবং স্বগ্রামবাসী হিন্দুদের পরশ্রীকাতরতায় ক্লান্ত হইয়া সে তাহাদেরই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত মুসলমান-প্রধান পাশের গ্রাম পীরপুরে স্কুল চালাইতে গেল। সেখানে মুসলমান ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের পড়াইয়া রমেশ শান্তি ও তৃপ্তি—দুইই লাভ করিল। শরৎচন্দ্র রমেশের ও তাহার জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়া কুঁয়াপুরের হিন্দুদের তুলনায় পীরপুরের মুসলমানদের সমাজব্যবস্থা ও মনুষ্যত্ববোধের যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মুসলমান-প্রীতিরই নিদর্শন। বিশ্বেশ্বরী চাহিতেন রমেশ

গ্রাম ত্যাগ করিতেছে। এইখানে আছে : "অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র খচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ্! আমাকে যত খুশী সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন মাপ করো না।"

নিজের গ্রামের সেবা করুক, তাহার মন পরিবর্তনের জন্য বিশ্বেশ্বরী একদিন তাহাকে কুঁয়াপুরের স্কুল ছাড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুঁয়াপুরের স্কুল রমেশেরই পিতৃ-পিতামহের দানে প্রতিষ্ঠিত, স্বগ্রামের এই বিদ্যায়তনটির জন্য রমেশের অনুরাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে ক্লান্ত, বিরক্ত ও হতাশ হইয়াই এই বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। জ্যাঠাইমাকে রমেশ স্পষ্ট বলিল যে, তাহার কাছে কুঁয়াপুরের চেয়ে পীরপুরের স্কুল অনেক ভাল। "যেখানে পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, যেখানে কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, সেখানে খেটে মরায় কোন লাভ নেই। শুধু মাঝে থেকে নিজের শত্রু বেড়ে ওঠে। বরঞ্চ যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় দেশের সত্যকার মঙ্গল হবে, সেইসব মুসলমান আর হিন্দুর ছোট জাতের মধ্যেই পরিশ্রম করব।"

শরৎসাহিত্যে যে সকল মুসলমানের স্থান হইয়াছে সংখ্যায় তাহারা খুব কম একথা আগেই বলা হইয়াছে; কিন্তু একমাত্র শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদা দিদির ধর্মান্তরিত স্বামী ব্যতীত সকলকেই তিনি মোটামুটি ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন। শেখজীকে যে দুশ্চরিত্র ও কুটিল করিয়া আঁকা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তাহার অমানুষিকতার বিপরীতে অন্নদার মহিমময়ী রূপটি উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ীর মত সঙ্কোচ করিবার জায়গাতেও যে দুরাত্মা বিধবা শ্যালিকার ধর্মনাশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করে এবং ধরা না পড়িবার জন্য নাম ভাঁড়াইয়া হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, সে আবার মুসলমান বা হিন্দু কি, সে তো একান্ত অমানুষ। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র যে ফকির সাহেব, গহরের মত সত্যকার সৎ মুসলমানদের সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ মুসলমান সমাজের কাছে আদর্শ রাখা এবং সৎ-দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের সাহিত্যরস উপভোগের সহিত মনুষ্যত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।*

*অবশ্য শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত সৎ মুসলমানরাও সম্প্রদায়ের কল্যাণে কতদূর সচেষ্ট সেকথা বিশেষ আলোচিত হয় নাই। ফকির সাহেবের কর্মক্ষেত্র একটি কুষ্ঠাশ্রম এবং তাঁহার অনুরাগিণী একজন হিন্দু ভৈরবী। গহর ধনী হৃদয়বান মুসলমান, কিন্তু তাহারও মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোন সৎকাজ উপন্যাসে দেখান হয় নাই। সে হিন্দুদের কিছু কিছু দান করিয়াছে, যেমন নয়ন চক্রবর্ত্তীকে বন্ধকী ভিটে ছাড়িয়া দিয়াছে, নবীনের ছেলেদের নামে দশ বিঘা

'বিলাসী'তে কায়স্থ সন্তান মৃত্যুঞ্জয় যে মুসলমান সাপুড়িয়া কন্যা বিলাসীকে স্ব-সমাজে সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিল, সেখানে বিলাসীর হৃদয়মাধুর্য ও প্রেমমাহিমারই জয়গান করা হইয়াছে। প্রবন্ধ বা চিঠিতে অবশ্য কোথাও কোথাও শরৎচন্দ্র মুসলমানদের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু এই নিন্দা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া গালাগালি দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করা নয়, ইহা দ্বারা তাহাদের বর্তমানের হীনতা সম্পর্কে প্রতিবাদ, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা, সমগ্রভাবে তাহাদের পশ্চাৎপদতার দৈন্য-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। কথাসাহিত্য স্থায়ী জিনিস, সেখানে আদর্শপ্রবণ সুন্দর চরিত্র আঁকা এবং সাময়িক সমস্যার উপর লেখা পত্রে বা প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের দোষত্রুটি লইয়া আলোচনা করা,—এই দুই পৃথক প্রয়াস পৃথকভাবেই বিবেচনা করা উচিত। তাছাড়া শরৎচন্দ্র প্রবন্ধে বা চিঠিতে মুসলমানদের শুধু নিন্দা করিয়াছেন এমন নয়, প্রশংসাও করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩৪২ সালের ১২ই মাঘ তিনি জাহানারা চৌধুরীর কাছে লেখা চিঠিতে (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সঙ্কলিত শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৬০ দ্রষ্টব্য) যে মুসলমান তরুণের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনার কথা আছে তাঁহার পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত, অসাম্প্রদায়িক, মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করে নি।" শরৎচন্দ্র মুসলমানদের যেখানে নিন্দা করিয়াছেন, সেখানে নিন্দার পশ্চাতে তাহাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া কল্যাণসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। এছাড়া অনেকস্থলে নিন্দা বা প্রশংসা

জমি দানপত্তর করিয়া দিয়াছে, বৈষ্ণবী কমললতাকে টাকা দিয়াছে। ইহার বিপরীতে শরৎসাহিত্যে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণসাধনের কাহিনী বেশি। বিপ্রদাসের যে দান-খয়রাতের কথা দ্বিজদাস 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাস চলিয়া যাইবার পর বন্দনাকে বলিয়াছে, তন্মধ্যে মুসলমানদের মক্তবের স্থান আছে। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ তো তাহার স্বগ্রাম হিন্দু-অধ্যুষিত কুঁয়াপুর ছাড়িয়া পাশের মুসলমান-প্রধান গ্রাম পীরপুরের সেবায় ও তথাকার বিদ্যালয় পরিচালনায় নিজেকে বিশেষ ভাবে নিয়োগ করিয়াছে।

কিছুই না করিয়াও সাধারণ আলোচনার সূত্রে শরৎচন্দ্র মুসলমানদের কল্যাণ-কামনা করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ মাতৃভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদার কথাও তিনি বলিয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতার এ্যালবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) বিরুদ্ধে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র পরিষ্কার বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জন্মভূমিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিষপানে বাধ্য করিয়া হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করা হইলে হিন্দুদের ক্ষতি যাহা হইবার তাহাতো হইবেই, মুসলমানদেরও প্রভূত ক্ষতি হইবে, কারণ তাহাদেরই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের অগ্রগতি ইহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে। জাহানারা চৌধুরীর নিকট ১৩৪২ সালের ১২ই মাঘ লেখা যে চিঠিটির কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত মুসলমান অধ্যাপক বন্ধুর সহিত কথোপকথনেও শরৎচন্দ্রের এই ধারণা প্রকাশিত হইয়াছে।* তাছাড়া এই চিঠিতে তিনি মুসলমানদের উন্নতি কিরূপ চাহিতেন তাহারও সম্যক পরিচয় মিলবে। এই মুসলমান বন্ধুটি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত দেশ যখন ভারতবর্ষ, এই দেশের ভাষা যখন তাহাদের উভয়েরই মাতৃভাষা এবং একই আবহাওয়ার মধ্যে যখন উভয়ে পাশাপাশি বাস করে, তখন শরৎচন্দ্রের উচিত স্নেহের সহিত, সহানুভূতির সহিত মুসলমানদের কথাও বলা। শুধুমাত্র হিন্দুদের লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি না করিয়া তিনি শরৎচন্দ্রকে মুসলমানদের কথাও মনে রাখিতে বলেন। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পরামর্শের মূল্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তবে তিনি নিজে এই ভার লইতে অগ্রসর হইলেন না, কারণ কথাসাহিত্য জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফসল এবং সমকালীন তিক্ত আবহাওয়ায় লেখকের উপর পাঠকের

* এই চিঠিতে উল্লিখিত তরুণ মুসলমান অধ্যাপক বন্ধুকে শরৎচন্দ্র বলেন; "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তা চূড়ান্ত। এ-ও মানি এবং তোমাদের 'বীর' বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্পর্কে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।"

বিশ্বাসেরও স্বাভাবিক প্রশ্ন আছে। তাছাড়া সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ-১০০) এ সম্বন্ধে আর একটি কারণ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "মোসলেম সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করবার অভিলাষ ছিল। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে দু'একখানি পত্র ও পত্রিকায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আপত্তি ও সংশয় প্রকাশিত হওয়ায় তিনি এ সংকল্প পরিত্যাগ করেছিলেন।" যাহা হউক, উপরোক্ত তরুণ মুসলমান অধ্যাপক বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি কার্যকরী হউক ইহা চাহিতেন বলিয়াই প্রবীন সাহিত্যরথী এই তরুণ অধ্যাপককে মিলনমূলক সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে আগাইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সেই সম্প্রদায়ের লোকেরাই উগ্র সাম্প্রদায়িক হীনতাক্লিষ্ট হইয়া দেশকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহাদের হিন্দু-লেখকদের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। শরৎচন্দ্র বলিলেন, মুসলমান সাহিত্যিকরা যদি এই মহান্ সংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন তাহার সুফল অবশ্যই মিলিবে। সাহিত্য মানুষের এই মিলনেরই সমতল-ভূমি। মুসলমান সাহিত্যসেবী বন্ধুটি যখন বিষণ্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন— "এমনি non-co-operation-ই কি তবে চিরদিন চলবে?" শরৎচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন: "না চিরদিন চলবে না; কারণ সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়,—মূলে, অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচাতে হবে!"—এবং এরপর বন্ধুটি যখন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন তিনি সেই চেষ্টাই করিবেন, শরৎচন্দ্র আবেগের সহিত তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানাইয়া বলিলেন: "করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।"

শরৎচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমানকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন, তাঁহার ক্ষোভ ছিল সাম্প্রদায়িক, হীন-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সমকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ে এরূপ ব্যক্তিদের আধিক্য ঘটিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের 'মুসলিম-সাহিত্য-সমাজ' (শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, ষষ্ঠ সম্ভার) প্রবন্ধটি পড়িলেই জানা যায় ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি গুণী বা সৎ ব্যক্তিকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: "যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক,

কৃশ্চান হোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তার যোগ্য আসন তাকে দিতে পারতাম।...বাংলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম।" হাওড়া, বাজে শিবপুর হইতে ২০শে মার্চ, ১৯১৮ তারিখে কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা একখানি চিঠিতেও শরৎচন্দ্র অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, লেখক কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক নন, তিনি মানব-সমাজের শাশ্বত প্রতিনিধি। চিঠিখানিতে আছে: "সকল জাতির মধ্যেই ভালমন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই।"

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্মে মিলন শরৎচন্দ্রের সময় খুবই কম দেখা যাইত। প্রীতিমূলক সম্পর্কের অভাবে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা তাঁহারা জীবনবোধে ও ধর্মবোধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, সনাতনপন্থী হিন্দুদের কাছে তাহা প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তাঁহারা ভাবিতেন যাহারা পিতৃপিতামহের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহারা নিতান্ত হীন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মরা হিন্দুদের পুরাতনপন্থী বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই মনে করিতেন যে, অগ্রগতিশীল পৃথিবীতে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার এ চেষ্টা হাস্যকর এবং এজন্য হিন্দু সম্প্রদায় অবশ্যই প্রগতির বিরোধী। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, পদস্থ বা অর্থবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদির সাধ্যমত বিরোধিতা করিতেন।*

* দত্তা' উপন্যাসে জমিদার বিজয়া ব্রাহ্ম, তাহার ম্যানেজার বিলাস-বিহারীও ব্রাহ্ম। বিজয়ার অসুবিধার অজুহাতে বিলাসবিহারী নরেন্দ্রকে তাহার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীর দুর্গাপূজার অনুমতিদানে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিয়াছে: "পুতুল পূজো আমাদের কাছে ধর্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় বলে মনে করিনে।" কিছুপরে একই দৃশ্যে বিলাস আবার বলিয়াছে: "আপনার মামা একটা কেন একশোটা পুতুল গড়িয়ে ঘরে বসে পূজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তি নেই; শুধু

হিন্দুরাও অনেকক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের নানা অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া, এমন কি সুবিধা পাইলে একঘরে করিয়া ধর্মত্যাগের শাস্তিদানের কল্পনায় আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম বা হিন্দু কাহারও এই গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা সমর্থন করিতেন না এবং তিনি মূলত আস্থা স্থাপন করিয়াছেন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মানবিক বোধশক্তির উপর। উভয়তই শরৎচন্দ্র আপাত-হীনতার মধ্যেই মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যের খোঁজ করিয়াছেন এবং খোঁজ মিলিলে তাহা উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়াছেন। হিন্দু চরিত্রগুলির নীতি-দুর্নীতি বোধের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে, সেখানে চরিত্রের মহত্ত্ব যেরূপ মর্যাদা পাইয়াছে, চরিত্রের হীনতা বা সংকীর্ণতা সেইরূপ হইয়াছে ধিক্কৃত।* ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি একইরূপ। হিন্দুদেরও যেমন শরৎচন্দ্র চরিত্রের সমগ্রতার নিরিখে ভালমন্দ বিচার করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কোন এক দিকে খারাপ হইলেও সমগ্রতার মাপকাঠিতে তাহাকে মোটের উপর ভাল করিয়াও আঁকিয়াছেন, ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পথ লইয়াছেন। তাছাড়া যেক্ষেত্রে মন্দ দেখিয়াছেন সেক্ষেত্রে সেই 'মন্দ' চরিত্রগত না কার্যকারণ-সম্পর্কিত তাহা বুঝাইবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। বলা বাহুল্য, এ ঝোঁক মানবতাবোধ-প্রসূত। হিন্দুদের মত ব্রাহ্মদের দোষত্রুটির বিচারও শরৎচন্দ্র এইভাবেই করিয়াছেন। 'দত্তা'

কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ করে তোলাতেই আমার আপত্তি।" হিন্দু নরেন্দ্র অতঃপর ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তরই দিয়াছে সে সাকার নিরাকার তত্ত্ব লইয়া বিবাদ করে নাই, প্রধানত গ্রামের সার্বজনীন আনন্দ উৎসবের ছবিটি বিজয়ার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া সে তাহার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বিলাসের বিদ্রূপের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে সে কঠোরভাবেই বলিয়াছে: "এটা হিন্দুর রোসনচৌকী না হয়ে মুসলমানদের কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য হলে কি করতেন শুনি? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয়।"

* এই প্রসঙ্গে 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের দুই বিপরীত প্রান্তীয় ব্রাহ্মণ চরিত্রের উল্লেখ করিতে পারা যায়,—কৈলাস ও রাখাল। কৈলাস মহৎ, সে মর্যাদা পাইয়াছে, রাখাল হীন, সে ধিক্কৃত হইয়াছে।

উপন্যাসে রাসবিহারী ও তাঁহার পুত্র বিলাসবিহারীর আচরণ মোটেই তৃপ্তিদায়ক নয়, কিন্তু রাসবিহারীকে সংসারী, পুত্রবৎসল গৃহকর্তারূপে আঁকিয়া তিনি তাঁহার স্বার্থপরতার হীনতা যথেষ্ট লঘু করিয়া দিয়াছেন, বিলাসবিহারীকে রূঢ় চরিত্র করিয়া আঁকিলেও তাহার মধ্যে সরলতা ও মানবিক অনুভূতি, কিছুটা গোঁড়ামি মিশ্রিত হইলেও ব্রাহ্মধর্মে নৈতিক অনুরাগ এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, বিলাসবিহারীর উপর পাঠকের পুঞ্জীভূত বিরক্তি শেষপর্যন্ত যথেষ্ট তরল হইয়া গিয়াছে। বিলাসের চরিত্রে রূঢ়তা, এমনকি কিছুটা হীনতাও দেখানো হইয়াছে, কিন্তু চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে বিজয়া বিলাসের সহিত তাহার বিবাহের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর দানের পর রাসবিহারী চলিয়া গেলে বিলাসবিহারী যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে আবেগের অতিশয়োক্তি থাকিলেও ধর্মের প্রতি তাহার অকুণ্ঠ নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা এমন একটি মহৎগুণ যাহা লোকের শ্রদ্ধা স্বতই আকর্ষণ করে। বিলাস এখানে বলিয়াছে: "আমি জানি আমাদের তুমি ভালবাস না। কিন্তু সাধারণ লোকের মত আমিও যদি ভালবাসাকেই সকলের উর্ধ্বে স্থান দিতাম, তাহলে আজ মুক্তকণ্ঠে বলে যেতাম—বিজয়া তুমি যাকে ভাল বেসেচ, তাকেই বরণ কর। আমার মধ্যে সে শক্তি, সে ত্যাগ আছে।…কিন্তু একটা সকাম রূপতৃষ্ণা, যাকে ভালবাসা বলে মানুষ ভুল করে, সেই কি ব্রাহ্ম কুমার-কুমারীর একমাত্র লক্ষ্য? না তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হতে পারে না। এর বিরাট উদ্দেশ্য সত্য, মুক্তি; পরব্রহ্মপদে যুগ্ম আত্মার একান্ত আত্মসমর্পণ। আমি বলচি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে।"*

রাসবিহারী, বিলাসবিহারী, কেদারবাবু অথবা অচলার মত শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ব্রাহ্মচরিত্রে কিছুটা হীনতা বা দুর্বলতা দেখে গেলেও তাঁহার অধিকাংশ ব্রাহ্মচরিত্রই সৎ ও সুন্দর। 'দত্তা'য় বিজয়া চমৎকার কমনীয় নারীচরিত্র। আপন মনের স্বপ্ন পূরণ করিতে ও পিতৃস্মৃতির প্রতি কর্তব্য পালন

* অনুরূপ কথা বলা যায় 'গৃহদাহের' কেদার বাবু সম্বন্ধে। কেদারবাবু ব্রাহ্ম। আত্মকেন্দ্রিক সংসারী মানুষ তিনি, কিন্তু সন্তানবাৎসল্য ও ন্যায়-নীতির পরিষ্কার অনুভূতি তাঁহার স্বার্থপরতার গ্লানি অনেকখানি মুছিয়া দিয়াছে।

করিতে সে অত্যন্ত বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও পথ করিয়া লইয়াছে। বিলাসবিহারীর উগ্রতার বিপরীতে তাহার প্রশান্ত দৃঢ়তা পাঠকমাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'দত্তা'র দয়াল এমনকি নলিনীও হৃদয়গ্রাহী সৎ ব্রাহ্মচরিত্র। 'সতী' গল্পের বরিশালের স্কুল ইনস্‌পেক্টার হরকুমারবাবু অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মচরিত্র, কিন্তু এই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহার মাধ্যমে 'দত্তা'র দয়ালের মতই ব্রাহ্মদের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধাভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। হরকুমার বাবুর কন্যা লাবণ্য এই গল্পে হরিশের চরিত্রে অকারণে সন্দেহপ্রবণা তাহার সতী স্ত্রী নির্মলার বিপরীতে উপস্থাপিত হইয়াছে। সে খুবই ক্ষুদ্র চরিত্র, কিন্তু অত্যন্ত অল্প পরিসরেও লাবণ্যকে তাহার পিতার মতই পাঠকের ভাল লাগে। হরকুমারবাবুকে শরৎচন্দ্র যেভাবে পরিচিত করাইয়াছেন, তাহাতেই চরিত্রটির তথা হরকুমারবাবুর অবলম্বিত ধর্মের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধাভাব ফুটিয়াছে: "লোকটি নিরীহ, নিরহঙ্কার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসৎ পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে সদর-আলা রায়বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন।···নিজে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হোক অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই।"*

'পথনির্দেশ' গল্পের ব্রাহ্ম যুবক গুণীনকে শরৎচন্দ্র খুবই দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন: এই সৎ হৃদয়বান তরুণ তাহার মানবতাবোধ ও সহৃদয়তার

* হাল্কা করিয়া লেখা হইলেও শরৎচন্দ্র সৎ ব্রাহ্মদের কিরূপ মর্যাদা দিতেন তাহা দিলীপকুমার রায়কে ১৯শে মাঘ, ১৩৪০ তারিখে লেখা তাঁহার একখানি চিঠি হইতে বুঝা যাইবে। ইহাতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন: "আর একটা কথা। বন্ধু সুরেন মৈত্র (যাঁর মাথাজোড়া টাক। প্রফেসর, শিবপুর Engineering College-এ আমরা যেতাম) তিনি শ্রীঅরবিন্দর গভীর ভক্ত। আমাকে অনুরোধ করেছেন অদ্যাবধি তুমি আমাকে তাঁর সম্বন্ধে যত বই পাঠিয়েছো (এবং বলা সত্ত্বেও যা আমি কোন কালে ফেরৎ দিইনি) সেইগুলি একবার পড়তে দিতে। আমি বলেচি দেবো। কিন্তু রাগ ক'রোনা যেন। সুরেন ব্রাহ্ম হ'লেও লোক ভালো।"

গৌরবে নায়িকা হিন্দুতরুণী হেমের মন একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছে, হিন্দু-সংস্কারে আচ্ছন্না জননী সুলোচনার সতর্ক পাহারা হেমকে আটকাইতে পারে নাই। সুলোচনা হেমকে লইয়া বিধবা হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় অনেকদিন আগেকার প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক ধরিয়া গুণীনের কাছে আশ্রয় লইয়াছেন; গুণীনের বাবা ইতিমধ্যে সপরিবারে ব্রাহ্ম হইয়াছেন জানিয়াও উপায় না থাকায় গুণীনের বাড়িতেই থাকিয়া গিয়াছেন। নিজে তিনি ব্রাহ্ম গুণীনকে এড়াইয়া চলিতে যান, কন্যার খাওয়ার সময় সে ঘরে গুণীন ঢুকিতে পায় না, কিন্তু হেম সেই গুণীনের পাতের ভাত জোর করিয়াই তুলিয়া খায়। সুলোচনা হেমের বিবাহ দেন গুণীনের অর্থানুকুল্যে এবং বিবাহের পর হেম শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে নিজে তীর্থস্থান নবদ্বীপে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হেম মায়ের এ সংকল্পে অত্যন্ত ব্যথাবোধ করে কারণ ইহাতে গুণীনকে দেখাশোনা করিবার কেহ থাকিবে না। মার ইচ্ছায় বাধা দিয়া সে যে চিঠি লেখে তাহাতে গুণীনের প্রতি ভাল-বাসার চেয়ে তাহার মনুষ্যত্ববোধের প্রতি শ্রদ্ধাই বেশি ফুটিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ শ্রদ্ধা মহত্ত্বের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা। হেম শ্বশুরবাড়ী হইতে সুলোচনাকে লিখিয়াছে: "তুমি যে-বাড়িতে আছ মা, সে-বাড়ির হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হয়ে যেতে পারে: ওখানে থেকেও যদি তোমার পুণ্যসঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না। ওঁকে ছেড়ে যদি তুমি এস, আমি নিজে গিয়ে তাঁর কাছে থাকব।"

'পরিণীতা' উপন্যাসের গিরিণ শরৎচন্দ্রের একটি মনোরম সৃষ্টি, অতি সুন্দর এক ব্রাহ্ম যুবার চরিত্র। 'দত্তা'র দয়াল এবং 'পরিণীতা'র গিরিণে স্নিগ্ধতার দিক হইতে অনেকখানি মিল আছে। 'পথনির্দেশ'-এর গুণীনের মত ইহারা শান্ত হৃদয়বান মানুষ। তবু দয়াল চরিত্রে শরৎচন্দ্র একটুখানি খুঁত রাখিয়াছেন, তিনি সেরেস্তার কার্যাধ্যক্ষ বিলাসবিহারীর অসঙ্গত ধমকানির সামনে ঠিক মত আত্মমর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। গিরিণ চরিত্রটি নিখুঁত। এই ব্রাহ্ম যুবকটি প্রথম হইতে সাধারণ মানুষের মত উপন্যাসে আসিয়াছে, আভিজাত্যের বা বিদ্যাবুদ্ধির কোন আড়ম্বর তাহার নাই। কিন্তু গুরুচরণ বাবুকে মৃত্যুর সময় তাঁহার দুঃস্থ পরিবারকে পরিত্যাগ না করিবার যে কথা সে দিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে এবং ললিতার নারী-মর্যাদা রক্ষা করিতে গিরিণ ললিতার পরিবর্তে গুরুচরণবাবুর কন্যা কালীকে বিবাহ

করিল। এইভাবে সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন গিরিণ অসহায় দুঃস্থ গুরুচরণবাবুর সংসার ঘাড় পাতিয়া লইয়া আত্মত্যাগেরই দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে। ইহার পূর্বেও পরিচয়ের সূত্রে সে গুরুচরণবাবুর শেষ জীবনে যথেষ্ট করিয়াছে। কিন্তু এতবড প্রাণের পরিচয় গিরিণের বাহিরের আচরণে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। সে বরাবরই ভদ্র, বিনয়ী, শান্ত, সংযত। গুরুচরণবাবুর স্ত্রী শেখরকে গিরিণ সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছেন: "আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখর নাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।" গিরিণ যেন শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনার আদর্শরূপ। শেখরের কাছে গিরিণ যখন ললিতাকে সে কেন বিবাহ করে নাই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গেল, শেখরের সহিত পাঠক সমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাও সে কুড়াইয়া লইল। 'পরিণীতা'য় ধনী সন্তান হিন্দু শেখর নাথ বরাবর ব্রাহ্ম যুবক গিরিণের সম্বন্ধে মনে মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেছে, বলিতে গেলে তাহাকে ঘৃণাই করিয়াছে, গিরিণের মহত্ত্ব দেখিয়া সে চলিয়া যাইবার পর সেই শেখর নাথই মুগ্ধ হইয়া ভূমিতলে বারবার মাথা ঠেকাইয়া তাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়াছে।

সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতই ব্রাহ্মদের মধ্যেও ভালো এবং মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আছে, এই ধরণের মোটামুটি একটা ধারণা থাকিলেও ব্রাহ্মরা লেখা-পড়ায় অগ্রসর বলিয়া এবং বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম মেয়েরা সপ্রতিভভাবে ও স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা করে বলিয়া শরৎচন্দ্র তাহাদের এক ধরণের শ্রদ্ধা করিতেন। কানপুরের শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে লেখা একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের পরিচয় মিলিবে।* ব্রাহ্মদের মধ্যেই ভাল এবং মন্দ চরিত্রের একত্র সমাবেশ তিনি করিয়াছেন 'দত্তা' উপন্যাসে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী চরিত্রের বিপরীতে দয়াল ও বিজয়াকে আঁকিয়া। অবশ্য, আগেই বলা হইয়াছে, সংখ্যার দিক হইতে শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত ব্রাহ্ম চরিত্রগুলির অধিকাংশই ভাল এবং রাসবিহারী-

* আমার অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু আছেন। তাঁহাদের পত্র লিখিতে এবং বন্ধুর মতই অসঙ্কোচে লিখিতে আমার বাধ-বাধ করে না। কিন্তু আমাদের সমাজ এবং তাহার বিধি-বিধান এমন যে ছোট বোনটিকেও চিঠি লিখিতে শুধু সংকোচ নয় শঙ্কা হয়, পাছে আপনার অভিভাবক বা স্বামী কিছু মনে করেন এবং সেজন্য আপনাকে দুঃখ পাইতে হয়।"

বিলাসবিহারীর মত যাহারা খারাপ, তাহাদের হীনতারও মোটামুটি কারণ তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এইভাবে ব্যক্তি-চরিত্র বহুক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভাবে ফুটাইলেও সমগ্রভাবে শরৎচন্দ্র সমকালীন ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার একটি কারণ—ব্রাহ্মসমাজীদের হিন্দু-বিদ্বেষ ও আচার-আচরণের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদের বিরোধী মনোভাব পোষণ করিয়াছেন। তাছাড়া এ কথাও এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সামাজিক ও ধর্মগত দুর্নীতির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করিলেও শরৎ-চন্দ্রের মনে হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা ছিল এবং মহত্ত্ব প্রকাশের পটভূমিকা ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে আপন কালের হিন্দু সমাজের বিরোধিতায় দ্বারা আক্রান্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আপেক্ষিক পক্ষপাত তিনি দেখান নাই। ব্রাহ্মরা হিন্দুধর্মত্যাগী, স্বধর্মত্যাগ অন্যায় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিয়া 'পরিণীতা'র গিরিণ, 'পথনির্দেশে'র গুণীন বা 'দত্তা'র দয়ালের মত চমৎকার সৎ চরিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন বটে, কখনও কখনও ব্রাহ্মদের শিক্ষার বা আত্মনির্ভরশীলতার সুখ্যাতিও করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মদের প্রশংসায় তিনি উৎসাহ দেখান নাই। 'দত্তা'য় রাসবিহারী-পরিকল্পিত এবং বিজয়ার সোৎসাহে সমর্থিত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরটি বিজয়ার পিতৃবন্ধু জগদীশের দেনার দায়ে ক্রোক করা বাড়ীতে স্থাপিত হইবে, যে বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া উপন্যাসের নায়ক নরেন পথে দাঁড়াইবে,—কাহিনীর এই বিন্যাসেই কেমন যেন একটা সদর্থক আবেগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে ব্রাহ্মমন্দির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব যাহাই হউক, রাসবিহারী-বিলাসবিহারী পরিকল্পিত নরেন্দ্রের বাস্তুভিটায় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাকে শরৎচন্দ্র যে ভালো চোখে দেখেন নাই তাহার প্রমাণ 'দত্তা'র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের সূচনায় এই মন্দির সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য: "বিলাসবিহারীর প্রচণ্ডকীর্তি—পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল।" বিজয়ার বিবাহ ব্রাহ্মমতে না হইয়া হিন্দু সমাজের অনুমোদন নিরপেক্ষভাবেই যেভাবে হিন্দুমতে সম্পন্ন হইয়াছে এবং ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য দয়ালকে দিয়া যেভাবে এই বিবাহের ব্যবস্থাদি সম্পাদন করান হইয়াছে, তাহাতে দয়ালের ব্যক্তিগত চরিত্রের মহত্ত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থ ইহাতে রক্ষিত হয় নাই, একথা

বলাই বাহুল্য। এই বিবাহের উপর উপন্যাসের পরিসমাপ্তি আনিয়া শরৎচন্দ্র যে ফলশ্রুতি রাখিলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহার ব্রাহ্মপ্রীতির পরিচয় নয়; বরং ইহা দ্বারা তাঁহার হিন্দু-গোঁড়ামিরই কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'দত্তা' উপন্যাসের শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপ 'বিজয়া'; 'বিজয়া'র দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বিজয়ার ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় যেভাবে পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মপ্রীতির নিদর্শন নহে। তাঁহারা যাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধেই মুখে "ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন", "করুণাময়ের করুণায়",— এই ধরণের ভগবৎপ্রেমের কথা আওড়াই-তেছেন। ইহা শুনিলে পাঠকের মনে পবিত্রভাব জাগে না, পাঠক অনায়াসে ইহার ব্যঙ্গাত্মক দিকটি উপলব্ধি করে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরমার (অচলার) পিতাকে ব্রাহ্ম জানিয়াও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ রামবাবু সুরমার হিন্দু-স্বামী গ্রহণের গল্পটি যেভাবে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করিয়া সুরমার হাতে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর উদারতার দিকটিই আপেক্ষিকভাবে ফুটান হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ব্রাহ্ম কেদারবাবুর কথার মধ্যে। শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে এই সুযোগে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। তখন অচলা সুরেশের সহিত চলিয়া গিয়াছে, কন্যাসমা মৃণালের উপর বৃদ্ধ কেদারবাবু নিজের ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেদারবাবু ব্রাহ্ম, মৃণাল শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণবিধবা। কেদারবাবু ব্রাহ্মসমাজের কথা উল্লেখ করিয়া মৃণালকে বলিলেন: "আমি সাধারণ মানুষ সাধারণের সঙ্গেই মিশে কাটিয়েছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য হয়ে গেছেন, তাঁদের উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেচি। তাঁদের সেইসব কতদিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্চে। তুমি বলেছিলে মৃণাল, ধর্মান্তর-গ্রহণের মধ্যে, ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষারেষি থাকবেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও ত এতকাল তাই বুঝেচি, তাই বলে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজ দেখতে পেয়েচি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই বলে অভিযোগ করে যে, দেশে বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট করে দিতে পেরেচি, ততখানি খৃষ্টান পাদ্রীরাও পেরে ওঠেনি—নালিশটা ত আজ আর তাদের মিথ্যে বলে ওড়াতে পারিনে মা!

মৃণাল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দৃকপাত করিলেন না। বলিতে লাগিলেন, মৃণাল, রেষারেষি যদি নাই-ই থাকবে, তাহলে আমাদের মধ্যে যাঁরা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি, সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শ পদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্মের মন্দিরে, ধর্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারানে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে একথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধাঘাটে আসুক। মা, ধর্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল ঠোকায় আমাদের সমাজশুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম, শ্রদ্ধায় তেমনি রুক্ষ হয়ে উঠত— আলোচনায় পুলকেব মাত্রাও কোথাও একতিল কম পড়ত না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে, তা থাক, কিন্তু ধর্মের লেশমাত্রও কোনস্থানে থাকবার যো ছিল না।"

ব্রাহ্ম কেদারবাবুর মুখে ব্রাহ্মসমাজ এইভাবে নিন্দিত হইবার পরই একমাত্র শ্রোত্রী নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা মৃণালকে লেখক পরধর্ম-সহিষ্ণুতার আদর্শে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে হিন্দুধর্মের আপেক্ষিক গৌরবই অধিকতর স্ফূরিত হইল। কেদারবাবুর কথাগুলি শোনার পর মৃণাল ব্যথিতকণ্ঠে বলিল: "বাবা, এ সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্ছ? তাঁরা (কেদারবাবুর দ্বারা উল্লিখিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরা) সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার প্রণম্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল।"

শরৎসাহিত্যের অধিকাংশ চরিত্র এবং পারিবারিক বা সামাজিক পটভূমিকা হিন্দুসমাজ হইতে (ব্রাহ্ম সমেত) লওয়া হইয়াছে, মুসলমানদের কথা সেখানে কমই স্থান পাইয়াছে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের এখানে ওখানে দুএকবার আনা হইয়াছে বটে, তবে তাহারা সংখ্যায় নগণ্য এবং শুধুমাত্র ব্যক্তি চরিত্র হিসাবেই তাহাদের স্থান হইয়াছে, স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের উজ্জ্বলতা তাহাদের নাই অথবা তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়গত সামাজিক পটভূমিকাতেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় নাই। 'শ্রীকান্ত' ও 'পথের দাবী' উপন্যাসে ব্রহ্মদেশে কাহিনীর বিস্তার হইয়াছে, 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ী দিবাকরকে লইয়া ব্রহ্মদেশের আরাকানে পলাইয়াছে, 'ছবি' গল্পের পটভূমিও

ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ব্রহ্মদেশ বৌদ্ধপ্রধান হইলেও 'ছবি' গল্পটি ছাড়া বাকীগুলিতে বৌদ্ধ নরনারীর সাক্ষাৎ কমই পাওয়া যায় এবং যদিও বা পাওয়া যায় বৌদ্ধ সমাজব্যবস্থার ছবি সেখানে মিলে না বলিলেই বলে। শিখধর্ম সম্পর্কেও একই কথা। 'পথের দাবী'র হীরাসিং অত্যুজ্জ্বল ক্ষুদ্র চরিত্র, কিন্তু সক্রিয় দেশপ্রেমিক হিসাবেই তাহার পরিচয়, শিখ হিসাবে নয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে একজায়গায় শরৎচন্দ্র শিখ ধর্মসম্পর্কে একটু শ্রদ্ধার ভাব লইয়াই লিখিয়াছেন: "অজিতের বাবা ছিলেন গুরু গোবিন্দর পরম ভক্ত। তাই শিখদের মহাতীর্থ অমৃতসহরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটি বাঙলো বাড়ী তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন।"

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে খ্রীষ্টান ধর্ম বা চরিত্রের স্থানও সামান্য, কিন্তু স্থান অল্প হইলেও, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবে একটা সচেতন তির্যকভাব ছিল। অবশ্য এই মনোভাবের অধিক যোগ তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার সহিত, ধর্মচেতনার সহিত ইহার যোগ ততটা নয়। ইংরেজ ভারতবর্ষকে শাসনের নামে শোষণ করিয়াছে, নিজেদের স্বার্থ কায়েমী করিতে বিপুল সম্ভাবনাময় এই উপমহাদেশকে তাহারা অভাব, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের হীনতায় পশ্চাৎপদ রাখিতে সঙ্কোচবোধ করে নাই, এই রাজনৈতিক ক্ষোভই মূলত ইংরেজদের ধর্ম খ্রীষ্টানধর্মের প্রতি তাঁহার বিরূপতার কারণ। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারী এদেশে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া দেশের মানুষকে খ্রীষ্টান করিয়া দেশবাসীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং নানা সুযোগ সুবিধা দিয়া তাহাদের স্বার্থ শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে, এই কুকীর্তির জন্য শরৎচন্দ্র খ্রীষ্টান মিশনারীদের ও সেইসঙ্গে তাহাদের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ হন। এইভাবে ধর্মের নামে অধর্মাচরণকে নিন্দা বা ঘৃণা করা আর ধর্মকে নিন্দা বা ঘৃণা করা এক বস্তু নয়, সে কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং সে অর্থে শরৎচন্দ্রকে প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধী বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের ঘৃণা করিতেন না, ঘৃণা করিতেন ইংরেজদের আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে। শরৎচন্দ্র এইভাবে শাসক ইংরেজ ও মানুষ ইংরেজদের মধ্যে তফাৎ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। এই হিসাবে তাঁহার চিন্তা অপেক্ষা হৃদয়বেগই নিঃসন্দেহে অধিক কাজ করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র

নিজে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে আপোষহীন স্বাধীনত সংগ্রামের যোদ্ধা রূপে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাই মানুষ হিসাবে ইংরেজকে পৃথকভাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তি দুর্বল হইয়া যাইতে পারে, হয়তো তাঁহার এ ভয় ছিল। ইংরেজকে হীন দেখাইতে গিয়া ইংরেজের ধর্ম খ্রীষ্টানধর্মকে ভাল বলিবার প্রেরণাবোধও তিনি স্বভাবতই করেন নাই। পক্ষান্তরে যে কোন উপায়ে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করিবার যে অসাধু সংকল্প লইয়া খ্রীষ্টান মিশনারীরা দেশের অভ্যন্তরভাগে ঘোরাফেরা করিয়াছে, তাহাদের ধিক্কৃত করিতে গিয়া তাহাদের উদ্দিষ্ট ধর্মকে প্রশংসা করিবারও তিনি উৎসাহবোধ করেন নাই।

'দেনা-পাওনা'য় 'কে' সাহেবের কথা আছে। 'কে' সাহেব উপন্যাসে উপস্থিত হন নাই, তবে কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারী কর্মচারী হিসাবে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে যেন একটু প্রশংসাই করিয়াছেন। ধর্মে খ্রীষ্টান হইলেও মানবিক মূল্যবোধ-স্বীকৃতিতেই শরৎচন্দ্রের এই প্রশংসাভাব। কিন্তু ইহার বিপরীতে বারোয়ারী উপন্যাস 'ভালমন্দ'-এ (৯ জনে লেখা, শরৎচন্দ্র প্রথম পরিচ্ছেদটি লেখেন) শরৎচন্দ্র যে ইংরেজ আই সি এস-এর কথা লিখিয়াছেন তিনি হীন কাজ করিয়া হীনরূপেই চিত্রিত। তাঁহার যৌবনে কথা-কাটাকাটির জন্য তিনি মুন্সেফ অবিনাশবাবুর উপর বিরক্ত হন, সেই রাগ মনে মনে পুষিয়া রাখিয়া পরে হাইকোর্টের জজ হইয়া তিনি অবিনাশবাবুর পদোন্নতির ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করেন ও তাঁহার নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে মুন্সেফ হইতে সাবজজ করিয়া দেন। ইহাতে দুঃখিত হইয়া অবিনাশবাবু পদত্যাগ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে উচ্ছৃঙ্খল যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের দেখাইয়াছেন তাহারা যেমন নীচ তেমনি ভীরু। তাহারা খ্রীষ্টান হিসাবে নয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিসাবে রক্তে ও ধর্মে শাসক-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়া সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করিবার সাহস রাখে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিপ্রদাসের হাতে ইহাদের লাঞ্ছনার ছবি আঁকিয়া শরৎচন্দ্র মানবিক গুণাবলীর উপরই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবে এ গুণ কোথাও কোথাও ফলপ্রসূ হয় নাই এমন দৃষ্টান্তও তিনি আঁকেন নাই তাহা নয়, 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী ক্ষোভ ভরে তাঁহার সম্পর্কিত দাদার যে মানবতাবোধমূলক সংগ্রাম ও শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা

করিয়াছেন, সেখানে খ্রীষ্টান সাহেবের অন্যায় নির্দেশই কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু তবু এ কাহিনীতেও হীনকে হীনরূপেই দেখানো হইয়াছে; ফলে পাঠকমনে হীনতার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং মনুষ্যত্বের এই পরাজয়ের জন্য বেদনাবোধ সঞ্চারিত না হইয়া পারে না। 'পথের দাবী'তে ভারতীর পিতা খ্রীষ্টান বেশী সাহেব, তাহার চরিত্র হীন করিয়া অঙ্কিত, কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমলের পিতা এইরূপ খ্রীষ্টান চা বাগানের সাহেব হইলেও এবং তাহার চরিত্রদোষের ইঙ্গিত (কমলের মা বাঙ্গালী বিধবা) থাকিলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপারে কমল মাঝে মাঝে তাঁহার প্রসঙ্গে যেসব উক্তি করিয়াছে তাহাতে পাঠক মনে তাহার সম্পর্কে মোটামুটি ভাল ধারণাই জন্মায়।*

মোটের উপর, যদিও শরৎচন্দ্র খ্রীষ্টান চরিত্র সৃষ্টি বেশি করেন নাই অথবা খ্রীষ্টধর্মের বা খ্রীষ্টান সমাজের কথা বেশি বলেন নাই, তবু এ সম্পর্কে তাঁহার সামান্য লেখা পড়িলে মনে হয় যে, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় খ্রীষ্টান জাতিগুলি ভারতে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম বিস্তারের যে অপচেষ্টা করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের মনে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জমিয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া ইহাদের দুশ্চরিত্রতার জন্য এদেশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নামে যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রায় ক্ষেত্রেই তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া-শীলতায় ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতায় শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তবু ভালকে ভাল বলিবার, মানবিক গুণ স্বীকার করিবার যে মহৎ হৃদয়বোধ তাঁহার ছিল, 'পথের দাবী'র খ্রীষ্টান ভারতী চরিত্র চিত্রায়ণে তাহার সম্যক পরিচয় মিলে। ভারতীর প্রথম দিকের ছবি খুব আশাপ্রদ নয়, কিন্তু তাহার পিতৃবিয়োগের পর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার সুযোগ পাইয়া ভারতীর অদ্ভুত পরিবর্তন

* ভারতবাসী হিন্দু দারিদ্র্যের জ্বালায় খ্রীষ্টধর্মের বা অন্যধর্মের আশ্রয় লইলে তাহার অভাব যদি ঘুচে, সেক্ষেত্রে ধর্মান্তর গ্রহণ দুঃখের হইলেও শরৎচন্দ্র নিন্দা করিতে পারেন নাই। 'পরিণীতা'য় গুরুচরণবাবু অভাবের জ্বালায় ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্বে ১৩শ পরিচ্ছেদে চক্রবর্তী-গৃহিণী দুমকাবাসী এক খুড় শ্বশুরের খ্রীষ্টান হইয়া কষ্ট লাঘবের কথা বলিয়াছেন। শ্রীকান্ত ভাবিয়াছে: "হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মান্তর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয় কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি বলিয়া?"

ঘটিয়াছে, সে শুধু উচ্চশ্রেণীর দেশকর্মী হইয়া উঠে নাই, সংযত আত্ম-স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত-মহিলা হইয়াও উঠিয়াছে। 'পথের দাবী' উপন্যাসে খ্রীষ্টান ভারতীকে শরৎচন্দ্র স্নেহে ও সহানুভূতিতে যেভাবে উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন, যেভাবে তাহার রাজনৈতিক সক্রিয়তা, মানবতাবোধ এবং প্রেমিকারূপ ফুটাইয়াছেন, তাহাতে ভারতী যে খ্রীষ্টান, একথা বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ সহকারে তিনি মনে রাখেন নাই। তাই বলা যায়, যে নৈতিক চেতনা শরৎসাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ, ভারতী চরিত্রের বিকাশে তাহাই কার্যকরী হইয়াছে। এই নৈতিক চেতনা শরৎচন্দ্রের আচারবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ব্রাহ্মণ সন্তান অপূর্ব এবং তাহার ব্রাহ্মণ পাচক তেওয়ারী খ্রীষ্টান ভারতীর হাতে খাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এ ছবি আঁকিতে লেখকের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব চোখে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী খ্রীষ্টান বলিয়াই তাহাদের উপর স্বাধীনতা-যোদ্ধা শরৎচন্দ্রের বিরাগ হীনতালিপ্ত খ্রীষ্টান বেসরকারী নুষদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল, এই বিরাগ খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অবশ্যই নয়। খ্রীষ্টান ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব 'পথের দাবী'তে ভারতীর কাছে সব্যসাচীর নিম্নোক্ত কথা কয়টিতেই উপলব্ধি করা যাইবে: "ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানদের হাতেও এদেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন।"

শরৎচন্দ্রের সব ধর্মের নৈতিক দিকের প্রতি অনুরক্তি ছিল এবং মূলগতভাবে সকল ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষতঃ সাহিত্যিক হিসাবে এই সর্বধর্মে শ্রদ্ধাভাব তিনি অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।*

* 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৩) লিখিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিকের ধর্ম সম্পর্কে উদার-মনোভাবের আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্বজন-পরিচিত 'আমি'-টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-

তবে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি স্বধর্মের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। এই অর্থেই ধর্মান্তর গ্রহণ, এমনকি হিন্দুধর্ম হইতেই উদ্ভূত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণও তিনি পছন্দ করিতেন না। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের অধিকাংশই তিনি যুক্তি-তর্ক-নিরপেক্ষ ভাবেই মানিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, তাহাও ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরস্থ সকল বিভাগের মধ্যে তিনি বৈষ্ণবধর্মকে সর্বাধিক পছন্দ করিতেন।* শরৎচন্দ্রের মন কোমল ছিল, তিনি হৃদয়বাদী সাহিত্যিক, প্রেম তাঁহার সাহিত্যে সর্বপ্রধান উপজীব্য। বৈষ্ণবধর্মের কোমল মাধুর্য তাঁহাকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। বৈষ্ণবদের হীনতা-দীনতা চোখে পড়িলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন না বা সাহিত্যে অনুরূপ প্রতিবাদ ধ্বনিত হইত না এমন নয়; কমললতার কণ্ঠি-বদল-করা স্বামী 'জাত বোষ্টম', তাহার হীনতার জন্যই সে হীনরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রশান্ত ভাবমণ্ডলটি শরৎচন্দ্রের বড় ভাল লাগিত। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে ৩য় পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর জবানীতে তিনি লিখিয়াছেন: "সর্বদিনের পুরাতন অথচ চিরনূতন বৃন্দাবনের বনে বনে তুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র—মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ, তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না।" শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' 'শরৎ কথা' শীর্ষক রচনায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন: "তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী

সাধনা ব্যর্থ হয়। এইজন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছু মেলে না, সেখানেও ম্যাক্সিম গোর্কির মতো সাহিত্য-সেবকেরা আমাদে বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন।"

*শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কবি নরেন্দ্র দেব তাঁহার 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র গ্রন্থে (ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১২৮) লিখিয়াছেন: "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে 'রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহমূর্তি দান করে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে সেই যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিত্য নিয়মিত পূজা করতেন।

হইতে ফেরার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেননি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতি বড় নাস্তিকও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।" শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনীগ্রন্থ 'শরৎচন্দ্র'-এ (১ম খণ্ড, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৪৭) লিখিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব-পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম যেদিন তাঁহার সামতাবেড়, পাণিত্রাসের বাড়ীতে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানান, সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: "হরেকৃষ্ণবাবু, আমিও বৈষ্ণব, এই দেখুন আমারও গলায় তুলসীর মালা রয়েছে।"* শুধু বৈষ্ণব ধর্মানুরাগ নয়—শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব সাহিত্যপ্রীতিও কিরূপ গভীর ছিল সে সম্বন্ধে গোপাল রায় মহাশয়ের উল্লিখিত শরৎচন্দ্র গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পাঠ করিলে মোটামুটি ধারণা হইবে: "বৈষ্ণব ধর্মের উপর শরৎচন্দ্রের যেমন একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্যপাঠের জন্যও তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন, সেই সময় একবার তিনি কলকাতায় এসে পড়বার জন্য হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তখন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বহুবার পড়েছিলেন। এই গ্রন্থপাঠের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তখন হরিদাসবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন: 'আপনি আমাকে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন, সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই।

* শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব ধর্মানুরাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শ্রীমনীন্দ্র চক্রবর্তীর "দরদী শরৎচন্দ্র" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয়ের এই উক্তি যথার্থ হইলে শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব-ভাবাশ্রয়িতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। উক্তিটি নিম্নরূপ: "হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারটি গ্রন্থে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে দোষ কিছু নেই। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারটির মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল, এমনি একটা মনোভাব তাঁদের মধ্যে স্থান না পেলে, পরবর্তীকালে (শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে) সামতাবেড়ের বৈষ্ণব মতে তাঁরা কণ্ঠীবদল ক'রে নূতন ক'রে বিবাহের বিধি পালন করতেন না।"

আসিবার সময় মনেই হয় নাই—তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে।... এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বই-গুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। আপনাকে অনেক রকমেই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে দান করুন। আমি অনেক আশীর্বাদ করিব এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।"

বৈষ্ণব ভাবপ্রীতির জন্যই বোধ হয় শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে আশ্রমাদি অপছন্দ করিলেও বৈষ্ণব আখড়ার রূপ ফুটাইতে তাঁহার অনেকখানি কোমলতা দেখা যায়। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বে দ্বারিকাদাস বাবাজীর আশ্রমের চমৎকার পরিবেশ, আশ্রমবাসিনী কমললতার পঙ্কিল অতীত জীবন সত্ত্বেও বর্তমান জীবনে সুরভি সংশ্লেষ লেখকের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতেই সম্ভব হইয়াছে। এই বৈষ্ণব পটভূমিতে কমললতা তাহার বেদনার্ত অতীত পিছনে ফেলিয়া আসিয়া শান্তি পাইয়াছে।* শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রই কিরূপ দরদ দিয়া আঁকা তাহা অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়িবে। অধিকাংশ বলা হইতেছে এইজন্য যে, 'পণ্ডিত মশাই'য়ে স্বার্থপর কুঞ্জ এবং তাহার কুটিলা শাশুড়ী বৈষ্ণব, শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে কমললতার কণ্ঠীবদলের স্বামী নিজেকে 'জাত বোষ্টম' বলিয়াছে। এগুলি নিঃসন্দেহে হীন চরিত্র। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুরারিপুর আখড়ার সুন্দরী রাজলক্ষ্মীর উপস্থিতিতে গায়ক মনোহরদাস বাবাজীর গলা কাঁপিয়া যাইবার কথা যে লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার নয়। যাহা হউক, এসব সত্ত্বেও

---

* শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে আছে একদিন মুরারিপুর আখড়ায় অতি প্রত্যূষে কমললতা ফুল তুলিতেছিল। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে শ্রীকান্তর মন উদ্বেল হইল, সে সহসা বলিয়া ফেলিল, "কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পেয়েছো, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও!" কমললতা সে কথা শুনিয়া শান্তভাবে পূজার ফুল তুলিতে তুলিতে জবাব দিল: "আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।"

অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্র এবং বৈষ্ণব ধর্মীয় পরিবেশ শরৎচন্দ্রের দরদ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে উল্লিখিত শ্রীকান্তদের গ্রামের লোকান্তরিতা যশোদা বৈষ্ণবী সম্পর্কে শ্রীকান্ত তাহার জনহীন শ্রীভ্রষ্ট ভিটায় দাঁড়াইয়া আবেগের সহিত স্মরণ করিয়াছে, এই ভিটায় একসময় যশোদা বৈষ্ণবী স্বামীর সমাধিতে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিত, ফুল ছড়াইয়া দিত। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-এর বৃন্দাবন বৈষ্ণব, অত্যন্ত স্নিগ্ধ মধুর তাহার চরিত্র। সে দুঃখকে শান্তভাবে গ্রহণ করে। সে একমাত্র পুত্র চরণকে হারাইয়াও অস্থির হয় না, হারানো স্ত্রী কুসুমকে ফিরিয়া পাইয়াও চঞ্চল হয় না। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পের সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যাম একজন আদর্শ বৈষ্ণব। বাড়ীতে বিমাতার গৃহিণীত্বে সে উপার্জনকারী হইয়াও অবহেলিত হয়, সেজন্য স্ত্রী সৌদামিনী ব্যথিত হয়, রাগ করে। ঘনশ্যাম কিন্তু শান্তভাবে সব কিছু সহ্য করিয়া বলে "আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন।" ঘনশ্যামের এই সহনশীল বৈষ্ণবভাব আরও প্রকট হইয়াছে যখন সে গৃহত্যাগিনী সৌদামিনীকে সরল বিশ্বাসে নিষ্পাপ ধরিয়া লইয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়'-এর সবিতার স্বামী ব্রজবাবুকে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব-ভাবাশ্রিত করিয়াছেন। সবিতা বহু বৎসর পরপুরুষের সহিত ঘর করিয়া একদিন হঠাৎ স্বামী কন্যার মোহে ব্রজবাবুর ঘরে আসিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিল। সবিতার এই জিদের অযৌক্তিকতা লইয়া ব্রজবাবু আলোচনা করিয়া কথা বাড়াইলেন না, বৈষ্ণবোচিত প্রশান্তির সহিত আশ্চর্য দৃঢ়তা মিশাইয়া সবিতাকে তিনি বলিলেন: "রেণুতো (তাঁহার ও সবিতার কন্যা) কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি?—যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্মের অনুশাসনে। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়ে হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় নেবো।"

শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর ভিত্তি না করিয়া মানবতামূলক কল্যাণবোধের উপর ভিত্তি করিয়া রূপ পাইয়াছে, অধ্যাত্মবোধে অধিক প্রসৃত না হইয়া নৈতিক ভাবাশ্রিত হইয়াছে, একথা এতক্ষণ আলোচনা

করিয়া দেখানো হইল।* এইসঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, সত্য ও কল্যাণ-বোধের উপর নির্ভরশীল হইলে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতাকেও তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের কাছে অধর্মাচরণ প্রশ্রয় পাইত না এবং সত্যের পথে ধর্ম সহায় একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের সুনন্দার কাহিনীতে তাঁহার এই বিশ্বাস রূপায়িত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর গঙ্গা-মাটির গোমস্তা কাশীরাম কুশারী তাঁতিদের বিষয় ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে কাশীরামের ছোট ভাই যদুনাথের স্ত্রী সুনন্দা কাশীরামের পাপের পয়সায় সুখভোগ অস্বীকার করিয়া স্বামী পুত্র লইয়া চরম দারিদ্র্য স্বীকার করিয়া পৃথক ঘর বাঁধিতে চলিয়াছে। কাশীরাম-গৃহিণী যদুনাথকে মানুষ করিয়াছিলেন, তিনি কাঁদিয়া তাহার কাছে গিয়া পড়িলেন। যদুনাথের চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু সে দুর্বলতা দেখাইল না। যদুনাথ বলিল, "বৌঠান তুমিই আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম। আমার বিশ্বাস সুনন্দা একটা অন্যায় কথাও বলেনি। শ্বশুর-মশায় সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।"

সত্য, ন্যায় ও মানবতা সমৃদ্ধ যে ধর্মবোধে শরৎচন্দ্র উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত আচারকেন্দ্রিক ধর্মবোধের তফাৎ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। শরৎচন্দ্র জানিতেন ভারতের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের গৌরব যতই হউক, ধর্ম যেভাবে ভারতবাসীর দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে তাহাতে সংস্কারই অধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে, মূলতত্ত্ব হইতে ভারতবাসী অনেক সরিয়া আসিয়াছে। যুগের প্রয়োজন এই ধর্মাচরণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। তিনি নিজে যেভাবে নৈতিক ধর্মবোধের উপর জোর দিতেছেন তাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত কল্যাণের দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, এই প্রত্যয় অন্ততঃ শরৎচন্দ্রকে স্বস্তি দিয়াছিল। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীমতিলাল রায়কে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার পবিত্র চরিত্রের জন্য শরৎচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। মতিবাবু ধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি। তবু চন্দননগরের

*এই ধর্মের সহায়তাতেই যেন 'কাশীনাথ'-এর নিঃস্ব বিন্দুর সিঁথির সিন্দুর শরৎচন্দ্র রক্ষা করিয়াছেন। বিন্দুর শ্বশুর মৃত্যুকালে যে বাক্সের চাবি তাহাকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এক সাহিত্য সম্মেলনে (২১।১০।১৯৩০) শরৎচন্দ্র সভায় মতিলাল রায় মহাশয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মবোধ সম্পর্কে ব্যথা প্রকাশ প্রসঙ্গে মতিবাবুর বিরুদ্ধেও মন্তব্য করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ধর্মের মৌলিক তত্ত্বচিন্তা করেন নাই, ভারতে ধর্মবোধের যুগোপযোগী পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে পরামর্শ দিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। কিন্তু প্রচলিত ধর্মের রূপ বহুলাংশে মূল্যহীন মনে হওয়ায় তিনি যে সত্যই ব্যথিত সে কথা সকলের সামনে আলোচ্য সভায় তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন। এই ভাষণের মধ্যে তাঁহার প্রিয় উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে একটু উচ্ছ্বাস ছিল, সেটুকু বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের স্বদেশবাসীর ধর্ম-বোধের পুনর্মূল্যায়নের আন্তরিক আগ্রহ এই ভাষণ হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলিলেন: "মতিবাবু এই যে লাইন নিয়ে চলেছেন, বোধহয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অশোভন হবে না—ও আমি ভাল বলি না। ওঁর লেখা আমি মন দিয়ে পড়ি। আমার মনে হয়, উনি পুরাতন ধর্মের উপর ভিত্তি করে আবার একটা নূতন জাতি গড়ে তুলতে চান। আন্‌ফরচুনেট্‌লি আমার মন উল্টো দিকে গেছে, ধর্ম সাধনায় আর মনে বল পাই না। আমাদের সবই ছিল যদি, সকলই জেনেছিলুম যদি, তবে আমাদের এ দশা হলো কেন? পৃথিবীর অন্য জাতিদের দিকে যখন তাকাই, কেমন তারা নিজেদের পরিচয় দেবার মত প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আমরা? যাদের সব ছিল, একবার পাঠানের একবার মোগলের একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরছি কেন? আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের খুব বড় করে বড়াই করে থাকি। কিন্তু বাইরের লোক সেকথা বিশ্বাস করে না। ধর্মের মধ্যে মস্ত গলদ আছে।"*

---

* 'গৃহদাহ'-এ ব্রাহ্ম অচলার বিপরীতে আচারনিষ্ঠ হিন্দু-বিধবা মৃণালকে শরৎচন্দ্র জিতাইয়া দিয়াছেন। এখানে শরৎচন্দ্রের নিজের হিন্দু-সংস্কার নিঃসন্দেহে কিছুটা কাজ করিয়াছে, তবে মৃণালের সত্যবোধ ও ধর্মবোধের মধ্যে যে সহজ সমন্বয় তিনি দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রাণের জিনিস।

রাজনৈতিক চেতনা

'চন্দননগরে আলাপ আলোচনা' শীর্ষক শরৎচন্দ্রের চন্দননগরের এক সভার যে ভাষণটি 'শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ'-এর ষষ্ঠ সম্ভারে স্থান পাইয়াছে, তাহার এক জায়গায় আছে: "আমি বড় চিন্তায় পড়েছি। Politics-এ যোগ দিয়েছিলুম। এখন তা থেকে অবসর নিয়েছি। ও হাঙ্গামায় সুবিধা করতে পারিনি। অনেক সময় নষ্ট হ'ল। এতটা সময় নষ্ট না করলেও হ'ত।"

শরৎচন্দ্র তাঁহার সামতাবেড়, পাণিত্রাসের পল্লীভবন হইতে সাহিত্যিক বন্ধু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৫শে কার্তিক, ১৩৩৬ তারিখে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ, মামলায় জড়িয়ে—civil এবং criminal,—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেব্‌তার সইল না, ঘাড়ে চাপলেন।... তারপরে ফৌজদারী। যাক্ সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েচে। ভাব্‌চি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের উপর সুসহ।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুইটিতে শরৎচন্দ্রের যে বিমর্ষভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার উদ্ভব হইয়াছে সাময়িক বিহ্বলতার চাপে, কিন্তু তাঁহার কর্মজীবনে ইহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রাজনীতির ঝামেলার জন্য সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র শান্তির আশায় মাঝে মাঝে রাজনীতি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিকে তিনি কখনই আপন জীবন-পথ হইতে সম্পূর্ণভাবে সরাইতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করিয়াছেন, কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদাধিকারী ছিলেন তিনি, তাছাড়া নিজে অহিংস আন্দোলনের কর্মী হইলেও বিপ্লবীরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতেন। এ অবস্থায় রাজনীতির সহিত জড়াইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের অবশ্যম্ভাবী দায়-দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট পোহাইতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার

মত ভাবপ্রবণ সাহিত্যিকের পক্ষে আশ্চর্য নয় এবং তাঁহার জীবনে সেরূপ ঘটনা যে ঘটে নাই এমন নয়। কিন্তু তবু দেশমাতৃকার পরাধীনতার বেদনা তাঁহার অন্তরকে মথিত করিয়াছিল বলিয়া তিনি সংগ্রাম হইতে নিজেকে একেবারে সরাইয়া লইতে পারেন নাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা কার্যকরী হইয়াছে। উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি সম্বন্ধেও একই কথা। পল্লীগ্রামের বহুবিধ দৈন্য তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তজ্জন্য আঘাত তাঁহাকে কম পাইতে হয় নাই, মাঝে মাঝে তিনি ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ, যেমন এই ক্লান্তি বা বিরক্তি সত্ত্বেও পল্লীগ্রামকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, শরৎচন্দ্রও প্রায় অনুরূপ ভাবেই কলিকাতার অভিজাত অঞ্চল বালিগঞ্জে বাড়ী থাকা সত্ত্বেও এবং সহরে সম্মান-প্রতিপত্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও পাণিত্রাসে রূপনারায়ণ-তীরস্থ শান্ত পল্লীনিবাসে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সরল জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন, সুযোগ সুবিধা পাইলেই গ্রামে চলিয়া যাইতেন। দেশে বিদেশে কথাসাহিত্যিক হিসাবে যখন তাঁহার প্রভূত মর্যাদা, সে সময়ও শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার এক প্রান্তে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যে ভাবে গ্রাম্য নানা ছোট বড় সমস্যার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, পল্লীগ্রামকে গভীর ভাবে ভাল না বাসিলে ইহা সম্ভব হইত না।

শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যিক, সমাজচিত্র উপস্থাপনে এবং সামাজিক নরনারীর হৃদয় ভাবের প্রকাশে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ। ব্যক্তিমনের অভ্যন্তরে বিচিত্র সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্ন লুকাইয়া থাকে, বহিরঙ্গ অথবা অন্তরঙ্গ সংঘর্ষে সেগুলি উদ্বেলিত হয়। ব্যক্তি-মনের এইসব চিত্র অঙ্কনে বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র শুধু সবচেয়ে জনপ্রিয় নন, প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড় শিল্পী। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিছক শিল্পচর্চা করেন নাই, আপন কালের স্বদেশ ও স্বদেশের সমাজ সম্পর্কে সচেতন মন তাঁহার লেখনীর পশ্চাতে সব সময় জাগ্রত থাকিয়াছে। এ যুগে রাজনৈতিক সমস্যা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের সময় ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছিল, তদুপরি শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন,এ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার রচনায় রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক তত্ত্বাদি সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন না, পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক

চিন্তাভাবনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, এইরূপ রাজনৈতিক চিন্তাপ্রবাহ তাঁহার স্বদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে বা কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সে সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁহার লেখায় দেখা যায় না; কিন্তু মাতৃভূমির পরাধীনতা ঘুচাইবার যে সর্বাত্মক সংগ্রাম তখন চলিতেছিল এবং আসমুদ্র হিমাচল•ভারতবর্ষ তখন যেভাবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, শরৎচন্দ্র তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার রচনায় রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ সর্বক্ষেত্রে বলিষ্ঠ হয় নাই, /তিনি প্রধানতঃ সামাজিক কথাসাহিত্যিক বলিয়া সামাজিক বিধিবিধানের ও মানুষের হৃদয়বৃত্তির কথা অধিক বলিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার সংশ্লেষ স্বভাবতঃই কম হইয়াছে। তবু যেখানেই প্রাসঙ্গিকতার সুযোগ মিলিয়াছে, সেখানে শরৎচন্দ্রের লেখায় তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার মাতৃভূমি বিদেশী রাজশক্তির শাসন ও শোষণে মুমূর্ষু; দীর্ঘ পরাধীনতার লাঞ্ছনায় বিগতশ্রী স্বদেশের শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামে তাঁহার ভূমিকা যখন সৈনিকের, তখন তাঁহার রচনায় স্থান-কাল-পাত্রের আনুকূল্য থাকিলে রাজনৈতিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ তো প্রত্যাশিত। ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও জনমত গঠনের চেষ্টা শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যেই করিয়াছেন। আবার বিদেশী শাসনের পটভূমির কথা বাদ দিলেও পরাধীনতার অভিশাপে পঙ্গু তাঁহার স্বদেশ দুর্নীতি, ভেদাভেদ ও শ্রেণীস্বার্থের পঙ্কিলতায় হীন হইয়া যাইতেছে, সে কলঙ্ক হইতে মাতৃভূমির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন/ তবে, আগেই যে কথা বলা হইয়াছে, শেষোক্ত এই প্রচেষ্টার পিছনে যে চিন্তার বৈশিষ্ট্য বা স্বচ্ছতা থাকিলে ভাল হয়, শরৎচন্দ্রের তাহার একটু অভাব ছিল, সেইজন্য কেতাবী আলোচনায় তাঁহাকে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌দের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। /গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্য-বাদ, ধনতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক দর্শনের তত্ত্বগত দিক তাঁহার লেখায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে স্থান পায় নাই, কিন্তু স্থূল ভাবে দেশী-বিদেশী শোষণ বন্ধ করিয়া দেশবাসীকে সুখে শান্তিতে থাকিতে দিবার এবং স্বাধীন মানুষের মাথা তুলিয়া চলিবার অধিকার ফিরাইয়া দিবার আগ্রহ তাঁহার অদম্য ছিল। শোষণ বন্ধ হইলে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে মোটামুটি উদ্বুদ্ধ হইয়া শরৎচন্দ্র লেখনী-চালনা করিয়াছেন/; ধনসম্পদের বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা দূরীকরণের সুচিন্তিত আবেগ কিন্তু তাঁহার রচনায় অনুপস্থিত। বলা

নিষ্প্রয়োজন, দ্বিতীয় চিন্তা ব্যতীত প্রথম চিন্তার সাফল্য হইতে পারে না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, শরৎ-সাহিত্যে এই দিকটি তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবে না। যাহা হউক, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, নিপীড়িত মানুষের জন্য গভীর বেদনা বোধে ও সেই পীড়ন দূরীকরণে সামাজিক চাহিদা বা আবেগ সৃষ্টির প্রয়াসে, সর্বোপরি বিদেশী শাসনের গ্লানি হইতে মাতৃভূমির মুক্তি কামনার ঐকান্তিকতায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য উজ্জ্বল। বস্তুতঃ লেখকের স্বদেশবাসীর বন্ধনমুক্তির চেষ্টা শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, সে বন্ধন রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ,—সব কিছুরই হইতে পারে। সাধারণ মানুষ সংখ্যায় বেশি, তাহাদের বঞ্চিত করিয়া কোন সমৃদ্ধি দেশের সত্যকার মর্যাদাবহ হইতে পারে না, এই ছিল শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়। এইজন্য সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তিনি কামনা করিতেন। কিন্তু দেশ ও কালের পরিস্থিতির নিরিখে এ পথে বিপুল প্রতিবন্ধক সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি এ সত্যও অনুভব করিয়াছিলেন যে, যাহারা দৈন্য, শোষণ বা হীনতার মধ্যে দিন কাটায় তাহাদের মনে অন্তর্নিহিত হীনতাবোধ (inferiority complex) জমা খুবই স্বাভাবিক এবং সে ক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নৈরাশ্যের চাপে ভবিষ্যৎ তাহাদের নিষ্ফল হইয়া যায়। অনেক সময় আবার এই হীন পরিবেশের প্রভাবে তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাহারা শুধু ছোট হইয়া যায় তাহাই নয়, সমাজ ও স্বদেশের ভার হইয়া দাঁড়ায়। ন্যায্য অনুকূল পরিবেশ পাইলে তাহারাও হয়তো মানুষ হইতে পারিত, হয়তো তাহাদের দৈন্যের পরিবর্তে সম্পদে সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারিত। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের দ্বারা বহু ভাবে উপকৃত ভৈরব আচার্য যে বেইমানী করিয়া রমেশকে জেলে পাঠাইল, এজন্য সমাজপতি ও জমিদার বেণী ঘোষালের মত হীন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন পরিবেশ ভৈরবের নিজের হীনতার চেয়ে কম দায়ী নয়। চারিদিকের দারিদ্র্য ও হীনতা ম্রিয়মাণ সাধারণ মানুষের মনে অবসাদ সৃষ্টি করে এবং তাহারা কর্মোৎসাহ হারাইয়া ক্রমে জড়তালাভ করে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত-সুবিধার প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া বা হীনতার অভ্যাসে এ সম্পর্কে সচেতনতা হারাইয়া তাহারা নিজেদের ছোট করিয়াও ফেলে। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে গঙ্গামাটি গ্রামে জনসেবক সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ শ্রীকান্তকে সাধারণ মানুষের প্রতিকূল

পারিপার্শ্বিকের চাপে এইরূপ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবার কথাই বলিয়াছে।* কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মানব মনের রহস্য-সন্ধানী সুগভীর দৃষ্টি ছিল, মানুষের মনের কথা সুন্দর করিয়া বলিবার ক্ষমতা ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন চরিত্র অঙ্কনে, বিশেষ করিয়া স্নেহ, ভালবাসার মত স্নিগ্ধরস মর্মস্পর্শী করিয়া ফুটাইবার শক্তির হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য। বিষয় বস্তু এবং রচনারীতি উভয় দিক হইতেই হৃদয়গ্রাহী গল্প বলার বিস্ময়কর ক্ষমতা তাঁহার। এই সবই সামাজিক কথাশিল্পী হিসাবে তাঁহার প্রখ্যাতির অনুকূল উপাদান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আপন শক্তি বা প্রতিভা অনুযায়ী হৃদয়-সংবেদী সামাজিক কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমায়িত করিয়া রাখিতে তাঁহার মন উঠিল না। রাজনীতির পথ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বন্ধুর, কিন্তু দেশাত্মবোধের প্রবল প্রেরণায় তিনি এই কঠিন পথে চলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ক্ষমতা তাঁহার সীমাবদ্ধ ছিল, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। পরাধীন মাতৃভূমির এবং অসংখ্য শোষিত অসহায় স্বদেশবাসীর কথা ভাবিয়া শরৎচন্দ্রের মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, মহান্ আবেগে সুপ্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র রাজনীতির পটভূমিকায় গল্প-উপন্যাস লিখিবার উৎসাহ দেখাইলেন। তিনি জানিতেন সামাজিক কথাসাহিত্যে যে প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রাখিয়াছেন এক্ষেত্রে তাহা রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু কথাসাহিত্য অসংখ্য মানুষের অন্তর স্পর্শ করে বলিয়া আপন বক্তব্য বহু মনে সম্প্রসারিত করিবার সুযোগ রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্র ছাড়িলেন না। ('পথের দাবী' উপন্যাসকে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় হিসাবে না দেখিয়া শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার আশ্রয় হিসাবে দেখিলে কথাটার সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

*"সাধুজী বলিলেন, আমার মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তাহলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত! কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি? বহু দিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ পিতাম'রা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন।"

শরৎচন্দ্র যেমন উগ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডল লইয়া 'পথের দাবী'র মত উপন্যাস লিখিয়াছেন, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনে মুক্তিকামী বাঙ্গালীদের কাছে যে 'পথের দাবী' ধর্মগ্রন্থের মত মর্যাদা পাইয়াছে, তেমনি তিনি আবার 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' অথবা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এর মত শ্রেণী-সংগ্রামের জটিল ও কঠিন সমস্যা মিশ্রিত হৃদয়ভাবপ্রধান সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাছাড়া 'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনায় কিছু কিছু স্পর্শ আছে। ইহা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র যে হৃদয়বাদী সামাজিক কথাসাহিত্যিক, তাহা তাঁহার উপরোক্ত শ্রেণী-সংঘর্ষ-চিহ্নিত লেখাগুলি হইতে তো বটেই, তাঁহার 'পথের দাবী'র মত মূলতঃ রাজনৈতিক উপন্যাস পড়িলেও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ইহার কারণ প্রধানতঃ বিচিত্র মানব-মন লইয়া সামাজিক গল্প-উপন্যাস লেখাই শরৎচন্দ্রের কাজ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে একথা এতখানি জোর করিয়া না বলা গেলেও ঔপ-ন্যাসিক আবেগ বঙ্কিমের সমগ্র কথাসাহিত্যে বড় জায়গাই জুড়িয়া আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্কিমের রাজসিংহের মত ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি যে জেব-উন্নিসা-মবারকের প্রেমকাহিনীর এতখানি প্রাধান্য দিয়াছেন তাহারও কারণ সম্ভবতঃ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর ক্ষেত্রে আদর্শ-প্রাধান্যের জন্য হৃদয় রহস্য বিশ্লেষণের সুযোগ তিনি তেমন করিয়া পাইলেন না বলিয়াই জেবউন্নিসা-মবারকের কাহিনী সন্নিবেশের সুযোগ করিয়া লইয়া-ছেন। এইজন্য ঐতিহাসিকতার শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজসিংহ উপন্যাসেও হৃদয়বাদী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৌল প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সার্থক করিতেই শরৎচন্দ্র রাজনীতি বড় একটা করেন নাই; তিনি আগে জীবনপ্রেমিক গল্পকার তারপর রাজনৈতিক প্রবক্তা। জীবনকে তিনি বাস্তবতার নিরিখেই দেখিয়াছেন, দুঃখ, রুক্ষতা, এমনকি হীনতা তাহাতে তথ্যগতভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অঙ্গাঙ্গী প্রত্যক্ষ বা অন্তর্লীন ঐশ্বর্যও তাহাতে মণ্ডিত করিয়াছেন। স্বদেশ সম্পর্কে মুক্তিকামী জাতির অংশ হিসাবে ব্যক্তিমানুষের মনে যে তরঙ্গ স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র তাহাই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সম্ভব হইলে ব্যক্তিচরিত্রে, আর ব্যক্তিচরিত্রে সম্ভব না হইলে সমগ্র-

ভাবে গ্রন্থের ভাবসত্যে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন। পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা প্রভৃতি রচনায় ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। পল্লীসমাজে সাধারণ মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবে, শিক্ষার আলোয় আত্মদীপ হইবে, এ আশ্বাস অবশ্যই রাজনৈতিক। দেনা-পাওনায় অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ বা জোতদার জনার্দন রায়ের জুলুমের বিপরীতে আপাত-অসহায় সাগর সর্দার, হরিহর সর্দার বা চণ্ডীগড় গ্রামের কৃষিজীবি প্রজাপুঞ্জের অধিকারবোধে মাথা তুলিবার আবেগ অনবধানী পাঠকের চোখেও ধরা পড়ে। তবে আগেই যে কথা বলা হইয়াছে, হৃদয়বান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ প্রায়ই এই রাজনৈতিক চেতনার ঊর্ধ্বে। শ্রেণী-সংগ্রামী আবেগ বা বিদেশী রাজশক্তির কবল হইতে মুক্তিলাভের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা শরৎসাহিত্যে যতই ফুটিয়া থাক, মানুষের হৃদয়ের কথা তাহার চেয়ে অধিক স্থান পাইয়াছে। "পল্লীসমাজ'-এ শ্রেণী-সংগ্রামের ইঙ্গিত আছে সত্য, কিন্তু এই উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরীর মাতৃত্ববোধ অথবা রমা-রমেশের হৃদয়বোধ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল সন্দেহ নাই। 'দেনা-পাওনা'-তেও তাই। 'দেনাপাওনা'য় জমিদার-প্রজার সংঘর্ষ, জমিদারের শোষণ ও প্রজাদের অসহায় লাঞ্ছনা এবং শেষপর্যন্ত জমিদারের মনের পরিবর্তন ও প্রজাদের সুবিধা হইবার কথা আছে, কিন্তু এই সমস্যা-চিত্রের অনেক উপরে স্থাপিত হইয়াছে জীবানন্দ-ষোড়শীর হৃদয়ের আদান-প্রদান। ভালবাসিয়া ভালবাসার মূল্য দিতে জীবানন্দ-ষোড়শী যে দুঃখবরণ করিয়াছে, জমিদারের অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখবরণের চেয়ে তাহার গভীরতা কম নয়। 'পথের দাবী' রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস, ইহাতে রাজনীতি স্বভাবতঃই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। ভারতের পরাধীনতার বেদনা, পরাধীন ভারতবাসীর মর্মজ্বালা ইহার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। মুক্তির অগ্নিক্ষরা দাবীতে এই গ্রন্থ সমকালীন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে অমূল্য রত্নস্বরূপ হইয়াছিল। 'পথের দাবী' রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হইলেও দেশাত্মবোধী পাঠকের অভাব কখনও হয় নাই, অনেক ঝুঁকি লইয়া অনেকে এই বাজেয়াপ্ত বইখানি সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু তবু এই রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনীতিই একমাত্র কথা নয়। অপূর্ব-ভারতীর প্রেম, নয়নতারার প্রতি শশীকবির হৃদয়ানুরাগ, সব্যসাচীর প্রতি সুমিত্রার দুর্বলতা,—এই নরম-মনের রসোজ্জ্বল ছবিগুলি রাজনৈতিক উপন্যাসের

উত্তপ্ততার পিছনে পিছনে স্নিগ্ধ দক্ষিণবাতাসের স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।\ ইহাতে উত্তাপ কমিবার সম্ভাবনা যে একেবারে নাই তাহাও নয়। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের মোটামুটি খোঁজ যাঁহারা রাখেন তাঁহারাই জানেন যে, ইহাতে শৃঙ্খলাবোধের উপর কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হইত এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার ফল সমগ্রভাবে সর্বনাশা বলিয়া বিশ্বাসঘাতককে কিরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তি লইতে হইত।/ কিন্তু 'পথের দাবী'তে অপূর্ব পুলিশের কাছে দলের অস্তিত্ব ও গোপনকথা ফাঁস করিয়া দিয়াছে, অথচ ভারতীর প্রেমাস্পদ অপূর্বকে দলের নেতা সব্যসাচী সহকর্মীদের দাবী উপেক্ষা করিয়া চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কেন, কোন কঠিন শাস্তিই দেন নাই। ইহা সব্যসাচীর হৃদয়-বোধের পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু 'পথের দাবী' ও তাহার নেতাকে যে বিপ্লবের সঙ্গে এক করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, সেই চেষ্টার সহিত সব্যসাচীর এই করুণার বাস্তব মিল সত্যই কম। এ কাহিনী শরৎচন্দ্রের হৃদয়বোধ-প্রভাবিত বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।\ 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিল তাহাও শরৎচন্দ্রের এই বিচিত্র হৃদয়বোধের প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম দৃশ্যে বলরাম-পুরের জমিদারবাড়ীর ছোটছেলে দ্বিজদাস জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করিয়াছে, কিন্তু জমিদার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মিছিল হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ, দ্বিজদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জমিদার বিপ্রদাস স্বগৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া মিছিলের দিকে তাকাইবার পর আনুষঙ্গিক ধ্বনি সহ মিছিল চালাইয়া লইয়া যাওয়ার সাহস মিছিলকারীদের হয় নাই। এই দৃশ্য হইতে স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে জমিদার-প্রজার সংঘর্ষে বিপ্রদাস শ্রেণীসংগ্রামমূলক ভাল উপন্যাসের রূপ পাইবে এবং বিপ্রদাস ও দ্বিজ দাস দুই ভাই সক্রিয় ভাবে সমস্যার বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করিয়া উপন্যাসখানির গতি ও শক্তি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানির প্রথম দিকের কয়েকখানি পাতার পর হইতেই ইহার রাজ-নৈতিক জৌলুষ বা সম্ভাবনা ফিকে হইয়া গিয়াছে এবং শেষপর্যন্ত ইহা পুরো-পুরি হৃদয়সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাসে দাঁড়াইয়াছে। বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস দুজনেই উপন্যাসের প্রথম অংশের পর আপন আপন অন্তরের কোমল ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, রাজনৈতিক আবহাওয়া হইতে তাহারা সরিয়া গিয়াছে দূরে। বন্দনার সহিত দ্বিজদাসের ঘনিষ্ঠতার তিনটি দৃশ্যে

তিন স্তরের উল্লেখেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। প্রথম আঘাতের সময় দ্বিজদাসকে বন্দনা যখন জিজ্ঞাসা করিল সে চিরকালের জন্য জমিদারী ত্যাগ করিতে পারে কিনা, দ্বিজদাস তাহার জবাবে বলিয়াছিল, "সত্যিই পারি। ওতে আমার একতিল লোভ নেই। দেশের পনের আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও-কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না, গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোষ করে মরতে পারলে বরঞ্চ একদিন স্বর্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ পথে কোন কালে সে আশা নেই।"

ইহার পর দ্বিজদাসের কলিকাতার বাড়ীতে বন্দনার সহিত দ্বিজদাসের সাক্ষাৎ দৃশ্য। বন্দনার পিতা বোম্বাই চলিয়া যাইবেন। বন্দনাও তাঁহার সহিত যাইতে চায়। দয়াময়ী যখন জানিলেন কায়স্থ সুধীরের সহিত ব্রাহ্মণ বন্দনার বিবাহের কথা হইয়াছে, কিছুটা সংস্কার প্রচণ্ডভাবে আহত হইবার জন্য এবং কিছুটা অন্তর্মনে বন্দনাকে দ্বিজদাসের বধূ করিবার আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া সতীকে লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বন্দনা, পিতার সহিত সেও যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় দ্বিজদাস তাহাকে বলিল: "এও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেওনা। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দে মাতরমের মন্ত্র।"

এই খাপছাড়াভাবে বন্দে মাতরমের উল্লেখটুকুও গ্রন্থের শেষ দিকে দ্বিজদাস-বন্দনার মিলন দৃশ্যে নাই। সেখানে সম্পূর্ণ হৃদয়ের কথা, বড়জোর সাংসারিক কর্তব্যের কথা। বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে দ্বিজদাস বলিল: "ভাবছি তোমার কথা, ভাবছি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

কেন?

নইলে পারতে না। সর্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না?

না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম। পেলুম বাবুকে, মাকে, বড়দাকে, আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগ্যের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।"

মোটের উপর শরৎসাহিত্যে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রকাশই বড় কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্র অন্তরের রাজনৈতিক চেতনার তাগিদে মাঝে মাঝে আপন শিল্পীসত্তার কিছুটা সঙ্কোচন ঘটাইয়াও রাজনৈতিক পরিবেশের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক কথাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে এ সুযোগ কম, সেই জন্যই হয়ত তিনি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক স্বদেশের পরাধীনতা এবং সেই পরাধীনতার আনুষঙ্গিক সব সমস্যার জন্য শরৎচন্দ্র যে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহার চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই অনুভূতি কথাসাহিত্যের প্রশস্ততর ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে স্থান করিয়া লইয়াছে, যদিও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র দু একটি ব্যতীত বাকী গল্প-উপন্যাসের পটভূমি সামাজিক মানুষের সমস্যাকেন্দ্রিক। যাহা হউক, বিশাল শরৎসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার স্থান বেশি নয়, কিন্তু যেটুকু স্থান আছে তাহাই লেখকের গভীর নিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের জন্য বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র যে যুগের মানুষ, সে যুগে তাঁহার মত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনৈতিক চেতনাবর্জিত হওয়াই অস্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া সমাজের সমস্যাসমূহ ভিত্তি করিয়া তিনি গল্প উপন্যাস লিখিয়াছেন বলিয়া একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সব সামাজিক সমস্যায় অনেকগুলিরই মূল হইল পরাধীনতার অভিশাপ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইয়াছিলেন। তদুপরি তিনি সাধারণ

মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন বলিয়া দেশের জনগণের সহিত অন্তরঙ্গতার ফলে সমকালীন জাতীয় গণ-আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সামাজিক কথাসাহিত্যিক হইলেও শরৎচন্দ্রের রচনায় রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের মানসলোক, শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সাধারণ, রবীন্দ্রনাথ অভিজাত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্ম-চেতনার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের তাহা ছিল না। কিন্তু যাহাকে গণজীবন বলে, বঞ্চিত, শোষিত, জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত সাধারণ মানুষের যে জীবন, শরৎচন্দ্র তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঠাকুরবাড়ীর সন্তান, উচ্চশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁহার আশৈশব নৈকট্য, জমিদারীর স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি অভ্যস্ত। যদিও রবীন্দ্রনাথ পাবনা অঞ্চলে জমিদারীতে বহু সময় কাটাইয়াছেন এবং প্রজাগণের জীবনযাপন মোটামুটি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তবু জমিদারী-আভিজাত্যের বেড়া ডিঙ্গাইয়া সাধারণ মানুষের আর্ত জীবনরূপ তাঁহার কাছে বেশি পৌছাইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। এছাড়া সেই সময়ে প্রজাগণ জমিদারের মালিকানার মায়াবাদে অনেকটা অভ্যস্ত বা আচ্ছন্ন ছিল বলিয়াও এ যুগের ঐ শ্রেণীর মানুষের বঞ্চিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, সংগ্রামী জীবনের রুক্ষতা এবং ব্যর্থজীবনের ঈর্ষা ও অভিশাপ-প্রবণতা তাহাদের মধ্যে কম দেখা যাইত। সহরে-বাজারে-কলে-কারখানায় সে সময় এই শ্রেণীর সংগ্রামমুখী গণচেতনা লক্ষণীয়ভাবে দানা বাঁধে নাই। পরিস্থিতির সহিত যে অন্তরঙ্গতায় এই প্রাথমিক রূপের কার্যকরী অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অন্তরঙ্গতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। পল্লীগ্রামের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-প্রকৃতির মাধুর্য এবং পল্লীবাসীর সারল্য ও কমনীয়তার যতটা আস্বাদ পাইয়াছিলেন, বাস্তব ঘনিষ্ঠতার অভাবে সে তুলনায় বাংলার পল্লীজীবনকে শরৎচন্দ্রের মত রিক্ততা, ধূসরতা, বিষণ্ণতার নিরিখে খোলাচোখে খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়, পারিলে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে সেই বামচক্ষুরও প্রভাব পড়িত। কিন্তু অভিজাত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া এবং অভিজাত মানস-গঠন লইয়াও রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মোচনের সংগ্রামে শুধু কবিসুলভ ভাবাবেগ-সমন্বিত আত্মিক সহযোগিতাই

করেন নাই, সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের দিগন্তব্যাপী প্রবাহে মাঝে মাঝে ভাসিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র মত রাজনৈতিক উপন্যাস অবশ্য রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাই, 'চার-অধ্যায়'-এর পটভূমি কিছুটা রাজনৈতিক হইলেও তাহা জাতীয় ভাবচেতনার বিস্তারে 'পথের দাবী'র সগোত্র হইবার দাবী করিতে পারে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাজাত আবেগের স্পর্শ চার অধ্যায়, গোরা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাসে, 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর মত গল্পে অনেকস্থলেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতায় এই রাজনৈতিক চেতনার সাক্ষাৎ মিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্পষ্ট কোন চরিত্র সোজাসুজি ইংরেজের গায়ে হাত তুলে নাই। রবীন্দ্রনাথের গোরায় চরঘোষপুরের ফরু সর্দার নীলকুঠীর সাহেবকে আঘাত করিয়া কারাবরণ করিয়াছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র যেখানে মোটের উপর স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্তমান পটভূমিকার ছবিই আঁকিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বর্তমানের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া ভারতের অনাগত সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের আশ্বাস দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' নামে যে নাটিকাটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে জনগণের দ্বারাই অচল মহাকালের রথ চালু হইয়াছে। জনশক্তির চরম স্বীকৃতিসূচক এই নাটকখানি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষরবাহী।*

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন বৈচিত্র্যময়। অভাবে, দুঃখে, অবহেলায়, আঘাতে সে জীবন একদিকে যেমন পীড়িত, অন্যদিকে আবার রসিকজনের অভিনন্দনে, গুণমুগ্ধ জনগণের শ্রদ্ধায় সে জীবন ধন্য। তাঁহার সাহিত্যসম্ভারের উপাদান তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন প্রাধনতঃ গ্রামাঞ্চল হইতে, এই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ

*রাজনীতির হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন: "Rabindranath is not and has never been either a practical or a theoretical politician .....But if we take politics in its human, and not in its professional sense, Rabindranath has been undoubtedly the greatest political force of modern Bengal." (Preface to 'Political Philosophy of Rabindnanath' by Sachin Sen, 1st. Edition)

মানুষের সহিত তিনি অকুণ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতির পর্বে এই পল্লীজীবনের ঘনিষ্ঠতা বিশেষ কার্যকরী হয়। শরৎচন্দ্র যখন এইভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল। সেই অনটনের দিনে এই করুণ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে সুবিধাভোগী স্বচ্ছল মানুষের চেয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের হৃদয় অনেক উদার এবং মনুষ্যত্বের পরিচয় তলার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিক দেখা যায়। অবশ্য দারিদ্র্য হইতে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়ার ট্র্যাজেডিও এই সাধারণ মানুষদের জীবনে ঘটে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের এই বেদনাদায়ক পরিণতির অভিজ্ঞতা পরবর্তী-কালের শক্তিশালী সামাজিক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের খুবই কাজে লাগিয়াছিল। এই সময় তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে, সাধারণ মানুষ মূলতঃ ভালো, সম্ভাবনার হিসাবেও ভালো, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায়ই যে দৈন্য চোখে পড়ে তাহার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বা বিধিবিধান এবং পরাধীনতার অভিশাপ কম দায়ী নয়। যাহা হউক, স্বদেশবাসী সম্পর্কে এই সব অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের অন্তরে বিপুল আলোড়ন আনিয়াছিল এবং ধনীশ্রেণীর তুলনায় অভাবী সাধারণ মানুষের দিকে তাঁহার সহানুভূতি ঝুঁকিয়াছিল। সমাজের উপরতলার মানুষ সুবিধা ভোগ করিতে করিতে অশেষ স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে, লোভে তাহারা আপন মহৎ বৃত্তিগুলি প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের হীন বৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম, লোভের বা স্বার্থপরতার উত্তাপে তাহাদের অন্তর শুকাইয়া যায় নাই। শরৎচন্দ্রের এইরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, পরিবেশ আনুকূল্য করিলে অথবা সুযোগ সুবিধা পাইলে এই তলার শ্রেণীর অনেকেই জীবনবোধের প্রতিযোগিতায় উচ্চশ্রেণীর মানুষদের অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই সহানুভূতির সহিত রাজনৈতিক চেতনার বিশেষ যোগ আছে, কারণ অসম ধনবণ্টনের ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অসাম্যের ফলে মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবানের বিপরীতে যে অসংখ্য তলার শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের বড় হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই প্রত্যয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার সহিত এক হিসাবে সংযুক্ত। শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁহার রচনায় হামেশা মিলে। সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রচুর ছিল। এ সম্পর্কে তাঁহার বন্ধু স্বর্গত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একবার

বলিয়াছিলেন : "আমার মতো করে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'তো তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন অনেক দিন গেছে যখন দু তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এগ্রাম সেগ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামে সকলের সঙ্গে মিলেছি, তাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।"—(চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎস্মৃতি : প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৫।)

(কাজেই শ্রেণীবিদ্বেষের যে আবেগ শরৎচন্দ্রের রচনায় লক্ষ্য করা যায় তাহার ভিত্তি কেতাবী বা কাল্পনিক নয়, তাহা তাঁহার আপন জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের বন্ধন হইতে ভারতের মুক্তি কামনা করেন না, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন হইতেই ভারতের মুক্তি চান। সাদা চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়া, ইংরেজের বদলে ভারতবাসী অসহায়দের শোষণ চালাইতে থাকিবে এমন স্বাধীনতা তাঁহার কাম্য নয়।* শরৎচন্দ্র কংগ্রেস সেবক হিসাবে গান্ধীজীর অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হিসাবে (শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সর্বস্ব বিনিময়ে সর্বাগ্রে ফিরাইয়া আনা প্রথম কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের মানুষ যাহাতে হীনতামুক্ত হয়, যাহাতে সকলে পরস্পর সমান বোধ করে, অন্যায় শোষণ যাহাতে বন্ধ হয়,

* "Swaraj for me means the freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from the British yoke, I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever. I have no desire to exchange king log for king stork. (অনাথগোপাল সেনের 'জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি', ১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা-৯ হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎচন্দ্র তজ্জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানাইয়াছেন। একই সঙ্গে বিদেশী রাজশক্তির সহিত এবং শোষণবৃত্তি ও অধিকারলিপ্সার সহিত সংগ্রাম চালাইবার আগ্রহ তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত।) রবীন্দ্রনাথ জাতি হিসাবে ইংরেজ জাতিকে বড় মনে করিতেন, ব্রিটেনের সভ্যতা-সম্পর্কিত মহান্ ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি ইংরেজদের ধিক্কার জানাইয়াছেন ভারতের ন্যায় বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ দেশকে শোষণের স্বার্থে তাহারা যে ছোট করিয়া রাখিবার অপচেষ্টা করে সেইজন্য। শরৎচন্দ্র কিন্তু এই দ্বিমুখী বিচারের মধ্যে না ঢুকিয়া সোজাসুজি ভারতের পরাধীনতার ও পশ্চাৎপদতার কারণ ইংরেজ রাজশক্তিকে ঘৃণা করিয়াছেন এবং এই শোষণকারী শাসনশক্তির পিছনে যাহারা সেই ইংরেজ জাতিকে নিন্দা করিয়াছেন। যে সব ভারতবাসী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া এই ইংরেজের পদলেহন করিত, বলিতে গেলে ইংরেজ রাজত্ব যাহাদের জন্য বহুলাংশে টিকিয়া ছিল, আপন জীবনে ইংরেজকে নকল করিয়া যাহারা গর্ববোধ করিত, শরৎচন্দ্র স্বভাবতঃই তাহাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।* ব্রজদুর্লভ হাজরা নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্বিন, ১৩৩৪ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে লিখিত একটি প্রবন্ধে বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলিতে চাহেন যে সাহিত্য রচনা অর্থোপার্জনের পথ, এদেশে বেকার লোকেরা অন্য কিছু না করিয়া সাহিত্য করে বলিয়া "হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।" শরৎচন্দ্র ইহাতে ক্ষেপিয়া গিয়া সাহিত্যিকের দারিদ্র্য যে তাহার ভূষণ এবং "সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের এত গৌরব"—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহভাজন হাজরা মহাশয়কে তীব্র ভৎর্সনা

*'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শশাঙ্কমোহন সরোজিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। সতীশের তুলনায় শিক্ষায় অন্ততঃ শশাঙ্কমোহন কম নয়। তাহার হীনতা তখনও তেমন কিছু প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু তাহার ইংরেজিয়ানাই তাহাকে লেখক শরৎচন্দ্রের অপ্রীতিভাজন করিয়াছে। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন: "শশাঙ্কমোহনের রঙটা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ,—তিনি বাংলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভুল।"

করিয়া বলেন: "এই ব্যক্তি ডেপুটিগিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং আজীবন গোলামির মোটা পেন্সন ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই।" (শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, ৯ম সম্ভার, 'রস-সেবায়েত' প্রবন্ধ।)

শরৎচন্দ্র মনে করিতেন ইংরেজ বিদেশী রাজশক্তি বলিয়া যে ভারতবাসী জাতীয় মুক্তির কামনা করে তাহার ইংরেজকে ভয় করিলে চলিবে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনা কাপুরুষের কর্ম নয়। যে স্বদেশবাসীর মধ্যে শরৎচন্দ্র এই ভীরুতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি তাহার নিন্দা করিয়াছেন দ্বিধাহীনভাবে। সেইসঙ্গে তিনি ভারতে হীন শাসন চালাইয়া ইংরাজ যে নিজেরাও হীন হইয়া পড়িয়াছে এ জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'চন্দ্রশেখর' নাটকের লরেন্স ফষ্টর নামটি ইংরেজের হওয়ায় ইংরেজ সরকার রাগ করিবেন এই ভয়ে এই নাম পাল্টাইয়া একটি পর্তুগীজ নাম রাখেন; আর একজন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের লেখক পাছে 'মাতৃভূমির মুক্তি' শব্দটিতে সরকার রাজদ্রোহের গন্ধ পান এই ভয়ে শব্দটি বই হইতে বাদ দেন। শরৎচন্দ্র দুইজনকেই ভীরুতার জন্য ধিক্কার জানাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ধিক্কৃত করিয়াছেন সেই শাসনতন্ত্রকে যাহার অধীনে এই হীনতা সম্ভব হয়। শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহের ৯ম সম্ভারে 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র এই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন: "তাহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম—যে রাজ্যের শাসনতন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়,—লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে দেশে মানুষ গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সে দেশের অসত্য সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক্ না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গমঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অকর্মণ্য। সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। ...দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখনও সত্য ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে, রাজসরকারে

তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে; তাই সত্য-বঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনিই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। ‘রুল ব্রিটানিয়া’ গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু ‘আমার দেশ’ আমার দেশে নিষিদ্ধ। ...আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাঁহারা এমনি করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন দেশের নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্যন্ত আজ এমন করিয়া বারিত হইতে পারিত না। অথচ সমস্ত দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্যকারগণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁস বাঁধা। বরং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে, দেশের কবি দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে কাব্য যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে, দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শান্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে একথাও আজ আমাদের মানিয়া লইতে হইতেছে। কিন্তু এই নির্বিচারে মানিয়া চলার লাভ লোকসানের হিসাব-নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। কিন্তু ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে কি ছোট হয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখভোগ সেই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে?”

শরৎচন্দ্র ভারতের ইংরেজ রাজশক্তিকে তীব্র ঘৃণা করিতেন এবং সেই ঘৃণা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার রাজনৈতিক প্রেরণা তাঁহার ছিল। লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি জানিতেন তাঁহার অনেক দেশবাসীর মনে ইংরেজের প্রাধান্য সম্পর্কে এক ধরণের সংস্কার আছে, ইহার উপর যদি তাঁহার কলম হইতে ইংরেজের সদ্‌গুণের প্রশংসা বাহির হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রচেষ্টা বহুলাংশে নিষ্ফল হইতে বাধ্য, কারণ তাহাদের মনে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যে বিরাগ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় আন্দোলনে তাহাদের অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, সে বিরাগ ইহাতে তরল হইয়া যাইবে। এইজন্যই শরৎচন্দ্র ইংরেজদের ভাল দিক লইয়া আলোচনা করেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজশক্তি ও ইংরেজের জাতিগত মহত্বকে পৃথক ভাগে দেখিয়া প্রথমটির নিন্দা ও দ্বিতীয়টির প্রশংসা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববন্দিত আন্তর্জাতিক কবি, স্বদেশের জন্য গভীর বেদনাবোধ

সত্ত্বেও তিনি আপন সত্তা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিয়াছেন তিনি, নিজেকে জাতীয়তাবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য সঙ্কুচিত করিতে চাহেন নাই। শরৎচন্দ্র ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্যিক, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী তরুণেরা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতছাড়া করিতে সর্বস্ব পণ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত শরৎচন্দ্রের আত্মার আত্মীয়তা ছিল। কাজের ক্ষেত্রে তিনি সব সময় তাহাদের সহিত হাতে হাত মিলাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহাদের আরব্ধ মহৎ প্রয়াসে তিনি সর্বদা সহানুভূতি দেখাইতেন এবং সহযোগিতা সীমাবদ্ধ হইলেও আন্তরিক ভাবে তাহাদের সাফল্য কামনা করিতেন। তিনি সাহিত্যিক, লেখনীই তাঁহার তরবারি। হৃদয়বান সামাজিক কথাসাহিত্যিক হিসাবে মানুষের মনের গ্রন্থিমোচন তাঁহার কারবার, এই সামাজিক উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আবেগ প্রকাশের সুযোগ খুবই কম, তবু যখনই পারিয়াছেন শরৎচন্দ্র ইংরেজের বিরুদ্ধে মনের জ্বালা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে নরম হৃদয়ের কথা, ভালবাসার ভাললাগার কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি আছে ইংরেজ রাজশক্তি ও ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রচণ্ড ক্ষোভ।* 'পথের দাবী'তে রেঙ্গুণে ফয়ার

* রেঙ্গুণে চাকরী করিতে গিয়া অপূর্ব একদিন রেলে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটে, কিন্তু পুলিসের ঝামেলায় তাহার রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হয়। ভোরের দিকে রেলগাড়ীতে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে যেন কঠিন ধাক্কায় চমকাইয়া উঠিল। নিজের অপদস্থ হইবার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল অফিসের সহকর্মী রামদাস তলোয়ারকরের কথা, ইংরেজ রাজশক্তির বীভৎস শোষণের কথা। ব্রহ্মদেশ তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই ব্রহ্মের শোষণের কথা ভারতের শোষণেরই কথা। রামদাস ব্রহ্মদেশের এই শোষণের কাহিনীই শুনাইয়াছিলেন "বাবুজি শুধু কেবল শোভা সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি মাতার দেওয়া এতবড় সম্পদও কম দেশে আছে। সে বেশী দিনের কথা নয়, সম্বাদ পাইয়া একদিন ইংরাজ বণিকের লুব্ধ দৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক কামান আসিল, সৈন্য সামন্ত আসিল,

মাঠে সভানেত্রী সুমিত্রা ও বক্তা রামদাস তলোয়ারকর অদম্য আবেগে যে সব কথা বলিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা শরৎচন্দ্রেরই কথা।' সুমিত্রা তাহার অভিভাষণে ইংরেজের শাসনযন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছে; "যে দেশে গভর্ণমেণ্ট মানেই ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা···"। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামদাস তলোয়ারকর আর একধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। সরকারের সাহায্যপুষ্ট সরকারের সগোত্র কারখানার শ্বেতাঙ্গ মালিকদের তলোয়ারকর তীব্র ধিক্কার জানাইয়াছেন। একটু মন দিয়া তলোয়ারকরের কথাগুলি পড়িলে একথাও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তাঁহার ধিক্কার শুধু শ্বেতাঙ্গ মালিকদের পরিমণ্ডলেই সীমায়িত নয়, দেশীয় শোষক মালিকদের দিকেও শাণিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। মাঠে উপস্থিত পুলিস ঘোড়সওয়ারদের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করিয়া রামদাস তলোয়ারকর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায়না যে কেউ তোমাদের দুঃখ দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ তোমরাও যে তাদেরই মত মানুষ, তেমনি পেটভরে খাবার, তেমনি প্রাণখুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ এই সত্যটাই এরা সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাহলে এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু। এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ

লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রাণীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়ায়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায় ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন।"

নেই,—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন শিখ কোন কিছুই নেই, আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।*

*শরৎচন্দ্র শাসক ও শোষক ইংরেজদের কিরূপ ঘৃণা করিতেন, তাঁহার ব্যক্তি-গত জীবনের কিছু কিছু স্পর্শ সম্বলিত শ্রীকান্ত উপন্যাসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস, সেখানে এ ধরণের অনেক কথাই আছে। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' মূলতঃ প্রেমের কাহিনী, তবু সুবিধা পাইলেই শরৎচন্দ্র এই হৃদয়প্রধান উপন্যাসেও আপন রাজনৈতিক ক্ষোভের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে অন্ধকারে বসিয়া সাধু বজ্রানন্দ বাংলার পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য রিক্ততার কথা বলিতেছিল। শ্রোতা শ্রীকান্ত। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মাধ্যমে বিদেশী রাজশক্তি-শোষিত হতভাগ্য গ্রাম-বাংলার বর্ণনা করিলেন: "অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া আর কে নাই জানা গেল না, সবাই শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে এবং এই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই-ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমগ্র সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।"

এই 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বেই কিছু পরে আছে বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজের কলেরায় মৃত্যুর পর শ্রীকান্ত গঙ্গামাটিতে ফিরিতেছে, দুইজন গ্রামবাসী তাহাকে তাহাদের গ্রামে দুপুরে খাইয়া যাইবার জন্য আটকাইল। কথা বলিতে বলিতে তাহারা মন্তব্য করিল "কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না।...দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুঁয়ো নেই, কোথাও এক ফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু বাছুরগুলো জলাভাবে ফড়ফড় করে মরে যায়; কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশ মারা যেতেন? কখ্খনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, হর-রকমের ব্যাধিপীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায়

এই অসহায়, বঞ্চিত, তলার শ্রেণীর মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি তাঁহার অনেকগুলি লেখায় ছড়াইয়া আছে। ইহারা পরিশ্রম করে, কিন্তু শ্রমের ন্যায্যমূল্য পায় না। ইহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইহাদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করিয়া ধনী, জমিদার, কারখানা মালিক, ব্যবসাদাররা আরও ধনী হইয়া উঠে। দেশের সরকারও বিদেশ হইতে মুনাফা লুটিবার জন্য আসিয়াছে, দেশের মাটির সহিত, দেশের মানুষের সহিত তাহাদের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান, ধনবান ও

কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই, ঠিক নয় ?"

এই মন্তব্যের উত্তরে শ্রীকান্তর মুখে কথা জোগাইল না। তাহার মনের প্রতিক্রিয়া হইল নিম্নরূপঃ "আলোচনা করিবার মত গলার জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই, কেবলমাত্র এইজন্যই তেত্রিশ কোটি নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীর শাসনযন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সংকীর্ণ ও বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।"

পরের দৃষ্টান্তটি শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের প্রথম দিকের। শ্রীকান্ত গ্রামের স্টেশনে হঠাৎ বাল্যবন্ধু গহরের দেখা পাইয়া গহরের আগ্রহে তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে। প্রিয় বাল্যবন্ধু, স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ, তদুপরি গহর হৃদয়বান কবি মানুষ, মুসলমান হইয়াও হিন্দুদের পুরাণাদি লইয়া কাব্য রচনা করে। গহরের সহিত গ্রামে প্রবেশ করিয়া গহরকে এবং আপন বহুস্মৃতি-বিজড়িত গ্রামকে ভাল লাগাটাই এখানে বড় কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে শ্রীকান্ত গ্রামের রাস্তার দুর্গতি দেখিয়া যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, তাহার রুক্ষতা পূর্বোক্ত আনন্দকে যেন একেবারে চাপিয়া দিয়াছে। এই রাস্তার মালিক সরকার, সরকার কর আদায় করেন অথচ রাস্তা সারাইতে সরকারের গা নাই, শোষক সরকারকে ধিক্কার জানাইয়াছে শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্র। আর্টের বা শিল্পকলার দিক হইতে এখানে রাস্তা উপলক্ষ্য

বুদ্ধিমান, অথচ যাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, নানারূপ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়া সরকার তাহাদের হাত করে। তাহারা সরকারকে শাসন ও শোষণে সাহায্য করে এবং নিজেরা দেশের অসংখ্য মানুষকে যখন নিষ্করুণভাবে শোষণ করে, তখন সরকারের দিক হইতে প্রজারক্ষায় রাজার কর্তব্য পালিত হয় না, সরকার জানিয়াও না জানিবার ভান করিয়া চুপ করিয়া থাকেন এমনও অনেক সময় হয়, যদি কোনক্রমে অসহায় শোষিত শ্রমিক বা সাধারণ মানুষ ক্ষমতাবান ধনিকের বিরুদ্ধে বা সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে আদালতে আশ্রয় চায়, সেই ন্যায্য প্রার্থনাও পূরণ করা হয় না নানা হীন মিথ্যা অজুহাতে। যাহাদের লইয়া সত্যকার দেশ, দেশের সেই অধিকাংশ মানুষকে এইভাবে জীবনের সম্ভাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। ভাবপ্রবণ হৃদয়বান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যে আবেগ লইয়া সমাজের শোষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই আবেগ লইয়াই তিনি অন্যায়ের জন্য ধনী, মালিক, জমিদার, সর্বোপরি সরকারকে ধিক্কার জানাইয়াছেন। সোজাসুজি মূল কাহিনীর সংশ্লেষ ঘটাইতে না পারিলেও তিনি অনেক সময় সামান্য সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপন মনের ব্যথা ও তিক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, বলিষ্ঠ ভাষায়, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে

করিয়া শ্রীকান্তর মুখ দিয়া লেখকের দীর্ঘ বক্তৃতা উপন্যাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাই, কিন্তু সেজন্য শরৎচন্দ্রের যেন কিছুই আসিয়া যায় না। দেশপ্রেমিক তিনি, দেশের দুর্গতির কথা বলিয়াছেন এবং এই দুর্গতির স্রষ্টা বিদেশী শাসককে নিন্দা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই যেন তাঁহার সান্ত্বনা। এখানে শ্রীকান্ত ভাবিয়াছে :
"তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এ দিনের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু পথকর যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।"

অত্যাচারী শোষকের মুখোস খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টায় কলাশিল্পের বা আর্টের দিক হইতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, কথাশিল্পী হিসাবে এই জন্যই তিনি বেপরোয়া হন নাই, তবু সংযত-ভাবে তাঁহার গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেভাবে আপন রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশের সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে একটু বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যই তিনি যে সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, বক্তব্য সংস্থাপনের পক্ষে সে সুযোগ যথেষ্ট নয়।* 'পথের দাবী' উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চেতনার কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, এই উপন্যাসের হৃদয়প্রধান প্রেমধর্মী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও জাতীয় ভাবাবেগের প্রেরণাতেই শরৎচন্দ্র ইহাকে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাসে রূপায়িত করিয়াছেন। যদিও আগে ব্রহ্মদেশ শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন। কাজেই ব্রহ্মদেশে 'পথের দাবী'র ঘটনাসমূহ ঘটায় বলা চলে যে, ভারতের বাহিরেই ইহার পটভূমিকা, পরিবেশের আনুকূল্য না থাকায় শরৎচন্দ্রের পক্ষে স্বদেশ ও

* শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুরুতে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সহিত স্বগ্রাম হইতে বিদায় লইল, মন তাহার বিষাদ-ভারাক্রান্ত। রাজলক্ষ্মীর আসিবার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহাতে ভবিষ্যতে শ্রীকান্তর গ্রামে আসা কঠিন। শ্রীকান্তর কাছে গ্রামের সব কিছুই আশ্চর্য সুন্দর লাগিতেছে। শ্রীকান্ত পথে যাইতে যাইতে ভাবিতেছে এই পথেই একদিন তাহার পিতামহী, তাহার মা বধূবেশে আসিয়াছিলেন এবং এই পথ দিয়াই তাঁহারা শ্মশানযাত্রা করিয়াছেন। এই আবেগ-মথিত স্মৃতিমন্থনের মাঝখানে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল এবং শিল্পকলার হিসাবে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি এখানে লিখিয়া বসিলেন: "তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে এত পঙ্ক এত বিষ জমিয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।"

স্বদেশবাসীর স্বাধীনতার সংগ্রাম ইহাতে যথাযথ ফুটানো একরূপ অসম্ভব। তবু যেটুকু সুবিধা মিলিয়াছে, শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে দরিদ্র শ্রমিকদের নিষ্করুণ শোষণ এবং বিদেশী ব্রিটিশ রাজশক্তিকে বিতাড়নের জন্য দেশবাসীর সর্বাত্মক সংগ্রামমুখিতাকে আবেগের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সামাজিক সমস্যাপ্রধান উপন্যাস-গল্পে এই ভাবপ্রকাশের সুযোগ কম, তবু শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, বিপ্রদাস, মহেশ প্রভৃতি রচনায় শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার সাক্ষাৎ মিলিবে। এরূপ ক্ষেত্রে, আগেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সব জায়গায় তিনি কাহিনীর সহিত চেতনা প্রকাশের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য হয়তো করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ সামাজিক গল্পের তিনি যাদুকর, এই গল্প যখন স্বাভাবিক পথে জমাট ভাবে অগ্রসর হইতেছে তখন রসসিক্ত পরিবেশে রাজনৈতিক ঘটনার বা মন্তব্য সংস্থাপনের যে কাঠিন্য বা রুক্ষতার চাপ পড়ে তাহাতে গল্পের সুরে অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধাক্কা লাগে এবং বিপরীতাত্মক দুই ভাবের সংযোগ সুষ্ঠু না হওয়ায় রসহানি ঘটে। কোন কোন স্থলে রাজনৈতিক ঘটনা বা মন্তব্য সন্নিবেশ গল্পের সাহত খাপ খাইয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে তাহা না হয়, সেখানেই পাঠকের চোখে শিল্পকলা বা আর্টের দিক হইতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার স্পষ্টতা ধরা পড়ে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হইতে এইরূপ একাধিক দৃষ্টান্ত আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে 'শেষ প্রশ্ন' হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইল। ('শেষ প্রশ্ন'-এ শিবনাথ বন্ধুর বিধবাকে ঠকাইয়াছে, বন্ধুর পাথরের ব্যবসা হইতে তাহার বিধবাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই মালিক হইয়া বসিয়াছে। ইহা অন্যায় কার্য এবং শিবনাথের, এমনকি কমলের চরিত্র বিন্যাসে এই ঘটনাটির কিছু গুরুত্ব আছে। ঘটনাটি উল্লেখ মাত্রেই শেষ প্রশ্ন উপন্যাসের কাজ চলিয়া যাইত। শরৎচন্দ্র কিন্তু এই উপলক্ষে দুর্নীতিপূর্ণ বিদেশী শাসনযন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ ছাড়িলেন না। শাসনযন্ত্র অসহায়া বিধবার সম্পত্তি সংরক্ষণে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা শুধু তাহার অক্ষমতা নয়; এ সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষমতা তাহার ছিল, ইহা দুর্নীতিপরায়ণতার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। অবিনাশ যখন কথাটা উত্থাপন করিলেন, আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আদালতই বা তাকে ডিক্রি দিলে কি কোরে? তারা কি কিছু বিচার করে দেখেনি?" অবিনাশের মুখে শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই জবাব বসাইলেন: "ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত

জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?" আশুবাবু নিরীহ ভদ্রলোক, তাছাড়া তাঁহার পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষাগত অসুবিধা আছে, তিনি অবিনাশের ঐ কথায় আমতা আমতা করিয়া "না, না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়,—তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন—"—বলিয়া দুকূল রাখিবার যে চেষ্টা করিলেন, তাহাতে যেন শরৎচন্দ্রের মন উঠিল না, তিনি ঘটনাস্থলে আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে হঠাৎ উপস্থিত করাইয়া শুধু ইংরেজ সরকারের হীনতাই প্রতিষ্ঠিত করিলেন না,হয়তো কিছু না ভাবিয়াই কন্যার দ্বারা পিতার চিন্তা ও বাক্যের অসামঞ্জস্য ইঙ্গিত করাইয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোককে অপ্রস্তুত করিলেন। আশুবাবুর কন্যা মনোরমা হঠাৎ উপরোক্ত আলোচনাস্থলে আসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "জানেন সবই বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জানো অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেন না।"

—বলা বাহুল্য, আপন কন্যার এই স্পষ্টোক্তির পর আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগায় নাই।*

অসহায়, বঞ্চিত, শোষিতদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়াই

* ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের ঘৃণার তীব্রতা তৎকালীন লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সহিত সংযুক্ত অমল হোমকে বাজে শিবপুর, হাওড়া হইতে ১৬।৮।১৯১৯ তারিখে লেখা তাঁহার নিম্নোক্ত পত্রাংশ হইতেও উপলব্ধি করা যাইবে। চিঠিখানি তিনি লিখিয়াছিলেন পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর। শাসক শক্তির বর্বর এই তাণ্ডবে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ তখন ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। লাহোরের পথে পথে ইংরেজ সেনার অবিরাম অত্যাচার চলিতেছে, অমল হোম তাহার প্রত্যক্ষদর্শী। শরৎচন্দ্র অমলবাবুকে লিখিলেন: "ভারতীর আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরাজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভালো করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯০)

বোধহয় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার 'কালের যাত্রা' নাটিকাখানি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির আকার ক্ষুদ্র বলিয়া ইহা শরৎচন্দ্রের অন্ধ-অনুরাগীদের, বিশেষ করিয়া ইহাদের মধ্যে যাঁহারা 'পথের দাবী' উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মন-কষাকষিতে সোজাসুজি শরৎচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের, পুরোপুরি সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের সহিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মিল থাকায় কবিগুরুর উপহারের বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসর্গের কথা জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জনদরদী শরৎচন্দ্র কবিগুরুর আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন: "'কালের যাত্রা' নামে একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই দড়ি টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল বিশেষভাবে যাদের পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদের আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

(বাস্তবিক এই মহাকালের অচল রথকে সচল করিবার জন্য শরৎচন্দ্র জীবনব্যাপী লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহার ভুল ভ্রান্তি, শিক্ষার সীমা প্রভৃতির জন্য দোষ ত্রুটি বাদ দিলে সাধারণ অবজ্ঞাত সমাজের সংখ্যাগুরু মানুষকে বড় করিয়া তুলিবার আন্তরিক আগ্রহ, তাহাদের দুঃখে অকৃত্রিম সমবেদনা ও সেই দুঃখ ঘুচাইবার আকাঙ্ক্ষা শরৎসাহিত্যে বহু স্থানেই দেখা যায়। সমাজে অবহেলিত হইয়া যাহারা বিকাশ লাভের সুযোগ না পাইয়া পিছাইয়া পড়ে, যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা যাহারা প্রায় বিনা দোষেই হারায়, জোর করিয়া নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইবার শক্তি ও সাহস

যাহাদের নাই, শরৎচন্দ্র সেইসব হতভাগ্যকে প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান অবস্থা এই দাবী আদায়ের অনুকূল নয়, কোন্ পথে চলিলে ইহারা সেই মর্যাদা লাভ করিবে তাহাও শরৎচন্দ্রের ধারণায় স্পষ্ট নয়, তবু তাহারা যে অবস্থায় আছে তাহা যে তাহাদের যোগ্য নয় এবং এই ক্লেদাক্ত পরিবেশ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা যে তাহাদের অন্তর-ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে, শরৎচন্দ্র এই আশার বাণী রাখিয়াছেন। ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সময় বিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তিনি এমন করিয়া ইহাদের চরিত্রের লুকানো উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, এমন স্পষ্টতা ও দরদের সহিত শক্তিমানের দম্ভ ও লোভের ছবি আঁকিয়াছেন, যাহাতে পাঠক সাধারণের সহানুভূতি ও আগ্রহ ইহাদের উপর গিয়া পড়ে। এইভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাঠক-মানসে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অবশ্যই শক্তিশালী ন্যায়াকাঙ্ক্ষী এমন এক জনমত গঠনের আশা করিয়াছেন যে জনমত ভবিষ্যতে দুর্নীতি ও দুর্গতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার হাতিয়ার হইবে। রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব সময় হয়ত সমান হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের আলোচ্য ভাবদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রসন্ন আশীর্বাদে শরৎচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, 'কালের যাত্রা' নাটিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু জাতীয় পুনর্গঠনের নিরিখে ইহার মর্মবাণী ক্ষুদ্র নয়। বস্তুতঃ যাহারা সংখ্যায় অধিক হইয়াও সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অব্যবস্থায় পিছনে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়, বিনাদোষে লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম দেশের মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই মহান্ তত্ত্বের উদ্গাতা শরৎচন্দ্রকে তাঁহার স্বদেশবাসীও বারবার অভিনন্দন জানাইয়াছে। তাঁহার ৫৭তম জন্মদিনে (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) কলিকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত এমনি এক অভিনন্দন সভায় প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত ভাষণাংশে তাঁহার আলোচ্য অন্তর-প্রেরণা, তাঁহার সাহিত্য-কৃতির বিচিত্র পরিমণ্ডলের সঙ্গতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে: "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই

—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি দেখেছি কত অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতি-জাতি-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কি যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।"

শরৎচন্দ্র যে তাঁহার গল্প উপন্যাসে মেয়েদের কথা বেশি করিয়া বলিয়াছেন, মেয়েদের দুরবস্থা বেশি করিয়া ফুটাইয়াছেন, এবং মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বেশি করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, ইহার পিছনেও উপরোক্ত মনোভাব নিঃসন্দেহে কাজ করিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজে মেয়েদের অপরিসীম দুর্গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার সময় স্বাতন্ত্র্য বা মানমর্যাদা বঞ্চিত হইয়াই অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়েকে দুঃখের জীবন কাটাইতে হইত। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষেরা এদেশে নারীজাতির পশ্চাৎপদতার কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এদিক হইতে বিশেষ কিছু সুফল দেখা যায় নাই। মেয়েরা সমাজের অর্ধেক, মেয়েদের উন্নতি না হইলে সমাজের সত্যকার উন্নতি হইতেই পারে না। শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ-প্রাধান্যের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়, কিছুটা বাস্তব অসুবিধার চাপে, কিছুটা কায়েমী স্বার্থের জন্য বহুদিনে এই অবস্থা হইয়াছে। মেয়েদের অন্তঃপুরের প্রাচীরান্তরালে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে বন্দী করিয়া রাখিয়া সমাজ তাহাদের কতকগুলি বাঁধা-ধরা ভুয়া মর্যাদা-সূচক স্তোকবাক্য শোনায়, অভ্যস্ত হীনজীবনের ফলে হীনমন্যতায় অভিশপ্ত নারীজাতি তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেদের প্রচলিত জীবন মানিয়া লয়।

এ জীবনে যে অসম্মান জমিয়া আছে সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে কদাচিৎ। কুসংস্কার হইতে, অজ্ঞানতা হইতে, পরনির্ভরতার বাধ্যবাধকতা হইতে তাহাদের মুক্তি দিতেই হইবে, অথচ সেজন্য সমাজের গরজ নাই। শরৎচন্দ্র এজন্য গভীর ব্যথাবোধ করিয়াছেন। মেয়েরা আগে মানুষ, তারপর মেয়েমানুষ,—এই সত্যের উপর শরৎচন্দ্র জোর দিয়াছেন। এইজন্যই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর মানুষ হিসাবে বাঁচিবার দাবীকে নিষ্ঠুরভাবে দাবাইয়া দিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ('স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না,—ইহা শরৎচন্দ্রের বাণী। যে মানুষ অভাবে, অশিক্ষায়, স্বাস্থ্যহীনতায় সমাজে ছোট হইয়া থাকে, তাহার এই ক্ষুদ্রত্বের জন্য সে নিজে যতটা দায়ী, সমাজের দায়িত্ব সে তুলনায় অবশ্যই কম নয়। সমাজ প্রতিকূল না হইয়া একটু অনুকূল হইলেই স্বাভাবিক বিকাশলাভের যোগ্যতায় ও আকাঙ্ক্ষায় সে আপন সত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে এবং সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকাশলাভের চেষ্টা করিতে পারে। মেয়েদের চলমান জগৎ হইতে বঞ্চিত করিয়া, বন্দী করিয়া মুখে তাহাদের দেবী পর্যায়ভুক্ত করায়, তাহার সেই দেবীত্বের বন্দনা করায় নারীসত্তার বিকাশের দিক হইতে কোন লাভ নাই। এইভাবে যে মর্যাদা সে পায়, তাহাতে আফিংয়ের নেশার মত তাহার জড়তা জন্মায়। মনুষ্যত্বের রুদ্ধগতি, বন্দিত্বের বেদনা সে অনুভব করে না। সমাজের বৃহৎ অংশ নারী সম্পর্কে মুখে বড় বড় কথা বলিয়া সে কথার বিপরীত আচরণ প্রগতিধর্মিতা নয় বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিতেন। শরৎচন্দ্রের ধারণা জন্মিয়াছিল নারীজাতির এই মুক্তির স্বপ্ন তিনি তাঁহার গল্প-উপন্যাসের ভিতর দিয়া জনসমাজে পৌঁছাইয়া দিলে পরিবর্তনের একটা আবেগ জনমানসে দেখা যাইবে। ইংলণ্ডে যেদিন মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইল, সেইদিন হইতে মানুষের সমস্যা-চিত্র উপন্যাসের সিংহদ্বার খুলিয়া গেল, এই ধরণের একটা কথা প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ বিশদভাবে আলোচনা না করিলেও চলিবে। মেয়েদের সমস্যা মানুষেরই সমস্যা এবং শারীরিক গঠনের বৈচিত্র্যে ও প্রবর্তিত সামাজিক বিধিব্যবস্থার চাপে মেয়েদের সমস্যাও যে অনেক, তাহা সবাই জানেন। কাজেই মেয়েরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমস্যা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই

অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিবে এবং সেই সমস্যার নিরিখে তাহাদের জীবনায়নের রূপান্তর ঘটিবে, ইহাও স্বাভাবিক। এইভাবে নারী-চরিত্র আত্মস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও গতিশীল হইয়া উঠিবার ফলে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে তাহারা সরাসরি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উপন্যাস গণতান্ত্রিক আধুনিক সাহিত্য, এই সংজ্ঞা নারী-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে অনুরূপ কিছুটা ধারণা চালু হইয়াছে, কিন্তু শরৎসাহিত্যে ইহা স্পর্শনক্ষম বাস্তবরূপ পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে নারীর আলোচ্য স্বাতন্ত্র্যবোধ যতটা ফুটিয়াছে, তদপেক্ষা বেশি যে তাহা শরৎ-চেতনায় স্পন্দিত হইয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের লেখা প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে উপলব্ধি করা যায়। শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের আবেগে ও প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় বাঙ্গালীর মনোজগতেও একটা উলটপালটের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। পুরাতন মূল্যবোধের পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময় সমাজে অসম্মানিত অবহেলিত নারীর চিত্র যদি তাঁহার গল্প-উপন্যাসে সঙ্গতি-সুযোগ অনুযায়ী যথাযথ ভাবে মহিমাদীপ্ত করিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে এদেশের নারী-সমাজের কল্যাণ হইবে। নারীর উন্নতি দেশের উন্নতি, নারীর অনুন্নতি দেশের অধঃপতন, ইহা শরৎচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "আমার জীবনের অনেক দিন আমি Sociology-র পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে।"* নারীদের জীবনের বঞ্চিত রূপ, ন্যায্য অধিকার এবং আপেক্ষিক

*এই 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধেই শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন: "আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গেছে। আমার বিশ্বাস একজনও ভারতবাসী নেই যে, এই মহান্ পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট গৌরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়।..... এইখানে একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চির-

গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই পুরুষদের তুলনায় সমগ্রভাবে শরৎসাহিত্যে মেয়েদের অপেক্ষাকৃত গতিশীল করিয়া আঁকা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় নারীর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী নারীর সমকালীন জীবন পর্যালোচনা করিয়া এবং সে জীবনের সুযোগ-সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার বহু-প্রশংসিত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, নবম সম্ভার) লিখিয়াছেন। মেয়েদের সাধ্বীত্বের পুণ্য-পবিত্রতার নামে সহমরণে পুড়াইয়া মারা, মেয়েদের হীনমন্যতা, স্বামীর তুষ্টির জন্য আত্ম-অসম্মান সম্পর্কে চেতনাহীনতা এইরূপ যে সব প্রচলিত রীতি বা ধারণার ফলে আমাদের দেশে নারীজাতি মাথা তুলিতে পারে নাই, শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে সেগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে একস্থানে তিনি নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন: "লেকি সাহেব লিখিয়াছেন, এই প্রথা ইংরাজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিত সমাজ চেঁচামেচি করিয়া, সভাসমিতি করিয়া রাজা-রাজড়ার নিকট চাঁদা তুলিয়া বিলাত পর্যন্ত আপিল করিয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল, এ প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে হিন্দুধর্ম বনিয়াদ সমেত বসিয়া হিন্দু একেবারে ধর্মচ্যুত হইয়া যাইবে। নারীপূজা বটে!"

জীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও।······আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মেয়েমানুষ হয় এবং স্বাধীনতায় ধর্মে ও জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী স্বীকার করি ত এ দাবী আমাদের মঞ্জুর করতেই হবে; তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছোক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, ওখানে যেতে নেই, তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এসো তোমার হিতের জন্যে তোমার মুখে পর্দা ও পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশি চলা ফেরা করা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর নয়।"

ভোটের উপর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তিনি নারীকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিবার কথাই জোর করিয়া বলিয়াছেন। দেশকে বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে যে কোন উপায়ে মুক্ত করিতে হইবে, সেই সঙ্গে দেশবাসীর অর্ধেক নারী-সমাজের স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ়তার ও নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করা দরকার। দেশের স্বাধীনতার সহিত দেশের মানুষের স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত, এবং দেশের মানুষের স্বাধীনতা নারীসমাজের স্বাধীনতা না হইলে কি করিয়া সম্ভব হইবে? স্বামী মাত্রেই নারীর কাছে পূজনীয় কি না, 'পতি দেবতা' শব্দটি মেয়েদের সর্ব ক্ষেত্রে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ কি না, এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করিয়া আমাদের মেয়েদের অন্তরের স্বামী-সংস্কারকে স্বীকার করিয়া লইয়াও নিছক বিবাহানুষ্ঠানের জোরে পাওয়া স্বামিত্বের অধিকারের চেয়ে শরৎচন্দ্র স্বামীর গৌরবকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন পূজার্হা বলিয়া মেয়েদের পদে পদে অসম্মান করা হয়,, পুরুষদের এ ব্যবহার হাস্যকর ও দুঃখজনক। তাঁহার মতে মেয়েদের সত্তাকে স্বীকার করাই বড় কথা, তাহাদের পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। পুরুষ আপন সম্পত্তি মনে করিয়া মেয়েদের পবিত্রতা রক্ষার ভ্রান্ত দায়িত্ববোধে তাহাদের যে প্রতি পদে অপমান করে, সেই অসম্মানের লাঞ্ছনা হইতে মেয়েদের মুক্তি দিতে হইবে। শরৎচন্দ্র উল্লিখিত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশে মেয়েদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মোহতেই সতীদাহ, এইজন্যই কোথাও কোথাও মেয়ে জন্মাইলে তাহাকে হত্যা পর্যন্ত করার ব্যবস্থা। তিনি বলিয়াছেন যে, আসলে এই ধারণা পুরুষের মালিকানা-মনোভাব-জাত। 'নারীর মূল্য'-এ আছে: "সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে বা কন্যা হত্যা করিলে নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান নির্ভরও করে না। করে, পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু! তাই নিজের কন্যা বধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা! নিজেদের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহাগৌরব! এইজন্য এক পুরুষের বহু স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন।"

মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচাইবার জন্য পৃথিবীতে বহুবার বহু বিপ্লব

ঘটিয়াছে। নারী পুরুষের অন্যায্য পার্থক্য ঘুচাইবার জন্যও সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন। সমাজের প্রতারণার প্রতিবাদ, পুরুষের কাপুরুষোচিত শোষণের প্রতিবাদ, নিজের অন্তরের ঘুমন্ত দেবতাকে জাগাইয়া তুলিয়া আপন শক্তিতে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া, ইহা মোটেই অন্যায় নয়। শরৎচন্দ্র নারীজাতির মুক্তিকামী, তাঁহার রাজনৈতিক চেতনাজাত একান্ত আগ্রহ নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন, পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের হাতে হাত রাখিয়া নারী যদি জীবনের কঠোর কর্তব্যপথে নামিয়া আসে, তাহার মহৎ মানসবৃত্তির সহিত যদি মহৎ প্রেরণার সমন্বয় হয়, এই নবশক্তির সহায়তায় দেশের চেহারা পাল্‌টাইয়া যাইবে। আমাদের মেয়েদের কল্যাণরূপ সম্বন্ধে, তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন বলিয়াই যখনই সুযোগ মিলিয়াছে তিনি নারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

মোট কথা, শরৎচন্দ্র শক্তিমান, বিত্তশালী শোষকদের ঘৃণা করিয়া বিপরীতে অসহায় দরিদ্র শোষিতদের ভালবাসিতেন। অন্যায় সুযোগলব্ধ ক্ষমতা শোষণকার্যে সহায়তা করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। 'সকল মানুষ জন্মগত অধিকারে সমান'—এই নীতিবাক্যে শরৎচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল, তাই সকলকে মানুষের মত বাঁচিবার সমান সুযোগ দিতে তিনি সর্বসময়ই উৎসাহী ছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, তাঁহার সাহিত্যে শোষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দুঃখ যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন করিয়া মেয়েদের, এমন কি পদস্খলিতা পতিতা মেয়েদের দুঃখ দেখাইয়াছেন, তেমনি করিয়া আবার শোষিত-নিপীড়িতদের মহৎ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিয়া তাহাদের হীনমন্যতা দূর করিতে এবং জনমানসে তাহাদের সম্পর্কে হীন ধারণার পরিবর্তে তাহাদের মহৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশার ভাব জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।* গ্রামের অবহেলিত মুসলমানরাও

*দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত শরৎচন্দ্র বরিশালে যাইতেছেন। রাত্রে স্টীমারের ডেকে বসিয়া দেশবন্ধু বলিলেন: "ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে পাঁচ-কোটি লোকও যদি সুতা কাটে, তাহলে ষাটকোটি টাকার সুতা হতে পারে।"

শরৎচন্দ্রের কথাটা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হইল। তিনি আরও বাস্তব দৃষ্টিতে সমস্যার দিকে তাকাইতে অনুরোধ করিয়া দেশবন্ধুকে বলিলেন: "তা পারে। দশলক্ষ লোক একসঙ্গে হাত লাগালে একদিনেই একটা

তাঁহার সহানুভূতি পাইয়াছে। রাজনীতির হিসাবে অনেক মুসলমান নেতার চালচলন তিনি পছন্দ করিতেন না, মুসলমানদের মধ্যে অনেকের অকারণ হিন্দুবিদ্বেষ ও তদানুষঙ্গিক ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া আপন স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা তাঁহাকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে, কিন্তু তবু দরিদ্র, পশ্চাৎপদ শোষিত মুসলমানেরা এ দেশেরই সন্তান, তাহাদের উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি নাই, এই ধারণাও শরৎচন্দ্রের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই জন্যই মাতৃভূমির মুক্তিকামী শরৎচন্দ্র মুসলমান নেতাদের রাজনৈতিক গোলমালের সুযোগে নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির ফন্দিতে অত্যন্ত বেদনাবোধ করিতেন। 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধে (শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ, অষ্টম সম্ভার) তাঁহাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অসহযোগিতায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায়। মুসলমান যদি তুরস্ক আরবের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এড়াইয়া যায়, তাহা জাতির পক্ষে মর্মান্তিক। কিন্তু তবু স্বাধীনতা আন্দোলন চলিবেই এবং মুসলমান ভাইরা আগাইয়া না আসিলে হিন্দুদেরই সে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। কিন্তু এই ক্ষোভ সত্ত্বেও অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শরৎচন্দ্র অকৃত্রিম দরদ দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে দেখা যায়, নায়ক রমেশ স্বগ্রাম হিন্দুপ্রধান কুঁয়াপুর ছাড়িয়া মুসলমান-প্রধান পীরপুর গ্রামে জনসেবার কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছে। 'পল্লীসমাজ'-এ একাধিক স্থানে হিন্দুদের দলাদলি, স্বার্থপরতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতার বিপরীতে মুসলমানদের একতা, নিষ্ঠা ও আদর্শবোধের তুলনামূলক সুখ্যাতিই করা হইয়াছে। আকবর সর্দার জমিদার বেণী ঘোষালের লোক, সে দাঙ্গায় রমেশের লাঠির ঘায়ে জখম হইয়াছে। কিন্তু বেণী যখন তাহাকে রমেশের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যাইতে বলিয়াছে, সে ফরিয়াদী হইয়া রমেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে রাজী হয় নাই। বেণী রাগিয়া

বাড়ী তোলা যেতে পারে। কিন্তু মানুষগুলোকে এক করতে হবে। নমশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের সসম্মানে কোলে টেনে নিন, মেয়েদের ওপর অন্যায় নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটান—তাহলে আর লোকের অভাব হবে না।" (নন্দদুলাল চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্রিকা, ১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৫২ হইতে উদ্ধৃত।)

তাহাকে যখন 'বেইমান' বলিয়া গালি দিয়া উঠিল, আত্মসম্মান আহত হওয়ায় আকবর সর্দার সঙ্গে সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইল। কর্কশ কণ্ঠে বেণীকে আকবর বলিল, "খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে সব সইতে পারি ও পারিনা।" পীরপুরে মুসলমানদের মধ্যে কাজ করিতে আসিয়া রমেশ স্বগ্রাম-বাসী হিন্দুদের তুলনায় ইহাদের মহত্ব কিরূপ অনুভব করিয়াছে উপন্যাসের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিই তাহার প্রমাণঃ "ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল কুঁয়াপুরের হিন্দু-প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না; করিলে তাহারা প্রতি হাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচার ফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক্ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতা আনয়নের ব্যাপারে যতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, রাজনৈতিক মর্যাদাবোধের প্রচার ও প্রবর্তনে তিনি ততটা উৎসাহিত হন নাই। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, ইহাদের আদর্শগত পার্থক্য, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে এই সব মতবাদের প্রয়োগ-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে শরৎচন্দ্র খুবই কম মাথা ঘামাইয়াছেন। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ হিসাবে তাঁহার অবদান সামান্যই, যদিও কর্মী হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা আসুক, দেশের মানুষ দুঃখবরণ করিয়া মাতৃভূমির মুক্তি আনুক, বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা ও কলঙ্ক হইতে দেশ মুক্তি পাক, শরৎচন্দ্র এই দিক হইতেই পাঠকদের প্রেরণা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে শরৎচন্দ্র কেতাবী রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে আশানুরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু হৃদয়-প্রধান সাহিত্যকৃতির ভিতর দিয়াও তিনি সুযোগ পাইলেই জাতির মুক্তি-

কামনার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, মানুষের মধ্যে শোষণগত বিভেদ দূরীকরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মন উত্তেজিত করিয়াছে, পরাধীনতার গ্লানি তাঁহাকে অবিরাম পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতা এবং অনেক মানুষের হীনমন্যতা ও অসহায়তা মানবসমাজে কৃত্রিম ভেদসৃষ্টি করিয়া যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছে শরৎচন্দ্র তাহার মূলোৎপাটন চাহিয়াছেন। তিনি দেশের মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ, নরনারীর মর্যাদা ও সামাজিক অধিকারগত বিভেদ, এবং যে ত্রুটিপূর্ণ বিধি-ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এইসব বিভেদ সম্ভব হইয়াছে তাহা সংশোধনের জন্যও তিনি সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহার গল্প-উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শ খুবই উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছে। তবে, আগেই যেকথা উল্লিখিত হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম দেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দুর্গত শোষিত দেশবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় রূপায়িত হইলেও এদিক হইতে তাঁহার নিজের মত ও পথকে চিহ্নিত করিয়া তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় জ্ঞাপনের সহিত অন্যান্য রাজনৈতিক মত ও পথের হিসাবে ইহার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ এক করিয়া দেখাও যায় না। এ ছাড়া শরৎসাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা পথচারিতার মধ্যে যতটা কেন্দ্রান্বিত, ততটা পরিণতির পরিচায়কও হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে আবেগের স্থান যতটা, চিন্তার স্থান ততটা নয়; হৃদয়ের স্থান যতটা, মস্তিষ্কের স্থান ততটা নয়। ইহাতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-সৃষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন এই চেতনাকে বিশিষ্ট রূপ দেয় নাই। কোন প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথেরও যোগ ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক তত্ত্ববোধ শরৎচন্দ্রের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।* রবীন্দ্রনাথ

* রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত ধনী কর্তৃক দরিদ্র-শোষণ আঁকেন নাই, কিন্তু তিনি যে দরিদ্র-অসহায় শোষিতদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য চাহিতেন তাহা তাঁহার বহু লেখায় দেখা যায়। শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া 'কালের

শরৎচন্দ্রের ন্যায় কোন রাজনৈতিক দলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন নাই, স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক বলিতে যাহা বুঝায়, সেই সক্রিয়তা তিনি দেখান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের তুলনায় রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশে সক্রিয়তাও যেমন কম দেখাইয়াছেন এই চেতনার জন্য শরৎচন্দ্রের তুলনায় হৈচৈও তিনি কম করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কাজ ভালই করিয়াছেন, কিন্তু মতভেদের জন্য সে পদ যখন ছাড়িয়াছেন তজ্জন্য বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে তিনি নিজেকে সকলের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টাও কম করেন নাই। গোবিন্দপুর গ্রামের জলকর লইয়া বিরোধে তিনি ইংরাজের বিপক্ষে গ্রামবাসীর হইয়া দাঁড়াইয়া গ্রামবাসীকে জিতাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই কৃতিত্বের কথা সাড়ম্বরে বন্ধুদের জানাইতে তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। তিনি হাওড়া পশুক্লেশ নিবারণী সংস্থার সভাপতি ছিলেন, সভাপতি হিসাবে কাজও হয়ত তিনি ভালই করিয়াছেন, কিন্তু সেই পদের কথা, পদের দায়িত্বের কথা এবং তাঁহার অন্য কাজের সময় এই পদ কিভাবে কাড়িয়া লয় সে কথা তিনি চিঠিপত্রে বন্ধুদের কাছে সালঙ্কারে জানাইয়াছেন। বাংলা কংগ্রেসের দলগত বিরোধে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন, এই দলাদলিতে

যাত্রা' নাটিকাখানিই তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ভারতীয় ঐতিহ্যের স্থান ছিল পুরোভাগে। যে ইংরেজ রাজশক্তি ভারতে ক্ষমতার ব্যভিচার চালায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন, কিন্তু রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নৈতিক উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের জাতীয় মহত্ত্বকে কখনও ছোট করিয়া দেখেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত ইংরেজদের সামগ্রিক বিরোধিতা করেন নাই, বরং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ইংরেজের তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় হইলে ভারতের প্রগতি ত্বরান্বিত হইবে এবং অধিক কল্যাণ হইবে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র যেমন মনে করিয়াছেন ইংরেজদের তাড়ানোই স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পথের ন্যায় অন্যায়কে তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লক্ষ্য বড় বলিয়াই তাঁহার বিবেচনায় নিন্দনীয় পথকে সমর্থন করেন নাই।

নেতৃস্থানীয় পদাধিকারী ও বড় সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার ভূমিকা অবশ্যই কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু দলাদলির সঙ্গে বিজড়িত গোলমালে তিনি যে কিরূপ জড়াইয়া পড়িয়া কতখানি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার পত্রাদিতে প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়-সেবার চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। তিনি রাজনৈতিক কর্মী, একটা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির মত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত, জেলে যাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, কারাবরণ তৎকালীন কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের নীতিগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র জেলে তো যানই নাই, জেলে যাওয়ার নিরর্থকতা লইয়া এই সংগ্রাম মুহূর্তে তর্কবিতর্কের মধ্যে তিনি ঢুকিয়াছেন। 'পথের দাবী'তে তিনি ইংরেজ সরকারের চূড়ান্ত বিরুদ্ধতা করিলেন, অথচ 'পথের দাবী' সরকার কর্তৃক যখন বাজেয়াপ্ত হইল রবীন্দ্রনাথকে তিনি ধরিয়া বসিলেন সরকারের এ কার্যের প্রতিবাদ করিতে। রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রামী মনোভাব লইয়া লেখার এই পরিণতি তাঁহাকে সহজভাবে লইতে বলিলেন তখন অভিমানবশে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর চটিয়া গেলেন। তাঁহার রবীন্দ্রনাথের উপর এই রাগ শুধু রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই শেষ হইল না, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় নানাভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের এই নিষ্ঠুরতা প্রচার করিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক সংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের সময় দেশের সঙ্কটকালে দেশবাসীকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, আবার ক্লান্তি বোধ করিয়া রাজনীতির আসর হইতে শান্ত ভাবেই সরিয়া গিয়াছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির মহান্ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা মনে অটুট রাখিয়াও ভারতশাসক ইংরেজ আমলাতন্ত্রের দেওয়া 'স্যার' উপাধি অনায়াসে ত্যাগ করিলেন।* বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখিয়াছিলেন,

* এই শোচনীয় ঘটনার যোগসূত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনে সি. এফ. এ্যাণ্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার এক মহান্ দলিল : "Let us forget the Punjab affairs but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order. Do not mind the waves of the sea but mind the leaks in your vessel···when non-co-operation comes naturally as our final moral protest against the unnaturalness of our political situation, then it

এজন্য জেলে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 'সভ্যতার সঙ্কট' লেখার সময় বা তাহার পরে জেলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে চিন্তার বিষয় হয় নাই। 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হইবার পর শরৎচন্দ্রের মনে হইয়াছিল হয়ত তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে, সেইজন্য জেলে আফিং পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি আফিংয়ের প্রচণ্ড নেশা সংযত করিয়া আফিং ছাড়িবার অভ্যাস করিতে গিয়া কঠিন অসুখ বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র চেয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'চার অধ্যায়' অনেক নরম লেখা একথা সবাই মানিবেন। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ধারণার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে এবং নিজস্ব গোষ্ঠী বা 'স্কুল' গড়িয়া তুলিবার মত মতবাদ না রাখিলেও রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মর্যাদার দাবী অনেক বেশী।

মোটের উপর, প্রতি দেশের স্বাধীনতায় এবং প্রত্যেক মানুষের জন্মগত সমতায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই বিশ্বাস ছিল এবং সেজন্য দুজনেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে ছিলেন একান্তভাবে জাতীয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ছিলেন বহুলাংশে আন্তর্জাতিক। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সমতার ভিত্তিতে 'এক পৃথিবী' গঠনের আশা আন্তরিকভাবে মনে মনে পোষণ করিতেন। শরৎচন্দ্রে এইরূপ ভাবনার গভীরতা বা বৈশিষ্ট্য ছিল না, বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ধারণা অনুযায়ী তিনি শোষকের সহিত শোষিতের, সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদীর সহিত অসহায় সাধারণ মানুষের, শক্তিমান জাতির সহিত শক্তিহীন জাতির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং মানুষের চিন্তায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন না হইলে শুধু নীতিবাদী কথায় বা ভাবসিঞ্চনে অবস্থার উন্নতি হইবে না এইরূপ মনে করিতেন। ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হউক বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হউক, যাহারা অন্যায় করে, শক্তির দম্ভে যাহারা অন্যকে পীড়ন করে, তাহাদের তীব্র ঘৃণা

will be glorious, because true ; but when it is only another form of begging, then let us reject it.

...It is criminal to turn moral force into a blind force." (Sachin Sen: Political Philosophy of Rabindranath, 1st Edition, pages—48-49)

করার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে মিল যথেষ্ট, কিভাবে এই অন্যায়ের অবসান ঘটিবে তাহার পথ নির্দেশ দুজনের কেহই সুস্পষ্ট ভাবে করিতে পারেন নাই, তবু দুজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ যখন আশাবাদের বশবর্তী হইয়া নিপীড়িতের মুক্তির জন্য উদার আশ্বাস রাখিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তখন রূঢ় বাস্তবের কঠিন ছবি আঁকিয়া পাঠককে সমস্যার জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে সচেতন করিবার উপরই অধিক জোর দিয়াছেন, মুক্তির সাধু-আশ্বাস তাঁহার মুখ হইতে বড় একটা বাহির হয় নাই। রাজনৈতিক পটভূমিকায় নরম হৃদয়াবেগের সংশ্লেষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে এই নরম হৃদয়বোধকে রাজনৈতিক পটভূমিকার শেষ বিন্দুতে পর্যন্ত প্রস্তুত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, শরৎচন্দ্র সেখানে অনুরূপ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পটভূমিকার উন্মাদনা নরম হৃদয়বোধের প্রশ্রয়ে স্তিমিত হইতে দেন নাই, হৃদয়বোধের প্রশ্রয় যাহা দিবার তাহা আগেই দিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'চার অধ্যায়ে'র সহিত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র শেষ দৃশ্যের তুলনা করিলে কথাটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শরৎচন্দ্র হৃদয়বান গল্পকার, মানুষের মনের রঙই তাঁহার সাহিত্য-চিত্রের শ্রেষ্ঠ উপচার, সে হিসাবে নরম হৃদয়ভাবকে শরৎচন্দ্র অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতেই পারেন না। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক রচনার ক্ষেত্রে সংগ্রামের রুক্ষ কাঠিন্যকে হৃদয়াবেগের ঘনিষ্ঠ সংশ্লেষে আনিয়াও তাহা দ্রবীভূত হইতে দেন নাই। এই কারণেই সব্যসাচী অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়া অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতা পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে, 'পথের দাবী'র নেতার ক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ড দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। 'গোরা'র শেষে গোরা আনন্দময়ীর পদতলে লুটাইয়াছে, 'চার অধ্যায়ে'র শেষে অতীন এলাকে বুকে টানিয়া লইয়াছে, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'র শেষে কিন্তু সুমিত্রাকে একরূপ চিরকালের মত বিদায় দিয়া দারুণ ঝড় জলের মধ্যে বিশ্বাসী সহকর্মী হীরা সিংহের সহিত সব্যসাচী 'পথের দাবী'র আস্তানা হইতে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াইয়াছেন, মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের কঠিন সংকল্পে নদী-পর্বত পার হইয়া বিদেশে শক্তিসংগ্রহের আশায় পাড়ি দিয়াছেন।

মানুষ আপন অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বে দেদীপ্যমান হইতে পারে যদি সে একটু পরিবেশের আনুকূল্য পায়, শরৎচন্দ্রের ইহাই ছিল দৃঢ় ধারণা। এইজন্য যাহারা হীন জীবন যাপন করে তাহাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি আশাবাদী

ছিলেন। পতিত-পতিতাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির ইহাই কারণ। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল মানুষের হীনতা বা অধঃপতন সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার মূলে রাজনৈতিক দুর্নীতি সক্রিয় থাকে। অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে রাজনৈতিক লোভের সংযোগও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একাংশকে অন্ধকারে রাখিয়া অপরাংশের সুখলাভের যে দুর্দম প্রয়াস পৃথিবীতে চলিতেছে তাহা ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিতেছে বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিতেন। এভাবে মানবসমাজের একাংশকে বঞ্চিত করিয়া অপরাংশের সত্যকার কল্যাণ কখনই হইতে পারে না, এই একাংশের অধঃপতনের দাম অপরাংশকে পাইকারীভাবেই দিতে হইবে। 'পথের দাবী'তে ভারতীর মুখ দিয়া এই কথাই তিনি এক জায়গায় বলাইয়াছেন। ভারতীরা শ্রমিক বস্তিতে কর্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। শ্রমিকরা সেখানে পশুর মত বাস করে, তাহাদের জীবনে না আছে সৌন্দর্য না আছে শৃঙ্খলা। নিজেদের হীন অবস্থা উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহাদের নাই, এই দুরবস্থা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা তাহাদের নিজের গরজে হওয়া অসম্ভব। অপূর্ব ভারতীর সহিত একদিন এই শ্রমিক বস্তিতে গিয়াছে। অপূর্ব মধ্যবিত্ত সমাজের পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, বস্তির নোংরা পারিপার্শ্বিকে অল্পক্ষণেই সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। সেখানে দশ-এগারো বছরের মেয়ে বাপের জন্য মদ কিনিয়া আনে, মায়ের পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগের কথা অসংকোচে সকলের সামনে গড়গড় করিয়া বলিয়া যায়। অপূর্ব এই অসহ্য নরক হইতে চলিয়া আসিবার জন্য ভারতীকে তাগাদা দিল। ইহার উত্তরে ভারতী যাহা বলিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের বাণী। ভারতীর কথামত তাহাকে সেখানে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে অপূর্ব অস্বীকার করায় ভারতী বলিল : "তাহলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষ কত অত্যাচার করছে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। এই মেয়েটার মা এবং যদু (যে পরপুরুষের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে) যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ না? কখ্‌খনো না!...আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান!"

তাঁহার স্বদেশ বিদেশী ইংরেজদের দ্বারা শাসিত, এজন্য স্বাধীনতাকামী

শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ তো বটেই, কিন্তু তাঁহার এই ক্ষুব্ধতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল শাসক ইংরেজের নিদারুণ শোষণ বৃত্তি লক্ষ্য করিয়া। বিশ্বব্যাপী মানবসভ্যতার স্বাভাবিক অগ্রগতিশীল প্রবাহে ভারতবাসীর ক্রমোন্নতি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিদেশী শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পড়িয়া তিলে তিলে তাহাদের অবক্ষয় ঘটিতেছে, ইহাই শরৎচন্দ্রের ব্যথা। শাসনযন্ত্রের হীনতার দিকটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া শরৎচন্দ্র ইংরেজদের হীনরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার আশা ইহাতে দেশবাসীর মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া অবশেষে একদিন বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটাইবে। কিন্তু এইভাবে শরৎচন্দ্র বিদেশী শাসনকে নিন্দা না করিয়া বিদেশী শাসনের হীনতার দিকটিকে নিন্দা করায় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে অসুবিধার উদ্ভবও হয়। তাঁহার লেখা পড়িলে একথা ঠিক বুঝা যায় না যে, ইংরেজ ভারত শাসনে ভারতবাসীর সহিত যদি দুর্ব্যবহার না করিত অথবা ভারতবর্ষকে শোষণ বা অবহেলা না করিয়া সহৃদয়তার সহিত শাসনকার্য চালাইত, তাহা হইলে বিদেশী শাসনের গ্লানিভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে শরৎচন্দ্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেন? এইখানে উল্লেখযোগ্য যে 'পথের দাবী'তে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামী নায়ক সব্যসাচীর বা ডাক্তারের সংগ্রাম-চেতনার প্রথম স্ফুরণে তিনি যে কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পরাধীন দেশের স্বতস্ফূর্ত মুক্তি-কামনা-সিক্ত ততটা নয়, যতটা ইংরেজ রাজশক্তির অত্যাচারের এবং অত্যাচারিত ভারতবাসীর প্রতিহিংসার সংকল্পের।

ডাক্তারের ছোট বেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে এক করুণ ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাঁহার এক জ্যাঠতুতো বড়দাদা তাঁহাদের গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত এক মঠ-বাড়ীতে ডাকাতির সময় ডাকাতদের কিছুটা বাধা দেন। ডাকাতরা শাসাইয়া যায় পরে তাহারা একদিন ইহার প্রতিশোধ লইবে। বড়দাদা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, একটা বন্দুক চাই। কিন্তু সে প্রার্থনা তাঁহার পূরণ হইল না। বৎসর দুই পূর্বে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী পুলিস সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারের কান মলিয়া দিবার অপরাধে তাঁহার দুই মাস জেল হইয়াছিল। এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত নাকচ করিলেন। দাদা বলিলেন, "সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো?" সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "এত যার ভয় সে যেন ঘর বাড়ী বেচে আমার জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যায়।"

কেবল তাই নয়, বড়দাদা যখন ব্যাকুল হইয়া তীর-ধনুক ও বর্শা তৈয়ারী করাইলেন, পুলিসের লোক খবর পাইয়া সেগুলি পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়া গেল।... তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যেই ডাকাতরা প্রতিজ্ঞা পালন করল। এবারে সম্ভবতঃ একটা বেশি বন্দুক ছিল। বাড়ীর আর সকলে পলাইল, শুধু বড়দাদাকে কেহ নড়াইতে পারিল না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে বড়দাদা প্রাণ দিলেন। বড়দাদা ঘণ্টা খানেক বাঁচিয়া ছিলেন, গ্রামশুদ্ধ জড় হইয়া হৈ চৈ করিতে লাগিল, কেহ ডাকাতদের, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গালি পাড়িতে লাগিল, শুধু বড়দাদাই কেবল চুপ করিয়া রহিলেন। পল্লীগ্রাম, হাঁসপাতাল দশ বারো ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে আসিলে দাদা তাঁহার হাতটি সরাইয়া দিয়া কেবল বলিলেন, "থাক, আমি বাঁচতে চাইনে।" সব্যসাচী বাল্যকালের এই ঘটনাটি তাঁহার উত্তর-জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত দিয়া ভারতীর কাছে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, লেখকের আবেগ এই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে মাখানো। 'পথের দাবীর' এইখানে আছে: "বলিতে বলিতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর যেন একটু কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—'মেয়েদের মত এইসব গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিসনে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনে।' এই কটা কথা, এর বেশি আর একটা কথাও তিনি বলেননি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষপর্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্ত বড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল। ..এই কথাটা আমার তুমি মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানদের হাতেও এদেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এত বড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা এই এদের মূলধন।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনায় শ্রেণী-সংঘর্ষের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট, তিনি শোষণের অবসান স্পষ্টতঃই চাহিয়াছেন এবং এজন্য প্রয়োজন হইলে সংগ্রামের কথাও বলিয়াছেন। যে চেতনার অভাবের জন্য নিপীড়িতরা মাথা তুলিতে পারে না, সেই চেতনা সৃষ্টি করা শরৎচন্দ্রের সাধনা। তিনি শোষক ও শোষিতের সমতা সৃষ্টির যে আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন, তাহার পথ লড়াইয়ের পথ, শান্তির পথ নয়।* মানুষের কল্যাণে মানুষের তৈয়ারী দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার মূল তিনি উৎপাটন করিতে উৎসুক ছিলেন। এই ধ্বংস অবশ্যই শুধু ধ্বংসের জন্য নয়, নূতন সৃষ্টির জন্য। এই অর্থে শরৎচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক। তাঁহার 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী ভারতীকে শ্রেণী-সংগ্রামের গুরুত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন: "ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলা মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এই অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো, পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ

* এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই শরৎচন্দ্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। শক্তিশালী মালিক স্বার্থপরবশ হইয়া অসহায় শ্রমিকদের শোষণ করে, শ্রমিকদের দিক হইতে সক্রিয় বাধাদান ছাড়া এই লোভ সংযত হইবার নয়, শরৎচন্দ্রের এইরূপ ধারণা ছিল। 'পথের দাবী'র ফয়ার মাঠের সভায় একথাই তিনি সুমিত্রা ও রামদাস তলোয়ারকরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের শ্রমিকদের সমর্থনের একটি চমৎকার কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, হাওড়া মিউনিসিপালিটিতে কংগ্রেস বোর্ড; সেই সময় হাওড়া মিউনিসিপালিটির ধাঙড় ধর্মঘটে শরৎচন্দ্র ধাঙড়দের পক্ষ লইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটির কংগ্রেস বোর্ড অপমানিত হইবে, ন্যায়ের মুখ চাহিয়া একথা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। এই ধর্মঘট শেষপর্যন্ত সি. এফ. এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় মীমাংসিত হয়, শ্রমিকরাই মোটামুটি জয়লাভ করে।—(শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৭।)

করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাইত হয়েচে, তাইত আজ দীন দরিদ্র চলার পথে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবু তাদেরি অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতন হোক্—আজ সে সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইট পাথর খসে মানুষের মাথায় ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।"

কাজেই দেখা যাইতেছে সুবিধাভোগীদের অমানুষিক শোষণ, শোষিতদের অসহায়তা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই অন্যায় ও সামাজিক সাম্য বিধ্বংসী শোষণ অবসানের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষা—ইহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে শরৎচন্দ্রের মনোজগৎ আলোড়িত। স্বদেশবাসীর মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক থাকিবে না ইহাতো তিনি চাহিয়াছেনই, ইংরেজ রাজশক্তির এবং সেই রাজশক্তির পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রিত ইংরেজ বণিকদের শোষণেরও শরৎচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে হয়তো তিনি পথনির্দেশের প্রাবন্ধিকতায় ঢুকিতে চাহেন নাই, হয়তো আবেগ যতটা ছিল পথনির্দেশ করার ক্ষমতা তাঁহার ততটা ছিল না, তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পরিণতি পর্যন্ত চিত্রকে টানিয়া লইয়া যাওয়া প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু সমকালীন চিত্রাঙ্কনে তিনি তাঁহার বিক্ষুব্ধ মনটিকে ঢাকিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। একথা সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।*

* সমাজনীতি ও রাজনীতি উভয়ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূরীকরণে শরৎচন্দ্রের উদ্গ্রীবতা তাঁহার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে রংপুর যুব সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে মিলিবে, "বৈদেশিক শাসন আমাদিগকে অস্ত্রহীন ও দুর্বল করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্যই আমাদিগকে অধিকতর দুর্বল করিয়াছে এবং প্রকৃত উন্নতির

ইতিহাস বলে ইংরেজ বাণিজ্য ও বাণিজ্যের মুনাফা কায়েম করিবার জন্যই ভারতে রাজ্যবিস্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, সমৃদ্ধ দেশকে নিষ্ঠুর শোষণে অন্তঃসারশূন্য করা ছাড়াও ভারতের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করা হইয়াছে এবং প্রগতির স্বাভাবিক সম্ভাবনা হইতে ভারতকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ইংরেজের ও ইংরেজ-প্রেমিক এদেশবাসীর পকেট ভর্তি করিবার চক্রান্ত অসংখ্য ভারতবাসীর বিকাশলাভের পথে, মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগলাভের পথে পর্বত-প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই ক্ষোভ শরৎচন্দ্রের বুকে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়াছিল। এই বেদনা রবীন্দ্রনাথও বারবার প্রকাশ করিয়াছেন। 'সভ্যতার সঙ্কট' তিনি বৃদ্ধবয়সে লিখিয়াছেন, পরিণত বয়সের বিপুল অভিজ্ঞতায় তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই বিখ্যাত প্রবন্ধে। ইংরেজকে একদিন ভারত হইতে বিদায় লইতেই হইবে, কিন্তু যে ভারতকে তাহারা পিছনে ফেলিয়া যাইবে তাহার রিক্ত, বঞ্চিত, অস্বাভাবিক রূপ ইংরেজ জাতির ঐতিহাসিক কলঙ্ক; 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ মননশীল কবিগুরুর এই ব্যথাই প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ইংরেজের ঐতিহ্যে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও পড়াশুনা করিতেন বলিয়া এসম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হয়তো তাঁহার ছিল না। আগেই বলা হইয়াছে, দুর্নীতিপরায়ণ ভারতশাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করিলে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা আহত হইতে পারে এই বাস্তব আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্র সুবিধা সুযোগ পাইলে ইংরেজদের নিন্দা করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মত ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্মেলনের উদার আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ শরৎচন্দ্র পান নাই বলিয়া বাল্যকাল হইতেই ভারতে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার এবং ইংরেজ রাজকর্মচারী ও বণিকদের হীনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন ইংরেজদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; পরবর্তীকালে ইংরেজদের ভাল দিক

পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই হৃদয়হীন সমাজ, প্রেমহীন ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ, আর্থিক বৈষম্য এবং নারীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার— এই সবই আমাদের দুর্দশার কারণ।"

কিছু কিছু চোখে পড়িলেও হীন রূপ অপ্রতিহত থাকায় তিনি তাঁহার রচনার প্রকৃতি পরিবর্তনে উৎসাহবোধ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের লেখায় ইংরেজ-শাসনের কলঙ্কিত রূপ কিরূপ ফুটিয়াছে সেকথা আগেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে, 'পথের দাবী' হইতে গৃহীত নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি পড়িলে তাহা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। এখানে শরৎচন্দ্র আবেগে কথা নয়, যেন অগ্নিবাণ ছুঁড়িয়াছেন। সব্যসাচী ভারতীকে বলিয়াছেন: "এক রকম সাপ আছে ভারতী তারা সাপ খেয়ে জীবন ধারণ করে। দেখেচ?···দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এদেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশের সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ আয়োজনের আর অন্ত নেই। সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে ৭০ বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাংলা দেশের মেয়ে বলছিলে না? বাংলার মাটি, বাংলার জলবায়ু, বাংলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয় না? এই বাংলার দশলক্ষ নরনারী প্রতি বৎসর শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে দশলক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠ্‌চে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেছ ভারতী?"

শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমি রচনায় শরৎচন্দ্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চেয়ে আবেগের আশ্রয় বেশী লইয়াছেন। সাধারণভাবে যখন তিনি শোষক ও সুবিধাভোগী এবং বঞ্চিতদের ছবি আঁকিয়াছেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার আপন মনোভাব লেখার মধ্যে ফুটাইয়া শোষিত ও বঞ্চিতদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'হরিচরণ' প্রভৃতি গল্পে এবং 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে এই পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে ইহারই

মধ্যে সুবিধাভোগী শ্রেণীভুক্ত হইয়া এবং শোষণের সহিত বিজড়িত থাকিয়াও হৃদয়বান কেহ কেহ শরৎচন্দ্রের বিরাগের পরিবর্তে অনুরাগ পাইয়াছে এমনও দেখা গিয়াছে। 'শেষ প্রশ্ন'এর জমিদার আশুবাবু ইহার দৃষ্টান্ত, 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দ এইজন্যই প্রথম দিকের তুলনায় শেষদিকে প্রজানিপীড়নের পরিবর্তে প্রজাদরদী হইয়া উঠিয়া শরৎচন্দ্রের বিরাগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। 'পল্লীসমাজ'-এ জমিদার বেণী ঘোষাল অসৎ বলিয়া শরৎচন্দ্র কর্তৃক ধিক্কৃত, কিন্তু রমেশ জমিদার থাকিয়াও সততার জন্য শরৎচন্দ্রের কৃপাধন্য হইয়াছে। 'শেষ প্রশ্ন'-এর হৃদয়বান চরিত্র আশুবাবু লেখক ও পাঠক উভয়ের কাছেই প্রিয়, কিন্তু জমিদার আশুবাবু অবশ্যই এমন এক শ্রেণীভুক্ত মানুষ যাহারা পরশ্রমের উপর অথবা অপরকে শোষণ করিয়া নিজেরা আরামে থাকে এবং অভিজাত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার আনুষঙ্গিক ব্যয়বাহুল্য অসঙ্কোচে চালাইয়া যায়। বাস্তবিক এই আশুবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে পৃথক পংক্তিতে রাখিয়া শরৎচন্দ্র যখন তাঁহারই মুখ দিয়া মোটামুটি তাঁহার শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ নরনারীকে আক্রমণ করেন, তাহা সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না।* যাহা হউক, শোষকদের তুলনায় শোষিতদের প্রতিই শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি অধিকতর নিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে ইহা এইরূপ ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্র

*'শেষ প্রশ্ন'-এর একেবারে শেষদিকে আশুবাবুর আগ্রা হইতে বিদায়ের সভা। কমলের ঔজ্জ্বল্যে নিষ্প্রভ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী মালিনী এবং তাহার বান্ধবী আশুবাবুর আত্মীয়া বেলা ঈর্ষ্যায় মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়াছে। সভা ত্যাগের সময় তাহারা দরিদ্রা শ্রমজীবিনী কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আশুবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এইখানে অপমানিতা কমলকে সান্ত্বনা দিতে আশুবাবু যে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, শ্লেষ ও আঘাতের রূঢ়তায় সেগুলি আশুবাবুর মুখ হইতে শুনিতে কানে বাজে। আশুবাবু বলিলেন: "কিছু মনে কোরোনা মা, এছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও ওই দলের লোক। সবই জানি। দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তির ভার্যা। হাই সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা কওয়া, চলা-ফেরা, বেশ-ভূষায় আপ-টু-ডেট্। এটুকু ভুললে যে ওদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওদের প্রতি অবিচার হয়।"

কায়স্থ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত মুসলমান (মালো) সাপুড়ে-কন্যা বিলাসীর বিবাহ দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিপরীতে তাহার খুড়োকে হীনরূপে চিত্রিত করিয়া মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর বিরুদ্ধে পাঠকের সহানুভূতি যাইতে দেন নাই, জাতি-কুলহীনা, সমাজের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন-কারিণী কমলকে আশুবাবুর মত সজ্জনের দ্বারা 'মা' বলাইয়া স্নেহের আহ্বান জানাইয়াছেন, পদস্খলিতা মায়ের কন্যা সরযূকে স্বামিগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিতা করিতে সম্ভ্রান্ত জমিদার মণিশঙ্করকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করাইয়াছেন এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছেন; —এ সবই তলার শ্রেণীর বা বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির পরিচায়ক। সাধারণ নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি তো তাঁহার সর্বত্র। বলা বাহুল্য, এই সহানুভূতি আবেগের উপর অধিকতর নির্ভরশীল না হইয়া যুক্তি-নির্ভর হইয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে আরও ভাল হইত।

শরৎ-সাহিত্যে বস্তুগত রূপের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং পরিণতি বা সিদ্ধান্ত কম, একথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক মনে মনে কোন পরিণতির ছবি ছাড়াই ঘটনার বা অবস্থার বস্তুগত রূপায়ণে উৎসাহ দেখাইতেই পারেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার আবেগ-অনুরাগে স্বাধীন ভারতের কল্পনা অবশ্যই কার্যকরী হইয়াছে। জীবনের বহুবিধ সমস্যা তিনি রূপায়িত করিয়াছেন, সমাধানের পরের কল্পিত চিত্র তিনি আঁকেন নাই, কিন্তু সমস্যার সমাধানের আগ্রহ এবং আশাবাদ নিঃসন্দেহে তাঁহার মনে ছিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সম্পর্কেও তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী হওয়া ছাড়াও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রণী প্রদেশ বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের রত্নস্বরূপ শরৎচন্দ্রের মনে স্বাধীনতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও আশা এবং ইহার রূপায়ণের অনুকূল ঘটনা বা নজিরগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকিলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। সিপাহী বিদ্রোহ ও কলিকাতার হিন্দু মেলার স্মৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের প্রভাব, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী,—উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের এই মহান্ স্মৃতিগুলি সে যুগের বাঙ্গালীমানসে যে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছিল, প্রথম জীবনে

পরিবেশের প্রতিকূলতায় কিছু বিলম্বে হইলেও সে প্রেরণা মানস বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের হৃদয়েও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উপর রবীন্দ্র-প্রভাব তো ছিলই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারিতায় বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট স্বদেশী আন্দোলন রূপ পায়, তাহার জন্যও শরৎমানসে জাতীয়তাবোধ প্রস্তুত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা আরও সন্নিবদ্ধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে রাউল্যাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড ঘোষণা দ্বারা মুমুক্ষু ভারতবাসীর পক্ষে অসন্তোষজনক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার সংশ্লেষে। শরৎচন্দ্রের নিজের মনে দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার আগ্রহ এবং তজ্জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টায় উৎসাহ এইসব ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া দ্রুতগতি লাভ করিয়াছিল। ভারতে ইংরেজ শাসনের সমগ্র ইতিহাস ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে শোষণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের করুণ অভিজ্ঞতার এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের, বিশেষ করিয়া শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নতি ও তুলনামূলকভাবে ভারতের অসহায়তার বাস্তব অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রকে অধিকতর ব্যথিত করিয়াছিল। রাশিয়ার বিপ্লবের পরে সেই দেশের সমাজতান্ত্রিক সাফল্য পৃথিবীব্যাপী শোষণ-মুক্তির যে সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল শরৎচন্দ্র তাহার দ্বারাও কিছুটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। মোটের উপর, শরৎচন্দ্রের রচনাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো, ধনতান্ত্রিক বণ্টনব্যবস্থার গুরুতর অসাম্য, বিদেশী ও দেশী শোষকদের অবিরাম লুণ্ঠন, দেশের স্বার্থ সম্পর্কে বিদেশী রাজশক্তির নিদারুণ অবহেলা, দেশবাসীর দৈন্যজনিত হতাশা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উপযোগী কর্মোৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব, এগুলি সবই সমগ্রভাবে শরৎমানসে তথা শরৎসাহিত্যে লক্ষণীয় ছাপ রাখিয়াছে। তবে যেকথা আগে বলা হইয়াছে, হৃদয়-প্রধান কাহিনী লইয়া অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস লিখিবার জন্য এই সব ঘটনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ মানসিকতার চিত্রণের সুযোগ তাঁহার কাহিনীগুলিতে সীমাবদ্ধ, তবে সুযোগ যেটুকু মিলিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়া শরৎ-চেতনা সেখানেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র মানুষের দুর্বলতা এবং মহত্ত্ব উভয়বিধ চিত্তরূপ লইয়া সমগ্র মানুষকে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইভাবে মানুষকে সবদিক হইতে গ্রহণ করাই বড় সাহিত্যিকের লক্ষণ। এই জন্যও শরৎচন্দ্রের পক্ষে রাজনৈতিক চেতনার উপর জোর দিয়া আদর্শনিষ্ঠভাবে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার অসুবিধা ছিল। আগেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'রাজসিংহ' উপন্যাস লিখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন এবং সেই অসুবিধার জন্যই হয়ত তিনি আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত রাজসিংহের কাহিনী ছাড়াও একটি জটিল প্রেমের পৃথক কাহিনী (জেবউন্নিসা-মোবারক-দরিয়ার কাহিনী) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন নৈতিক কর্ম-চেতনার উপর সর্বাংশে গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজনৈতিক নিষ্ঠাহীনতাকে ধিক্কৃত করিয়াছেন, 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপকে হীনতর করিয়া আঁকিয়া তাহাকে নিদারুণভাবে হারাইয়া দিয়াছেন, শরৎচন্দ্র অতটা নিষ্ঠুর হইতে পারেন নাই। 'পথের দাবী'র অপূর্ব বা 'বিপ্রদাস'-এর দ্বিজদাসের মত রাজনীতির হিসাবে কিছুটা দুর্বল চরিত্রকেও তিনি গোটা মানুষের বিবেচনায় স্নিগ্ধ দরদে আঁকিয়াছেন। তবে এইরূপ শিথিলতা যে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভাল নয় এবং নৈতিক আদর্শ-প্রবণতাই যে রাজনৈতিক সংগ্রামে সৈনিকের মহত্তম ঐশ্বর্য, এই দৃঢ়বিশ্বাসও শরৎচন্দ্রের ছিল।* এইজন্য সমগ্র চরিত্রকে দোষ-গুণে পূর্ণ চরিত্র করিয়া আঁকিলেও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী শুধু রাজনৈতিক এবং সামাজিক নীতিহীনতার দৃষ্টান্তকে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে বা পৃথকভাবে নিন্দা অথবা ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে আগ্রায় অধ্যাপক অবিনাশের বাড়ীতে বন্ধুদের আড্ডার বর্ণনায় তাঁহার এইরূপ চেষ্টার প্রমাণ মিলে। এই আড্ডার

*স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের সক্রিয় নিষ্ঠার উপর শরৎচন্দ্র কিরূপ জোর দিতেন, তাহা তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে বুঝা যায়: "আজ আমাদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালাগালিও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবল তাদের ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি নেবে কে?"

বর্ণনায় শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আহারাদির পর প্রফেসর মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন দুই নিচের ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাইচ্যস ইন্‌ডিগ্‌নেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত।" 'বিপ্রদাস'-এ বিপ্রদাস এক জায়গায় অতি নিষ্ঠাবতী দয়াময়ীর কাছে বন্দনাদের হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ভাল করিয়া না মানারও সমর্থন করিয়াছে তাহাদের প্রবাসে বিশেষ সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া, কিন্তু দয়াময়ীর সন্তান ও তাঁহার প্রীতিভাজন ছোট ভাই দ্বিজদাসের নিষ্ঠাহীনতার স্পষ্ট নিন্দা করিয়াছে মায়ের সম্মুখেই। বিপ্রদাস বলিয়াছে: "তার (বন্দনার) এখনো বিয়ে হয়নি কিন্তু হলেও (বন্দনা ব্রাহ্মণ, পাত্র সুধীর কায়স্থ) আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবেই শ্রদ্ধা করবো যে ওদের বিশ্বাস সত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেছি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতিভেদ বিশ্বাস করে না, গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলেনা। রাগ ক'রো না মা, তোমার দ্বিজুটি হ'লো এই জাতের।"

শরৎচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী পরদেশ-শোষণকারী ইংরেজদের যেমন ঘৃণা করিতেন, তেমনি ঘৃণা করিতেন স্বদেশের উপরতলার শোষণকারীদের। মোটামুটি ভূমিকেন্দ্রিক-অর্থনীতি-বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা তাঁহার সাহিত্যের পটভূমি, শরৎ-সাহিত্যে জমিদার বা জমির উপর নির্ভরশীল লোক অনেক। কিন্তু যে জমিদার শোষক তাহাকে তিনি নির্দয়ভাবে ধিক্কার জানাইয়াছেন। তিনি কেতাবী অর্থে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, জমিদার বলিয়াই জমিদারকে অপছন্দ করেন নাই, কিন্তু জমিদার যেখানে অত্যাচার বা শোষণের মত ঘৃণ্য কাজ করিয়াছে সেখানে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেন নাই। তাই দেনা-পাওনা উপন্যাসের নায়ক জীবানন্দ প্রথম দিকে হীনতার জন্য তাঁহার দ্বারা ধিক্‌কৃত ও শেষদিকে সুকৃতির জন্য তাঁহার সহানুভূতিধন্য হইয়াছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসেও এইরূপ প্রথম দিকে জবরদস্ত বিপ্রদাসের কৃষক শোভাযাত্রার প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া

শেষ পর্যন্ত যখন দাদার প্রতি ভক্তিপরায়ণ দ্বিজদাস দাদার মুখের উপর জনগণের শোষণ হইতে মুক্তির সংগ্রামে জয়ের বিশ্বাস ব্যক্ত করে, তখন নিঃসন্দেহে বিপ্রদাস লেখক তথা পাঠকের সহানুভূতি হারায়।* তারপর গ্রন্থের অগ্রগতির সঙ্গে নীতিবান মানুষরূপে গৃহকর্তা বিপ্রদাস যখন মানবিক গুণসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন তাহার উপর হইতে লেখকের ও পাঠকের বিরূপতা একেবারেই চলিয়া গেল।

বাংলায় একদিন জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল জনকল্যাণের আশায়। ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭৬ সাল, ইং ১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করে, সারা দেশ অভাবে ও বিশৃঙ্খলায়, মৃত্যুতে ও মৃত্যুভয়ে শ্মশান হইয়া যায়। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম-চারীরাও নানা জুলুম করিয়া অসহায় প্রজাদের নিপীড়ন করিতে থাকে। অবস্থার শোচনীয়তা লক্ষ্য করিয়া ভারতের পরবর্তীকালীন শাসনকর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রজাদের দুর্দশা কমাইবার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জমিদার করিয়া জমিদারী প্রথার (১৭৯৫ খ্রীঃ) প্রবর্তন করেন। পরে এই প্রথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, কারণ অধিকাংশ জমিদারই অনুপার্জিত মুনাফাভোগে স্ফীত হইয়া সুখ-সুবিধার লোভে গ্রাম ছাড়িয়া নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য-বিলাসে গা ঢালিয়া দেয়, অথবা গ্রামে থাকিয়াও প্রজার ও গ্রামের কল্যাণ সাধন নাকরিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সর্বপ্রকার অপচেষ্টা

*বিপ্রদাস যখন তাহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাওয়া দ্বিজদাসের পরিচালিত কৃষক শোভাযাত্রাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল: "তোমাদের রকমারি নিশান আর বড বড় বক্তৃতাকে আমি ভয় করিনে। বেশ বুঝি ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচানোই যায় তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।"

দ্বিজদাস মৃদুকণ্ঠে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করিয়া জবাব দিল: "দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয় না এ আমি জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।"

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বটে!"

চালাইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের প্রজারা প্রায় ক্ষেত্রেই লোভী জমিদার বা জমিদারের লোভী কর্মচারীদের শিকার হইয়া দাঁড়ায়। তদুপরি ইংরেজ সরকার জমিদারদের কায়েমী স্বার্থের ও সরকারী মর্যাদার সুযোগ দিয়া অর্থবান ও ক্ষমতাবান জমিদারদের সরকার-সমর্থক এক শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টা অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিতও হয়। এইভাবে জমিদাররা রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক হইতে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হইয়া উঠে। কল্যাণের পরিবর্তে অভিশাপে রূপান্তরিত এই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ শরৎচন্দ্র কামনা করেন। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রথম দিকে জমিদার জীবানন্দ গোমস্তা এককড়ি ও জোতদার জনার্দন রায়ের অঙ্কনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই জমিদারী প্রথার প্রতি বিরাগ সুপরিস্ফুট হইয়াছে।* 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে জমিদার বেণী ঘোষালের চিত্রও অনুরূপ মনোভাবের পরিচায়ক। 'বড়দিদি' উপন্যাসে জমিদার সুরেন্দ্রনাথের কর্মচারী বিধবা মাধবীর ভদ্রাসনখানি গ্রাস করিয়াছে। জমিদারীর সহিত জমিদারের সম্পর্ক কিরূপ রজতকেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ২৮তম পরিচ্ছেদে চণ্ডীগড়ের চণ্ডীদেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রী উমাচরণের কথাগুলি তাহার স্মারক। মানভূম জেলার বংশীবট গ্রামে দরিদ্র উমাচরণের স্ত্রী-পুত্র বিনাচিকিৎসায়

*শরৎচন্দ্রের যুগ ভূমিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার শেষ দিক, শিল্প-সভ্যতা তখনও এদেশে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। সরকার-নির্ধারিত খাজনা আদায় ছাড়াও সেকালে জমিদার ও তাহার আমলারা অসহায় প্রজাদের কিভাবে শোষণ করিত শরৎচন্দ্রের সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই অন্যায় জুলুমের তিনি বহুবার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই জুলুম কি সাংঘাতিক তাহার ছবি শরৎচন্দ্র 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের গোড়ার দিকে চণ্ডীগড়ে জমিদার জীবানন্দের পদার্পণের দৃশ্যে গোমস্তা এককড়ির সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবানন্দ এককড়িকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কাছারির তশিল কত?'

অসহায়ভাবে 'এককড়ি বলিল, 'আজ্ঞে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।'

'হাজার পাঁচেক? বেশ, আমি দিন আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার দশেক টাকা আমার চাই।'

এককড়ি বলিল, 'যে আজ্ঞে।'

মরিয়াছে, কোন উপায় না দেখিয়া উমাচরণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু করিয়াছে। জীবানন্দকে না চিনিয়া তাহার কাছেই উমাচরণ স্বগ্রামের সহিত গ্রামের জমিদারের শোচনীয় সম্পর্ক বর্ণনা করিয়াছে (ইহার দ্বারা জীবানন্দের আত্মোপলব্ধিই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য)। এখানে আছে: "গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসা নাই,—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন এক শহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার।"

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র যে এইভাবে জমিদারদের হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য প্রজাদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্ন পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করা। তিনি যে সময়ের কথা প্রধানতঃ বলিয়াছেন, তখনও ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাততন্ত্রের বা সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয় নাই। শিল্পীয় পুঁজিবাদ তখনও এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। কাজেই উচ্চস্তরের সুবিধাভোগীদের অসহায় জনসাধারণকে শোষণ ও নিপীড়নের ছবি ফুটাইতেই শরৎচন্দ্র জমিদারী প্রথার এই সব চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা মানুষে মানুষে অসমতা বিদূরণের আকাঙ্ক্ষাজাত এবং সেই অর্থে সমাজবাদী মনোভাব-প্রসূত। অর্থনীতি এবং রাজনীতি উভয় দিক হইতেই এই বৈষম্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় বৃহৎ নেতৃত্বের ভূমিকা লন নাই, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা কামনা তাঁহার বুকে যে আগুন জ্বালিয়াছিল, ইহা তাঁহার কথাবার্তায় ও লেখায় বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের

তাহার মনিব বলিলেন, 'কাল সকালে তোমার কাছারিতে গিয়ে বসব—বেলা দশটা এগারোটা হবে—তার পূর্বে আমার ঘুম ভাঙে না। প্রজাদের খবর দিও।'

এককড়ি সানন্দে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'যে আজ্ঞে।' কারণ ইহা বলা বাহুল্য যে খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের গুরুভারে এককড়ি আপনাকে নিরতিশয় প্রপীড়িত বা বিপন্ন জ্ঞান করে নাই।"

ইহার উপর রহিল জমিদার জীবানন্দের গ্রামে বসিয়া বেপরোয়া চরিত্রহীনতার জুলুম।

অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বা ভালবাসা জানাইয়াছেন। তিনি নিজে সামাজিক গল্প-উপন্যাসের সার্থক লেখক, মানুষের মনের গভীর সব রহস্য তিনি রূপায়িত ও উন্মোচিত করিতে চাহিয়াছেন। মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁহাকে যেমন শরৎচন্দ্র আরতি করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে যে দানব আছে তাহারও তিনি যেমনি চিত্রায়ণ করিয়াছেন, মানুষের ভালোমন্দ দুইই তাঁহার লেখায় নিষ্ঠায় ও বাস্তব রূপে অঙ্কিত। তবু ইহার মধ্যে দেশের কথা, বিশেষ করিয়া পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা লিখিবার সুযোগ মিলিলে অন্য দিক উপেক্ষা করিয়াও শরৎচন্দ্র সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন কোন লেখক, তিনি যত তরুণই হউন, যদি দেশাত্মবোধক লেখা লিখিতেন, তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে শরৎচন্দ্র তাঁহার আগুন-ঝরানো লেখার জন্যই অত ভালবাসিতেন।* 'বেণু' একখানি ক্ষুদ্রাকার পত্রিকা, এখানি কয়েকজন দেশাত্মবোধী তরুণ চালাইত, এই পত্রিকার আদর্শের জন্যই শরৎচন্দ্র ইহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ইহার মঙ্গল কামনা করিতেন। এই সামান্য পত্রিকাখানির তথা ইহার পরিচালকবর্গের প্রতি শরৎচন্দ্রের এরূপ স্নেহ ছিল যে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহার 'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দেন। অবশ্য 'বেণু' বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ১-১০ পরিচ্ছেদ মাত্র ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে 'বিপ্রদাস' আবার বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬ ১০ই চৈত্র শরৎচন্দ্র পানিত্রাস, সামতাবেড় হইতে 'বেণু' সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে যে পত্রখানি লেখেন তাহাতে সাহিত্য সেবায় উৎসাহ দানের সহিত আদর্শমণ্ডিত রাজনৈতিক চেতনাকে তিনি অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহার এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছিলেন: "সমাজের মধ্যে আবর্জনা অনেক হয়েছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা

*বাজে শিবপুর হইতে ১৭।৫।১৯২৩ তারিখে শরৎচন্দ্র শ্রীমতী লীলা গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: "হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মরমর হইয়াছে। বেলা একটার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখিনা। একজন সত্যকার কবি! রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এতবড় কবি নাই। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত)

নেই, একথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র করে এক সঙ্গে মিলেছ—তোমরা যে নরনারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করনি, এইটি আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন আর ব্যতিক্রম না হয়।"—('বেণু', বৈশাখ, ১৩৩৬)

যে সব রাজনৈতিক নেতা পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের দেবতার মত দেখিতেন। তিনি নিজে নানা কারণে এই সক্রিয় সংগ্রাম তেমন করিয়া করিতে পারেন নাই, এজন্য বরাবর তাঁহার মনে একটা ব্যথা ছিল। ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধীকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। মহাত্মা গান্ধী তখন কারাগারে, দেশের জন্য এই সর্বত্যাগী জননায়ক যখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অসীম দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তখন দেশের মানুষ যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকিবে, তাহাদের মাতৃভূমির জন্য, তাহাদের নেতার জন্য উদ্বেলিত চিত্তে তাহারা আকুল হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না, শরৎচন্দ্রের ইহা অসহ্য মনে হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর দুঃখবরণ তাঁহার নিজের স্বার্থে নয়, এই দুঃখবরণের ফলে দেশে যে সুফল ফলিবে তাহা তিনি একা ভোগ করিবেন না, সমস্ত দেশের লোকের সহিত সমানভাবে ভোগ করিবেন। সুতরাং দেশবাসী যদি পরাধীনতার গ্লানির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রামের মহান্ নেতার আত্মত্যাগে আপন অন্তরে প্রেরণা অনুভব না করে, তাহার চেয়ে বেদনার কথা আর কি হইতে পারে? পরাধীনতা তো মৃত্যুর চেয়ে বেশি দুঃখের। দেশবাসী যদি মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণ সত্ত্বেও স্থাণুর মত বসিয়া থাকে, সে তো তাহাদেরই চরম লজ্জার কথা। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'আমার কথা' প্রবন্ধে এই ব্যথাই প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:

"তাঁর (মহাত্মাজীর) একান্ত মনের আশা ছিল হোক না জেল ছ'বছর, হোক না দশবছর, তাঁকে মুক্ত করাতো দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশি কেউ তাঁকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গভর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হউক। কিন্তু যে আশা তাঁর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে ভরসা করবার সাহস হ'ল না। তাদের অর্থোপার্জন

থেকে সুরু করে আহার নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হলো না, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জাবোধ করবার শক্তি পর্যন্ত যেন তাদের চলে' গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non-violence কি সম্ভব? Non Co-operation কি চলে? গান্ধীজীর Movement কি Practical? তাইত আমরা…। কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে যে কোন Movement-ই কিছু নয়, যে Move করে সে মানুষই সব।"*

জনগণ মহাসম্ভাবনা-সম্পন্ন, তাহাদের ভিতর অদম্য কর্মক্ষমতা রহিয়াছে, নেতৃত্ব শুধু সেই কর্মক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে, সক্রিয় করে। শরৎচন্দ্র চাহিয়া-

*মহাত্মা গান্ধীকে শরৎচন্দ্র কতখানি ভক্তি করিতেন তাহা ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধের (এই প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে) ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই প্রবন্ধে গান্ধীজীর বিস্ময়কর প্রভাব আলোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র ইংরেজের কারাগারে বন্দী এই মহান নেতার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন: "যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল! দেশের মঙ্গলেই, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ, শাসনযন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এদেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থে রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে। আত্ম-বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাদণ্ডের অধিকার অর্জন করিয়া।"

ছি:গন ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করুক। জয় তাহাদের হইবেই। ভারতবর্ষের মানুষ অবশ্যই স্বাধীনতার অধিকারী, বিদেশী রাজশক্তি চিরকাল ভারতশাসন করিবে কিসের অধিকারে? তাই স্বাধীনতা আনিতে হইলে যে শ্রম, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশ্ন আছে, তাহা হইতে জনগণ সরিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের স্বাধীনতার স্বাভাবিক দাবী চলিতে থাকিবে, অথচ তাহাদের ভীরুতা স্বাধীনতা লাভের পথে বাধার প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা একান্ত অবাঞ্ছিত। মহাত্মা গান্ধীর মত নির্ভীক সত্যানুরক্ত মহান্ নেতা ভারতবাসীর সৌভাগ্যক্রমেই মিলিয়াছে বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন সাফল্যের পথে যাইবে, জনগণের সংগ্রামী চেতনা অবশ্যই উদ্বুদ্ধ হইবে,—এইজন্যই তিনি তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়া মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করিতে চাহিয়াছেন। উপরোল্লিখিত 'আমার কথা' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্তব্যের দায় নিয়েও তো আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটাকে পাব এতবড় অন্যায়, অসঙ্গত দাবী—এতবড় পাগলামী আর ত কিছু হতে পারে-না।"

মহাত্মা গান্ধীর মতই অপর ভারতীয় মহান্ নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে শরৎচন্দ্র গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। শরৎচন্দ্রের দৃঢ়প্রত্যয় ছিল মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত (সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও তাঁহার বিশেষ আশা ছিল, তখনও সুভাষচন্দ্র নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উঠেন নাই) মহান্ নেতারা যখন জাতীয় আন্দোলনের হাল ধরিয়াছেন, তখন ভারতের মুক্তি সাধনা ত্বরান্বিত না হইয়া পারে না। সাধারণ ভারতবাসীর উপর এইরূপ বরেণ্য নেতার প্রভাব পড়িবেই। এই নেতারা জাগতিক সাফল্যের সুযোগ জীর্ণ কন্থার মত ত্যাগ করিয়া সংগ্রামের চরম দুঃখ ও কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম দিকের আত্মত্যাগ বা কারাবরণ দেশবাসীর সমষ্টিগত অনুগামিতা আকর্ষণ করিতে না পারিলেও নৈতিক আদর্শ-দৃঢ়তা বিফল হইবে না, দেশের লোক অবশ্যই মাতৃভূমির মর্যাদারক্ষার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে। ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশবন্ধু যখন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানো

হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র সম্বর্ধনা সভার অভিনন্দন পত্রটি যত্ন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি দেশবন্ধুর অদম্য দেশপ্রেম, দুর্ধর্ষ সংগ্রামী শক্তি এবং উদার মানবতাবোধের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন: "...তাহার পর একদিন মাতার কঠিন আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বপণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।...যে কথা তুমি বরাবর বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।...আপনার স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ তাইতো আজ তোমার করতলে। তাইতো তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদেরও। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী যে যেখানে আছে সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে। একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত না হইয়া আসিবে, ততদিন অবমানিত উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশে সর্বকালে,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ কেবল বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এসত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।"

শরৎচন্দ্র যখন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন, সুভাষচন্দ্র বসু তখনও বিশ্ববিখ্যাত 'নেতাজী' হইয়া ওঠেন নাই, কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের বিপুল সম্ভাবনা তখনই তাঁহার মধ্যে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর বাংলা কংগ্রেসের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পরিচালিত উপদলের সহিত সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত উপদলের মতান্তরজনিত কিছুটা রাজনৈতিক বিরোধ দেখা যায়। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব অকুণ্ঠভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সুভাষচন্দ্রের নির্দেশাদি তিনি নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেন। সামতাবেড়, পানিত্রাস হইতে ১৩৩৮ সালের ৫ই আষাঢ় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির মত শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও নিজেকে "সুভাষী" বলিয়াছেন। অধিক বয়সের বা সাহিত্যিক হিসাবে সুবিপুল জনপ্রিয়তার গর্ব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে নাই, তিনি সুভাষচন্দ্রের অনুগত সহকর্মীরূপে তৃপ্তিলাভ

করিতেন।* সুভাষচন্দ্রও তাঁহার এই অসমবয়সী সহকর্মীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন এবং দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রয়োজন হইলেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। শরৎচন্দ্র কবি রাধারাণী দেবীকে সামতাবেড়, পানিত্রাস হইতে ১১ই নভেম্বর, ১৯২১ তারিখে লেখা এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : "দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসে ভারী গোলযোগ (উপদলীয় কোন্দল) বেধেছে। পরশু সুভাষ ধরেছিল যে দিনকতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে

*শরৎচন্দ্রের সুভাষ-প্রীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি আগ্রহোদ্দীপক :— "তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসা প্রথম ক'বছর সবচেয়ে বেশী ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি এবং শেষের ক'বছর ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতি। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।"

শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলন হল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্মীরা—প্রবোধবাবু, বিজয় ভট্টাচার্য, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী, অনিল দত্ত, গুরুদাস দত্ত, জীবন মাইতি, গুরুপদ মুখোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, ডাঃ ভূপেন দত্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এঁরা সবাই ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। দলাদলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হননি। শরৎচন্দ্রকে যখন সম্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্মীরা গেলেন তিনি বললেন, "আমি যাব না।"

"কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?"

"ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে।"

একজন খুব রেগে বলে উঠল, "আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত।"

"ভূত নয় রে ভূত নয়, ভূতনাথ", তিনি বললেন।

কয়েকজন বললেন, "আমরা আপনার কেউ নই?"

তিনি সজল চোখে বললেন, "তোমরা আমার অনেকখানি। কতখানি যে তা মাপাও যায় না—কিন্তু তবু আমি যাব না।"

কর্মীরা বিষণ্ণচিত্তে বিদায় নিলেন, তিনি ততোধিক ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বিদায় দিলেন।"—(শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬।)

দিতে। আমি মেটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।"
(গোপাল চন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' ১ম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।)
নেতাজী সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে দেশপ্রেমিক মানুষ হিসাবে এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কতখানি সম্মান করিতেন, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্যেই তাহা বুঝা যায়। এই প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখিয়াছেন: "তিনি (শরৎচন্দ্র) ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাংলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জেলায় বিতরণ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে, একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন,—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে।" শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন,—'আমি কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।'

শরৎচন্দ্রের উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহার আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভাসমিতিতে বড় একটা যোগ দিতেন না বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চিরসবুজ—তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি

তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার 'পথের দাবী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল—তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাহারা বঞ্চিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। ...তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুবসমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন।"

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার সামাজিক চেতনার মতই স্পর্শকাতর ছিল। তাঁহার চিন্তায় বা সাহিত্য-কৃতিতে প্রাণের আবেগ অথবা ভাবের আবেগের ছাপ অত্যন্ত বেশি। তাঁহার দৈন্য-বর্ণনাত্মক ছবিগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, এই ছবিগুলিতে আবেগ যতটা কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, বাস্তবতার বিচারে অনেক সময়ই ততটা কারুণ্য দাঁড়ায় না। এই জন্য শরৎসাহিত্যে বাস্তবতার ঝোঁক থাকিলেও বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এই বাস্তবতার ফাঁক চিন্তাশীল পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এই ত্রুটি আবেগ-প্রবণতার, কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা অধিকাংশই আবেগপ্রবণ ছিলেন বলিয়া বাস্তবতার অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তাঁহাদের রচনায়ও বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এই ফাঁক দেখা যায়। এই ভাবপ্রবণ মানস-সংগঠনের জন্যই সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রের মধ্যে নানা গুণ থাকিলেও তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মী পরিচালনার বা আন্দোলন পরিচালনার মত বড় নেতৃত্ব লইতে পারেন নাই। রাজনৈতিক নেতার মত আবেগ থাকিলেও ধীর স্থির চিন্তা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা একই সঙ্গে বিবেচনা, পারিপার্শ্বিকের প্রতি বৈজ্ঞানিক-সুলভ দৃষ্টিপাত এবং পূর্ণ বাস্তবতার নিরিখে পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষমতা,—প্রভৃতি নেতার যেসকল অপরিহার্য গুণ থাকা দরকার, ভাব-প্রবণ শরৎচন্দ্রের মধ্যে এই সকল গুণের যে একটু অভাব ছিল তাহা তাঁহার লেখা হইতে উপলব্ধি করা কঠিন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার বিখ্যাত গল্প 'অভাগীর স্বর্গ' ধরা যাক। এই গল্পে প্রতিফলিত শ্রেণী সংগ্রামী চেতনার জন্য শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানো হয়। কিন্তু

গল্পটির কাঠামো লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, ইহাতে ধনী এবং দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর লোককে যান্ত্রিকভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এই গল্পে জমিদারের গোমস্তা, দরোয়ান, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঠাকুরদাস মুখুজ্যে, তাঁহার পুত্র, তাঁহার পুরোহিত,—একেবারে সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত অবস্থাপন্ন সব লোক হৃদয়হীন স্বার্থপর রূপে চিত্রিত, পক্ষান্তরে সব দরিদ্রই হৃদয়বোধের দিক হইতে উঁচুদরের। এমন কি যে রসিক বাঘ গল্পের সুরুতে স্ত্রী অভাগীকে বিনাদোষে ত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রীকে লইয়া অন্যত্র ঘর বাঁধিয়াছে, স্ত্রী অভাগী ও পুত্র কাঙালীচরণকে এক মুষ্টি অন্ন পর্যন্ত যে যোগায় না, সেই রসিক গল্পের মধ্যে অভাগীর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়া ভালো হইয়া গিয়াছে।

শরৎসাহিত্যে লেখকের আবেগাধিক্য বহুস্থলেই চোখে পড়ে। বলা নিষ্প্রয়োজন. আবেগের আধিক্য ঘটিলে সংযমের অভাব ঘটে এবং যুক্তিনির্ভরতা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, শরৎচন্দ্রকে বড লেখক বলিয়া তিনি এত সম্মান করিতেন যে, একবার তাঁহার 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্য শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটিকে লইয়া দেশবন্ধু টাকার অঙ্ক না বসাইয়া একখানি আপন নাম স্বাক্ষর করা চেক শরৎচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি গল্পটির পারিশ্রমিক হিসাবে যে কোন অঙ্ক বসাইয়া লইতে বলিয়াছিলেন। এ হেন শরৎ-অনুরাগী দেশবন্ধুও একবার শরৎচন্দ্রের আবেগবশে অতিশয়োক্তির প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'র দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যায় 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে ('স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) আছে, দেশবন্ধু একবার সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে লইয়া শিয়ালদহে এক ধনী ভদ্রলোকের কাছে দেশের জন্য কিছু টাকা সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন তো আছেনই, ধনী ভদ্রলোকের নীচে নামিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার সময় আর হইতেছে না। এই অবহেলায় বিরক্ত হইয়া শরৎচন্দ্র থাকিতে না পারিয়া দেশবন্ধুকে বলিয়া ফেলিলেন: "গরজ কি শুধু আপনার?" অর্থাৎ দেশ কি শুধু চিত্তরঞ্জনের, ওই বড়লোকটি তাঁহাদের এই যে অবজ্ঞা করিতেছেন, দেশ স্বাধীন হইলে, দেশের কল্যাণ হইলে তাঁহার কি কোন লাভ নাই? দেশবন্ধু প্রাজ্ঞ জননায়ক, মহান্ নেতার মতই শান্ত কণ্ঠে তিনি শরৎচন্দ্রকে বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদের,

আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়।"

'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'আমার কথা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের এই আবেগ-প্রবণতার আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। একবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্র আমতায় গিয়াছিলেন। আচার্য রায় আবেদন করিয়াও দেশের জন্য মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জাগাইতে পারিলেন না, যদিও আমতায় সাহায্য করিবার মত অর্থশালী লোকের অভাব ছিল না, আচার্য রায়ের আবেদনের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিবার মত লেখা-পড়া জানা লোকও অনেক ছিলেন। শরৎচন্দ্র এই হতাশাজনক অবস্থায় বিরক্ত হইয়া আলোচ্য প্রবন্ধে লিখিলেন, "আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হলো টাকা পঞ্চাশ। ঝড়ে জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিসেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এমনি একটা কিছু। বর্ধিষ্ণু স্থান, উকিল, মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁতি ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হলো তিন টাকা পাঁচ আনা। তারপর আচার্যদেব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করলেন জন দুই উকিল বিলাতী কাপড় কেনেন না এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন ভবিষ্যতে তিনি আর কিনবেন না।" বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে শরৎচন্দ্রের আবেগপ্রবণ অসহিষ্ণু মনের পরিচয় যেমন স্পষ্ট, আচার্য রায়ের আশাবাদী নেতা-সুলভ ধৈর্যশীল মনের পরিচয়ও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বরিশাল সম্মেলনে যাত্রার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই যাত্রাপথে রাত্রে স্টীমারে দেশবন্ধু বলিলেন যে, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ কোটি লোক সুতা কাটিলেই ষাট কোটি টাকার সুতা হইতে পারে। এই আশাবাদী উক্তি শরৎচন্দ্রের পছন্দ হইল না, এইভাবে সুতা কাটিলে দেশের স্বাধীনতা আনা ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু নেতার এই আশাবাদী উক্তি স্থিরভাবে চিন্তা ভাবনা না করিয়াই অসহিষ্ণু শরৎচন্দ্র দুম্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তা পারে, দশলক্ষ লোক একসঙ্গে হাত লাগালে একদিনেই একখানা বাড়ী তোলা যেতে পারে।" বলা নিষ্প্রয়োজন, এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর মধ্যে কল্পনা বা ভাবধর্মী রূপটি আপাত দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের তুলনায় অবাস্তব মনে হইতে পারে, কিন্তু নেতৃত্বের হিসাবে এই আশাবাদী গঠনমূলক ভাবদৃষ্টির গুরুত্বও অপরিমেয়। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'কাজের কথায় কেবল জোড়াতালি লাগে,

সৃষ্টি কল্পনায় হয়। শরৎচন্দ্র বাস্তবজীবনকে অনুধাবন করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার প্রতিফলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং রোমান্টিকতার অল্পবিস্তর স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান জগৎ ও জীবনরূপের বিন্যাসে, বিশেষ করিয়া মানুষের বর্তমান জীবনের বেদনা-বিন্যাসে লক্ষণীয় সাফল্য লাভও করিয়াছেন, কিন্তু যে কল্পনার দৃষ্টি বা ভাবদৃষ্টি লইয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে হয়, শরৎ-চন্দ্রের সেদিকে বেশ কিছুটা অভাব ছিল। মনের এই অভাবাত্মক দিকটি হৃদয়-ভাবমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ততটা না হইলেও রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাফল্যের কিছুটা পরিপন্থী। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেশবন্ধুর মধ্যে গঠনমূলক কল্পনা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, পৃথিবীতে মহান্ নেতৃত্বের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে একরূপ শূন্যহাতে সুরু করিয়া যাঁহাদের বড় কিছু গড়িয়া তুলিতে হয়, তাঁহাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ভাবদৃষ্টি থাকে। শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যস্রষ্টা হইলে কথাটা হয়ত উঠিত না, কিন্তু রাজনৈতিক সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে এই অভাবাত্মক দিকটি চিন্তাশীল পাঠকের চোখে না পড়িয়া পারে না। এজন্য সামাজিক কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, কিন্তু রাজনৈতিক কথাসাহিত্যিক অথবা রাজনৈতিক নেতা শরৎচন্দ্রের অগ্রগতি কিছুটা প্রতিহত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা স্থূল ছিল বলা চলে। কেতাবী রাজনৈতিক জ্ঞান অথবা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। যথা-যথ নিষ্ঠার সঙ্গে এই রাজনৈতিক বোধকে কথাসাহিত্যে রূপ দিবার ধৈর্যও যেন তাঁহার ছিল না। তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার এই আপেক্ষিক স্থূলতা সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বহু প্রচারিত উপন্যাস 'পথের দাবী'তে এবং 'পথের দাবী' রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবার পর এই প্রসঙ্গ লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাদানুবাদে। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র জটিল ও গভীর রাজনৈতিক সমস্যার রূপ আবেগাশ্রিত করিয়াই উপস্থাপিত করিয়াছেন, ফলে ইহা জাতীয় মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাজাত স্থূল রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষরযুক্ত ইংরেজ-বিদ্বেষের গল্প যতটা হইয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ইহার ততটা দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারতের মুক্তিযজ্ঞের বিশালতার ছাপ ইহাতে আছে সন্দেহ নাই, আদর্শপ্রবণতা ও কর্মনির্ভরতার উপরও ইহাতে অনেক জায়গায় বেশ জোর পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বাস্তব ঐক্য ইহাতে প্রায় অনুপস্থিত এবং গঠনমূলক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ইহাতে

নাই বলিলেই চলে। বিপ্লব আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলন, সহিংস বা অহিংস ভারতের উভয় প্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনেই নৈতিকতার যে মান ছিল, ব্যক্তিগত আশা বাসনার উর্ধ্বে উদ্দিষ্টলাভের যে ঐকান্তিক আকুতি ছিল, তাহা হইতেও 'পথের দাবী' বহুলাংশে ভ্রষ্ট। অবশ্য ইহার উপন্যাস-ধর্মই এজন্য বেশি দায়ী একথা মানিয়া লইলে 'পথের দাবী' উপন্যাস লইয়া এত কথা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'পথের দাবী' 'আনন্দমঠ'-এর বা 'সীতারাম'-এর চেয়ে উগ্র রাজনৈতিক উপন্যাস, 'চার অধ্যায়ে'র চেয়ে তো বটেই। একদা গ্রন্থটি মুক্তিকামী বাঙ্গালীর কাছে প্রায় গীতার অনুরূপ মর্যাদা পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর ইহাতে সর্বাধিক ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য 'পথের দাবী'র আলোচ্য ত্রুটি বিবেচনা করিতে হইবে। প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' পুস্তকে 'পথের দাবী'র গল্প ঘটনা ও চরিত্র আলোচনা করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে এই গ্রন্থ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহার সহিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ খুবই কম। তিনি বলিয়াছেন : "মনে হয় শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসকে যথাসম্ভব বিস্ময়কর করিতে চাহিয়াছেন। বিপ্লবীর জীবনে চমকপ্রদ ঘটনার অভাব নাই। যাঁহারা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের My Brother's face পড়িয়াছেন তাঁহারা এমন সকল ঘটনার বর্ণনা পাইয়াছেন যাহার কাছে গিরিশ মহাপাত্রের বা ইরাবতীর মাঝির কাহিনী হার মানে। শরৎচন্দ্র যেন এই সকল পরমাশ্চর্য ঘটনার মোহে পড়িয়া নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই সন্দেহ দৃঢ় হইবে। সুমিত্রা 'পথের দাবী'র প্রেসিডেণ্ট।...তাহার চরিত্রের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু মনে হয় 'পথের দাবী'র ইতিহাসে তাহার অভ্যাগম একেবারে আকস্মিক এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই। শুধু সুমিত্রার অভ্যাগম ও অন্তর্ধানই নহে। একাধিক আভাস আছে যে জাপান যখন কোরিয়া আত্মসাৎ করে তখন সব্যসাচীর দল খুব তৎপর হইয়াছিল। তিনি কোটুকুর কাগজের ইংলিস সাব-এডিটর এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দলের উত্তর চীনের সেক্রেটারি আহমেদ তুরাণী মাঞ্চুরিয়ায় তখন ধরা পড়ে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সম্পর্ক কোথায় ?"

রবীন্দ্রনাথের সহিত 'পথের দাবী'র বাজেয়াপ্ত হওয়া লইয়া শরৎচন্দ্রের

মনোমালিন্য শরৎচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত স্থূল রাজনৈতিক চেতনার আর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। 'পথের দাবী'তে ইংরেজ বিদ্বেষের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি সকলেরই চোখে পড়িবে। কোন কোন জায়গায় এই অভিব্যক্তি একরূপ গালাগালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বই তখনকার দিনে রাজরোষে পড়িবে এবং বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রতিবাদ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একখানি বইও দিয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়িয়া শরৎচন্দ্রকে ২৭শে মাঘ, ১৩৩৩ তারিখে একখানি ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি তাঁহার মর্যাদাবোধের স্মারক। ইহার মধ্যে বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কবিগুরুর প্রাজ্ঞ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথচ ইংরেজের জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ফুটিয়াছে, শরৎচন্দ্রের শক্তির প্রতিও শ্রদ্ধাভাব ফুটিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে শরৎচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষায় অক্ষমতা জানাইলেন। অভিমানের আবিলতা শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিল, তাঁহার স্থূল রাজনৈতিক চেতনা রবীন্দ্রনাথের এই অস্বীকৃতিতে অত্যন্ত আহত হইল। রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করিলেন না, বড় করিয়া দেখিলেন আপন অহংবোধকে, তাঁহার যাচিয়া অনুরোধ করার ব্যর্থতাকে। তিনি রবীন্দ্রনাথের যুক্তি তলাইয়া দেখিলেন না, তাহার বহিরঙ্গ কাঠিন্যকে কটূক্তি মনে করিয়া এক কড়া প্রত্যুত্তর লিখিলেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁহার ক্ষুব্ধ মনের দুঃখ দশজনকে জানাইতে লাগিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিলেন, "ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এতবড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই-জন্য যে কবির এতবড় সার্টিফিকেট তখুনি ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজ-ওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনাবিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে খুব আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।" শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এমনি সম্মান করিতেন। আগেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে 'কালের যাত্রা' নাটিকাখানি উৎসর্গ করেন; শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীল বিপ্লবী মনের প্রতি

রবীন্দ্রনাথের আস্থা এই উপহারের মধ্যে রহিয়াছে।* অথচ পরস্পরের দীর্ঘ পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চেতনায় স্থূলতার জন্যই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। চিঠি দুইখানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার সম্যক পরিচয় লাভে উভয় পত্রই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নিম্নে চিঠি দুইখানি উদ্ধৃত হইল :—

* শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ও অমল হোমকে লেখা তাঁহার দুইখানি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি লিখিয়াছিলেন : "আমার চেয়ে ভাল Novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো।" (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী, ১ম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।) অমল হোমকে তিনি লিখিয়াছিলেন : "কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি, রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে বড় ভক্ত কেউ নেই—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশীবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর পত্রগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁর জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। (শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ, ১২শ সম্ভার হইতে উদ্ধৃত।)

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালের ২৫শে আশ্বিন বেলেঘাটায় রবিবাসরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎ-সম্বর্ধনায় এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন : "আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে।··· অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি।···তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।··· কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন।"

রবীন্দ্রনাথের পত্র

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কারণ লেখক যদি ইংরেজ রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু এই পরের সহিষ্ণুতার জোরে যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটবে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এ কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্মে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র শরৎচন্দ্রকে খুবই আঘাত করে। মনে হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বক্তব্য রবীন্দ্র-মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার মনের দৈন্য ও ভীরুতার প্রতি কবি কটাক্ষ করিয়াছেন ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হন। আবেগের বশে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখেন যাহাতে তাঁহার মনের উত্তেজনাই অধিকতর ফুটিয়াছিল, যুক্তি নয়। চিঠিখানি ১৩৩৩ সালের ২রা ফাল্গুন সামতাবেড়, পানিত্রাস হইতে লিখিত হইয়াছিল। এই চিঠি 'পথের দাবী'র প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে পড়ে। উমাপ্রসাদ বাবু এই চিঠি কবির হাতে পৌঁছাইলে বাংলার দুই দিক্‌পাল সাহিত্যিকের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবে এবং ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিবে ও সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই মর্যাদা-হানি হইবে, এইরূপ বিবেচনায় চিঠিখানি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া না দিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেন বলিয়া শোনা যায়। মণীন্দ্র চক্রবর্তী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে চিঠিখানির নকল লইয়া তাঁহার 'দরদী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৩-৫) ছাপিয়া দিয়াছেন। 'দরদী শরৎচন্দ্র' হইতে চিঠিখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহাতে প্রকাশিত ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্রের অভিমান, আবেগাতিশয্য ও রাজনৈতিক চেতনায় স্থূলতা যে কোন পাঠকেরই চোখে পড়িবে :—

শরৎচন্দ্রের উত্তর

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা ক'রতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্‌লা ভাষায় এধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দু'দিন আগেপিছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ থাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না দিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয়ত করতেই হবে…তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এইজন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি-ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যেও হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হ'ল

কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ-ছানা-মাখন পায় না বলে কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি jail authority ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কি না এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য-সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তি কারও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এই বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justification'ও তেমনি আছে।

আমার মতে আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়েছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক সাহিত্যকীর্তি হিসাবে 'পথের দাবী' বহু-প্রশংসিত গ্রন্থ, বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বাজেয়াপ্ত থাকিবার কালেও এই গ্রন্থের একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পড়িবার জন্য বহু দুঃখ স্বীকার ও ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তবু 'পথের দাবী'র আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্নই বারবার মনে জাগে যে, এই অগ্নিক্ষরা উপন্যাসটিতে কি লেখকের সার্থক রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়াছে? ইহার হৃদয়মূলক অংশের আবেগাতিশয্য

* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শরৎচন্দ্রের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী' (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটিতে তাহার পরিচয় মিলিবে: 'পথের দাবী' সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে একটি মজার ঘটনা বিবৃত করেছেন। তা হচ্ছে যে, 'একদিন কে এক প্রেন্‌টিস সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বললেন: তুমি সরকারের পক্ষ থেকে 'পথের দাবী'র মতো একখানি বই লিখে দাও, ভাল টাকা পাবে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: সাহেব, ছেলেবেলা আমার ঘুড়ি উড়িয়ে লাট্টু খেলে দিন কেটেছে। যৌবনটা গাঁজাগুলি খেয়ে; তারপরে রেংগুনে গিয়ে চাকরি করেছি। আর 'চার অধ্যায়' লেখার বয়স নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

—রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' লইয়া এইরূপ হাল্কা কথা থাকায় এই ঘটনাটি সত্য নাও হইতে পারে। শরৎচন্দ্র কোন ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের কাছে কবিগুরুর রচনা সম্পর্কে এরূপ বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন মনে হয় না। তবে ইহা যিনি লিখিয়াছেন সেই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল ছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ যে সশস্ত্র আন্দোলনের পটভূমিকা তাহাতে কি শরৎচন্দ্রের প্রকৃত আস্থা ছিল? 'পথের দাবী'র নায়ক ডাক্তার বা সব্যসাচী এই গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরে ঝড়ের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, ব্রহ্মদেশ তো এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। ভারতের মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সব্যসাচীর প্রচেষ্টার একটা বড় দিক। তাঁহার মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগঠনকারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মোদ্যমের একরূপ পূর্বসূচনা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সব্যসাচী চরিত্রই কি শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়জাত? 'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের যেরূপ প্রিয় গ্রন্থ ছিল, ইহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবার পর যেভাবে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই বাজেয়াপ্ত-করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য নিজে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রন্থখানির বর্ণিত বিষয়ের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ অনুমান করা কঠিন নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখা ও জীবনকাহিনী হইতে এই সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভাল প্রমাণ মিলে না। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, শরৎচন্দ্র আবেগপ্রবণ, দেশাত্মবোধী সাহিত্যিক ছিলেন বলিয়া দেশাত্ম-বোধক সংগ্রামী চেতনামাত্রই পথ ও মত নিরপেক্ষভাবে তাঁহার অভিনন্দন লাভ করিয়াছে এবং সেই জন্যই সশস্ত্র বিপ্লবের উপর গভীর আস্থা না লইয়াও তিনি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু যত্ন করিয়া সাজাইয়াছেন। কিন্তু 'পথের দাবী'র ভাব-প্রকৃতি এমন যে ইহার সঙ্গে লেখকের ভাবদৃষ্টির একাত্মতা নাই, ইহা মনে করিতে রসিক পাঠক-মন স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হইবে।

শরৎচন্দ্র কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলনে বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন?—'পথের দাবী' পড়িবার পর পাঠকমনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মুক্তি আনিতে চাহিয়াছিল। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার শরৎচন্দ্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সর্বত্যাগী সংগ্রামরত কংগ্রেসের নীতিবাদে প্রত্যয়সম্পন্ন ছিলেন এবং হিংসার পথে, রক্তপাতের পথে ভারতের স্বাধীনতা, আনিবার সম্ভাবনায় তাঁহার আস্থা ছিল না।

তিনি কংগ্রেসে বিশ্বাস করিয়াই কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই সাধারণভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন—ভারতের মুক্তি-আহবে এই দুটি বিপরীত পন্থা; সুতরাং একই সঙ্গে একজন কংগ্রেসপন্থী এবং সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী হইবেন ইহা আশা করা যায় না। তবে আগেই বলা হইয়াছে, আবেগপ্রবণ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের হৃদয়বোধের প্রাবল্য হয়ত স্বাধীনতা অর্জন করাটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং সেইজন্যই সশস্ত্র আন্দোলনের পথে যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা আনিবার জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। এই শ্রদ্ধাভাব হইতেই 'পথের দাবী'র জন্ম হওয়া আশ্চর্যের নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সর্বোচ্চপদে থাকার সময়ও ভারতের সশস্ত্র বা সহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতিসূচক যোগাযোগ ছিল বলিয়া শুনা যায়। সুভাষচন্দ্রের উত্তর জীবনে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এই ধারণার অনুকূল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত, শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে নেতারূপে সর্বদা অনুসরণে প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই শরৎচন্দ্রের মনে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণের বিষয় একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার আবেগ-প্রবণ মনের কথা আগেই বলা হইয়াছে। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' (১৩৬৫) গ্রন্থে আছে (পৃষ্ঠা ৬৩-৬৬)—শরৎচন্দ্র একবার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন আইনে এবং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী বিপ্লবী রাজবন্দীদের মুক্তির পর হাওড়া টাউন হলে তাঁহাদের সম্বর্ধনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চির-চঞ্চল, চিরজীবী চির-তরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি তোমাদের এত বড় আপনজন, এতবড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।"

মোটের উপর, মনে হয়, দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র দেশমাতৃকার শৃঙ্খল

মোচনের জন্য পথের সংস্কার বর্জন করিয়া বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহিংস এবং অহিংস উভয়বিধ সংগ্রামকেই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, লক্ষ্যের মহনীয়তা পথের গোঁড়ামির দ্বারা তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন নাই। এমন কি 'পথের দাবী'র মত সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক উপন্যাসেও তিনি ইহার প্রধান স্ত্রী চরিত্র ভারতীর ভিতর দিয়া সহিংস আন্দোলনের প্রতিবাদ সূচক বক্তব্য রাখিয়াছেন। যদিও সব্যসাচী 'পথের দাবী'র প্রধান চরিত্র এবং তাঁহার সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা ও অত্যুগ্র দেশপ্রেমের সক্রিয় রূপ 'পথের দাবী'কে দেশাত্মবোধী পাঠক সমাজে আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে, তবু শান্ত বুদ্ধিমতী ভারতীর বক্তব্য 'পথের দাবী'তে উপেক্ষার বস্তু নয়। ভারতী সব্যসাচীর মত শৃঙ্খলাপরায়ণ বীর বিপ্লবীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সন্ত্রাসবাদে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছে। শশিকবির বাড়ী যাওয়ার পথে নৌকায় ভারতী সব্যসাচীকে বলিল যে, নিরীহ চাষীদের মধ্যে বিপ্লব বা মারামারি কাটাকাটি ছড়ানো অর্থ তাহাদের দুঃখ আরও বাড়ানো। সব্যসাচী স্বীকার করিয়া বলিলেন, তাঁহার লক্ষ্য চাষীরা নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানেরা। তাহারাই জীবন দিয়া আদর্শ রূপায়িত করিবে। কৃষকেরা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। তাহা পঙ্গুর জড়ত্ব। ভারতী সব্যসাচীর মুখের উপর এই কথার পরোক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আমিও তাই চাই দাদা, আমাকে বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার 'পথের দাবী'র ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিঃশ্বাস আমার রুদ্ধ হয়ে আসচে।" ভারতী সব্যসাচীকে শুধু মুখে দাদা বলিত না, দাদার মতই ভালবাসিত। এই একান্ত প্রিয়জনকে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত করিতে ভারতী চেষ্টা করিয়াছে, চেষ্টা করিয়াছে সব্যসাচীকে হিংসার পথ ত্যাগ করাইতে।* 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী

*অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'পথের দাবী'তে সহিংস ও অহিংস এই দুই বিপরীতাত্মক পথের একত্র সন্নিবেশ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "বিভীষিকা পন্থার দুই দিক দেখাইবার জন্য তিনি (শরৎচন্দ্র) দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র সব্যসাচী ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ও ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরোধী অনুভূতি ও মতও এই গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা জোরালো অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সব্যসাচী অতিমানব বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে,

অবশ্য ভারতীর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, বরং ভারতীর কথার প্রতিবাদ করিয়াই আবেগভরে বলিয়াছেন, "বৃথা নরহত্যার আমি কোন দিনও পক্ষপাতী নই। ও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজহাতে আমি পিঁপড়েও মারতে পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে? আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল—সমস্ত যে কেড়ে নিল তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, রইল না আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী?" কিন্তু ভারতীর আবেদনে সাড়া না দিলেও সব্যসাচী ভারতীর মুখ চাহিয়াই বিশ্বাসঘাতক অপূর্বকে স্বাভাবিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডদানের পরিবর্তে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহাতেই ভারতীর প্রতি তাঁহার প্রসন্নতার পরিচয় মিলে। কাজেই আপন পথ ত্যাগ না করিলেও সব্যসাচী 'পথের দাবী'র সদস্যা ভারতীকে তাঁহার পথে নিষ্ঠাবতী হইবার জন্য চাপও দেন নাই। বলিতে গেলে 'পথের দাবী'তে ভারতী একরূপ অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছে মুখোমুখি সব্যসাচীর বিরোধিতা করিয়া। সে খ্রীষ্টান, যীশুখ্রীষ্টের প্রেমধর্মের গৌরবকে সে ভুলিতে পারে না। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতীক সব্যসাচীর বিপরীত-প্রান্তীয় না হইলেও সে সব্যসাচীর হিংসাত্মক বিপ্লবকে সমর্থন করে নাই। সব্যসাচী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি—"এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী"—বলিলেন, ভারতী তাহাতে অভিভূত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল যে, সব্যসাচীর কথাগুলি পুরাতন প্রচলিত কথারই পুনরাবৃত্তি, হিংসার পথে যাহারাই প্রবৃত্তি দেয়, তাহারাই এই সব কথা বলে। ভারতী দৃঢ়ভাবে জানায়, "এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের বড় কথা আছে।"

সব্যসাচী যখন কথাটা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, ভারতী তখন ব্যাখ্যা ভাল

তাহারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার শক্তি কম, যে তাঁহার প্রবল প্রভাব অনুভব করিয়াছে, যে তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মমতায় বিগলিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার হিংসার মন্ত্রকে শিরোধার্য করিতে পারে নাই। সে ভারতী। এই গ্রন্থের নায়ক ডাক্তার, কিন্তু নায়িকা ভারতী। আর এই দুইটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাও নায়ক ও নায়িকার সম্বন্ধ নহে; নায়ক ও প্রতি-নায়কের সম্পর্ক।"—(শরৎচন্দ্র, নবম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৪)

করিয়া করিতে পারিল না বটে, কিন্তু অত্যাচারের নীতির বিরুদ্ধতা করিয়া প্রকৃতপক্ষে সে সহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করিল। সব্যসাচীর প্রশ্নের উত্তরে সে উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল: "যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্বরতার দিন থেকে চলে আস্‌চে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?"

এছাড়া সব্যসাচী নাস্তিক, ধর্ম তিনি বিশ্বাস করেন না, ধর্ম নেশার মত মানুষকে কর্মবিমুখ করে বলিয়া তাঁহার ধারণা; ভারতী খ্রীষ্টান, ধার্মিক; শুধু নিজের ধর্মের মর্যাদাই সে রাখে না, হিন্দু অপূর্বর ধর্মবিশ্বাসের মর্যাদা রাখিতেও সে প্রাণপণ করে। সর্বোপরি সব্যসাচী শ্রমিকদের উপর নির্ভর করিয়া নগরকেন্দ্রিক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন, তিনি শোষণ বন্ধ করিবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, বিদেশী ইংরেজকে শোষণের জন্য ঘৃণা করার সঙ্গে মাড়োয়ারীকে শোষণের জন্য বিদেশী আখ্যায় তিনি অভিহিত করেন, কৃষকদের উপর, গ্রামের উপর নির্ভরশীলতা তাঁহার নাই বলিলেই চলে, অথচ ভারতী গ্রামের দিকে চাহিয়া আন্দোলনের রূপ কল্পনা করে, কৃষকদের সেবা করিয়া জাগাইয়া তুলিতে চায়, মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম ও কৃষকদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন মিলে তাহার মধ্যে। এইভাবে সব্যসাচী ও ভারতীর মত বিপরীত সংগ্রাম-পথে আস্থাসম্পন্ন দুটি চরিত্রকে একান্ত কাছাকাছি সহাবস্থান করাইয়া শরৎচন্দ্র উভয় পথের প্রতিই শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় রাখিয়াছেন।*

* কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের অনেকের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা করিতেন ইহা দেখাইয়া শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' (১৩৬১) গ্রন্থে লিখিয়াছেন (পৃষ্ঠা-৫২ ৫৩): "এযুগে নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা বিপ্লবীদের নিতান্ত ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্র এতে দুঃখিত হতেন। তিনি বলতেন, আমরা নন-ভায়োলেন্স গ্রহণ করেছি, কিন্তু যারা তা করেনি, করেনি বলেই যে তারা ভ্রান্ত একথা কি করে বলা যায়? ভারত উদ্ধার আমাদের পথেই হবে, অন্য কোন পথে হবে না এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যারা ফাঁসিতে

'পথের দাবী' ব্যতীত শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্রে যেটুকু রাজনৈতিক পরিবেশ ও ঘটনা-সংস্থান হইয়াছে (শরৎসাহিত্যে সামাজিক পরিবেশেরই প্রাধান্য) তাহাতেও শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত দুই বিপরীত পন্থার মধ্যে

ঝুলেছে তারা দেশের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দিচ্ছে একথার মধ্যে গোঁড়ামী ছাড়া আর কি থাকতে পারে?"

ইহার পরই শচীনন্দন বাবু লিখিয়াছেন: শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তিনি কংগ্রেসের অহিংসানীতি গ্রহণ করেছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না কিন্তু বিপ্লবী কর্মীদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে যখনি প্রয়োজন হয়েছে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। এসময় হাওড়া জেলাতে শিবপুর, শালকিয়া ও ডোমজুড় প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কর্মীদের কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানের বিপ্লবী কর্মীদের রোগের চিকিৎসার জন্যে, আত্মগোপন করে থাকবার জন্যে এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে সর্বদাই অর্থসাহায্য করেছেন। তাঁর প্রিয়তম সহচর প্রবোধ বসুর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁদের জন্য প্রবোধবাবু যখনই প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের কাছে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। শিবপুরের এবং ডোমজুড়ের বিপ্লবী কর্মীরাও যখনি দুরবস্থায় পড়ে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র অর্থসাহায্য করেছেন, কখনো না বলেন নি। একবার মেদিনীপুর জেলার এক বৈপ্লবিক কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী একটি রাজনৈতিক মোকর্দমায় গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী জেলে ছিলেন, চুঁচুড়া আদালতে স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাঁদের বিচার হয়েছিল। এঁদের দলের শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস ছিল আমার বন্ধু। আদালতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, স্বদেশরঞ্জন বললে, 'ভাই, জেলখানাতে সময় কাটাবার জন্যে কিছু বই দিয়ে যেও, আর শরৎদাকে আমাদের প্রণাম দিও।' আমি শরৎচন্দ্রকে গিয়ে বললুম, তিনি আমার হাত দিয়ে তাদের জন্য অনেক টাকার বই কিনে পাঠিয়ে দিলেন। স্বদেশ একখানা ভাল গীতা চেয়েছিল, শরৎচন্দ্র নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে তিনখানা বিভিন্ন প্রকারের ভাল গীতা এনে পাঠিয়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ৺ বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের বহু বিপ্লবী কর্মী ছিলেন বিপিনদার শিষ্য। এদের যে কেহ যখনই কষ্টে পড়ে শরৎচন্দ্রের সাহায্য চেয়েছেন তিনি তখনি তাঁর সস্নেহ সাহায্য পেয়েছেন!"

কোন্‌টিতে তাঁহার প্রকৃত আস্থা তাহা যেন ভাল বোঝা যায় না। 'পথের দাবী'তে বিপ্লব-আন্দোলনের পতাকা আকাশে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, বিদেশী রাজশক্তি ছাড়া ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ইহাতে প্রবল বিক্ষোভ ধ্বনিত হইয়াছে, আবার 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে শরৎচন্দ্র ১৩৩৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে 'পথের দাবী'র বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। এই পত্রে ছিল : "ভূপেন, একখানি মাসিক পত্রিকার তুমি সম্পাদক, catchword-এর মোহ যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। কারণ, এ-কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war :—আত্মকলহ গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী। (১৩৩৬, আষাঢ় সংখ্যা 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত)

এই পত্রের মধ্যে, বলা নিষ্প্রয়োজন, রাজনৈতিক চিন্তার দিক হইতে দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ না হইলেও ইহাতে শরৎচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিধ্বংসী কার্যকলাপের মোটামুটি প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বদেশী ডাকাতি, শোষণ বন্ধের নামে হত্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠান, জন-সাধারণের নামে শ্রমিক ও জনগণকে উত্তেজনায় মারমুখী করিয়া তোলা, আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া অরাজকতার সৃষ্টি,—এককথায় মারামারি, কাটাকাটি, ভাঙ্গনের ভয়ঙ্কর রূপের সহিত জড়িত যে বিপ্লব-প্রয়াস, সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের যাহা আনুষঙ্গিক ও প্রায় অঙ্গাঙ্গরূপ, শরৎচন্দ্র তাহাতে প্রীতিভাজন তরুণ ভূপেন্দ্রকিশোরকে নিরুৎসাহ করিতে চাহিয়াছেন। শরৎচন্দ্র মনে করিতেন সশস্ত্র বিপ্লবের আগুনের দাহিকাশক্তি যেরূপ, আকর্ষণশক্তিও তেমনি। পুড়িবার এবং পুড়াইয়া মারিবার উৎসাহ দেশের তরুণ সমাজে সঞ্চারিত হইলে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। ভারতে রাজনৈতিক বিপ্লব আন্দোলনের যেরূপ অবিন্যস্ত রূপ এবং বিপ্লবীদের যেরূপ উত্তেজনা-প্রাবল্য, পক্ষান্তরে বিদেশী রাজশক্তির যেরূপ প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, তাহাতে পথ অবাধ হইলে দেশ ধ্বংসস্তূপে ভরিয়া যাইবে, দেশের মুক্তিসংগ্রাম সর্বাত্মক হইবে না, স্বাধীনতা

স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ বিলম্বিত হইবে। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ) শরৎচন্দ্র এই আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আছে, বিপ্লব যদি করিতেই হয় তাহার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি চাই। শুধু অস্ত্র হাতে পাইলে কার্যোদ্ধার হয় না, পূর্বাহ্ণে মন গড়িয়া তোলা দরকার। শরৎচন্দ্র ইহাতে লিখিয়াছেন: "ধৈর্য ধরে তার (বিপ্লবের) প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিন্তাহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্য তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। যারা মনে করে জগতে আর সব কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না—ওটা সুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত কিছু জানুক বিপ্লব-তত্ত্বের কোন সংবাদই জানে না।"

এইভাবে সমকালীন দেশের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাছাড়া এক জায়গায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার এই আন্দোলনের প্রতি আপেক্ষিক অনুরাগহীনতারই পরিচয় দিয়াছেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে এই ঘটনাটি আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত শরৎচন্দ্র বরিশালে রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে চলিয়াছেন, ষ্টীমারের ডেকে দেশবন্ধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এ দেশের 'রেভোলিউশনারীদের' সম্বন্ধে দেশবন্ধুর যথার্থ মতামত কি। ইহার উত্তরে দেশবন্ধু যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র এমন সুন্দরভাবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে পড়িলেই ইহার পিছনে শরৎচন্দ্রের নিজের সমর্থনও অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। এখানে আছে: "সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই এ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা'ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষে আলো অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।”

‘পথের দাবী’র মত গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন, সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সহিত যোগ না থাকিলেও তাঁহার কোনো সহানুভূতি ছিল না একথা ভাবিতেও অস্বস্তি লাগে, কিন্তু কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্রের ইহার প্রতি সমর্থন আছে। অসমাপ্ত উপন্যাস ‘জাগরণ’-এ (শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, তৃতীয় সম্ভার) নায়ক অমরনাথ অসহযোগ আন্দোলনের একজন কর্মী, সে পিকেটিং করিয়া হাটে বিলাতী কাপড় বিক্রী বন্ধ করে, নিরক্ষরতা দূর করিতে নৈশ বিদ্যালয় খোলে, জমিদারের শোষণের প্রতিবাদ করে প্রকাশ্যে। গ্রন্থ যদিও শেষ হয় নাই, তবু যতটুকু লেখা হইয়াছে, তাহার মধ্যেই অমরনাথ যে লেখকের প্রতি ধন্য তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। জমিদার বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার রে সাহেব (নায়িকা আলেখ্যর পিতা) অমরনাথের একরূপ প্রশস্তি করিয়া বলেন যে তাহারা “চারিদিকে গান্ধীর নন্ কো-অপারেশন মত প্রচার করে বেড়িয়েছে; দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা মারামারি কাটাকাটি ক’রো না, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কো’রো না, কিন্তু এই অনাচারী, ধর্মহীন, সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্নমেণ্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো না, চাকরীর লোভে এর দ্বারে যেও না, বিদ্যের জন্যে এর স্কুল কলেজে ঢুকো না, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্যন্ত মাড়িও না।* বাজে শিবপুর

*অমরনাথের অসহযোগ চিন্তার একটু নমুনা : আলেখ্যদের বহু টাকার আসবাবপত্র কেনার প্রস্তাব হইয়াছে, অমরনাথ আপত্তি করিল। আলেখ্য বলিল, “কিন্তু জিনিস কেনা আমার কি করে বন্ধ করবেন? আমার প্রজাদের বোধ করি খাজনা দিতে নিষেধ করে দেবেন?

অধ্যাপক কহিলেন, অসম্ভব নয়। প্রজাদের অনেক দুঃখের টাকা।

আলেখ্য বলিল, কিন্তু তাতেও যদি বন্ধ না হয়, বোধ করি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবেন।

হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে লেখা এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র তাঁহার স্নেহধন্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের কাজে তাঁহার ব্যস্ততার কথা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন, "যথার্থই দিদি এখন আমার এক মুহূর্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' 'প্রথম সংস্করণ' পৃষ্ঠা ৮৮ হইতে উদ্ধৃত)। কংগ্রেসের সেবায় তথা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কাজে এইভাবে তিনি একদা নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'আমার কথা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনকে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করেন। অসহযোগ আন্দোলনের মর্মবাণী কি, কি তাহার নৈতিক শক্তি, যাহারা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তাহারা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করে এবং দেশবাসীর কতখানি শ্রদ্ধা তাহারা দাবী করিতে পারে, শরৎচন্দ্র এইসব কথা এখানে জোরের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের লোক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীদের যোগ্য সম্মান দেয় না ইহা লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র কিরূপ ব্যথাবোধ করিতেন তাহাও এই প্রবন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহাতে লিখিয়াছেন: Non-Co operation বস্তুটা ভিক্ষে চাওয়া নয়, ও একটা কাজ, সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয় যে, Non-Co operation পন্থা এদেশে অচল, মুক্তির পথ সেদিকে যায়নি। অন্ততঃ এখনও একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে এখনো বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকিল তার ওকালতি ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে, চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এঁরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আপনার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, পীড়িত, ভিক্ষুকের দল।...অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে।"

অধ্যাপক কহিলেন; ভাঙবো কেন? আপনাকে কিনতেই ত দেবো না।...

মহাত্মা গান্ধীকে শরৎচন্দ্র নেতারূপে কিরূপ ভক্তি করিতেন সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রবর্তিত ও পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল এবং এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, একথা তাঁহার লেখা হইতেই বুঝা যায়।* বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের আবেগে বা উত্তেজনায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দেশের সকলের মনে আশানুরূপ সাড়া না জাগাইলেও এবং কেহ কেহ শেষপর্যন্ত প্রবল-পরাক্রান্ত ইংরেজকে এই আন্দোলনের সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে তাড়ানো সম্ভব হইবে কি না সে সম্পর্কে সন্দিহান হইলেও শরৎচন্দ্র এই আন্দোলনে সৈনিকত্ব বরণ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্যিক হইয়াও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর চরকা আন্দোলনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের

*মহাত্মা গান্ধীর ও তাঁহার দ্বারা পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও আস্থার গভীরতা তাঁহার অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। জমিদার ব্যারিষ্টার সাহেবের (রাধামোহন রায়ের) মনে যাহা জাগিয়াছে তাহা অস্থায়ী আবেগ মাত্র, বিপরীত কথাও তিনি বলিতে পারেন, কিন্তু এই পংক্তি কয়টির মধ্যে যে দৃঢ় আস্থাভাব আছে তাহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব। এখানে আছে "...যথেষ্ট পরিমাণ না থাকার জন্যই হউক বা স্ত্রীর মৃত্যুতে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতেই হউক, এক সাহেবিআনা ব্যতীত আর সমস্তই ত্যাগ করিয়া তিনি (মি. রে) একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা বড় শহরে নির্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন। এমনি সময় একদিন তাঁহার নিশ্চিন্ত শান্তি ও সুগভীর বৈরাগ্য দুই-ই যুগপৎ আলোড়িত করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নন্-কো-অপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ একমুহূর্তে একেবারে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ অসহযোগ' নিমিষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ-দৈন্য, যত উৎপাত-অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জনা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া সঞ্চিত আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গবেগে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।"

সহযোগিতা চাহিয়া আবেদন জানাইতেন। তিনি নিজে মহাত্মা গান্ধীর কাছেই একবার চরকা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' (১৩৬৫) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৯৪): "I have learnt spinning because I have love for you though not for charka ···I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders."—তথাপি সংগঠনের মুখ চাহিয়া সমগ্রভাবে আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তিনি নেতার নির্দেশে প্রচার-কার্যও চালাইয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতাকামী সকল মানুষকে এই আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা তিনি কংগ্রেস কর্মীরূপে করিয়াছেন। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, যাহারা অর্থনীতির হিসাবে চরকার দ্বারা কাপড়ের কলের স্থান পূরণকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সহিত এ হিসাবে তর্ক তিনি করতে চান না। তিনি জানেন যে, কাঠের চরকা দ্বারা লোহার যন্ত্রকে হারানো যায় না এবং গেলেও তাহাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। কিন্তু সে প্রশ্ন অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক প্রশ্নে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে সংগঠনের, আদর্শের নৈতিক শক্তির কথাই বড় করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আন্দোলন যখন চরকাকে কেন্দ্র করিয়া হইতেছে, তখন "জাপানী সুতায় দেশের তাঁতের কাপড় দিয়ে হোক, দেশের কল-কব্জার তৈরী কাপড় দিয়ে অথবা খেয়ালী লোকের খদ্দর দিয়েই হোক, এ ব্রত উদ্‌যাপন করাই ব্রত।" মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শরৎচন্দ্রের একটি শ্রদ্ধার্ঘ্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। মহাত্মা গান্ধীর কথা বুঝাইতে গিয়া মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ১৩২৯, বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে বিধৃত হইয়াছে: "সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্রশস্ত্র বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁহার সমস্ত আবেদন, নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই এবং সহানুভূতিই যখন সকল জীবের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ

করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন, যত আচ্ছন্নই না হইয়া যাক, একদিন ইহাকে নির্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই ধর্মযুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি জীবের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। অবিচারের যাঁতাকলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে। এইরূপ সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা ব্রতকে মাত্র ক্ষণিকের উপায় বলিয়া নয়, চিরজীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শরৎচন্দ্রের সময়ে রাজনীতির দিক হইতে পরাধীনতাক্লিষ্ট বহু ভারতবাসী পিছাইয়া ছিল, স্বদেশী আন্দোলনে যাহারা কারাবরণ করিত সকলে তাহাদের দেশাত্মবোধ স্বীকার করিয়া অভিনন্দন জানাইত না। জেলখানা পাপী কয়েদীদের জায়গা, তাহা সৎব্যক্তির স্থান নয়, এই ছিল কিছু লোকের ধারণা। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাসের মাধ্যমে দয়াময়ীর এই ধারণা ভাঙিয়া শরৎচন্দ্র পাঠক সমাজকে আন্দোলনকারীদের কারাবরণের গৌরব সম্পর্কে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুত্র দ্বিজদাস স্বদেশী করে, এজন্য তাহার জেল হইতে পারে এবং যদি তাহার জেল হয় তাহা হইলে ঐতিহ্যপূর্ণ মুখুজ্যে বংশ কলঙ্কলিপ্ত হইবে, এই ছিল দয়াময়ীর আশঙ্কা। বিপ্রদাস কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজদাসের স্বদেশী করাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে না, অন্যায় মনে করে তাহার নিষ্ঠাহীন স্বদেশী করাকে। মাকে বিপ্রদাস বুঝাইয়া দেয়, দ্বিজদাস স্বদেশী করিয়া জেলে গেলে গ্লানি নাই, কারণ দেশের জন্য কারাবরণ হীন কাজ নয়, গৌরবের কাজ! বিপ্রদাস তাই বলে, "জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে।"

সামাজিক গল্প-উপন্যাসের শক্তিমান শিল্পী শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার দৃঢ়তা বা পূর্ণতা ছিল না একথা আগেই বলা হইয়াছে। তাহা থাকিলে তিনি বিপ্রদাসের মত উপন্যাসে দ্বিজদাসকে রাজনৈতিক পটভূমিতে ঐরূপ অপরিণত

রাখিয়া উপন্যাসের কাহিনীকে সামাজিক বা পারিবারিক অরণ্যে হারাইয়া যাইতে দিতেন না। যে দ্বিজদাস 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রেম নিবেদন করে, সেই আবার নব-পরিচিতা বৌদির সম্পর্কিত বোন তরুণী বন্দনার অনুরোধে তাহারই নায়কত্বে সংগঠিত স্বগ্রামের রাজনৈতিক মিছিলে যোগদানে বিরত থাকিয়া মিছিলে পুলিসের লাঠালাঠির সম্ভাবনায় সন্ত্রস্তা মাতা দয়াময়ীর আতঙ্ক দূর করে। উগ্র রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'তেও ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যতটা বলিষ্ঠভাবে শরৎচন্দ্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, সংগ্রামের প্রকৃত ছবি বা সংগ্রামের বাস্তব পথ ততটা দেখাইতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী কথাসাহিত্যিকের নরম হৃদয়বোধের দাবীতে শরৎচন্দ্র যেন এই রাজনৈতিক আবর্তসঙ্কুল উপন্যাসের পটভূমিতে একটি শ্যামল আশ্রয়পীঠ সযত্নে রচনা করিয়া সেখানে নরনারীর ভালবাসার কাহিনীগুলিকে সাগ্রহে স্থাপন করিয়াছেন। ইহা মানবতাবোধের প্রভাবজাত হইতে পারে, ঔপন্যাসিক প্রতিভার মৌল পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'পথের দাবী'র মূল্য এই মানবতাবোধের বৃত্তে আবর্তিত হওয়ায় ইহার ঔজ্জ্বল্য নিঃসন্দেহে কিছুটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবী নায়ক সব্যসাচীকে পর্যন্ত এই আবেগ-তরঙ্গে তরঙ্গিত করা হইয়াছে। অথচ একদিন কারখানার বয়লার ঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময় সুমিত্রা ভারতীর কাছে অগ্নিগর্ভ অথচ ঢাকা দেওয়ার জন্য বাহিরে শান্ত বয়লারের সহিত সব্যসাচীর তুলনা দিয়াছিল। অপূর্ব যে কতখানি ভীরু, কিরূপ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর তাহার পরিচয় 'পথের দাবী'তে আছে। যেদিন ফয়ার মাঠে শ্রমিক সমাবেশ হয়, সেদিন সভানেত্রী সুমিত্রার নির্দেশমত সামান্য একটি ঘোষণা অপূর্ব পুলিস উপস্থিত বলিয়া করিতে সাহস পায় নাই, তাহার জায়গায় রামদাস তলোয়ারকর উপযাচক হইয়া এই কাজ করিয়া পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত ও বন্দী হইয়াছে। তারপর 'পথের দাবী'র অফিসে রামদাস যখন কৃষ্ণ আইয়ার কর্তৃক জামিনে মুক্ত হইয়া আসিয়া সব্যসাচীকে পুরাতন সহকর্মীদের কথা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার কাহারও ফাঁসি কাহারও জেলের কথা বলিতে বলিতে নিজের ফাঁসির সম্ভাবনা যখন বলিতেছিলেন, অপূর্ব ভয় পাইতে পাইতে আর সামলাইতে না পারিয়া তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।* সেদিন কৃষ্ণ আইয়ার তাহার

* অপূর্ব কিরূপ ভীরু ও স্বার্থপর তাহা মৃত্যুর প্রান্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া

ভীরুতায় বিস্মিত হইয়াছে, এরূপ সেন্টিমেণ্টাল লোক এখানে কেন? ডাক্তার সেদিন অপূর্বকে মানাইয়া লইয়া কৃষ্ণ আইয়ারকেই বলিতে গেলে একটু কঠিন কথা বলিয়াছেন, "সেন্টিমেণ্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হলেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।" তারপর কৃষ্ণ আইয়ারের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করিয়া ভীরু অপূর্ব পুলিসের কাছে 'পথের দাবী'র সন্ধান দিয়াছে, ইহার সদস্যরা রিভলবার রাখে জানাইয়াছে, ডাক্তারই যে সব্যসাচী একথা বলিয়াছে। ইহার ফলে তাহার চাকুরী বাঁচিয়াছে কিন্তু রামদাস অবিলম্বে কর্মচ্যুত হইয়াছে। 'পথের দাবী'র সদস্যরা সংবাদ পাইয়া কৌশলে অপূর্বকে বন্দী করিয়া আনিয়া এই বিশ্বাসঘাতকের বিচার করিয়াছে এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছে। অপূর্বর সহকর্মী বন্ধু রামদাস অভিযোগ আনিয়াছে, সভানেত্রী সুমিত্রা সদস্যদের মত জানিতে চাহিয়াছে, ভারতী ও সব্যসাচী বাদে সমস্ত সদস্য একবাক্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছে। কৃষ্ণ আইয়ার হীরা সিংয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছে বাগানের উত্তর কোণে যে শুকনো কূয়া ছিল, একটু বেশী মাটি চাপা দিয়া কিছু শুষ্ক ডাল-পালা ফেলিয়া দিয়া মৃত-দেহের গন্ধ বাহির হওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু এই সময় ডাক্তার বাদ সাধিলেন। ভারতী বন্দী অপূর্বকে দেখিয়া তাহার কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভারতীর প্রেমাস্পদকে সকলের মতের বিরুদ্ধে মুক্তি দিলেন। ডাক্তারের বক্তব্যই রহিল, অপূর্ব দুর্বল কিন্তু দেশপ্রেমিক। অতঃপর এই দুর্বল মানুষটিকে সবল করিবার ভার ভারতীর। ডাক্তারের এই অভাবিত স্বৈরাচারের প্রতিবাদে সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হইল, উত্তেজিত হইল, বিদ্রোহের অবস্থা হইল, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ডাক্তার সব কিছু থামাইয়া মুক্ত অপূর্বকে ভারতীর

ভারতীর সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়াই তাহার কথাবার্তায় প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা নাই, ডাক্তারের এত বড় অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা নাই, নিজের নিদারুণ অন্যায় সম্বন্ধে সচেতনতা নাই, অপূর্ব পাঁচশো টাকা মাহিনার চাকরী ছাড়িবার শোকে আকুল হইয়াছে এবং অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, মা ব্রহ্মদেশে আসিতে তাহাকে একশ' বার মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শুনে নাই। ইহার ফল হইল এই যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে সে পড়িয়া রহিল। এখন দুর্গা বলিয়া জাহাজে উঠিতে পারিলে সে বাঁচে।

সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে দলের প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল, যাহার জন্য ব্রহ্ম দেশে 'পথের দাবী'র কাজ অনেকটা বন্ধ হইয়া গেল, দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, সব্যসাচীর নেতৃত্বে অনুগত সদস্যদের অনাস্থা জন্মিল, সে শুধু ভারতীর প্রেমিক বলিয়াই স্বাধীনতা আন্দোলনের এতবড় শত্রুতা করিয়া বাঁচিয়া গেল; ডাক্তার দলের সর্বনাশ ও ভাঙন মানিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে অপূর্ব বাঁচিয়াছে, কিন্তু ভালবাসার ধন এই দুর্বল পুরুষটিকে বাঁচাইয়া ভারতীর নারীসত্তার যে তৃপ্তিই হোক, 'পথের দাবী'র দেশপ্রেমিকা দায়িত্বশীল সদস্যা ভারতীর মন কি ইহাতে অস্বস্তিবোধ করে নাই? বলা বাহুল্য, অপূর্ব প্রসঙ্গে বিপ্লবী নায়ক ডাক্তারের এই কোমল মনোভাব শরৎচন্দ্রের নিজের কোমল-কঠিন মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত। ইহা সংগ্রামী সৈনিক ও হৃদয়বোধ-সম্পন্ন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিচিত্র মানসলোকের পরিচয় বহন করিতেছে।

তবে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ আলোচনায় ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তির প্রভাবজনিত একটু এলোমেলো ভাব দেখা গেলেও দেশপ্রেমের ব্যাপারে কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনে কোন খাদতো ছিলই না, অধিকন্তু উষ্ণ হৃদয়াবেগের দ্বারা তাহা গতিশীল ও অন্য-হৃদয়-স্পর্শনক্ষম ছিল। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার দেশপ্রেমিক রূপটিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র গভীর প্রত্যয়বশেই 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী') লিখিয়াছেন: "দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করি।" সাহিত্য-কৃতিতে রাজনৈতিক চিন্তার ঘন-সন্নিবদ্ধতা ততটা না থাকিলেও দেশকে ভালবাসিবার প্রশ্নে শরৎচন্দ্র যে শ্রদ্ধার্হ তাহা শুধু 'পথের দাবী'র পাঠকেরা নয়, সমগ্র শরৎসাহিত্যের পাঠকেরাই স্বীকার করিবেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত সর্বোচ্চ স্তরে আরূঢ় কংগ্রেসনেতাও শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া তাঁহাকে 'কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৪)। তাঁহার সময় দেশকে যাঁহারা ভালবাসিতেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা সৈনিক, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রাণ-প্রিয় ছিলেন। এইজন্য তরুণদের, বিশেষ করিয়া ছাত্রদের শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

শরৎচন্দ্র নিজে স্বদেশকে ভালবাসিতেন এবং সকলে যাহাতে স্বদেশকে ভালবাসে সেজন্য তিনি সব সময় উৎসাহ দিতেন। মাতৃভূমির প্রত্যেকটি সন্তান দেশজননীর মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করুক, দেশের স্বাধীনতা কঠিন হইলেও করায়ত্ত হইবেই,—ইহা শরৎচন্দ্রের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। নিজেকেও তিনি এইভাবে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটু আয়েসী মানুষ ছিলেন। যৌবনের মদের নেশা পরে আফিংয়ের নেশায় রূপান্তরিত হইয়াছিল, আফিংয়ের নেশা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই; কিন্তু 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবার পর যখন তাঁহার জেলে যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন তিনি জেলে যাইতেই প্রস্তুত হইলেন* এবং জেলে আফিং মিলিবে না এইজন্য আফিং খাওয়া ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করায় এই সময় তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শরৎ পরিচয়', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬০-এ এই কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে।) দেশের জনসাধারণ যাহাতে জাতীয় সংগ্রামে উৎসাহিত হয় সেজন্য

*শরৎচন্দ্র মনে করিতেন ভিড় করিয়া জেলে গিয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বাহিরে থাকিয়া দেশের কাজ করিয়া যাওয়ার প্রয়োজন কম নয়। তবে কাজ করিতে করিতে আবশ্যক হইলে মুক্তিসংগ্রামের সৈনিককে তো জেলে যাইতেই হইবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সম্বর্ধনা বয়কট করার এবং কলিকাতায় হরতাল পালিত হইবার সময় শরৎচ কংগ্রেসের কাজ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে এভাবে কাজ করিলে এক সময় তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইতে পারে এবং সেইজন্য তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় বে-আইনী মিটিংয়ে গেলেই বা বে-আইনী শোভাযাত্রায় যোগ দিলেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। এইরূপ বন্দিত্ব স্বীকারে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ছিল না। এই সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় "শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন", (১৩৬৮) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল: "আমি সেজে গুজে আমাকে ধর ধর ভঙ্গী করে জেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াব না। কাজ করতে করতে এমনি ধরে নিয়ে যায়, যাবো, কিন্তু জেলে যাবার জন্যে জেলে যাব না।"

তিনি 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'আমার কথা' প্রবন্ধে তাহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন স্বরাজকে জন্মস্বত্ব মনে করিলে তাহা অর্জনের জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব কোনক্রমেই এড়ানো যাইবে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত সংযোগের বিষয় প্রধান আলোচ্য হইলেও ইহাতে তিনি মুক্তিকামী দেশবাসীকে উদার আশ্বাস দিয়াছেন। তাহাদের সংগ্রামী প্রয়াসকে অভিনন্দিত করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: "স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই।"*

ছাত্র সমাজই দেশের ভরসা, দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপর নির্ভর করে বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিতেন। ছাত্ররা লেখাপড়া করে, মন তাহাদের মার্জিত, সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়। তাহাদের মধ্যে তারুণ্যের আবেগ আছে, আদর্শবোধের নিষ্ঠা আছে। বরণীয় নূতনকে গ্রহণ করিবার মত মানসিক উদারতা আছে। ছাত্ররা বড় হউক এবং দেশকে বড় করুক ইহাই তিনি চাহিতেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে প্রদত্ত ভাষণে (১৯৩৪) তিনি কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন: "তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও।" দেশের আগামী দিনের আশা ভরসা এই ছাত্ররা মন দিয়া পড়াশুনা না করিলে, যোগ্য নাগরিক হইয়া

*রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে (এপ্রিল, ১৯২৯) সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, (ভারতে ইংরেজ রাজ্য) "শয়তানের রাজ্য কিনা এসব প্রমাণ করবার দায়িত্ব যুব সমিতির নেই। ...স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বরাজ্যও দেশের যৌবন শক্তি কোনদিন প্রার্থনা করবে না।"

না উঠিলে দেশের সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিতে বা সমস্যাদির মীমাংসা করিয়া দেশের ভার বহন করিতে পারিবে না একথা শরৎচন্দ্র ভালভাবেই জানিতেন। সেইজন্য ছাত্রসমাজকে মানুষ হইতে উৎসাহ দিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ এইরূপ আদর্শ মানুষ গড়িতে চাহিয়াছে, 'পণ্ডিত মশাই'য়ের বৃন্দাবন এবং তাহার বন্ধু কেশবও তাহাই চাহিয়াছে। তবু শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার হিসাবে লক্ষণীয় হইল এই যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে তিনি এই ভবিষ্যৎ জাতীয় সম্পদ ছাত্রসমাজকেও আহ্বান জানাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মালিকান্দা অভয় আশ্রমে পশ্চিম বিক্রমপুর যুব ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র ছাত্র ও যুবসমাজকে দেহে ও মনে শক্তি অর্জনে উৎসাহিত করিয়া বলেন যে, সবার চেয়ে বড় সত্যাশ্রয়ী হওয়া। তাঁহার বাণী ছিল, "তোমরা দৃঢ়পণ সত্যাশ্রয়ী হও।" ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের ঠিক আগে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শরৎচন্দ্র ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার সভাপতির অভিভাষণটিই 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ। ইহাতে তিনি যুবক, তথা ছাত্রদের সুস্পষ্টভাষায় বিদেশী শাসন হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ-গঠনে উৎসাহ দেন। উদাত্তভাবে তিনি ঘোষণা করেন, "ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার. দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে এবং এই অধিকারের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবারও অধিকার আছে।" এই প্রসঙ্গেই তিনি ১৩৩৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যুবসঙ্ঘ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "বয়স কাউকে আটকে রাখতে পারে না।—তোমাদের মত কিশোর বয়স্কদেরও না।

একজামিনে পাশ করা দরকার,—এ (স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ) তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলা থেকে এই সত্য চিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না।"*

---

*দেশের স্বাধীনতা আনিতে দেশবাসীকে কিভাবে সর্বস্ব ত্যাগে আগ্রহী হইতে হইবে, শরৎচন্দ্রের সেই ধারণার উজ্জ্বল উদাহরণ 'পথের দাবী'র রামদাস

ঘোটের উপর, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, যে কোন পটভূমিতেই শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, দেশের মঙ্গল চিন্তা হইতে, দেশবাসীর কল্যাণচিন্তা হইতে নিজেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে দেন নাই। বিদেশী শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে, স্বদেশের ক্ষমতাবান স্বার্থপর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা লেখনী চালনায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন এবং আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে সেই সংগ্রাম চালাইতেন। এই বুদ্ধি বিবেচনার ক্ষেত্রে যেখানে ফাঁক ছিল

তলোয়ারকর। 'পথের দাবী'র সভ্য হইবার পর অপূর্ব সে-কথা রামদাসকে জানাইলে রামদাস বলিল যে আহ্বান আসিলে সেও এই সংস্থার যোগ দিতে পারিত; কিন্তু অপূর্ব তো তাহাকে আহ্বান করে নাই। অপূর্ব লক্ষ্য করিল রামদাসের কণ্ঠে অভিমানের সুর, কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল, "আপনি ত জানেন, এসব কাজের কত বড দায়িত্ব, কত বড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, আপনি গৃহস্থ,—তাই আপনাকে এই ঝড়ের মধ্যে আর ডাকৃতে চাইনি।"

তলোয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয়? অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলোয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অন্যত্র আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এই বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলোয়ারকর কহিল, বোধ হয়! তা হ'তে পারে। কিন্তু বিজিত পরাধীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ববাবু। তার যে আর কোন নাম নেই একথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম, মাতৃভূমির সেবা তার চেয়ে বড ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্মাচরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজি, আমি কখনো বিবাহ করতাম না।"

ফয়ার মাঠে সভার দিন তলোয়ারকর দেশপ্রেমের এই গভীর আবেগেই জনতার কাছে সুমিত্রার নির্দেশিত যে ঘোষণা অপূর্ব ভীরুতা-বশে করিতে পারিল না, তাহা উপযাচক হইয়া করিতে গিয়া পুলিসের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বন্দী হইয়াছে।

সেখানে তিনি অবিন্যস্ত, কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতার অভাব কখনও ঘটিত না। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এই কথাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের উপযুক্ত হইতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার মত। 'পথের দাবী'র অপূর্ব ভাবাবেগ-প্রবণ দেশাত্মবোধী বাঙ্গালী, কিন্তু সে দুর্বল-মনা মানুষ। অপূর্ব আদর্শ রাজনৈতিক সৈনিক নয়, দেশাত্মবোধ ও কর্মশক্তি উভয়ের সমন্বয় ভারতীর মধ্যে হইলেও অসহায় পুরুষকে রক্ষণ-প্রবণতা হইতে তাহাকে ভালবাসিবার যে চিরন্তন হৃদয়-বৃত্তি নারী-হৃদয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, ভারতী তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। নবতারা শশি-কবির সহিত বিবাহের দিনে শশিকে বিবাহ না করিয়া আহম্মদকে বিবাহ করিয়া বসিল, শশির অসহায়তা ও গভীর প্রেম লক্ষ্য করিয়া সেদিনও ভারতীর মন তাহার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে এবং শশির দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের সঙ্গে এই অসহায়তা ও প্রেম যুক্ত হইয়া শশিকে ভারতীর চোখে এমন সম্পদ করিয়া তুলিয়াছে যে তুলনা-মূলকভাবে অপূর্ব ম্লান হইয়া গিয়াছে। একদিন ভারতী ডাক্তারকে বলিয়াছিল, শশিকে কোন নারী ভালবাসিতে পারে না। সেদিন ভুল ভাঙ্গিলে ভারতী অকুণ্ঠিত চিত্তে শশির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল! চঞ্চল মনের জন্যই বোধহয় শশি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, ভারতী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল আপন মনের কথা: "একদিন দাদার (ডাক্তারের) কাছে বলেছিলাম, কোন মেয়ে মানুষেই কোনদিন আপনাকে ভালবাস্‌তে পারে না। সেদিন আপনাকে আমি চিনি নি। আজ মনে হচ্ছে অপূর্ববাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো।" তবু শেষ পর্যন্ত ভারতী অপূর্বকে ছাড়িতে পারে নাই, আপন কোমল হৃদয়ের ছায়ায় আশ্রয় দিয়া অপূর্বকে সে 'পথের দাবী'র উগ্র রাজনীতির উত্তাপ হইতে সরাইয়া লইয়াছে। কিন্তু শশিকবি বা নয়নতারাকে, অপূর্ব বা ভারতীকে, এইভাবে আঁকিলেও শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস 'পথের দাবী'তে রাজনৈতিক বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়নিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে দুইটি উজ্জ্বল চরিত্র আনিয়াছেন সব্যসাচী ও হীরাসিং। চরিত্র দুইটি যেন এক আদর্শ-দণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থান করিয়া দণ্ডটির ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। দুজনেই আদর্শ চরিত্র, একজন নেতা, তাঁহার মুখের কথাই দলের আইন; পরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশে দেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠনকারী তিনি, তাঁহার হাতে অস্ত্র,—নিষ্কলুষ আত্মবিশ্বাসে সব্যসাচী উজ্জ্বল, প্রত্যয় নির্ভরতার আপাত বক্রপথে তিনি নির্ভয়ে পদচারণ করেন। হীরাসিং নেতা

নয়, মহান্ কর্মী, দলের মহান্ সম্পদ। দলগত বিরোধ আয়ত্তে আনা তাহার কাজ নয়, পরিচালনা বা সংগঠন তাহার কাজ নয়, সে হুকুম চালায় না, নিষ্ঠার সহিত দলপতির হুকুম সে বিনাদ্বিধায় পালন করে মাত্র। গ্রন্থের সমাপ্তিতে এই দুই মুক্তিসংগ্রামীর একত্রে ঝড়জলের মধ্যে 'পথের দাবী'র অফিস ঘর হইতে যাত্রা সুরুর ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুজনকেই আদর্শরূপে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। দেশের মুক্তি কঠিন লভ্য, ভাল নেতা এবং ভাল কর্মী উভয়ের মিলিত সাধনাতেই এই রত্ন অর্জিত হইতে পারে। এই কথার উপর জোর দিয়াই শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ'-এ লিখিয়াছিলেন যে: দেশসেবা যতদিন না ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন তাহার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থাকিয়া যায়।

ভারতের মহান্ ঐতিহ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত সচেতনতা ছিল। যাহাদের অতীত এত মহান্, যাহাদের বুকে অতীত গৌরবের শ্লাঘা আছে, বিরূপ পারিপার্শ্বিকের জন্য তাহাদের জাগরণ বিলম্বিত হইলেও তাহাদের স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য, এই আশাবাদ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্রও ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে অনুরূপ সচেতন ছিলেন, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জটিল, কুটিল বর্তমানের সমস্যা লইয়া তাঁহাকে বেশি কাজ করিতে হইয়াছে বলিয়া কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র জীবনের বর্তমান ধূলি-ধূসর রূপের উপর অতীত গৌরবের আলো তেমন উজ্জ্বল করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। এইভাবে বিষয়বস্তু বিন্যাসের দিক হইতে তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যাহা হউক, ভারতের গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে এই আশাবাদ আন্তরিকভাবে লালন করিতেন বলিয়াই, শরৎচন্দ্র সবসময় চেষ্টা করিতেন অন্ততঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের মত মহৎ প্রয়াস যেন যথাসম্ভব পাপ-পঙ্কিলতার ত্রুটি-মুক্ত থাকে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাসে এ সম্বন্ধে যে দৃঢ় মনোভাব দেখাইয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহা দেখান নাই, কারণ তিনি ধরিয়া লইয়াছেন দোষে-গুণে মানুষ লইয়া তিনি কারবার করিতেছেন এবং উপন্যাসের পূর্ণ চরিত্র যে মানুষ, তাহার আদর্শ বোধের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকগত মানসিক দ্বন্দ্বের অল্পবিস্তর সংঘাত স্বাভাবিক। তবে ভাবপ্রবণ, দেশাত্মবোধী বাঙ্গালীর চরিত্র তাঁহার কথাসাহিত্যে বিধৃত, দেশের মুক্তি-প্রশ্নে তাহাদের অন্তরের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা সন্দেহাতীত,

তুলাদণ্ডে মাপিলে দুর্বলতার তুলনায় এই আবেগ-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ওজনে ভারি হইবে। তাঁহার নিজের মনের অবস্থাও অনুরূপ। তিনি আবেগপ্রবণ রূপকার, বাঙালীসুলভ হৃদয়াবেগবশে কোন কোন সময় তিনি নিজেই এই মহৎ বোধ হইতে কিছুটা বিচ্যুত হইয়াছেন। তবে অধিকাংশ সময় শরৎচন্দ্র ন্যায় ও সত্যের উপর জোর দিয়াই লেখনী চালনা করিয়াছেন, প্রচলিত সংস্কার বা সমকালীন অবক্ষয়জনিত মূল্যবোধের অভাবে তিনি নিজের আদর্শ হইতে সরিয়া যান নাই। 'বিলাসী' গল্পে মুসলমান সাপুড়ে-কন্যা বিলাসীর সহিত হিন্দু কায়স্থ-সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ একপ্রান্তে রাখিয়া 'পল্লীসমাজে' রমার রমেশের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কাশীযাত্রার পরম দুঃখ বরণ অপর প্রান্তে রাখিলে সহজে কথাটা উপলব্ধি হইবে। রাজনৈতিক দিক হইতেও একথা সত্য। যে কংগ্রেসকে শরৎচন্দ্র প্রাণপ্রিয় মনে করিতেন, আদর্শে মিলিল না বলিয়া তিনি তাহার নেতৃত্ব ত্যাগ করেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ তাঁহার পক্ষে ঠিক হইয়াছিল কি না সে বিচার না করিয়াই বলা যায় আপন নীতি-বোধের নৈষ্ঠিক অনুসরণের জন্য শরৎচন্দ্র একবার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই এই সম্মানের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। হাওড়ায় কংগ্রেসের তৎকালীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, ইহার শীর্ষে থাকিলে তাঁহার আদর্শবোধ ক্ষুন্ন হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'আমার কথা' প্রবন্ধরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পাঠ করিলে শরৎচন্দ্রের মানসলোকের সম্যক পরিচয় মিলিবে। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে তাঁহার পছন্দ হইল না বলিয়া চুপি চুপি প্রতিষ্ঠান হইতে সরিয়া যাইতে তাঁহার মন চাহিল না, যাহা তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং যাহার জন্য একান্ত প্রিয় হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি হইতে বিদায় লইতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সকলের দৃষ্টিগোচর করা তাঁহার কর্তব্য। প্রবন্ধটিতে আছে; "একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে গেলেই ত হতো; এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে' জানাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হয়ে উঠত।"

আসলে তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তা সততার মর্যাদা নিয়ে অমলিন থাক, এই ছিল শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা। কংগ্রেসকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন,

কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা আনিবে এই ছিল তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের মত কঠিন কাজ কংগ্রেস ব্যতীত ভারতের আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিষ্পন্ন করা সম্ভব ছিল না বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। 'বর্তমান-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন: "কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে।" কিন্তু এই কংগ্রেসের মধ্যে কোন দোষত্রুটি যখনই তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তিনি অকুণ্ঠভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বারদৌলী আন্দোলনের সাফল্য অনেকের মতে ঐতিহাসিক সাফল্য, কিন্তু শরৎচন্দ্র ইহা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেন।* ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ একবার তিনি যে ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাও সংগঠনটির

*বারদৌলীতে খাজনাবৃদ্ধি বন্ধের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে প্রজারা সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাহারা বর্ধিত খাজনা দেওয়া বন্ধ করে এবং শেষপর্যন্ত সরকার খাজনাবৃদ্ধি বন্ধ করেন। এই সাফল্যকে রাজনৈতিক সাফল্য ধরিয়া লইয়া অনেক রাজনৈতিক নেতা হৈচৈ আরম্ভ করেন। নিখিল ভারত যুব সঙ্ঘের (All India Youth League) কলিকাতা অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৮) সভাপতি নরীম্যান সাহেব আবেগের মুখে বলেন যে, ব্রিটিশ সিংহের মাথা ভারতবাসী বারদৌলীতে ধূলিতে লুটাইয়া দিয়াছে, ব্রিটিশ সিংহ লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। অতএব সারা দেশকে বারদৌলীর পথে লইয়া যাইতে হইবে। শরৎচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল বারদৌলীর আলোচ্য গণ্ডগোল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক। ইহা প্রজাদের বিদ্রোহ নয়, খাজনা একটু কমাইবার দাবী, ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাগ সামলাইয়া লওয়াতেই গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। এজন্য হৈচৈ করিয়া বাহাদুরী দেখানো শরৎচন্দ্রের পছন্দ হইল না। তাঁহার এসম্পর্কে প্রতিবাদ 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে: "বারদৌলীর গৌরবহানির সংকল্প আমার নাই এবং ওরা যে সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত এবং বড় কাজই করেছে তা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। কিন্তু ঠিক এমনি কাজ যদি কখনও তোমাদের বাঙলায় করতে হয় ত কোরো, কিন্তু ভারতের কংগ্রেস নেতাদের মত পৃথিবীময় অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িও না। একটুখানি বিনয় ভালো।"

কাজে দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া। তিনি তাঁহার নিজের বিশ্বাস মত সুস্পষ্ট ভাষায় হাওড়া জেলা কংগ্রেস সংগঠনে দুর্নীতির প্রকোপ সম্পর্কে অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন যে তাঁহার এই পদত্যাগের পর "এ জেলায় কংগ্রেস কমিটি থাকবে কি থাকবে না, আমি জানিনে। থাকতে পারে, না থাকাও বিচিত্র নয়; কিন্তু সে যাই হোক্ ভেতরে যার ক্ষত, বাইরে তাকে অক্ষত দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা Policy হতে পারে, কিন্তু ভাল Policy বলে কোনমতেই ভাবতে পারিনে।" ('আমার কথা' প্রবন্ধ)

অবশ্য শরৎচন্দ্র দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এইরূপ মত-বিরোধের ফলে সক্রিয় প্রতিবাদ সব সময় বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, সংগঠনের ভাল করিবার আন্তরিক চেষ্টায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে গতিসঞ্চারের প্রেরণাদানে সেইসব প্রতিবাদ অনেক সময় কার্যকরী হইয়াছে। তাঁহার বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত ভাষণগুলি 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হওয়ায় যাহা অন্যায় মনে হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তিনি কিভাবে প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার পরিচয় শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে আমাদের ধারণার উপর আলোকপাত করে। নিজের লাভক্ষতি নিরপেক্ষভাবেও অন্যায়কে তিনি অন্যায়রূপেই দেখিয়াছেন, ইহা শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। একবার হাওড়া জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনে তাঁহার দল এবং বিরোধী দল উভয়েই বেশ তোড়জোড় করিয়া শক্তি সংগ্রহ করে। বাংলা কংগ্রেসে তখন সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পরিচালিত দুই উপদলে তীব্র মতবিরোধ, শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের দলে। নির্বাচনে শরৎচন্দ্রের পক্ষই জয়ী হয় এবং তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের আবহাওয়া ভাল ছিল না বলিয়া জয়ের আনন্দ ছাপাইয়া নীতিহীনতার দুঃখ শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করে। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামতাবেড়, পানিত্রাস হইতে ১৩৩৮ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখে লেখা চিঠিতে হাল্কাভাবে এই বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই চিঠি পড়িলেই বুঝা যায় বিরুদ্ধ দল যাহাই করিয়া থাক, তাঁহার নিজের দলও জয়ের জন্য যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, সাফল্য সত্ত্বেও কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষে তাহা সমর্থনযোগ্য নয় বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিয়াছেন। চিঠিখানি নিম্নরূপ: "সুহৃদ্বরেষু,

কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ কদিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারিনি। কাল আমাদের হাওড়া জেলা কংগ্রেস ইলেকসন হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধদলের সোরগোল গালিগালাজ ও লাঠি ঠোকাঠুকি দেখে ভেবেছিলাম হয়তো বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় ইলেকট্রিফিকেশন সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরী ছিল বলেই দাঙ্গা হয়নি, নির্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক প্রেসিডেণ্ট আছি, ভেষ্টেড ইন্‌টারেষ্ট জমে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষে যুক্তিটা এই যে গলদ যতই থাক, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারা আসুক। তোমরা পারবে না, তোমরা হাত দিতে যেও না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না বলেই ত আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী-দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা।"

মহাত্মা গান্ধীকে শরৎচন্দ্র কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'কিশলয়' পত্রিকার ১৩৪৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায় তিনি অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বিচ্ছিন্ন অক্ষম ভারত-বাসীকে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জাগরিত করিয়াছেন শক্তি ও প্রাণ। (কিন্তু আবেগপ্রবণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর কার্যপদ্ধতির সহিত একমত হইতে না পারিয়া প্রকাশ্যেই তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহা তখনও জোর চলিতেছে। হঠাৎ একদিন গোরক্ষপুর জেলার চৌরী চৌরা গ্রামে সত্যাগ্রহীরা পুলিসের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া অহিংসা মন্ত্র ভুলিয়া থানা আক্রমণ করিয়া পুড়াইয়া দেয় এবং সিপাহীদের অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। মহাত্মা গান্ধী এই ঘটনায় এমন মর্মাহত হন যে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রভাব বিস্তার করিয়া অসহযোগ আন্দোলন থামাইয়া দেন। ইহাই ইতিহাসখ্যাত বারদোলী প্রস্তাব (Bardoli Halt)। সমস্ত দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চলতি অসহযোগ আন্দোলনে রূপায়িত ও সম্প্রসারিত হইতেছিল বলিয়া হঠাৎ ইহা বন্ধ হইবার ফলে দেশব্যাপী হতাশা দেখা দিল। শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ

হইলেন। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে দলের শ্রেষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ্যে প্রকাশ করার কথা নয়, কিন্তু আবেগপ্রবণ শরৎচন্দ্র উত্তেজনায় রাজনৈতিক দলগত রীতি মানিলেন না, তিনি লিখিতভাবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। এত বড দেশের একটি বিশেষ গ্রামে কিছু লোক আন্দোলনের অসম্মান করিতে পারে, অথবা নিজেরা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া মহাত্মাজীর পক্ষে উচিত হয় নাই বলিয়া শরৎচন্দ্র মত প্রকাশ করিলেন।*

তাহা হইলে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার মূলে কাজ করিয়াছে স্বদেশ হইতে বিদেশী শাসন ও শোষণ দূরীকরণের, দেশীয় শোষণ অবসানের, স্বদেশবাসীর হীনতা বিদূরণের এবং তাহাদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। নীতি বা আদর্শগত গৌরবে, তাঁহার আন্তরিকতায় ও আবেগে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক সক্রিয়তা অলঙ্কৃত হইয়াছে। তবে তাঁহার হৃদয়বাদী সাহিত্যধর্মিতার জন্যই বোধহয় রাজনৈতিক চেতনার একাংশে দৃঢ় ও আপোষহীন নিষ্ঠার এবং এপথে অত্যাবশ্যক একমুখিতার একটু অভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ রাজনৈতিক চেতনায় থাকে রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনায় এইরূপ রাজনৈতিক মতবাদের নির্দিষ্ট প্রভাব, অন্ততঃ কেতাবী রাজনৈতিক প্রভাব প্রায়ই অনুপস্থিত। বিদেশী রাজশক্তির সহিত লড়াইয়ের পথ হিসাবে তিনি কংগ্রেস-কর্মপন্থা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা বিপ্লব আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা

*এ সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থে (১৩৬৫) লিখিয়াছেন; "জেল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম বারদৌলি হুল্টে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মন একেবারে ভেঙে গেছে। বল্লেন, মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটান। Mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল।" "গোটা কতক কনষ্টেবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে; তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে?" (পৃষ্ঠা ২৭-২৮)

করিয়াছেন তাঁহাদের তিনি শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পথের দাবী'র সব্যসাচী যেভাবে কৃষি-প্রধান ভারতে কৃষকদের উপর অধিক নির্ভর না করিয়াই মজুরদের সহায়তায় বিপ্লব-সৃষ্টির প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে বিদেশী বিপ্লব-সাফল্যের প্রভাব সত্বেও তাহা কংগ্রেস-নেতা শরৎচন্দ্রের সমর্থন-নিরপেক্ষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। মোটের উপর, দেশ স্বাধীন করা দরকার এবং সেজন্য যে কোন নৈতিক আদর্শগত ক্রিয়াশীলতার মূল্যই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একথা বলা আবশ্যক যে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে তাঁহার আগ্রহ যেমন অপরিমেয় ছিল, নিষ্ঠায় যেমন ফাঁক ছিল না, অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক চেতনায় সেই ধরণের গৌরব তিনি দাবী করিতে পারেন না। মোটামুটি গরীবের কল্যাণ তিনি চাহিয়াছেন, মানুষে মানুষে ঐক্য চাহিয়াছেন, ধনীর শোষণ বন্ধ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই উদারতার সঙ্গে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আবেগ ও ঐকান্তিকতা সহজেই আশা করা যায়, তাঁহার মধ্যে সেই ভাব দানা বাঁধে নাই। শরৎচন্দ্রের মানবহিতৈষী রূপই তাঁহার অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক ভাবচিন্তার প্রধান আশ্রয়, কেতাবী কোন রাজনৈতিক মতবাদ নয়। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ জমিদারী-ব্যবস্থার পটভূমিকায় গল্প উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনে ও অর্থনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের যুগই চলিতেছিল, বলা যায় তখনও প্রধানতঃ এদেশে ভূমিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল, শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর ধনতন্ত্র তখনও এখানে প্রতিষ্ঠা পায় নাই, সমাজতন্ত্র তখনও বহুলাংশে বিদেশী একটা ভাব-কল্পনার বস্তু। এ অবস্থায় শরৎ-সাহিত্যে স্বভাবতঃই ভূমিস্বত্ব-সংশ্লিষ্ট মানবিক সমস্যাগুলিই প্রধান উপজীব্য হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার লেখায় জমিদার ও প্রজার হামেশা সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই জমিদার যেখানে অত্যাচারী বা সুবিধাবাদী স্বার্থপর, মানবতাবাদী শরৎচন্দ্র তাহার সম্পর্কে কঠোর, কিন্তু যেখানে সে উদার ও নির্বিবাদী, সেখানে শরৎচন্দ্র সেই জমিদারের প্রতি প্রসন্ন। পক্ষান্তরে যেখানে প্রজা জমিদারের দ্বারা অন্যায় ভাবে শোষিত হয় সেখানে তিনি অবশ্যই প্রজার পক্ষে ও জমিদারের বিপক্ষে, কিন্তু যেখানে প্রজা অন্যায় করে সেখানে প্রজার প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রজা-জমিদারের সংঘর্ষে ভাল জমিদারের বিপরীতে খারাপ প্রজা তিনি রাখেন নাই বলিলেই হয়। এই চরিত্রাঙ্কনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে শরৎচন্দ্রের জমিদারী

প্রথার যুগের সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ততার, এমন কি কিছুটা অনুরক্তির পরিচয় নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়। জমিদারী প্রথার যুগে গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের যে মর্যাদা তাহা শুধু মালিকত্বের মায়াবাদে রীতিগত সুবিধা নয়, তজ্জন্য জমিদারদের অবদানও যথেষ্ট, এরূপ ধারণাও শরৎচন্দ্রের ছিল। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী শক্তিমান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যেও এইরূপ জমিদারী ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, একথাও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বেণী যেমন খারাপ জমিদার, তাহার খুড়তুতো ভাই রমেশ তেমনি ভাল জমিদার, তাঁহার ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিতে এই ভাল-মন্দ নির্ধারিত। 'শুভদা'য় দরিদ্র কর্মচারী হারাণ হীনচরিত্র বলিয়াই খারাপ, জমিদার ভগবান নন্দী হৃদয়বান মহৎ বলিয়াই ভাল। 'দেনা-পাওনা'য় জীবানন্দ যতক্ষণ খারাপ ততক্ষণ ধিকৃত, তাহার হীনতা বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি শরৎচন্দ্র প্রীতিপরায়ণ হইয়াছেন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের বিপ্রদাস চরিত্র অঙ্কনেও অনেকটা অনুরূপ রচনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। শেষোক্ত দুইখানি উপন্যাসেই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদ্বয় মানবতার দিক হইতে যত শান্তচরিত্র হইয়াছে, ততই তাহারা লেখকের সহানুভূতিলাভ করিয়া পাঠকের মনের আরও কাছে পৌঁছাইয়াছে। রাজনীতির দিক হইতে অবশ্য গ্রন্থারম্ভে তাহাদের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের যে সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছিল, মানবতামূলক সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং সৎ ও অসৎ কাজের উপর চরিত্রচিত্রণের প্রবণতা শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলা চলে। তদুপরি জমিদারী ব্যবস্থাধীন সমাজ-জীবনে অভ্যাসের জন্যও তাঁহার রচনায় জমিদারদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধাচারী মনোভাব সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মনোভাব কেতাবী ধরণের হইলে জমিদার সম্প্রদায়ের উপর শরৎচন্দ্রের বিরাগ সাধারণভাবে জমিদার-চিত্রণে স্ফুরিত হইত এবং জমিদারদের উপর পাঠকদের শ্রদ্ধাভাব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে সচেতন ভাবে লক্ষ্য রাখিতে দেখা যাইত। ইহার কারণ, তত্ত্বগত দিক হইতে দেখিতে গেলে জমিদারী প্রথার উদ্ভব পরশ্রমজীবিত্বের ভিত্তিতে এবং অনুপার্জিত মুনাফাভোগ ও কমবেশী শোষণের উপর ইহার স্থিতি। তাছাড়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ যে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার কারণ খাজনা

আদায়ে পরস্পরের অসুবিধা এবং তিনি জমিদারদের প্রকৃতপক্ষে খাজনার একাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়া তাহাদের সরকারের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবার ভার দিয়াছিলেন। ইহার পর জমিদারির আয় যতই বাড়ুক এবং স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই আয় বৃদ্ধিতে জমিদারদের মুনাফা যতই বাড়ুক, জমিদার-সরকারের সম্পর্ক অনেকাংশে একই নীতির উপর নির্ভর করিয়াছে। কাজেই জমিদারদের পিছনে সরকার আছেন এই ধারণার দাম অতীতে জমিদাররা যতটা পাইয়াছেন, আইন ও শৃঙ্খলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারের প্রসারের সহিত তাহা স্বাভাবিক ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেও প্রজাশোষণের পিছনে জমিদারদের সরকারনির্ভরতার অন্ততঃ একটা মনস্তাত্ত্বিক ভরসা চিরকালই থাকিয়া গিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রসারিত হইবার পর এই ধারণার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত মানব-কল্যাণ-প্রয়াসী যে কোন লেখকই জমিদারের ব্যক্তিগত উদারতা বা সততার জন্য প্রজাসম্পর্কিত জমিদার-চরিত্র রূপায়ণে তাহাকে জমিদারী ভোগের আইনগত অধিকারের নিরিখে শ্রদ্ধার্হ করিয়া আঁকিতে ইতস্তত করিবেন, কারণ ইহাতে পাঠকের মন নরম হইয়া যাইতে পারে এবং ফলে রাজনৈতিক অগ্রগতির হিসাবে তাঁহার ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া যাইতে পারে। বস্তিভাড়ার শোষণের ইতিবৃত্তের উপর লেখা বার্নার্ড শ'র Widower's Houses নাটকখানির কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এই নাটকে ডাঃ হেনরি ট্রেঞ্চ বিস্ময়ের সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন যে. তিনি যত ভদ্রলোকই হউন, ভাড়াটিয়া দরিদ্রকে শোষণ করিয়া তাঁহার সমৃদ্ধি এবং শুধু তিনি নন, তাঁহার সমশ্রেণীর সবাই এই হীনতায় ক্লিষ্ট। এইভাবে ডাঃ হেনরি ট্রেঞ্চকে সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপিত করিয়া বার্নার্ড শ' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক জটিল ব্যাপক সমস্যার উপর তাঁহার নাটকের বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার ফাঁক 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের গহরের নয়ন চক্রবর্তীকে বাগান দান করিবার কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে। নয়ন চক্রবর্তী খাতক, গহর উত্তমর্ণ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নয়ন চক্রবর্তীর ভিটে ও পুকুর ছাড়িয়া দেওয়ার মত মহৎ কর্মের জন্য গহর স্বভাবতঃই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাহার পৈতৃক এই সম্পদের মূলে কুসীদজীবিত্বের যে গ্লানিময় ইতিহাস তাহার বিরুদ্ধে লেখকের অসহযোগিতায় পাঠকমনে তো কোন প্রতিবাদই জমিয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। গহর তাহার পিতার চেয়ে ব্যক্তিগত

ভাবে হয়তো ভাল, ব্যক্তিগতভাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রাখা হইতেছে না, কিন্তু তাহার পিতা যে মহাজনী কারবারের দৌলতে নয়ন চক্রবর্তীর ভিটে ও পুকুর গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তির শোষণজনিত অগৌরব সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগেই গহরের গ্রাস করা ভিটে-পুকুর প্রত্যর্পণের গৌরব ধ্বনিত হওয়ায় এই দুর্নীতির পটভূমি-প্রান্তে উপনীত পাঠকের মনে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধিতে পারিল না।

শরৎচন্দ্র শক্তিশালী জনপ্রিয় সামাজিক কথাসাহিত্যিক, সেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তবে প্রধানতঃ সামাজিক মানুষের হৃদয় লইয়া কারবার করিলেও তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং সেই চেতনা কিছুটা সক্রিয় রূপ লাভ করিয়াছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও তাঁহার সাহিত্যকৃতিতে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত উনবিংশ শতাব্দীর মহৎ জাতীয় প্রাণবন্যার স্পর্শধন্য হইতে পারেন নাই, তাঁহার মানস-বিকাশ রবীন্দ্রনাথের মত পরিবেশের আনুকূল্য পায় নাই। লেখাপড়া তিনি কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় পরবর্তীকালে করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রাজুয়েট হইবার সুযোগ তাঁহার মিলে নাই। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেও শরৎচন্দ্র আত্মপ্রস্তুতির ভাল সুযোগ পান নাই। জীবনের প্রথম দিকে স্বদেশী আন্দোলন বা আন্দোলনকারীদের সহিত তাঁহার বিশেষ সংযোগ হয় নাই। দেশাত্মবোধ তাঁহার মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল পরিবেশে রাজনৈতিক দায়িত্বশীল কর্মীপদ তাঁহার হাতের কাছে অনেকটা সহজেই আসিয়াছিল। কিন্তু এজন্য তাঁহার মন বিশেষভাবে অনুশীলিত না হইবার ফলে চারিত্রিক যে দৃঢ়তা এবং মনের যে বলিষ্ঠতা পরাধীন দেশের কঠিন স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক, শরৎচন্দ্রের তাহার যেন কিছুটা অভাব ছিল। কিন্তু প্রাণের আবেগ, মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা, বিদেশী শাসন, শোষণ ও স্বদেশী দুর্নীতিকে পরমশত্রু ভাবিয়া দৃঢ়সংকল্প সৈনিকের মত লড়াইয়ে উৎসাহ, মহৎ কর্মজীবন যাপনের প্রেরণা সৃষ্টি,—এসব দিক হইতে শরৎচন্দ্র গুণান্বিত ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বই তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ করিয়াছিল। (দেশবন্ধু তাঁহাকে কংগ্রেসের বরিশাল সম্মেলনে সঙ্গী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের আগ্রহে তাঁহাকে কুমিল্লায় কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সভায় যোগদান করিতে ভালবাসিতেন না, সভা এড়াইবার জন্যই চেষ্টা করিতেন, তবু তাঁহার কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার জন্য কলিকাতা

হাওড়ায় শুধু নয়, কুমিল্লা, রংপুর, ফরিদপুর, শিলচর, বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরদূরান্তে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান না করিয়া পারেন নাই। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলিয়াই হিন্দু-মুসলমান দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টিমূলক ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতার টাউন হলের সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত আর একটি সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের দেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের আপেক্ষিক কম অংশগ্রহণে তাঁহার ব্যথার অন্ত ছিল না। ইংরেজ রাজশক্তি মুসলমানদের তোষণ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সরাইয়া রাখিবার যে অপচেষ্টা করিতেন, দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র তাহারও তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ভারতের ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং এ হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পথানুসারী ছিলেন বলা যায়। ভারতের পরাধীনতা মোচনের উগ্র আকাঙ্ক্ষা পোষণের জন্য তিনি অত্যাচারী শোষক ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, সকলের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হইলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই, এই রাবীন্দ্রিক প্রত্যয়েও তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন।* প্রকৃতপক্ষে ভারতের ন্যায় সম্ভাবনাপূর্ণ দেশকে ইংরেজরা নিজেদের ক্ষুদ্রস্বার্থে যে দৈন্য-পীড়িত, অশিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবাসীকে মানুষ হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইবার সুযোগ দিতেছে না, ইহাই তাঁহার প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষের মূল কারণ। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল ভারতবাসী মানুষ হইয়া উঠিলে অন্তরের প্রেরণাই তাহাদের বিদেশীর বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত

---

* শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-এ নায়িকা কমল বিশ্বমানবতার ভাবকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছে ; "বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধিনিষেধের ধ্বজা বয়ে বেড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই তো ভয়? নাইবা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?"

করিবে। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা ভারতবাসীর আত্মনির্ভরশীল হইবার পথে একান্ত প্রতিবন্ধক—শরৎচন্দ্র এইরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার বিপরীত ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলন ঘটাইয়া ভারতে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এইজন্য ইংরেজদের বহু বিষয়ে অপছন্দ করিলেও তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধিক্কৃত করিতেন না। তাঁহার প্রধান আপত্তি ছিল এই শিক্ষার সহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে, গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রসার হয় নাই বলিয়া, ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এবং ইহার মাধ্যম দেশীয় ভাষা নয় বলিয়া। শিক্ষা অজ্ঞানের মনে আলো দিবে, ইহা সহজলভ্য হওয়া চাই—ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। 'শিক্ষার' মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার মিলিত রূপের উপর যে জোর দিয়েছেন, বলিতে গেলে, শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি তাহার প্রতিবাদ। শরৎচন্দ্র বিদেশী ইংরেজদের ভারতে প্রতিপত্তির সমগ্রভাবে বিরোধিতা করিয়াছেন, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার প্রতিবাদও তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে কঠোরভাবেই করিয়াছেন: "যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে,—তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার দিন আজ এসেছে।"

মোটের উপর, দেশের মানুষ যদি যোগ্য হইয়া উঠে, যদি তাহাদের শিক্ষার ও জীবনবোধের প্রসার ঘটে, মাতৃভূমির এবং নিজের সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির আবেগ ও সেই বন্ধনমুক্তির জন্য যে কোন দুঃখবরণের উৎসাহ তাহারা অবশ্যই বোধ করিবে,—এই বিশ্বাসে শরৎচন্দ্র উদ্দীপ্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী রাজশক্তির কাছে পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হীনমন্যতা, কর্মোৎসাহের অভাব, মানসিক দৈন্য, ভেদাভেদ-বোধের প্রাবল্য—এইসব ত্রুটিও শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। পরাধীনতার অভিশাপের ফলে দেশবাসীর এই হীনতা যে বহুলাংশে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন,* তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, পরাধীনতার গ্লানি বিদূরিত

*'পথের দাবী'তে সব্যসাচী ভারতীকে ইংরেজ শাসনের বৃহত্তম কলঙ্ক হিসাবে ভারতবাসীর ব্যাপক পশ্চাৎপদতাকে চিহ্নিত করিয়াছেন "স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন।"

করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই হীনতার গ্লানিও দূর করিতে হইবে। এজন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণপণ সংগ্রাম চালাইতে হইবে। অশিক্ষার দৈন্য আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, আত্মকলহ আমাদের অধঃপতনের মূল, কুসংস্কার আমাদের পায়ের বেড়ী। শিক্ষার প্রসার ও সর্বমুখী আত্মোন্নতির জন্য তাই শরৎচন্দ্র অবিরাম আবেদন রাখিয়াছেন।* এই বাধা অপসারিত হইলে অন্য অভাব জাতীয় সমৃদ্ধির পথ রোধ করিতে পারিবে না, শরৎচন্দ্রের ইহা দৃঢ়বিশ্বাস। স্বদেশের স্বাধীনতার এবং স্বদেশবাসীর সমুন্নতির যথেষ্ট পথ খোলা আছে, এ সম্পর্কে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই,—ইহা শরৎচন্দ্রের প্রত্যয়। তিনি মনে করিতেন, শাসক ইংরেজ যত বড়ই হউক, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতবাসী সাময়িক দীনতা সত্ত্বেও নিষ্ঠার সহিত একটু চেষ্টা করিলেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতে পারিবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'র 'সত্যাশ্রয়ী' প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্রের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, মালিকান্দা অভয় আশ্রমে পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনের শরৎচন্দ্রের সভাপতির অভিভাষণ। এই ভাষণে তিনি স্বদেশবাসীর দৈন্যে ব্যথিত হইয়া দৈন্য-মুক্তির উপায় রূপে স্বদেশের যুবক ও ছাত্রদের মনে একই সঙ্গে সহিষ্ণুতা-বোধ এবং আবেগ, আশা ও প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন: "জগৎ জানুক আর না জানুক, আমরা মস্তবড় জাতি, একথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা করে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করিনে, তেমনি, বিদেশী রাজশক্তিকেও ধিক্কার দিয়ে ডেকে বলতে লজ্জাবোধ করি যে, হে ইংরেজ, তোমরা কিছুই নও, কারণ অতীতকালে আমরা যখন এই এই মস্ত বড় বড় কাজ করেছি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে

*'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ) স্বদেশবাসীর আত্মকলহের দৈন্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: "অস্ত্রশস্ত্র আজই না হয় নেই, কিন্তু হাজার বছর ধরে করেছিলাম কি? তখন ত Arms Act জারি হয়নি। সবচেয়ে বেশী নিরুৎসাহ করেছে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মকলহ। তাই বারবার মোগল-পাঠান-ইংরাজদের পায়ে আমাদের মাথা মুড়ানো গেছে।"

বেড়াতে।···বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল, এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,—আমি বলি, ইংরাজ, আজ তুমি বড়; শৌর্যে, বীর্যে, স্বদেশ-প্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মালমসলা মজুত। আজ দেশের যৌবন-চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হ'য়ে তার জন্মের অধিকার আদায় করে নেবেই নেবে।"

সমস্যাসমূহ লইয়া শরৎচন্দ্র যখন লিখিয়াছেন, তখন সমস্যাগুলির বাস্তব রূপাঙ্কনের উপরই তিনি জোর দিয়াছেন, এই সব সমস্যার চাপে মানুষ কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার জীবন্ত ছবি ফুটাইয়াছেন। কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে হদিশ তিনি কমই দিয়াছেন এবং সমগ্রভাবে এ সম্পর্কে তাঁহার আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। সামাজিক সমস্যা কত কঠিন, ইহার মূল কত গভীরে, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বা মুক্ত হইয়া মানুষ সুস্থ সুন্দর জীবনের অধিকারী হইবেই, অপরাজিত জীবন-মহিমা বাস্তব দুঃখবেদনা অতিক্রম করিয়া বিজয়ী হইবেই,—এ আশাবাদ শরৎসাহিত্যের সামাজিক চিত্রে তেমন প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাঁহার কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক সমস্যার যেটুকু ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহাতেও এই বাস্তব-সমস্যা-চিত্রণের প্রতি আপেক্ষিক ঝোঁকই বড় কথা। ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য, সেজন্য যে কোন ত্যাগস্বীকারে বা দুঃখবরণে পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না, এই উদাত্ত আবেদনে শরৎচন্দ্র যতটা মুখর, ভারত স্বাধীন হইবেই, ভারতসন্তানের মুক্তি-কামনা বিদেশী রাজশক্তি পীড়নমূলক বাহুবলে দীর্ঘকাল প্রতিহত হইবে না, এই বিশ্বাস শরৎচন্দ্রের মনে জাগ্রত থাকিলেও গল্প উপন্যাসে সেরূপ ফুটে নাই। কিন্তু তবু সামাজিক সমস্যার তুলনায় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে শরৎচন্দ্রের উদারতর মনোভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় সামাজিক সমস্যার বাস্তবরূপ তিনি শিল্পীর মন লইয়া আঁকিয়াছেন, নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাহা জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়াছেন, সমাধানের জন্য চিন্তাজগতে চারণার চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বলিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়প্রত্যয় তাঁহার চিত্রিত সমস্যার রূপরেখায় কিছুটা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে

ভারতবর্ষ অবশ্যই ইংরেজ শাসনের কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবে এই বিশ্বাসবশেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তিগত দুর্বলতা তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, আন্দোলনের নিষ্ঠা ও মহৎ প্রেরণাই বিজয় আয়ত্ত করিবে, এই আশা তিনি অন্তরে লালন করিয়াছেন। "বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা" (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ৮ম সম্ভার) প্রবন্ধে তাঁহার এই আশা চমৎকার ফুটিয়াছে :—

"দেশের মুক্তি সংগ্রামে দেশশুদ্ধ লোকই কি কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশী লোকে ত ইংরেজের পক্ষেই ছিল। আয়র্লাণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়, কেবল মাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতা বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের পরে।"

শিল্প-চেতনা

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না; কিন্তু শিল্পকলা বা আর্টের দিক হইতে এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সাহিত্যবিভাগ আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছেন: "নবেল আধুনিক সাহিত্যের প্রবলতম লক্ষণ।—(বাণীমন্দির, ১৯২৮, পৃষ্ঠা —১৫।) শিল্পকলা এবং জনপ্রিয়তা উভয় হিসাবেই উপন্যাস এখন একরূপ সকল সাহিত্য-বিভাগের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলা যায়।

উপন্যাসের বড় একটি আকর্ষণ যে ইহার গল্প তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আগে যখন উপন্যাসের জন্ম হয় নাই, গল্প তখনও ছিল। হৃদয়গ্রাহী গল্প বরাবরই মানুষকে আকর্ষণ করে। ক্রমে উপন্যাসের উদ্ভব হইলেও উপন্যাসে গল্পের আকর্ষণ রহিয়া গেল। উপন্যাসটি ভাল করিতে হইলে ইহার গল্প যাহাতে চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ঔপন্যাসিকের স্বাভাবিক দায়িত্ব। অবশ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে বলিয়া অত্যাধুনিক কোন কোন উপন্যাসরীতিতে (যেমন 'চেতনা-প্রবাহ-মূলক' উপন্যাসে) অপেক্ষাকৃত দুর্বল গল্প সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়, কিন্তু তবু এখনও সমগ্রভাবে পাঠক-সাধারণের কাছে গল্প উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই মনোরম-গল্প-সমন্বিত উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেই শরৎচন্দ্র অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন।

তবে গল্প উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আগেকার হিসাবে উপন্যাসস্থ গল্পের প্রকৃতি এখন বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। আগে গল্প যেভাবে ঘটনা-পরম্পরার সাজানো মালা রূপে অতঃপর কি ঘটিবে সেই কৌতূহলটুকু বজায় রাখিয়াই পাঠকের মনোহরণ করিত, এখন সেই ঘটনা-প্রাধান্যের অধিকার কমিয়া গিয়াছে। সেইস্থলে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সংঘাতজনিত চরিত্রের জটিলতা গল্পের কৌতূহল সংরক্ষণে ও অগ্রগতিতে এবং আখ্যান-বিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা লইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এখন গল্পের চেয়ে যেন চরিত্রসৃষ্টিই আধুনিক উপন্যাসের বড় লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'মানুষের বাহিরের জীবন ও মনের আশা-আকাজ্ক্ষা একরূপ নয়, মন

তাহার রহস্যময়, বিচিত্র বাসনা-কামনাযুক্ত। কাজেই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সংঘর্ষে ব্যক্তিগত মনে যে তরঙ্গ জাগে, উপন্যাসে তাহাই যত গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়, যত ফুটিয়া উঠে চরিত্রের অন্তর্লোকের রহস্যঘন পরিচয়, একালের উপন্যাস ততই উচ্চ শ্রেণীর হয়। মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন : "নভেল নামক বিলাতী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—তাহার character বা ব্যক্তি চরিত্রাঙ্কন ; ইহার মূলে আছে সমাজ বা গোত্র-চেতনার বিপরীত এবরূপ ব্যক্তিত্বের উন্মেষ।"*—('সাহিত্য বিচার', ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৮।)

আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মূল্যবোধের রূপান্তর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে, মানুষ চারিপাশের ঘটনা-প্রবাহ ও চিন্তা-প্রবাহের রূপ উপলব্ধি করিতে তাহাদের সম্যক মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে, কারণ এই মূল্যায়নের উপর সে তাহার নিজের জীবনের গতি সার্থকভাবে বিন্যাস করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। রোমান্সের ইন্দ্রজাল নয়, মানব-জীবনের বাস্তবরূপ উপন্যাসের প্রধান উপাদান হওয়ায় স্বভাবতই এখন উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি পাল্টাইয়া গিয়াছে। এখন ক্রমেই ঔপন্যাসিক তাঁহার উপন্যাসে যে জীবনের ছবি তুলিয়া ধরিতেছেন তাহা আগেকার সমাজগত প্রত্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিতিশীল নয়, বিশ্বব্যাপী সঞ্চরমাণ আধুনিক জীবন-চাঞ্চল্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিজীবনে বিধৃত হইয়া এযুগের উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। উপন্যাসকে বিশেষভাবে একালের সাহিত্য বলা হয় এইজন্য যে, এই উপন্যাসে যেভাবে জনসাধারণের সর্বস্তর হইতে ব্যক্তিগত চরিত্র আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত মহিমায় স্থানলাভের অধিকার পাইয়াছে, আগে ভূমি-নির্ভর অভিজাততন্ত্রের দিনে অল্পসংখ্যক ভূম্যধিকারীর দ্বারা দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথানুসারী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনের সে বিকাশ ও প্রকাশ লাভের সুযোগ ছিল না। এখন সব মানুষের ভিতর হইতেই উপন্যাসের চরিত্র গড়িয়া উঠে, সে চরিত্র গোটা-মানুষের তরঙ্গিত চরিত্র। এইভাবে বহুবিস্তৃত

*অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা' নামক সংকলন গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) 'কপালকুণ্ডলা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন : "সাহিত্য জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করে। ভাষা-নৈপুণ্য, কাহিনী রচনা বা ভাব-পরিবেশন—সাহিত্যের দিক দিয়া ইহাদের মূল্য গৌণ। প্রধান হইতেছে চরিত্রসৃষ্টি ; অন্যান্য উপাদান চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াই সার্থকতা লাভ করে।"

পটভূমি ও বহু-বিচিত্র চরিত্র অঙ্কনের সুযোগ মিলিয়াছে বলিয়াও ঔপন্যাসিকের কল্পনা বাস্তব জগতের সীমা ছাড়াইয়া রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার দিকে ঝুঁকিবার অবকাশ পায় না বা ঝুঁকিবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষ করিয়া সমাজের যে মানুষ ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল, যাহাদের বাহিরের সামাজিক জীবন-রূপের সহিত আশা-কামনা-সাফল্য-ব্যর্থতা-মথিত অন্তররূপ প্রায়ই মিলে না, তাহাদের জটিল চরিত্র ফুটাইবার দিকেই আধুনিক সাহিত্য উপন্যাসের প্রবণতা। উপন্যাসে সর্বস্তরের সব মানুষের ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে স্থান লাভের সমান অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসকে 'গণতান্ত্রিক সাহিত্য' আখ্যা দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসের তুলনায় শরৎসাহিত্যে সর্বশ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র বা হৃদয়-চিত্র অঙ্কনের প্রবণতার জন্য শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বা আধুনিকতা স্বীকার করিতে হয়। এইভাবে বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতির ধারায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের স্থাননির্দেশ করা যাইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের মননশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল, পৃথিবীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে মানব-জীবনে বা মানব-মনে নবনব বর্ণ-সমাবেশের সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজনীয় সবটুকু শক্তি তাঁহার ছিল না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব লইয়াই তিনি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্য রচনায় শরৎচন্দ্র পূর্বসূরীদের স্বীকৃত বা পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন নাই, তিনি চলমান জগৎ ও জীবনের প্রতি খোলাচোখে তাকাইয়া বাস্তব-জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য-কৃতির মৌল-গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ৩০তম পরিচ্ছেদে গল্পকার-যশ-প্রার্থী দিবাকরকে কিরণময়ী বলিয়াছে: "যা নিজে বোঝ না তা পরকে বোঝাবার মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।" কথাসাহিত্যিকের বাস্তবানুস্মৃতির গুরুত্বব্যঞ্জক কিরণময়ীর এ কথা শরৎচন্দ্রেরই কথা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দ্বারা সমাজভুক্ত অথচ স্বতন্ত্র-সত্তা-লীলায়িত বিচিত্র ব্যক্তিমনের নৈষ্ঠিক রূপায়ণের জন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। চরিত্র তাঁহার সাহিত্য-কর্মের সম্পদ। তাঁহার লেখায় সমাজ ব্যক্তি-চরিত্রকে আঘাতই করুক আর প্রশ্রয়ই দিক উভয়তই চরিত্রের চলমানতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চরিত্র ভাব-তরঙ্গিত হইয়া

পূর্ণাঙ্গতার দিকে গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের আপন কালের জীবনাশ্রয়ী কথা-সাহিত্যের মূল্যায়নে একালের সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক লইয়া অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন; "আধুনিক গল্পে মানুষের সমাজ পরিচয়টা একেবারেই গৌণ; বংশানুক্রমিকতা ও বৃত্তি অনুশীলনের প্রভাব এখন তাহার জীবনের রূপ নির্ণয়ে প্রধান সহায়ক নহে। ইহার পরিবর্তে অচির প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সমাজ-নিয়ন্ত্রণমুক্ত অন্তরের প্রবৃত্তি-সমষ্টিই আজ ব্যক্তিমনের নিয়ামক। এখন সমাজের সহিত ব্যক্তিমনের সম্বন্ধ শান্তি ও সামঞ্জস্যের স্থিরতা-বিধায়ক নহে, গাঁটছড়ায় বাঁধা এই দুই সত্তার মধ্যে অবিরত সংঘর্ষে উহাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ সদা বিচিহ্নিত। সমাজের প্রতিকূলতা বা মমতাহীন ঔদাসীন্য আজ ব্যক্তির জীবনসংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া উহার সমস্ত অন্তরকে নৈরাশ্যতিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।"—(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা', ১ম সংস্করণ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১)*

শরৎচন্দ্রের নিজেরও সুস্পষ্ট মত ছিল যে, চরিত্রসৃষ্টিই উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঘটনার উপর তিনি জোর দেন নাই এমন নয়, কিন্তু চরিত্র যাহাতে মনস্তত্ত্বসম্মত ও জীবন্ত হয়, সেজন্য তিনি প্রভূত যত্ন লইতেন। এজন্য যদি তাঁহার নিজস্ব পরিমণ্ডলের সমকালীন সামাজিক জীবনরূপের হিসাবে চরিত্রটিকে কিছুটা অপরিচিত মনে হইত, তিনি তাহা বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। শক্তিমান আধুনিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এইভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছেন। 'চরিত্রহীন' এর

*সোভিয়েট সমালোচক আনাতলি লুনাচারস্কি সাহিত্যরূপ সম্পর্কে বলিয়াছেন: "The form of a given work is in fact determined not merely by its content but also by other elements The psychological thought processes and conversations of a given class, its "style" of living, the general level of the material culture of a given society, the influence of its neighbours, the inertia of the past or the striving for renovation, which can manifest itself in all of life's aspects—all this can affect the form, can act as a subsidiary factor defining it."—(Anatoly Lunacharsky,—On Literature and Art, 1965, page 15.)

কিরণময়ী, 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শীর মত চরিত্রে এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে। শরৎচন্দ্রের বাল্যবয়সের পরিকল্পিত 'দেবদাস' অপরিণত রচনা, কিন্তু শরৎচন্দ্রের এইভাবে চরিত্র-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য দেবদাসেও দেখা যায়, যদিও 'দেবদাস' উপন্যাসে ঘটনারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। উপন্যাসে চরিত্রের স্থান সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের ধারণা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে বুঝা যাইবে। ভাগলপুরের অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত একবার শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনিই শ্রীকান্ত কি না। শরৎচন্দ্র উত্তরে বলিয়াছিলেন; "আপনারা তা মনে করেন কেন? শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত। আপনারা আমার উপন্যাস পড়তে বসে অনুগ্রহ করে ঘটনা ও পরিস্থিতির ওপর জোর দেবেন না। কারণ আমি ঘটনার সৃষ্টি উপন্যাসের আসল জিনিস বলে মনে করিনে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্রসৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে হয় না। আমার চরিত্রগুলির অন্তরালে কোন কোন স্থলে বাস্তব হয়ত থাকতে পারে, চিত্রের background হিসেবে, তার বেশী নয়।"—(পাটনা হইতে প্রকাশিত 'প্রভাতী' মাসিক পত্রিকার ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় অধ্যাপক গুপ্তের 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধের অংশ।)

সামাজিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সমাজের ও সমাজ-অন্তর্ভুক্ত মানুষের কথা বলিয়াছেন, যে চিত্র তিনি ফুটাইয়াছেন তাহা মোটের উপর তাঁহার অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, কল্পনার জগতে তিনি বড় একটা বিচরণ করিতেন না। জীবনে যে ঐশ্বর্য, যে সমস্যা, যে আঘাত-সংঘাত সম্ভবপর, শরৎচন্দ্র প্রায়ক্ষেত্রে তাহাই তাঁহার সাহিত্যের মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হইয়া সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া অম্লান শুভ্র মানব-হৃদয়-মহিমার প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছেন, এক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকিলেও পরিণামে যে আশ্বাস তিনি রাখিতে চাহিয়াছেন বা তাঁহার গল্প-উপন্যাসের যাহা বক্তব্য, তাহাতে ভাব-কল্পনার এক ধরণের প্রশ্রয় লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত যখন আমরা শরৎচন্দ্রকে বাস্তববাদী বা রিয়ালিস্ট কথাসাহিত্যিক বলি, আমরা তাঁহার বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি রূপায়ণের উপরই জোর দিই, এই ত্রুটি-বিচ্যুতির আকাঙ্ক্ষিত অবসানে নির্মল জীবনবোধের ইঙ্গিতকে তাহার সহিত জড়াই না। কিন্তু শরৎ-মানসের উপলব্ধিতে এই পরিণতির ইঙ্গিত বা ফলশ্রুতির গুরুত্ব কম নয়। তাই ইহা ধরিলে শরৎচন্দ্রকে শুধু বাস্তববাদী বা রিয়ালিস্ট না বলিয়া বাস্তববাদী ও ভাববাদীর অথবা রিয়ালিস্ট

ও আইডিয়ালিস্টের সমন্বয় বলিতে হয়। বাস্তব জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই ভাববাদিত্বের আলোচনায় অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য ; "আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ-বিদ্রোহী ; ইহাকে মিথ্যা ভাষণ না বলিলেও বলিব অসতর্ক ভাষণ। সমাজ-বিদ্রোহী শিল্পী কখনও রিয়ালিস্ট হইতে পারে না। বিদ্রোহ আসলে সমাজের সেই অংশটার বিরুদ্ধে যে অংশ জীবনের পক্ষে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে অথচ জীবনকে তাহার কবলমুক্ত করিতে চাহিতেছে না। শরৎচন্দ্র সমাজকে যথার্থ কোনদিন ভাঙিতে চাহেন নাই ; যে নূতন সত্যকে সমাজ জীবন বহন করিয়া আনিয়াছে—যাহার সন্ধান তাঁহার সূক্ষ্ম তীব্র সংবেদনশীল হৃদয়ের কাছেই ধরা পড়িয়াছে, তখন পর্যন্ত জনসাধারণের নিকট গ্রাহ্য হইবার মত রূপ পরিগ্রহ করে নাই—সেই সত্যের উপরে সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। একটা বৃহৎ জাতির জীবনে প্রবাহের ঘূর্ণাবর্তে কি সত্যের সঞ্চার হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন সত্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা প্রথমে আসিয়া সংবেদনের স্পন্দন তোলে যথার্থ শিল্পিচিত্তে, গণচেতনা হয়ত তখনও উদ্বুদ্ধ হয় না, জনগণ অস্পষ্ট অন্তর্বেদনাকে নিজেরাই ততক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় যখন ঘটে একজন যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাব, তখন সেই আবির্ভাব স্বভাবতই বহন করে একটা বিদ্রোহের সুর। সেই বিদ্রোহের সুরের ভিতরেই আছে রিয়ালিজম্-এর পদধ্বনি !"—(শিল্প-লিপি, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮১-৮২।)

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে সমাজ ও সমাজভুক্ত মানুষের কথা লইয়াই সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়, কাজেই সামাজিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁহার সমাজকে জানিবার, চিনিবার এবং সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্কের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন আলোচনা না করিলেও চলিবে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান ব্যক্তি-চরিত্র বলিয়া এই ব্যক্তির সমাজবোধ, সমাজের সহিত তাহার হৃদয়ের সংযোগ, তাহার মনের এমন কি জীবনের উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া,—এসব সামাজিক উপন্যাসকারকে অবশ্যই ভালভাবে উপলব্ধি করিতে হয় এবং এজন্য তাঁহাকে সামাজিক মানুষের প্রকৃতি ছাড়াও সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সামাজিক মানুষের সম্পর্কে সমাজের ভূমিকা সাবধানতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। এই সূত্রে বর্তমানের সমস্যা অনুধাবনে সংশ্লিষ্ট অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণের

আবশ্যকতাও কম নয়। বলা বাহুল্য, এই সঙ্গে থাকে লেখকের সংস্কৃতিবোধ, পরিবেশের প্রভাব, পড়াশুনা। বলা বাহুল্য, এভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি-পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের ফলে লেখকের-বিশেষ ভাবদৃষ্টি ও মতবাদ গড়িয়া ওঠে। উপন্যাসে গল্প, আখ্যান, চরিত্র, ভাষা, গঠন-কৌশল ও রচনারীতির মতই লেখকের ভাবদৃষ্টি ও মতবাদের গুরুত্ব আছে।

প্রকৃতপক্ষে ভাবদৃষ্টি অনেক সময় ঔপন্যাসিককে সাময়িক উত্তেজনার হাত হইতে বাঁচায়, তাঁহাকে সাময়িক ঝড়ের মুখে রক্ষা করিয়া চিরকালের হিসাবে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ করিয়া দেয়। বস্তুতঃ যদি সাময়িক কোন বহিরঙ্গ ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দেয় এবং লেখক তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়া উপলব্ধি করেন যে, এই বাহিরের ভাবোচ্ছ্বাস কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তাহা হইলে ইহাতে তাঁহার ভাবদৃষ্টির সায় থাকে না। হয়তো সমকালীন কোন কোন লেখক বা অনেক লেখক ভিন্নরূপ চিন্তাশ্রয়ী, তবু তিনি ব্যক্তিমনের কাছে সমাজের দাবীর প্রশ্নে অথবা সমাজের কাছে ব্যক্তিমনের দাবীর প্রশ্নে এইরূপ লেখকদের পরিমণ্ডল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াও আপন ভাবদৃষ্টির মর্যাদা রাখিতে চেষ্টা করেন। এই ভাবদৃষ্টি বাস্তব-অনুগামিতা সত্ত্বেও উপন্যাসে বিশেষ ভাব-সুরভির সঞ্চার করে বলিয়া বস্তুগত তথ্য কবিসত্যে সম্প্রসারিত হয়। এইরূপ ঔপন্যাসিক যখন সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করেন তখন অম্লান জীবন-মহিমার আকৃতি তাঁহার শিল্পী-মানসে বল সঞ্চার করে। শিল্পকৃতির প্রত্যক্ষ রূপের ব্যঞ্জনায় এই আগ্রহের স্পন্দন রসিক সহৃদয় পাঠক অনুভব করে। ঔপন্যাসিকের ভাবদৃষ্টি বাস্তবতার অত্যানুসৃতির নিরর্থকতা হইতেও সাহিত্যসৃষ্টিকে রক্ষা করে। আবার উপন্যাস-রচয়িতার এই ভাবদৃষ্টি বা জীবনবোধ তাঁহার সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে সাহায্য করা ছাড়াও পাঠককে তাহার নিজের জীবন-মূল্যবোধের পুনর্নির্ধারণে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিতে উপন্যাসকে নিছক শিল্পকলা হিসাবে দেখিলে উল্লিখিত আপন কালের জীবনবৃত্ত হইতে ঔপন্যাসিকের বিচ্ছেদ প্রশংসনীয় মনে না হইতে পারে, কিন্তু কালের বিচারে এই ভাবদৃষ্টি-আশ্রিত সাহিত্যকর্ম লেখকের বৈশিষ্ট্যের স্মারক হয়। কবিকে ক্রান্তিদর্শী বলা হয়, উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসকারও ক্রান্তিদর্শী। বাস্তব জীবন অবলম্বন করিয়া তিনি লেখেন, কিন্তু তাঁহার জীবন-দর্শন তাঁহার লেখাকে যুগোত্তীর্ণ বা কালজয়ী করিয়া তোলে।

শরৎচন্দ্রের ঠিক এই মহৎ ঔপন্যাসিকোচিত মানস-ঐশ্বর্য ছিল না সত্য, কিন্তু ভাঙনের যুগে ভাঙন অস্বীকার না করিয়াও তিনি প্রতিরোধের যে উদার আশ্বাস রাখিয়াছেন, অপমৃত্যুর গ্লানি হইতে সত্যকে বাঁচাইবার আপন প্রত্যয়গত যে অনুপ্রেরণা তিনি পাঠক-মনে যোগাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘজীবী করিবে।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই লেখকের নিজস্ব বক্তব্য থাকে, শুধু বিষয়-বস্তুর রূপাঙ্কনেই সাহিত্যিকের তৃপ্তি হয় না। উপন্যাসে এই বক্তব্যের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ উপন্যাস মূলতঃ সমস্যা লইয়া লিখিত হয় এবং সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহের নিরিখে উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য খুবই গুরুত্ব পায়। শরৎচন্দ্র সমাজের দোষগুণ, মানুষের সুস্থ ও অসুস্থ আকাঙ্ক্ষার ছবি আঁকিয়াছেন, কাজেই তাঁহার লেখায় আপন বক্তব্য সন্নিবেশ স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের অভিমত উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন: "শরৎচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সাহিত্যে যাহা চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হয় তাহার অন্তরালেও মতবাদের আলোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে।" (শরৎচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১) শরৎচন্দ্র মনে করিতেন, পৃথিবীর সমস্ত মহৎ সাহিত্যেই মতবাদ ও বক্তব্য আপন দাবীতে স্থান করিয়া লয়; বাংলাদেশের মত পশ্চাৎপদ দেশে গতানুগতিকতার সহিত গতিশীল নূতন জীবনরূপের সংঘর্ষ স্বাভাবিক বলিয়া এখানে নিছক সমস্যাজড়িত বিষয়বস্তুর অবতারণাতেই লেখকের কর্তব্য শেষ হয় না, আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার মনের ভাব পাঠকদের জানিতে দিলে রচনা পড়িবার ও বুঝিবার সুবিধাতো হয়ই, তাছাড়া ইহা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে পাঠকের অভিমত গঠনেও সাহায্য হয়। তবে এই মনোভাবের প্রকাশ সূক্ষ্ম ও শিল্পকলাসম্মত হওয়া চাই; অন্যথায় কথাসাহিত্যের মূল্যহানি ঘটিবে।

অবশ্য লেখকের গতিপ্রকৃতিতে আপন মতবাদ মোটামুটি প্রতিফলিত হইলেও শরৎচন্দ্রের রচনায় সমস্যাসমূহ যে তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা ও বাস্তবতা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তুলনায় কি উপায়ে সেগুলির সমাধান হইতে পারে, কোন্ পথে গেলে সমস্যা হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিবে না এবং ব্যক্তি ও সমাজকে বিপন্ন করিবে না, সে সম্পর্কে শরৎচন্দ্র তেমন সবাক নন। সমাজ-সচেতন কথাসাহিত্যিকের এই দিকটি লক্ষ্য করিবার মত। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী' পুস্তকে (১ম সংস্করণ,

পৃষ্ঠা ১০৮) অনৈকা মহিলাকে (সুনন্দ ভবনের শ্রীমতী সেন) লেখা শরৎচন্দ্রের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "সমাজ সংস্কারের দুরভিসন্ধি আমার নাই, তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নাই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তা'ছাড়া আর কিছুই নই।" তবে ইহা সত্ত্বেও পাঠক যদি মনঃসংযোগ করিয়া শরৎসাহিত্য পড়েন, তাহা হইলে তিনি ইহাতে প্রতিফলিত শরৎচন্দ্রের বক্তব্য সর্বত্রই অনুভব করিবেন। এই বক্তব্য সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পথ-নির্ধারক না হইতে পারে, কিন্তু যে সমস্যা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কণ্টক স্বরূপ, তাহার আপাত-রূপ বা আপাত-শক্তি যাহাই হউক, স্বরূপে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া এবং তদ্দ্বারাই সে সম্পর্কে প্রতিবাদ রাখিয়া শরৎচন্দ্র পাঠকমনে তৎপ্রতি বীতরাগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সংশোধনে পাঠকমনকে উত্তেজিত ও সংগঠিত করিয়াছেন, একথা দ্বিধাহীন-ভাবেই বলা যায়। শরৎচন্দ্র নিজের পড়াশুনা ও সাংস্কৃতিক মানস-প্রস্তুতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সাবধানতাবশতঃই বোধহয় সরাসরি রূপায়িত সমস্যার সমাধানের পথ নিজে দেখাইবার সাহস পান নাই, কিন্তু সমাধানের জন্য আগ্রহ তাঁহার কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্র ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সীমায়িত শক্তির জন্য পথনির্দেশ না করিয়াও তিনি যদি পাঠক-হৃদয়ে সমস্যাটি তুলিয়া ধরিতে পারেন এবং ইহার কালো দিকটি একটু বিস্তারিত ও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন, জনমত ইহার বিরুদ্ধে গঠিত হইবে এবং সমাধানের পথ আপনি আবিষ্কৃত হইবে। সমস্যার গ্লানিকর রূপটি যেমন শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সাধ্যমত কলাসম্মত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জনপ্রিয় সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে পাঠকমনে সমস্যা হইতে অব্যাহতিলাভের আবেগও তিনি সঞ্চারিত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র মুরলীধর বসু মহাশয়কে ১০ই মার্চ, ১৯১৬ তারিখে রেঙ্গুন হইতে তাঁহার পল্লীসমাজ উপন্যাস' সম্পর্কে লেখা একখানি চিঠিতে সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার উৎকণ্ঠা, প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা, অথচ আপন সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিঠিতে (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৯) তিনি লিখিয়াছিলেন: "তারপরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি যে সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি অনেক অভিজ্ঞতার

কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়া ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে জ্ঞানবিস্তারে।”

বিদেশী শাসনের হীনতালাঞ্ছিত বাঙ্গালীর আত্মদীপ হইবার সদ্যোজাগ্রত প্রেরণা লাভের যুগে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সে সময় আদর্শবাদের একটা প্রাবল্য বাঙ্গালীর চিত্তকে তরঙ্গিত করিতেছিল, সব দিক হইতে ভাল ও বড় হইবার একটা দুর্দম আশা সর্ববিধ দৈন্য ও হীনতার বিরুদ্ধে তাহাদের আবেগোচ্ছল করিয়া তুলিতেছিল। নবজাত বাংলা উপন্যাসকেও এই আদর্শবাদের জোয়ার প্লাবিত করে। তখন উপন্যাসের গঠনশৈলী দুর্বল, কিন্তু লেখকের বক্তব্য প্রধানতঃ তাঁহার চরিত্র-বিন্যাসের মধ্য দিয়া সৎ ও সুন্দরের আরতি-বাচক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক, উপন্যাসের সংগঠন ও কাহিনী-বিন্যাস তাঁহার হাতে পড়িয়া অনেক পরিচ্ছন্ন, হৃদয়গ্রাহী ও বলিষ্ঠ হইল। কিন্তু তিনি উনবিংশ শতাব্দীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জাতীয় শুভলগ্নের নায়ক স্বরূপ, তাঁহার লেখনী আদর্শবাদের আবেগ ত্যাগ করিল না, সত্য শিব ও সুন্দরকে সাহিত্যকৃতির স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের পাঠক হৃদয়ে অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা দুর্বার করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির যে বিপুল আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে, কিছুটা শিল্পকলা-নিরপেক্ষভাবেও এই সাহিত্যসেবীরা সেই আদর্শবোধের আবেগের সহিত আপনাদের একাত্ম করিয়া লইয়াছিলেন।

আদর্শবোধের দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ধারার মোটামুটি অনুগামী হইয়াও শরৎচন্দ্র গভীরভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, উপন্যাস বাস্তবাশ্রয়ী সাহিত্য। কল্যাণধর্মের স্থান ইহাতে যতই থাক, বাস্তব জীবনের উপর তাহার ভিত্তি হওয়া চাই। এইজন্য শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে আদর্শবোধ বাস্তব জীবনাশ্রিত কাহিনীর ভিতর দিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জীবনে যাহা ঘটে বা ঘটা সম্ভব তাহার উপর জোর দিয়াই শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাস

লিখিয়াছেন।* তবে এই বাস্তবানুভূতি নীতিহীন বস্তুগত রূপাঙ্কনে যাহাতে পর্যবসিত না হয় সেদিকে শরৎচন্দ্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি বাস্তব প্রয়োজনে হীন পরিবেশ আঁকেন নাই এমন নয়, কিন্তু সত্য ও সুন্দরের প্রতি সজাগ থাকিয়াই তিনি তাহার ভিতর হইতে জীবনের রস-রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। বাস্তবধর্মী ছিলেন বলিয়াই শরৎচন্দ্র যে-জীবনকে চিনিতেন না তাহা লইয়া লিখিবার দুঃসাহস বড একটা করেন নাই। কলিকাতার ধনী অভিজাত সমাজ সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা কম ছিল বলিয়াই সে সমাজের ছবি তাহার সাহিত্যসম্ভারে কদাচিৎ দেখা যায়। যেখানে তিনি এই ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, সেখানেও পরিবেশটিকে আপন আয়ত্তে রাখিয়া ইহার ভিতর হইতে তিনি আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সুস্থ সুন্দর জীবনরূপের একটা আশ্বাস রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের আশুবাবুর কথা উল্লেখ করা যায়। আশুবাবু ধনী, অভিজাত বিলাত-ফেরৎ মানুষ, শরৎচন্দ্র তাঁহাকে উদারপন্থী, সংস্কৃতিমান করিয়া আঁকিয়াছেন। মোটের উপর মনের সারল্য, সততা, ঔদার্য ও মানবতাবোধে আশুবাবুর চরিত্রটি সমৃদ্ধ। তাছাড়া আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'শেষপ্রশ্ন'-এর ঘটনাস্থল কলিকাতা বা বাংলাদেশের কোন স্থান নয়, আগ্রা। শরৎচন্দ্র হয়তো আশা করিয়াছেন আগ্রার ঘটনাবলীর সংঘটনে ত্রুটিবিচ্যুতি যদিই বা ঘটে, তাহা স্থানের দূরত্বের ফলে এবং পরিবেশের অপেক্ষাকৃত অপরিচিতির জন্য একরূপ মানাইয়া যাইবে। অনুরূপভাবেই শরৎচন্দ্র তাঁহার অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এর 'মিঃ রে'-কে আঁকিয়াছেন। এই বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টারও মোটামুটি সৎ ব্যক্তি, হৃদয়ের উদারতাই তাঁহার প্রধান পরিচয়। এখানেও তাঁহার বাসভূমি

* বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লিখিবার চেষ্টা করিলেও শরৎচন্দ্র জগৎ ও জীবনকে কিরূপ বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়টিতে বুঝা যাইবে: "ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, তাঁহার মনটি ছিল সংস্কার-মুক্ত,—জীবনকে তিনি দেখিয়াছিলেন শুধু সমাজ, জাতি, ধর্ম ও নীতি সংস্কারের রঙীন চশমার ভিতর দিয়া নহে,—জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন সংস্কারের বাহিরে, তাহার স্বাধীন স্বাভাবিক রূপে।"—('বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৪-২৫

কলিকাতা উপন্যাসে তাঁহার কর্মক্ষেত্র নয়, জমিদারীতে গ্রামীণ পটভূমিতেই চরিত্রটি উপস্থাপিত হইয়াছে। 'অনুরাধা' গল্পের বিলাত-ফেরৎ বিজয়ের কলিকাতার বাড়ীর কথা যদিও বলা হইয়াছে, তবু এ গল্পের কেন্দ্র গ্রামের মেয়ে অনুরাধা ও তাহার সরল উদার গ্রামীণ পরিবেশ এবং তাহাই আধুনিকতা-ক্লান্ত বিজয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। 'নব বিধান'-এর শৈলেশকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে আঁকা হইয়াছে তাহাতেও শরৎচন্দ্রের আলোচ্য মনোভাবের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এইভাবে কোন লেখক যদি অপেক্ষাকৃত অপরিচিতির জন্য সমাজের একাংশের রূপায়ণ এড়াইয়া যান তাহাতে নিন্দা করিবার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যে জীবন সেই লেখক ভাল জানেন না বলিয়া পাঠকের ধারণা জন্মে সেই জীবনের ভাসা-ভাসা অভিজ্ঞতা লইয়া পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহাকে যদি তিনি সুযোগ পাইলেই ধিক্কৃত করেন, তাহা হইলে রসিক পাঠকের মনে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র বড় লেখক ও তাহাদের প্রিয় লেখক বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে মনে জাগে। বাস্তবিক শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত আধুনিক সমাজের বা সেই সমাজের মানুষদের যেটুকু ছবি আমরা পাই, মানবিক ঔদার্য-সমন্বিত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায়ই সেখানে লেখকের কেমন যেন একটা বিরূপভাব লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, সেই সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই সমাজের খুঁটিনাটি তিনি দেখিয়াছেন, সেই সমাজের মানুষকে তিনি ভালবাসিয়াছেন এবং তাহাদের কথাই তিনি প্রধানতঃ লিখিয়াছেন। আধুনিক অভিজাত নাগরিক জীবন সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা না থাকা সম্ভব, কিন্তু প্রাচীনপন্থী সামাজিক জীবনের প্রতি কিছুটা আবেগ-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি এই আধুনিক নাগরিকভাবকে বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়া যেটুকু আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যেই তৎপ্রতি তাঁহার কেমন যেন অশ্রদ্ধার ভাবই ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'শেষ প্রশ্ন'-এর আশুবাবু মালিনীদের যে সমাজকে নিজের সমাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার হীনতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহার বিপরীতে যে কমল বিবাহ-প্রথার মত হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিকেই স্বীকার করে না, সেও আশুবাবুর উদারতায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত 'আশুবাবু' হইতে 'কাকাবাবু' সম্বোধন করিয়াছে এবং হাত তুলিয়া নমস্কার হইতে প্রাচীন হিন্দুরীতিতে

পদ-ধূলি লইয়াছে।* 'অনুরাধা' গল্পে বিলাত-ফেরৎ বিজয়ের আপন সমাজের হীনতা দেখাইবার চেষ্টাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিজয় গ্রামের শান্ত পরিবেশে শান্ত মেয়ে অনুরাধাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য কলিকাতার অভিজাত সমাজের যে শিক্ষিতা মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা হইয়াছে এবং যে তাহার বৌদির বোন হিসাবে মর্যাদাসম্পন্ন কুটুম্ব, তাহার সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বিজয় যেরূপ নিন্দা করিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের আলোচ্য দুর্বলতারই পরিচায়ক। সেই মেয়ে তাহার সপত্নীপুত্র কুমারকে দেখিবে না, তাহার ও তাহার স্ব-শ্রেণীর মেয়েদের মানবতাবোধ নাই, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তাহারা আর কিছুই ভাবে না, এরূপ মন্তব্য বিজয় অসঙ্কোচে অনাত্মীয়া অনূঢা বয়স্কা একটি গ্রাম্য মেয়ের কাছে করিয়া গিয়াছে; শরৎচন্দ্রের মন যদি সায় না দিত, বিজয়ের মুখ দিয়া অতি সামান্য পারিবেশিক সুযোগে এরূপ কটূক্তি বাহির হওয়া সম্ভব ছিল না।

'নববিধান'-এ শৈলেশের সাহেবিয়ানার যে পরাজয় এবং উষার হিন্দুয়ানির যে জয় দেখানো হইয়াছে তাহাও অনুরূপভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয়। উষার এই সংযত হিন্দুয়ানি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিসিঞ্চিত বলিয়াই শৈলেশের বৈষ্ণব-

* 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশের দেওঘরের বাড়ীর সামনে সরোজিনীর গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া বিপন্না হওয়া আকস্মিক ঘটনামাত্র। কিন্তু এই উপলক্ষ্য করিয়া সতীশ সরোজিনীকে 'মেমসাহেব' বলিয়া বারবার যে বিদ্রূপ করিয়াছে এবং তাহার আচরণকে সাহেবিয়ানা বলিয়া যে ব্যঙ্গ করিয়াছে তাহাতে শরৎচন্দ্রের মনের সমর্থন যেন লক্ষ্য করা যায়। সরোজিনীর সাংঘাতিক বিপদে তাহার দাদা জ্যোতিষবাবুর চরম উৎকণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক, সেস্থলে সরোজিনী যখন ঠাকুরকে পাঠাইবার সময় দাদাকে চিঠি লেখার কথা বলিল, "সতীশ বলিল, অমনি লিখে দেবেন, বোনকে মেমসাহেব করে তোলবার ফলটা আজ কি হয়েছিল, সাহেব মানুষ শুনলে হয়ত খুশিই হবেন।" ইহার পর আবার শুধু সেমিজের উপর সতীশের একখানি সাদাসিধে লাল পেড়ে ধুতি পরিয়া সরোজিনী যখন সতীশের সম্মুখে আসিল, তখন সতীশের যেভাবে "চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছে," যেরূপ উচ্ছ্বসিত আবেগে সে সরোজিনীকে বলিয়া উঠিয়াছে: "কি চমৎকার আপনাকে মানিয়েচে। যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটি!"—সেই আবেগোক্তির মধ্যেও নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের সনাতনী মনের স্পর্শ আছে।

বাহুল্য চিত্রিত ও পরাজিত হইয়াছে। শৈলেশের এই পরিবর্তনের চিত্র শরৎচন্দ্র যেন ইচ্ছা করিয়াই হীন ও অসহ্যরূপে অঙ্কিত করিয়া উষাকে জিতাইয়া দিয়াছেন। শৈলেশের সাহেবিয়ানার উপর উষার বিজয় 'নববিধান'-এর আসল কথা, উষাকে সগৌরবে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই যেন শৈলেশের চরম দুর্গতি সৃষ্টি। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাসের বাড়ীর আবহাওয়ায় প্রাচীনপন্থী ভাব সুস্পষ্ট। বন্দনা আধুনিকা প্রবাসিনী, এ বাড়ীর আবহাওয়া তাহার পছন্দ করিবার কথা নয়। ইহার বিপরীতে বালিগঞ্জে তাহার মাসিমার বাড়ীর আবহাওয়া তাহার ভাল লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বালিগঞ্জের মাসিমার বাড়ী হইতে আসিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের কাছে বলিয়াছে: "ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথ্যে ভালবাসার গল্প। কোথায় নৈনী আর মুসৌরীর হোটেল আমি জানিওনে কিন্তু এদের নোংরা চাপা ইঙ্গিত শুনতে শুনতে ইচ্ছে হোত, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই।" এই অশ্রদ্ধাভাব লেখকের ইচ্ছাকৃত, আর্টের হিসাবে ইহা দুর্বল।* প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বন্দনা ঠাকুরঘরে বিপ্রদাসের পূজারত প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়াই আত্মহারা হইয়াছিল।

মোটের উপর চরিত্র পরিস্ফুটনে এবং পটভূমিকা রচনায় শরৎচন্দ্র নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাহিরে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু পল্লীগ্রামের রূপ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে সুবিপুল অভিজ্ঞতা ছিল তাহা তিনি সর্বাংশে কাজে লাগাইয়াছেন। মধ্যবিত্ত সংসারের পরিচিত পটভূমিই তাঁহার প্রধান আশ্রয়। এখানে ওখানে নাগরিক জীবনের কথা বলিতে হইলেও বা কাহিনীকে নগরের কর্মক্ষেত্রে আনিতে হইলেও তিনি সাধ্যমত সেসব জায়গায় নিজেকে গুটাইয়া লইতেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং আধুনিক উচ্চবিত্ত নাগরিক জীবনের কাহিনী

* 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের শেষে দ্বিজদাস-বন্দনার বাসর ঘরে বন্দনার উক্তিতে এ দুর্বলতা আরও স্পষ্ট। বন্দনা দ্বিজদাসের গলায় মালা দিয়া মুখুয্যে পরিবারের ভার পাইবার সৌভাগ্যে পুলকিত হইয়া বলিয়া বসিল,—"কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?"—এবং ইহার পরই যেন সম্বিৎ লাভ করিয়া বলিল,—"কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগ্যের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।"

রূপায়ণের প্রয়াস কম করিয়া মোটামুটি মধ্যবিত্ত আচার-আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহিয়াছেন। পরিচিত জগৎ ও জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার এই চেষ্টা তাঁহার সাহিত্যে স্নিগ্ধ রসসঞ্চার করিয়াছে সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে কিছু কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার 'পথের দাবী' উপন্যাসের ঘটনাস্থল ব্রহ্মদেশ। 'ছবি' গল্পও তাই, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে অভয়া-শ্রীকান্ত কাহিনী ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে রচিত, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ী দিবাকরকে লইয়া ব্রহ্মদেশের আরাকানে পলাইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের স্থান-পরিচিতি শরৎচন্দ্রের যেমন ছিল, ব্রহ্মদেশের মানুষদের জীবন-রূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বোধহয় তেমন ছিল না, তাই ব্রহ্মদেশের মানুষদের স্বরূপে আঁকিবার সুযোগ পাইয়াও তিনি সে লোভ সংবরণ করিয়াছেন মনে হয়। ছবি গল্পের সব চরিত্রই ব্রহ্মদেশের, কিন্তু একমাত্র ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতার গৌরবে মা শোয়ের বিজয়ী পো থিন্‌কে মাল্যদানের উত্তেজক গল্পাংশটুকু ছাড়া চরিত্রগুলির নামই শুধু ব্রহ্মদেশীয়, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই হাতে অন্যত্র আঁকা বাঙ্গালী নরনারীর প্রেমের হৃদয়বাদী রূপ এক্ষেত্রেও প্রতিফলিত। তবু 'ছবি' গল্পে কিছুটা ব্রহ্মদেশীয় আবহাওয়া বা জীবনের ছাপ আছে, অন্য লেখাগুলিতে ব্রহ্মদেশ আসিয়াছে শুধু ভৌগোলিক সূত্রে, জীবনসূত্রে নয়। শরৎচন্দ্রের শক্তির পরিচায়ক 'পথের দাবী' উপন্যাসটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পথের দাবী' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড, কিন্তু পটভূমি ব্রহ্মদেশ না হইয়া অনেক ভারতবাসী বাস করে এমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য যে কোন দেশ হইলেও ফল অনেকটা একইরূপ হইত। এত বড় উপন্যাসে হৃদয়, সমাজ, মানুষের কথা প্রচুর আছে, কিন্তু ব্রহ্মদেশের মূল অধিবাসীদের কথা তাহাদের স্বরূপে বা স্বধর্মে অতি সামান্যই প্রকাশিত হইয়াছে; যেটুকু হইয়াছে তাহাও হইয়াছে অত্যন্ত হাল্কাভাবে অথবা খুবই অনুদারভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রহ্মদেশীয়ের চরিত্রের কোন বড় দিক বা সংজ্ঞাবাচক দিক না ফুটাইয়া শরৎচন্দ্র অপূর্বর ভামোর বাসার নীচের তলার ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকের চারি কন্যার চারিজন অব্রহ্মদেশীয় দাঙ্গাবাজ জামাতার (একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙ্গালী পর্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব ও একজন চামড়া-ব্যবসায়ী চীনা) আন্তর্জাতিক শ্বশুর হইবার গৌরব ফুটাইয়া মূলতঃ হাল্কারসই পরিবেশন

করিয়াছেন।* ইরাবতীর তীরে সব্যসাচীর যে গুপ্ত-আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে সেখানে সব্যসাচীর বন্ধু-পত্নী ব্রহ্ম-রমণী ও তাহার তিন চারটি নোংরা শিশুর যে ছবি আঁকা হইয়াছে, সব্যসাচী কিরূপ অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া ও কিরূপ কদন্ন গ্রহণ করিয়া দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রাম চালান, তাহাই ভারতীর অথবা পাঠকের মনে গভীরভাবে আঁকিবার জন্য এ দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, 'পথের দাবী'তে রেঙ্গুন শহরে বেয়ারা, কুলি, পথচারী ভদ্রলোক প্রায় সকলেই ভারতীয়, যেন বাছিয়া বাছিয়া ভারতীয়দের লইয়াই এ উপন্যাস সাজানো হইয়াছে। রেঙ্গুন বাসের প্রথম দিকে অপূর্ব যেদিন রামদাস তলোয়ারকরকে ট্রেনে তুলিয়া দিবার পর রেলস্টেশনে অপমানিত হইল, সেদিন তাহাকে অপমান করিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরারা, উপদেশ দিল হিন্দুস্থানী কুলি ও চানাওয়ালারা, সাহেব স্টেশন মাস্টার তাহাকে তাচ্ছিল্য করিল। স্টেশনে ব্রহ্মদেশীয় বিশেষ কাহারও দেখা পাওয়া গেল না।

শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের সার্থক রূপায়ণের হিসাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনরূপ অঙ্কনে বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করিয়াছেন। এই মধ্যবিত্ত সমাজের গুণ এবং দোষ সবই তাঁহার লেখায় সুন্দর ফুটিয়াছে। মধ্যবিত্তদের ঔদার্যের বিরাটত্ব নাই, সারল্যের সর্বত্র নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু তাহাদের রোমান্টিক মন স্বল্প বস্তুর কেন্দ্রেও রঙীন পরিবেশ রচনা করিয়া আন্দোলিত হয়। তাহাদের ভালবাসার এবং ভাল লাগার গভীরতা যেমন, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতার সংকীর্ণতাও তেমনি। তাহারা সাধারণভাবে হৃদয়বান, অথচ সামাজিক সমস্যার নিরিখে সংস্কার-প্রভাবিত তাহাদের হৃদয়হীনতাও সাংঘাতিক। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ এই মধ্যবিত্তদের কথা লিখিয়াছেন, ইহারা প্রায়ই বাঙ্গালী এবং গ্রামের মানুষ। গ্রাম্য দলাদলি, স্বার্থপরতা, জাতিবৈষম্য, পরশ্রীকাতরতা তাহাদের প্রত্যক্ষ দুর্বলতা। আবার স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি মানবিক গুণও তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের হাতে এই মধ্যবিত্তদের আসন দৃঢ় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রে জমিদার শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেভাবে

---

* 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও অভয়ার রেঙ্গুনে পৌঁছাইবার দিন ব্রহ্ম-রমণীদের গাড়োয়ানকে আখ পেটার দৃশ্যটিতেও ব্রহ্ম দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার সামাজিক রূপ অতিক্রম করিয়া হাস্যরস সৃষ্টিই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে।

জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে, শরৎ-সাহিত্যে জমিদার থাকিলেও তাহারা সেরূপ করিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্রের হাতে সামন্ততান্ত্রিক ভাঙনের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, শোষিতের ব্যথায় সহানুভূতির ছবিতে এবং 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি রচনায় তলার শ্রেণীর মানুষের প্রতিবাদমুখিতায় ইহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মার্জিত মানুষের ভিড় নাই, কিন্তু জীবন্ত সাধারণ মানুষের ভিড় আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মত ভূমিনির্ভর বড় লোকেরা না হইলেও বড় লোক বা আর্থিক-স্বচ্ছলতাসম্পন্ন লোকেরাই বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষেরই গুরুত্ব বেশি।* কিছু কিছু বড় লোকের ছবি আঁকা হইলেও সমাজের কল্যাণসাধনের উৎসাহে শরৎচন্দ্র হয় তাহাদের অন্তর-ঐশ্বর্যই বড করিয়া দেখাইয়াছেন আর না হয় সেই অন্তর-ঐশ্বর্য একরূপ আবৃত রাখিয়া হীনতার দিকটিই স্পষ্ট করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ, 'বিপ্রদাস'-এর বিপ্রদাস, 'শেষপ্রশ্ন'-এর আশুবাবু, 'শুভদা'র ভগবান নন্দী, 'পথনির্দেশ'-এর গুণীন, 'জাগরণ'-এর মিঃ রে; দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত 'দেনা-পাওনা'র জনার্দন রায়, প্রথম দিকের জীবানন্দ, 'পল্লী-সমাজ'-এর বেণী ঘোষাল, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে। প্রকৃতপক্ষে

* সাধারণ মানুষকে শরৎচন্দ্র কত ভালবাসিতেন তাহা ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে তাহার ৫৩তম জন্মোৎসবের ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে: "নানা অবস্থা বিপর্যয়ে এতদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তার সকল ক্ষতিই তারা আবার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোনদিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়।"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২১-২২২)

দোষে গুণে সকল দিক হইতে পূর্ণাঙ্গ ধনী অভিজাত চরিত্র শরৎসাহিত্যে নাই বলিলেই চলে।

শিল্পকলা বা আর্টের হিসাবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টিতে অনেক ত্রুটি আছে, একথা সত্য। এইসব ত্রুটি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্তমান গ্রন্থে ইতস্তত দেখানো হইয়াছে, পরেও ইহা আলোচিত হইবে। কিন্তু শিল্পকলার দিক হইতে তাঁহার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। তিনি 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত'র মত শিল্পকলা-সমৃদ্ধ উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। শিল্পকলার দিক হইতে শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব চরিত্রসৃষ্টিতে। তাঁহার উপন্যাসের কাহিনীর উদার বিস্তৃতি বা বৈচিত্র্য যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি চরিত্রের গতি বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যও সীমাবদ্ধ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অবলম্বন তো বাঙ্গালী জীবন, যে জীবনের সীমাবদ্ধতা প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে পরিমিত গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিবেশে সীমায়িত বাঙ্গালী জীবনের উপর শরৎচন্দ্র তাঁহার জটিল পূর্ণাঙ্গ চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আধুনিক কালের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টিকেই সবচেয়ে বড উপাদান মনে করা হয়, একথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্রগুলি খুবই গতি-সম্পন্ন বা জীবন্ত। শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্রগুলির অধিকাংশই অবশ্য মন্থর, তবু স্ত্রী-চরিত্রের গতি সঞ্চারের হিসাবে এবং সমগ্রভাবে কাহিনীর গতি সঞ্চারে এই পুরুষ চরিত্রগুলির কাযকরিতা অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রগুলির ভিত্তি ও রূপ যে প্রায় ক্ষেত্রেই বাস্তব একথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রগুলিকে ভাল করিয়া আঁকিবার কথাই বড় করিয়া ভাবিতেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন লইতেন। চরিত্রগুলির হৃদয় ও জীবনরূপের সঙ্গে তাহাদের নামকরণের যাহাতে মিল থাকে এজন্য তিনি চরিত্রের নামকরণেও অনেক সময় যত্ন লইয়াছেন। কমল, অভয়া, বিশ্বেশ্বরী, কিরণময়ী, ভুবনেশ্বরী, আশুবাবু, গিরিশ, সতী, সাবিত্রী, বিজয়া, উষা প্রভৃতি নামের সহিত তাহাদের জীবন-রূপের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য পাঠকের চোখে ধরা না পড়িয়া পারে না। শরৎ-সাহিত্যের নারী-চরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দুইটি চরিত্র অন্নদা এবং রাজলক্ষ্মীর নামকরণও তাহাদের বাস্তব জীবনের কিছুটা পরিচয়বাহী মনে হয়, অন্নদার দরিদ্র স্বামীর ঘরে স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগিনী সতী রূপ এবং রাজলক্ষ্মীর লক্ষ্মীর মত ঐশ্বর্য এবং লক্ষ্মীর মত কল্যাণবোধ!

শরৎচন্দ্র তাঁহার চরিত্রগুলিকে প্রধানতঃ বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি, ভাবকল্পনা এবং বহিরঙ্গ আবহাওয়া বা ঘটনার সংঘাতের উপর জোর দিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহার নানা ধরণের চরিত্র-চিত্রণের প্রতি ঝোঁক ছিল না; কিন্তু হৃদয়-সংঘাতে চঞ্চল, ভালমন্দ-মিশানো গোটা মানুষকে ফুটাইবার দিকে তাঁহার প্রবণতা ছিল। মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করিয়াছেন। চরিত্রের অগ্রগতি বিপরীতাত্মক অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় ঘটিতে পারে, ইহা শিল্পকর্মের প্রশংসনীয় রীতি, শরৎচন্দ্র এই রীতিতে অনেক চরিত্র ফুটাইয়াছেন এবং চরিত্রগুলি জটিল হওয়ার ফলে কাহিনী বা আখ্যানভাগেও স্বভাবতই জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে; শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে অনেকসময় এই বিপরীতাত্মক অনুভূতি হঠাৎ আসিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মন দ্রুত উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গিত হইয়াছে, তাহা যে পথে চলিতেছিল, এই বিপরীতমুখী ভাবভাবনা সে পথে ফাটল ধরাইয়াছে, মন এলোমেলো হইয়াছে বা প্লাবনী নদীর মত অন্যপথে সহসা বাঁকিয়া গিয়াছে। 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দু নিজের অহংবোধ সঙ্কুচিত করিয়া অসুস্থ স্বামীকে প্রায় মানাইয়া লইয়াছিল এমন সময়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করিল তাহার স্বামীর উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অজ্ঞাতসারেই এবং গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে ননদিনী বিমলাকে। বিমলা ও তাহাদের ভাড়াটে অম্বিকাবাবুর বউ বইখানি পড়িতে পড়িতে যখন উপন্যাসের নায়িকা দুর্গামণির দুঃখে অশ্রুসজল হইয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ইন্দু গিয়া হাজির হইয়াছে সেখানে। ইন্দুর মনের গতি এই অভাবিত সংঘর্ষে ঘুরিয়া গেল। সে বিমলাকে জানাইয়া দিল, সে পরদিন বাপের বাড়ী যাইতেছে, সেখান হইতে তাহাকে যেন বিমলার দাদা আনিতে না যান, তাহাকে তিনি যেন 'জ্বালাতন না করেন'। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা মহিমের গ্রামের বাড়ীতে মহিমকে একান্তভাবে পাইয়া তাহার প্রেমোচ্ছল হৃদয়খানি মহিমের কাছে মেলিয়া দিতে পারিত, কিন্তু কোথা হইতে শনির মত অভাবিতভাবে সেখানে উপস্থিত হইল সুরেশ, যাহার পৌরুষের আকর্ষণ অচলাকে দুর্বল করিয়া তুলিল এবং চঞ্চলা গ্রাম্যবধূ মহিমের পুরাতন বান্ধবী মৃণাল, যে তাহার সতীনরূপে নিজেকে ঘোষিত করিয়া ও সেজদা মহিমকে নানাভাবে ঘনিষ্ঠ ঘোষণা করিয়া এই গ্রাম্য রসিকতায় অনভ্যস্ত আঘাতে-জীর্ণ অচলার মনে মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিল। ফলে অচলার জীবনপথে সৃষ্টি হইল গভীর আবর্ত। 'গৃহদাহ'-এর আর একটি দৃষ্টান্তে

কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। অসুস্থ মহিমকে লইয়া অচলা জব্বলপুরে হাওয়া বদলে যাইতেছে। তখন অন্তর তাহার স্বামিময়। মহিম তাহার সহিত একেলা যাইবে, বেশ কিছুদিনের জন্য তাহারা যাইতেছে। মহিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশ অসুস্থ মহিমকে আপন গৃহে আনিয়া বাঁচাইয়াছে, সুরেশের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অচলা "একটা বসন্তের দমকা বাতাসের মত" তাহার ঘরে গেল। সুরেশের মুখ দেখিয়া কিন্তু অচলার মনের গতি পরিবর্তিত হইল। এইখানে বইয়ে আছে: "তাহাদের বাড়ী পুড়িয়া গেলে আশেপাশের গাছগুলার যে চেহারা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের এই মুখখানা এমনি করিয়াই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল।" তারপর সুরেশ যখন অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "আজই ত তোমরা যাবে—সমস্ত ঠিক হয়েছে? কত কাল হয়ত আর দেখা হবে না"—অচলা বেদনায় ভাঙিয়া গেল, তাহার চোখ হইতে সুরেশের সঙ্গে "চোখাচোখি হইবামাত্র বড বড অশ্রুর ফোঁটা টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।"*

(সামাজিক বিধান সমাজ কার্যকরী রাখে বলিয়াই তাহা বড নয়, সামাজিক মানুষের মনের উপর সামাজিক বিধানের যে প্রভাব, তাহাই সামাজিক বিধানের অস্তিত্ব রক্ষায় অধিকতর কার্যকরী,) শরৎচন্দ্র মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রের গতি-প্রকৃতিতে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শী বা 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মী প্রেমাস্পদকে পাওয়ার সীমানা হইতে যে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, 'পণ্ডিতমশাই'-এর কুসুম যে বৃন্দাবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে নিজের সহিত লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, এজন্য সমাজের বিধান কেহ জোর করিয়া তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে আসে নাই, তাহাদের মন সমাজের বিধান মানিয়াছে বলিয়াই মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে

* 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে গঙ্গামাটিতে স্বামী পরিচয়ে জমিদার রাজলক্ষ্মী অসুস্থ শ্রীকান্তকে লইয়া গিয়াছে। মুক্ত প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে শ্রীকান্তকে দীর্ঘকাল পাওয়ার ফাঁকে রাজলক্ষ্মীর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় রাজলক্ষ্মীর জীবনে হঠাৎ আসিয়া জুটিল সুনন্দা, যাহার ব্রাহ্মণ্য দৃঢ়তা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং নীতিবোধ রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তর সহিত এক বাড়ীতে বাস সত্ত্বেও শতযোজন দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

সেই সমাজবোধ দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় সৃষ্টি করিয়াছে। অচলা যে সুরেশকে পাইয়াও লইতে পারিল না, এজন্য স্বামী মহিমের নিকট হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে বা কাহারও মারফৎ কোন বাধা আসে নাই, অচলার স্বামী-সংস্কারের অথবা সমাজিক বিধানের জন্য তাহার অন্তর্মনের দুর্বলতাই তাহাকে দুই বিপরীতপ্রান্তে দৌড করাইয়াছে। সমাজের অননুমোদিত প্রেমে শরৎচন্দ্রের যে চরিত্র জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার মনে প্রেম ও প্রেমের সামাজিক অননুমোদনের সংঘর্ষ সর্বদাই ক্রিয়াশীল। এই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্বে অনেকক্ষেত্রেই প্রেমিকা (শরৎসাহিত্যে প্রেমিকাই প্রায়ক্ষেত্রে সক্রিয়, প্রেমিক প্রায়ই শান্ত) অসামাজিক প্রেমের দুর্বার আবেগে সাড়া দিয়াছে অন্তরঙ্গভাবে, কিন্তু বহিরঙ্গভাবে সমাজের প্রতি কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে তাহার আনুগত্যই সে দেখাইয়াছে। ইহা সর্বক্ষেত্রে বা সর্বাংশে আন্তরিক নাও হইতে পারে, ভয়ে অথবা সংস্কারবশে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই সমাজ-আনুগত্যের প্রমাণ সে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোথাও এমনও ঘটিয়াছে যে মনের বিপুল প্রেমভার যাহাতে একেবারেই লোকে বুঝিতে না পারে সেজন্য প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমিকা প্রকাশ্য বিরোধে নামিয়া আসিয়াছে, প্রেমিককে সে আপাতভাবে অবজ্ঞা করিবার, এমনকি অপদস্থ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শী বা 'পল্লীসমাজ'-এর রমার প্রেমাস্পদ জীবানন্দ বা রমেশের সহিত বিবাদ করিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাহিরে লোকচক্ষুর সম্মুখে অন্তত লডাইয়ে তাহারা দৃঢ়তা দেখাইয়াছে। ষোড়শীর এই লড়াইয়ের পিছনে তবু জনকল্যাণের এবং দেবীর স্বার্থরক্ষার একটা আদর্শবোধ কাজ করিয়াছে, রমার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রমা শেষপর্যন্ত রমেশকে জেলে পাঠাইয়াছে, ষোড়শী আরও অগ্রসর হইয়া সাগরসর্দারকে ইঙ্গিত করিয়াছে জীবানন্দকে আঘাত করিবার। তবে এ কাজের পিছনে স্বার্থ বা আদর্শ যাহাই থাক, রমা ও ষোড়শী মোটেই চাহে নাই যে, রমেশ ও জীবানন্দ সম্পর্কে তাহাদের দুর্বলতা বাহিরের লোক জানুক।

শরৎচন্দ্র বিভিন্নমুখী বিচিত্র ভাবতরঙ্গ-সমন্বিত জটিল মানব-চরিত্র অঙ্কনে খুবই সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর জটিলতা না থাকিলেও অন্তরের এই জটিলতা সম্পাদন কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রাজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতা-নির্ভর জীবন-রহস্য বিশ্লেষণে

এবং জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন: "তিনি প্রেমের উদ্ভব-রহস্য ইহার বিধিনিষেধ উল্লংঘন প্রবণতা ও সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের যেরূপ গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্কিমের বিশ্লেষণে সেরূপ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টি নাই।" (বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা—১৪৮।)* শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি মানুষের হৃদয়-রহস্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং জটিল তরঙ্গিত মানবমনের স্বরূপ ফুটাইয়াছেন, কিন্তু এই গহন চিত্তলোক আবিষ্কারের চেষ্টায় মানুষের অন্তরঙ্গ প্রবৃত্তি সন্ধান করিলেও যৌন-জীবনের জৈবিক দিকটি তিনি যথাসম্ভব আভাসে ইঙ্গিতে অত্যন্ত সংক্ষেপে সারিয়াছেন। এই মনোভাবের জন্য তিনি যে সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত হন নাই সেকথা বলাই বাহুল্য, বরং কোন কোন সময় এজন্য তিনি সম্ভোগবিরোধী বা পিউরিটান রূপে উল্লিখিত হইয়া বাস্তবানুগামিতা-বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। এ হিসাবে তাঁহার সহিত "কল্লোলগোষ্ঠী" নামে পরিচিত সমকালীন অনুজ-প্রতিম কথাসাহিত্যিকদের লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। এই কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাপ্রবাহ বাংলাসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে বাস্তবতার নামে, অন্তর্মন উদ্ঘাটনের নামে তাঁহাদের সাহিত্যে যৌনমনস্কতার যে বাহুল্য দেখা দিয়াছিল শরৎসাহিত্যকে তাহার বিপরীতপ্রান্তীয় বলা চলে।** মোহিতলাল মজুমদার 'সত্যসুন্দর দাস'

*নিজের সাহিত্যসৃষ্টির সাংগঠনিক ভিত্তি হিসাবে শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন: "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে।" —(ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভাষণ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' পৃষ্ঠা—২০৭)

**অবশ্য নূতনকে স্বীকার করিবার উদারতাও শরৎচন্দ্রের ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন কালের প্রয়োজনে সাহিত্যরূপের পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-পথ অন্ধভাবে অনুসরণ না করিবার ইহাই তাঁহার যুক্তি। বাস্তবতার নামে দেহজ কামনা বাসনার উপর অত্যধিক

ছদ্মনামে আশ্বিন, ১৩৩৪ 'শনিবারের চিঠি'তে এই আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করেন: "আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তাহার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।… যাহা কিছু সুন্দর তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের আক্রোশ।"

বাস্তবিক শরৎচন্দ্র মানুষের চিত্তক্ষুধার বর্ণনা প্রসঙ্গে অসামাজিক কামনা বাসনার কথা বলিয়াছেন, পতিতাকে মানুষরূপে দেখিয়া ভদ্রনারীর হৃদয়-বর্ণনার মত করিয়াই পতিতা নারীর হৃদয়ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা নোংরা, বাস্তবতার নামে তাহার বিস্তারিত চিত্রণে শরৎচন্দ্রের উৎসাহ ছিল না। শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী ঘরের বৌ বলিয়াই তাহার এত সমালোচনা. তিনি যে নিজে কোন কুলমহিলাকে কোন কামনা-বাসনার বশবর্তিনী করিয়াই কুলত্যাগ করান নাই, ইহা তাঁহার সন্তোষের কথা।*

জোর দেওয়ায় সমাজের কল্যাণ নাই, সাহিত্যিকের প্রতিভা স্ফুরণেও ইহা সম্যক আধার নয়, এই ধারণাতেই তিনি 'কল্লোলগোষ্ঠী'র সহিত নিজেকে মিলাইয়া দেন নাই; না হইলে কল্লোলগোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের বাস্তব জীবনচর্চা তিনি অশ্রদ্ধা করেন নাই। ইতিপূর্বে ১৩৩৫ সালে ৩১শে ভাদ্র তাঁহার ৫৩তম জন্মতিথি অনুষ্ঠানের ভাষণেই শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন: "একথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোনো দেশের কোনো সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকেনা। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের কারণ আছে।…রসবোধ ও সৌন্দর্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই একযুগে যে মূল্য মানুষ খুসি হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্ধেক দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না"

*তাঁহার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে ১২ই মে, ১৯১৩ তারিখে যে চিঠি লেখেন তাহার একস্থানে ছিল: তার ('চোখের বালি'র বিনোদিনীর) নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরে পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত

যৌন আকর্ষণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়াই শরৎচন্দ্র মনে করিতেন, এইরূপ ঘটনা জীবনে সম্ভবপর ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি যাহারা এসব দুর্বলতায় জড়াইয়া পড়ে তাহাদের মানবিক সহানুভূতি সহকারে সম্যক উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই দুর্বলতার কাহিনী রসের হিসাবে সরাসরি সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করে বলিয়া তিনি তাহার বিস্তারিত বর্ণনা বা আলোচনা করেন নাই। মানুষের মন দুর্বল হইলে তাহার নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, শরৎচন্দ্র একপ দুর্বলতা তাঁহার লেখায় বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উল্লেখ করিয়াছেন বা তৎপ্রতি মানবিক সহানুভূতি দেখাইয়াছেন বলিয়াই সেই দুর্বলতা তিনি সমর্থন করিয়াছেন একথা বলিলে ভুল হইবে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণের আগ্রহে তিনি এইরূপ দুর্বলতার দুঃখময় ফলই বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র মানুষকে সব দোষ গুণ মিলাইয়া সমগ্রভাবে দেখা উচিত বলিয়া মনে করিতেন, নৈতিক পদস্খলনের মত গুরুতর সামাজিক অপরাধ সত্ত্বেও মানুষের গুণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' অধ্যায়ে উল্লিখিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনার পুনরুল্লেখ করিতেছি। প্রসঙ্গটি তাঁহার গ্রাম-সম্পর্কিতা এক বালবিধবা দিদি সম্বন্ধে। তাঁহার এই দিদির নানা সদ্গুণ ছিল এবং সেজন্য শরৎচন্দ্র তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু এই সদা-হাস্যমুখী, পরোপকারিণী দিদির ঘরেই একরাত্রে বালক শরৎচন্দ্র এক পরপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ব্যাপারটা অনুরাগী বালকের পক্ষে মর্মান্তিক, কিন্তু দিদির এই নৈতিক দুর্বলতায় গভীর ব্যথাবোধ করিলেও তাঁহার প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা এজন্য বিলুপ্ত হয় নাই। জৈবিক কামনা-সংযমে দিদির অক্ষমতার জন্যই শরৎচন্দ্র তাঁহার নানা মহৎ গুণ উপেক্ষা করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পান নাই। শরৎচন্দ্রের অভিমত ছিল এই যে, নারীর সতীত্ব যদি কোন ক্ষেত্রে নাও থাকে, সেজন্য তাহার নারীত্ব থাকিতে বাধা নাই। মানবিক

করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই; পরে কি করিব জানি না।"—(গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১ম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।)

মূল্যবোধে প্রত্যয় অথবা সমগ্রভাবে মানুষের প্রতি প্রবল সহানুভূতির জন্যই যে শরৎচন্দ্রের এই উদার মনোভাব সম্ভব হইয়াছিল, সেকথা বলা বাহুল্য।*

শরৎচন্দ্রের প্রধান স্ত্রী-চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সুন্দরী এবং তাহার প্রেমিকা রূপের প্রাথমিক পটভূমিতে এই দৈহিক সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী, কমল, কিরণময়ী, বিজয়া, অচলা, মা শোয়ে, সুমিত্রা, সরযূ প্রভৃতির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। তবু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম অবস্থায় এই দৈহিক সৌন্দর্যের মূল্য যাহাই হউক, সে মূল্য প্রেমের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্প্রভ হইয়াছে এবং মানসিক সৌন্দর্য সেই স্থান লইয়াছে। নৈতিকতা বলিতে আমরা সামাজিক অর্থে যাহা বুঝি রাজলক্ষ্মী, কমল, কিরণময়ী, সাবিত্রীর মত শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি প্রধান স্ত্রী-চরিত্র সে হিসাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধা না হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের যেমন প্রায় ক্ষেত্রেই দৈহিক সৌন্দর্য, মানসিক সৌন্দর্য এবং নৈতিক সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে, শরৎচন্দ্রের আলোচ্য চরিত্রগুলির মধ্যে নৈতিক সৌন্দর্য সে হিসাবে কম হইতে পারে, কিন্তু দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যে তাহারা উজ্জ্বল। তথাপি তাহাদের স্থিতিমান রূপ দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্যের উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছে, ইহা শরৎ-সাহিত্যের অবধানী পাঠককে বলিয়া দিতে হয় না। মনের নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার গৌরবে লেখকের সহৃদয়তা-সম্পৃক্ত কমনীয় নারী-চরিত্রগুলি এই জন্যই অসামাজিক প্রেমের পথে চলিলেও তাহাদের প্রতি পাঠকের অনুরাগ তীব্রই থাকে। ইহা শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এজন্য সামাজিক কাঠামো অক্ষত রাখিতে উৎসাহী দেশবাসীর কাছে শরৎচন্দ্র কখন কখন নিন্দিতও হইয়াছেন।

জৈব কামনার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনায় অনিচ্ছুক হইলেও শরৎচন্দ্র

*সামতাবেড়, পানিত্রাস হইতে ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ চমৎকার ফুটিয়াছে: "যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism-ত নেই-ই realism-ও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যে স্পর্ধা—না জানার অহমিকা।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৯)

কামনা-বাসনা-ক্লিষ্ট চরিত্রের গতি-প্রকৃতি যেভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তি-জীবনের উপর কামনা-বাসনার প্রভাব কতখানি তাহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব, শিক্ষা-সংস্কৃতি-পরিবেশ তাহার কামনা-বাসনার অবারিত রূপ প্রকাশে অথবা তাহা পূরণে প্রকাশ্য চেষ্টায় অবশ্যই বাধা দান করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত-সংস্কৃতির আওতায় মানুষ চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। এইভাবে মানব মনে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহার ফলে একধরণের বিচিত্র নীতি-বাদের নির্মোকে আপনাকে আবৃত করিয়া মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে, অথবা দোটানায় পড়িয়া দার্শনিক-সুলভ নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকা অবলম্বন করিতেও পারে। বাস্তব জীবনায়নের হিসাবে উপন্যাসের নায়ক নায়িকা এই পথে চলিলে স্বভাবতঃই পাঠকদের কিছুটা অস্বস্তি দেখা যায়। কেহ কেহ যে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির সম্ভোগনীতি-বিরোধিতার সমালোচনা করেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের এই শুদ্ধাচারিতার প্রশংসা না করিয়া ইহা পলায়নী মনোবৃত্তিসূচক বলেন। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তর প্রণয়-কাহিনী প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার নায়ক হিসাবে শ্রীকান্ত-চরিত্রের অপূর্ণতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করিয়াছেন: "শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহার ঐ দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইতেও ছাড়িবে না। অধঃপতন আর কাহাকে বলে। আবার শ্রীকান্ত চরিত্রে এই দুর্বলতার অনুরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। এইরূপ egotism—বালক প্রকৃতি লক্ষণ।"—('শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪৬) কিন্তু এই সমালোচনা সত্ত্বেও 'শ্রীকান্ত'র মত অপেক্ষাকৃত অল্প জঙ্গম চরিত্রের হৃদয়দ্বন্দ্ব প্রকাশে শরৎচন্দ্র যেরূপ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং 'শ্রীকান্ত'র সান্নিধ্যে তাহারই অন্তরালোকে উদ্ভাসিত এযাবৎ অস্পষ্ট রাজলক্ষ্মীর নারীরূপটিকে যেভাবে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন, মনস্তত্ত্বমূলক ও জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে সে কৃতিত্ব কি কম? শরৎচন্দ্র 'স্বামী' ও 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে এই প্রবল হৃদয়দ্বন্দ্ব ফুটাইবার জন্যই সৌদামিনী এবং বিরাজকে স্বামিগৃহত্যাগিনী করাইয়াছেন। 'বিরাজ-বৌ' রচনার সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজ-জীবন যেরূপ পুরাতনপন্থী ছিল, সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এইভাবে অন্তরের জ্বালায় ক্লিষ্টা নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার অত্যুগ্র

প্রয়াস দেখানো যে কত কঠিন ছিল আজ তাহা ভাবাও যায় না। খ্যাতিমান সাহিত্য-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের মত ব্যক্তি বিরাজের পরপুরুষের সঙ্গে স্বামিগৃহত্যাগকে বিভীষিকাময় ও বীভৎস ঘটনা বলিয়া শরৎচন্দ্রের নিন্দা করিয়াছেন।* মোটের উপর শরৎচন্দ্র ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য ফুটাইতে পূর্ণ চরিত্র অঙ্কনের আবেগে তাহার স্থূল নৈতিক কামনার বাস্তবচিত্র বিস্তারিতভাবে আঁকেন নাই একথা ঠিক, কিন্তু আগেকার উপন্যাসের মত ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত অনুগত করিয়া তাহার অন্তর্লীন কামনা-বাসনার সন্ধানী না হইয়া শুধু বহিরঙ্গ ঘটনা বা প্রচলিত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত জীবনালেখ্য আঁকিতেও উৎসাহবোধ করেন নাই। সমাজের পটভূমিতে সামাজিক মানুষের স্বতন্ত্র সত্তাকে মানবিক মর্যাদা দিয়া তিনি তাঁহার চরিত্রের মন ও ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তিমন ও সমাজমনের সংঘর্ষ অনুপম ভঙ্গিতে আঁকিয়াছেন। আধুনিকতার পথে বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতিতে ব্যক্তি-চরিত্রের এই বন্ধনমুক্তির যে কৃতিত্ব শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহার মূল্যও কম নয়। শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি শুধু নৈতিক বাসনা-কামনায় অবারিত রূপায়ণেই বিরত থাকেন নাই, অশ্লীলতা যথাসম্ভব পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভব্যতা-বিরোধী ভাষা সযত্নে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অকারণে বা তুচ্ছ কারণে শরৎচন্দ্র সমাজকে আঘাত করিতে চাহেন নাই একথা সত্য, তবে অপেক্ষাকৃত সংযত লেখক হইলেও সৃষ্ট চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য সমাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়াকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কিত করিবার ব্যাপারে বাস্তবধর্মী সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার দ্বিধা ছিল না। তিনি জীবনশিল্পী, জীবন-বিশ্লেষণ তাঁহার কাজ, সে কাজে কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন। তাছাড়া সমাজ-

*" 'বিরাজ-বৌ'-এর মত চরিত্রের পক্ষে উপস্থিত অবস্থায় স্বামী পরিত্যাগ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু 'স্বামী ভাবে' পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ!...উহা একেবারে বিভীষিকাময়—অপিচ বীভৎস হইয়া সমগ্র গ্রন্থের প্রাণ এবং সমাধানের উপর বজ্রাঘাতের মতই পতিত হইয়াছে।"—(শশাঙ্কমোহন সেন, বাণীমন্দির, ১৯২৮, পৃষ্ঠা ২০৫)

সচেতন শিল্পী হিসাবে সত্যসুন্দরের দিকে ফলশ্রুতিকে রাখিবার যে আগ্রহ তাঁহার ছিল, সে উদ্দেশ্য দৈন্যাঙ্কনে অতিবিমুখতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও তিনি বুঝিতেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১২।৫।১৯১৩ তারিখে রেঙ্গুন হইতে লেখা চিঠিতেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়াও ঔপন্যাসিকের অন্য কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য যদি ক্ষত দেখাইবার দাবী করে তাহা হইলে লেখককে ক্ষত দেখাইতেই হইবে। তবে, আগেই বলা হইয়াছে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধিতামূলক মানুষের হৃদয়ভাব অঙ্কনের সময় শরৎচন্দ্র বিশেষ করিয়া এইজন্য সাবধান হইতেন যে, পাঠকমনে এই বিরোধী ভাব অনুসরণের জন্য যেন ভালমন্দ-চিন্তা-নিরপেক্ষভাবে রোমাঞ্চকর আবেগ না জন্মায়। এই কারণে তিনি এই বিপরীত ভাবের রূপায়ণেও দেহজ কামনা-বাসনার ছবি বিস্তারিতভাবে ফুটান নাই। তবু মোটামুটি মানব-মনের সীমায় সাহিত্যকৃতি রাখিয়া তিনি মনের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষাসমূহকে সমাজের অনুমোদনের পরোয়া না করিয়াই বিশদভাবে ও জীবন্তভাবে ফুটাইবার যে সাহস দেখাইয়াছেন, তাহার জন্যই তিনি বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারায় লক্ষণীয় অগ্রগতির সঞ্চার করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র আপন ধারণামত প্রচলিত সামাজিক নীতিধর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবাদ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি সেই প্রতিবাদের উত্তেজনায় ভাঙনধর্মিতার প্রশ্রয় দেন নাই। এদিক হইতে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী মনোভাবের কথা স্মরণ রাখিয়াও তাঁহাকে সংযমী লেখক বলিতে হইবে।* সাহিত্য সৃষ্টিতে বাস্তবাশ্রয়িতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণবোধের সম্পর্ক তিনি মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা শরৎচন্দ্রের সংযম ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। তিনি যাহা ন্যায্য মনে করিয়াছেন দৃঢ়তার সহিত তাহা কিভাবে

* সাহিত্যে সত্য শিব ও সুন্দরের স্থান সম্পর্কে শরৎচন্দ্র ১৭ই আশ্বিন, ১৩৩১ তারিখে প্রবর্তক সঙ্ঘের পরিচালক মতিলাল রায় মহাশয়কে এক চিঠিতে লেখেন: "আচার্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলছিনে,—বলচি সাধারণ-অর্থে), অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যাঁরা, তাঁদের একমাত্র

সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন সেকথা ব্যাখ্যা করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্য সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "আমি প্রথমেই দেখলুম—ছোটগল্প বড় দরকার। রবিবাবু আগে লিখে গেছেন তারপরে আর তেমন কেউ লেখেনি। আমি লিখতে লাগলুম। সম্পাদক বললেন —দেখ, প্রেম ট্রেম না। ও একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। দুর্নীতি না থাকে এমন সব ভাল গল্প লেখ। লিখলেম। তাঁরা বললেন—ভাল হয়েছে। ক্রমশঃ সাহিত্যের মধ্যে যখন আসতে লাগলুম, দেখলুম—দুর্নীতি প্রচার ক'রো না; প্রেমের গল্প লিখ না; এ ক'রো না—এসব বললে তো চলবে না। তখন চরিত্রহীন সুরু করি।" (প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯২৩।)

* * *

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সরল মানবিক গুণাবলীর প্রতি অনুরক্তি ছিল বলিয়া শরৎচন্দ্র মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্য অনুপম ভঙ্গিতে ফুটাইয়াছেন। স্নেহ, ভালবাসা, করুণার মত মহৎ কোমল হৃদয়বৃত্তি তাঁহার লেখায় জীবন্ত রূপ পাইয়াছে। এই গুণগুলির মহত্তম আধার হিসাবে তিনি নারী-চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়াছেন। সন্তানের পরিপ্রেক্ষিতে মা সারল্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। মাতৃরূপ শরৎসাহিত্যে আশ্চর্য সুন্দর। স্নিগ্ধ সৌকুমার্য শিশুর মধ্যে সদাস্ফুরিত, শরৎচন্দ্র হৃদয়বাদী সাহিত্যিক

মন্ত্র হ'লো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই! হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই।

অথচ সাহিত্য সেবায় বহুদিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি, তাকে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না করেও ত পারিনে।" (শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, ১০ম সম্ভার, পত্র-সঙ্কলন।)

হইলেও মাঝে মাঝে শিশু চরিত্র আঁকিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী'তে অপুর যে শিশু-জীবনলীলা চিত্রিত করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের শিশুর জীবনরূপ ঠিক সেই শ্রেণীর নয়। শরৎ-সাহিত্যের শিশুকে শিশু না বলিয়া বালক-বালিকা বলাই সঙ্গত। অবশ্য 'নিষ্কৃতি' গল্পে শৈলজার সন্তানদের মত বয়স্কদের হৃদয়রূপ সংগঠনে শিশুর ভূমিকা শরৎ সাহিত্যে সামান্য আছে বটে, কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রেই বালক-বালিকার। শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রথম জীবনের রূপটি ধরিবার প্রয়াসে 'দেবদাস' উপন্যাসে তিনি এইরূপ দুটি বালক-বালিকাকে আনিয়াছেন যাহারা পরে দেবদাস-পার্বতী বা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইয়াছে। 'পল্লীসমাজ' এবং 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার শৈশব জীবনের চিত্র গল্পচ্ছলে কিছুটা আনা হইয়াছে। এই বালক-বালিকাদের পরবর্তীকালে যে জীবনরূপ হইবে, তাহার খানিকটা প্রস্তুতি প্রথম জীবনে হোক, ভবিষ্যৎ জীবনের কিছুটা আভাস এই প্রথম জীবনে দেখা যাক, এই উদ্দেশ্যেই বলিতে গেলে শরৎচন্দ্র দেবদাস-পার্বতী, রমেশ-রমা, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রথম জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন।

শিশুরা চঞ্চল, দুষ্টবুদ্ধিতে ইহারা আপন পথে প্রতিভাবান, পৃথিবীতে নূতন আসিয়াছে বলিয়া জগতের হীনতা-দীনতার সঙ্গে ইহাদের সংযোগ প্রায়ই ঘটে নাই, যে মানবিক সহানুভূতি শরৎসাহিত্যের বড় দিক তাহাতে ইহারা সবিশেষ সমৃদ্ধ। ইহাদের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয়। শরৎচন্দ্র ইহাদের কথা যতটুকু বলিয়াছেন, সরলতাতে হোক, বোকামিতে হোক, দুষ্টামিতে হোক, করুণাতে হোক, সবক্ষেত্রেই রস-সমৃদ্ধ কাহিনীগুলি খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলাকার গল্প' নামক গল্প সঞ্চয়নে 'লালু' শিরোনামায় যে তিনটি গল্প আছে, তাহার মধ্যে প্রথম গল্পটিতে দুরন্ত ছেলের লেখাপড়ার জন্য মায়ের কড়াকড়ির প্রতিশোধ দিতে লালু মায়ের পরমারাধ্য গুরুদেবের মশারির চালে বরফের টুকরা বাঁধিয়া রাখিয়া সারারাত মশার কামড় খাইয়া গুরুদেবকে বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য করিয়াছে। এই দুষ্টামি প্রকাশ পাইলে গুরুদেব নিজের বোকামিতে হাসিয়া অস্থির হইয়াছেন, সে হাসির প্রবাহে পাঠকদের অন্তরের অসন্তোষ বা গ্লানিও ধুইয়া গিয়াছে। 'দেবদাস' উপন্যাসের

গোড়ায় পাঠশালায় ফাঁকি দিয়া মাঠে ঘুড়ি উড়াইবার বাসনায় দেবদাস যে ভাবে সর্দার পোড়া ভুলোকে চুনের গাদায় ফেলিয়া দিয়া ভূত সাজাইয়াছে, তাহা কাজ হিসাবে ভাল নয়, কিন্তু দেবদাসের জীবন-বিন্যাসের সূচনা হিসাবে পাঠকের কাছে তাহার কিছু মূল্য আছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিশু ইন্দ্রনাথ ক্লাসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর "গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া" হেডমাস্টার মশাইয়ের শাস্তিদানের প্রতিবাদে তাঁহার "পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিং ডিঙ্গাইয়া" চিরকালের জন্য ইস্কুল ত্যাগ করিয়াছিল। কাজ হিসাবে সেও অত্যন্ত অন্যায়ই করিয়াছে, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহাকে চিনিতে হইলে এই ঘটনার গুরুত্ব আছে। যে শিশু তাহার ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া বিশ্বের সমস্ত রহস্য আয়ত্ত করিতে চায়, তাহার এই দৃষ্টি পথের সঞ্চয় বাড়ায় সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এই পর্যবেক্ষণের জোরেই অন্তরটি এমনভাবে ভরিয়া লইয়াছে যাহাতে উত্তর জীবনে বন্ধুর বহুবিস্তৃত পথ-পরিক্রমায় তাহার প্রশান্ত জীবনরূপটি বিপর্যস্ত হয় নাই। ইন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে সে চোখ ও মন প্রসারিত করিয়াছে। মেজদার সংকীর্ণ অভিভাবকত্বের বেড়াজালে যে শ্রীকান্ত বন্দী ছিল, তাহার মত শান্ত, সরল, ভীরু বালকের কপালে বাঙ্গালী ভদ্রলোকত্ব তথা ছাপোষা সংসারী কেরাণীর জীবন নাচিতেছিল, ইন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া বাহিরের বিশাল জগতের ও হৃদয়বোধের মুখোমুখি হইয়া সে সহানুভূতিশীল, আলোক-সঞ্চারী মুক্তমন নায়ক হইয়া উঠিল। শিশুকে অবলম্বন করিয়া মায়ের তো বটেই, মাতৃসমা নারীদের জীবনও ছন্দায়িত হয়, 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুর ক্ষেত্রে অমূল্য, 'রামের সুমতির' নারায়ণীর ক্ষেত্রে রাম, 'পণ্ডিত মশাই'-এর কুসুমের ক্ষেত্রে চরণ, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনীর ক্ষেত্রে কেষ্ট, 'মামলার ফল'-এর গঙ্গামণির ক্ষেত্রে গয়ারাম সেই ছন্দই আনিয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিশু (বালক) ইন্দ্রনাথ। 'শ্রীকান্ত'র ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে সকলেই এক অসামান্য সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। ইন্দ্রনাথকে সৎ বালক বলা যায় না, সে সিদ্ধি-সিগারেট খায়, অন্যায় করিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছে, পরের মাছ চুরি করিয়া বেচিয়া দেয়। সে দুঃসাহসী, বনে বাদাড়ে রাত-বিরেতে নির্ভয়ে একা ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রাণের মায়া

করে না, বাঘের ভয় না করিয়া লণ্ঠন হাতে লইয়া গাছে বাঘ দেখিতে আগাইয়া যায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া উত্তাল নদীতে জেলেদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া মাছ চুরি করে, জোয়ান সাপুড়ে শাহজীর সঙ্গে নির্ভয়ে মল্লযুদ্ধ করে। আবার তাহার বুকখানি মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরা, সে অচেনা শ্রীকান্তকে বাঁচাইতে একা বহুলোকের সঙ্গে মারামারিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, পাতানো দিদির অভাব ঘুচাইতে সাধ্যের অতীত চেষ্টা করে, মরা শিশুকে স্নেহভরে বুকে তুলিয়া লয়। ভগবানে তাহার অখণ্ড আস্থা ; রাম-নাম বা মা কালীর নাম করিলে, তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, কোন ক্ষতি হইতে পারে না। তাহার কর্তব্যবোধও অসাধারণ, স্বার্থপর নতুনদাকে যখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, যে নতুনদাকে সে সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাকে না লইয়া বাড়ী ফিরিবে না বলিয়াই সে স্থির করিল। সব চেয়ে বড় কথা ইন্দ্রনাথ অন্নদাকে, তাহার দিদিকে আবিষ্কার করিয়াছে, তাঁহার স্নেহনির্ঝরে সে অভিষিক্ত। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরিয়াই, তাহার অন্তরঙ্গতার সুযোগ পাইয়াই বড় জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথকে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ নায়ক করেন নাই, সহায়ক এক উজ্জ্বল কিশোর চরিত্রই রাখিয়াছেন। তিনি তাহাকে ততক্ষণই উপন্যাসে রাখিয়াছেন, যতক্ষণ সে বালক, তাহার আচার-আচরণ যতক্ষণ পাঠক প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আস্বাদন করিতে পারে, তাহার দুর্বল দিকগুলি যতক্ষণ তাহার অল্পবয়সের জন্য পাঠক সামাজিক ত্রুটি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বালক-সুলভ চপলতা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে। ইন্দ্রনাথকে ইহার পরই তিনি হারাইয়া যাইতে দিয়াছেন।* অবশ্য এইভাবে ইন্দ্রনাথের অকস্মাৎ হারাইয়া যাওয়াটা কার্যকারণ-সম্পর্কহীন বলিয়া উচ্চ শিল্পকর্ম বলা যায় না, কিন্তু অন্যভাবে শরৎচন্দ্র ইহারই মধ্যে এক ধরণের শিল্প-প্রতিভারও স্বাক্ষর রাখিয়াছেন বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে

*ইন্দ্রনাথের মহত্ত্ব 'শ্রীকান্ত' নিম্নলিখিত কথা কয়টিতে ফুটাইয়াছে: "কতকাল কত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদনদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এতবড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।"

ইন্দ্রনাথ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হইতে বিদায় লইয়াছে বলিয়া নিঃশেষে চলিয়া যায় নাই, শ্রীকান্তর মধ্যেই একটু খুঁজিলে তাহার দেখা মিলিবে। শ্রীকান্তর মধ্যে শ্রীকান্তর সহিত ইন্দ্রনাথের যেন সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই জন্য উপন্যাসের প্রথম দিকের অতি সাধারণ ভীরু গৃহস্থ বালক শ্রীকান্তর সঙ্গে পরবর্তী কালের দুঃখজয়ী, নির্ভীক, জীবনরসিক ও জীবন-পথিক শ্রীকান্তর এত পার্থক্য। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চরিত্রটি নিষ্ক্রিয় পৌরুষের প্রতীকরূপে, স্থাণু নায়ক রূপে কম সমালোচিত নয় নাই, কিন্তু শ্রীকান্তর জীবনরূপের উদারতা, বিশাল বিশ্বের সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগ, সীমাহীন মানবিক সহানুভূতি, আপন ব্যক্তিত্বের আলোয় অন্যকে আলোকিত করিবার ক্ষমতা এবং উপন্যাসের গতি-প্রকৃতিতে আপন ভাব-প্রভাব,—এসব অস্বীকার করিবার জিনিষ নয়। নিষ্ক্রিয়তা শ্রীকান্ত চরিত্রের প্রেমের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য, কর্মের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনে সক্রিয়তাও দেখাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে সতীশ ভরদ্বাজের কলেরা উপলক্ষে গিয়া শ্রীকান্ত কলেরা মহামারীর সঙ্গে সামান্য চিকিৎসা-জ্ঞান ও উপকরণ লইয়া প্রকৃত বীরের মতই যুদ্ধ করিয়াছে।

* * *

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শিল্পকলার স্থান নগণ্য নয়। আপন কালের পরিচিত মানুষের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার গল্প হৃদয়গ্রাহী, তাহাতে পাঠকের কৌতূহল অটুট থাকে, সে গল্পের আশ্রয় বাস্তব জীবন। রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তব জীবন অবলম্বনে মানবিক সহানুভূতি-সমৃদ্ধ কথাসাহিত্য-রচনার প্রবণতা লইয়া মধ্যজীবন পর্যন্ত গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, শেষদিকে তাঁহার 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা'র মত ভাবোজ্জ্বল রচনায় সে প্রবণতা নিঃসন্দেহে হ্রাস পাইয়াছিল। তাছাড়া শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ যে বাক্‌চাতুর্যময় ভাষার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রবণতার পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল নয়। শরৎচন্দ্র কিন্তু একমাত্র 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি ছাড়া কি বিষয়বস্তু, কি ভাষা, কোনদিক দিয়াই তাঁহার অভ্যস্ত রচনাধারা হইতে অনেকখানি সরিয়া যান নাই।* তাঁহার

*'শেষপ্রশ্ন'কে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক সৃষ্টি না বলাই ভাল। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া বহুলাংশে এবং ভাষার দিক দিয়া

প্রথম জীবনে লেখা 'দেবদাস'-এর পাশে রাখিয়া শেষ জীবনে লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' বা 'জাগরণ' পড়িলে কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। শরৎচন্দ্রের লেখা স্বাভাবিকতার গুণে অতি সহজে পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে বলিয়াই তাঁহার গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সেই সব গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপের চরিত্র, বিষয়বস্তু, কথোপকথন বা ভাষার প্রভৃত মিল সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের 'রমা' (উপন্যাস—'পল্লীসমাজ'), 'নিষ্কৃতি', 'দেবদাস', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিজয়া' (উপন্যাস—'দত্তা') প্রভৃতি নাট্যরূপগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, নাট্যরূপে কত সহজে এই দুরূহ কর্তব্য পালন করিবার সুযোগ মিলে ও তাহাতে কত কম কল্পনার আশ্রয় বা মৌলিক প্রতিভার আশ্রয় লইতে হয়।

লক্ষণীয়ভাবে 'শেষপ্রশ্ন'-এর অমিল অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়িবে। এইজন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনায় প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা নয় বলিয়া 'শেষপ্রশ্ন'কে পৃথকভাবে দেখাই উচিত। মনে হয় সমকালীন 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র সাহিত্যিকদের সহিত একধরণের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবেই তিনি বিষয়বস্তু ও ভাষার নূতনত্ব সমন্বিত 'শেষপ্রশ্ন' লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজেই 'শেষপ্রশ্ন'কে তাঁহার বিশেষ সৃষ্টি বলিয়াছেন। সামতাবেড়, পাণিত্রাস হইতে ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ কবি রাধারাণী দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি বলিয়াছিলেন: "অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো—সময় হ'ল না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা 'শেষপ্রশ্নে' করেছি।" অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী'তে মুদ্রিত এই চিঠির পরেই ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে সামতাবেড় হইতে ১৩৩৮ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ লেখা 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে আর একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "আরও একটা কথা মনে ছিলো। সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম, এই দিকটার একটা ইসারা রেখে যাবো।"

শরৎচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনীর রচয়িতা; তাঁহার কথা-সাহিত্যের অধিকাংশ কাহিনীই বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনের উপর লেখা, তাহাতে বিষয়বস্তুর জটিলতা বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকে আগ্রহ কমই দেখা যায়। শরৎচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর লেখক, এযুগে সভ্য মানুষের মন আপন দেশের ও কালের সীমা ছাড়াইয়া বহুপ্রসারিত, সে মনে নিত্যনূতন আশ্চর্য আশ্চর্য ভাবতরঙ্গের লীলা, তাছাড়া অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপও বাস্তব জীবনে ক্রমবর্ধমান; এ অবস্থায় উপন্যাসে বিষয়বস্তুর যে বৈচিত্র্য প্রত্যাশিত, তাহা শরৎচন্দ্রের মত শক্তিশালী উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যিকের রচনায় কিন্তু বহুলাংশে অনুপস্থিত। বাঙ্গালীর শান্তিপ্রিয়, ঘরোয়া জীবনের ছবি দরদের সহিত উপস্থাপিত করিয়া শরৎচন্দ্র পাঠক-মন জয় করিয়াছেন বলা চলে। বাস্তব ঘরোয়া জীবনবৃত্তের উপর রচনার সীমায় শরৎচন্দ্রের সহিত প্রখ্যাত ইংরাজ মহিলা ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের মিল আছে। তবে জেন অস্টেনের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই যে, শরৎচন্দ্র বাংলার সমাজ-জীবনের ছবি আঁকিবার সময় জেন অস্টেনের মত অতখানি নির্লিপ্ত মনের পরিচয় রাখিতে পারেন নাই; যে পরাধীন, সমস্যা-কণ্টকিত দেশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেখানকার সাধারণ জীবনের দুর্নীতি ও হীনতার বা দুর্বলতার অবসান ঘটাইতে তাঁহার আগ্রহ এবং এই দৈন্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা তাঁহার লেখায় বারবার স্পন্দিত হইয়াছে।

শরৎসাহিত্যের বাঙ্গালী-জীবন প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গ্রাম-বাংলার সামাজিক জীবন। স্নেহ, ভালবাসা, লোভ, হিংসা, জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের কথা লইয়াই তাঁহার অধিকাংশ কাহিনী রচিত। শরৎচন্দ্র এই সমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিষিদ্ধ প্রেমের সমস্যা লইয়া লিখিয়াছেন, রাজনৈতিক পটভূমিকায়ও কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী জীবনের ঘরোয়া পরিমণ্ডল অতিক্রম করিয়াছে। তিনি 'ছবি' গল্পে ব্রহ্মদেশের পটভূমিতে মা শোয়ে বা থিনকে আঁকিয়াছেন, 'পথের দাবী' উপন্যাসে ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের বহির্ভারতীয় কর্মকাণ্ডের নায়ক করিয়া সব্যসাচীকে আঁকিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের ও বাঙ্গালী হৃদয়ের স্নিগ্ধ কোমল ছবি এই বিচিত্র পটভূমিতেও লক্ষণীয় রূপ লাভ করিয়াছে। এযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী

ঔপন্যাসিকগণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন শরৎচন্দ্রের পরিমণ্ডল সে হিসাবে অনেক সংকীর্ণ। মৃত্যু ও জীবনের ছন্দে একই সঙ্গে আলোড়িত যুদ্ধে ও বিপ্লবে বিক্ষত উদ্দাম কসাক জীবনের উপর লেখা সোভিয়েট ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোকভের 'এ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন', সুইজারল্যাণ্ডে আলপস্ পাহাড়ের যক্ষ্মা হাসপাতালের পটভূমিতে লেখা বিচিত্র মানবমনের কাহিনী জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মানের 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন', স্পেনের গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত পটভূমিতে বিপরীতমুখী সংগ্রাম ও প্রেমের আশ্চর্য-সুন্দর সমন্বয় মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের, 'ফর হুম দি বেল টোলস্', আলজিরিয়ার ওঁরা সহরে প্লেগ মহামারীর পটভূমিতে লেখা ফরাসী ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কামুর 'দি প্লেগ', দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে পাইকারী দেশত্যাগের ও আশ্রয় সন্ধানে সুদীর্ঘ পরিক্রমার বেদনাবিহ্বল মানবিক কাহিনী মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টেইনবেকের 'দি গ্রেপস অফ্ রাথ', স্নিগ্ধ সুপবিত্র ধর্মবোধে সুরভিত যীশুখৃষ্টের সমকালীন কুখ্যাত দস্যু বারাব্বাসের হৃদয় পরিবর্তনের উপর লেখা সুইডিস ঔপন্যাসিক পার ফেবিয়ান লাগারভিষ্টের 'বারাব্বাস' অথবা প্রাচীন ভারতীয় গভীর ধর্মানুভূতির উপর লেখা জার্মান ঔপন্যাসিক হেরম্যান হেসের 'সিদ্ধার্থ',—এ ধরণের বিদেশী উপন্যাসের কথা দূরে থাক, বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' অথবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মত বিচিত্র পটভূমির উপন্যাস শরৎচন্দ্র লেখেন নাই। ছোট গল্পে বিস্তৃত কাহিনী-বিন্যাসের প্রয়োজন নাই। ছোট গল্পে পৃথিবীর সবদেশেই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বেশি, বাংলা সাহিত্যেও এ পর্যন্ত বহু ছোট গল্প লেখক নূতন নূতন নানা বিষয়-বস্তু লইয়া গল্প লেখার চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র ছোট গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ছোট গল্পেও বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য কম। অবশ্য শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'মহেশ', 'ছবি', 'বিলাসী' প্রভৃতি গল্পে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র বৈচিত্র্যের দিক হইতে কিছুটা প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তবু সমগ্রভাবে বিশাল শরৎসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিচিত বাঙ্গালী সংসার-জীবনের ছবি ফুটাইবার দিকেই শরৎচন্দ্রের অধিকতর আগ্রহ। তাঁহার

বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সাধারণ সংসার জীবনে যাহারা অংশীদার, সেই সব নরনারীর অন্তর্মনের রহস্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাদের আশা-আকাজ্ক্ষা-সাধ-স্বপ্নের স্পর্শ-তরঙ্গিত অন্তর-বার্তা শুনাইয়া তিনি পাঠকের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়াছেন।

উপন্যাসের কলাশিল্পী হিসাবে কেতাবী অর্থে শরৎচন্দ্রকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের প্রচলিত শিল্পরীতি অনুসরণের জন্য তিনি বিশেষ যত্নও লন নাই। তিনি বড় সাহিত্যিক, পড়াশুনাও কিছু করিয়াছিলেন,* যে রচনাশৈলী তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাহার সংযোগ স্বাভাবিকভাবেই ছিল, তাছাড়া তাহাতে তাঁহার নিজের মৌলিক প্রতিভারও কিছুটা স্বাক্ষর বর্তমান। উপন্যাসের গঠন-রীতি ঠিক কিরূপ হইবে সে সম্পর্কে এখনো সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া শরৎচন্দ্রের এই নিজস্ব রীতির বিচার প্রচলিত সংজ্ঞার হিসাবে না হইয়া অন্তর্নিহিত গুণাগুণের হিসাবেই হওয়া উচিত।‡ তাছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাস শিল্পকলার দিক হইতেও অন্ততঃ এইজন্য প্রশংসনীয় যে, গল্প ও চরিত্রকে অধিকাংশ সমালোচক উপন্যাসের প্রধান

*শরৎচন্দ্র ২২।৩।১৯১২ তারিখে রেঙ্গুন হইতে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লেখেন: "পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ।)

—এই পাঠস্পৃহা তাঁহার প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৮।৮।১৯১৩ তারিখে রেঙ্গুন হইতে লেখা আর একখানি চিঠিতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে: "এই আশ্বিনে 'ভারতবর্ষে' যে গল্পটা বার হবে সেইটে নিয়ে চারটে একসঙ্গে ক'রে ছাপানই ভাল হয় বোধ হয়। Copyright বিক্রী করে যদি টাকা পাই ত H. Spencer এর বইগুলো কিনে ফেলি।"—(গোপালচন্দ্র রায়, 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', ১ম সংস্করণ।)

‡অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য: আসল কথা উপন্যাসের কোন প্রামাণ্য সুনির্দিষ্ট রূপ নাই। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ও গ্রীস ও রোমের আরিষ্টটল

উপাদান বলিয়াছেন এবং এই হিসাবে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। শরৎচন্দ্রের গল্প আখ্যান বা প্লটের দিক দিয়া খুব জটিল হয় না সত্য, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী জমাট গল্প লিখিয়া তিনি সর্বশ্রেণীর পাঠকের মন জয় করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্মনের রহস্যবাহী বৃত্তান্বিত চরিত্র, বিশেষ-ভাবাশ্রয়ী স্থূল একমুখী চরিত্র নয়। হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকায় কোথাও কোথাও তাঁহার চরিত্র অবশ্য শ্লথগতি কিম্বা অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হইয়াছে, তবে সমগ্রভাবে শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র জটিল মনোবৃত্তি-সমন্বিত মানুষের বাস্তব চরিত্র। শরৎচন্দ্রের চরিত্র একেবারে ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু ত্রুটি মনে রাখিয়াও তাঁহার বৈশিষ্ট্য অল্লায়াসে উপলব্ধি করা যায়। শরৎচন্দ্রের চরিত্রের ত্রুটির দিকগুলি আগেই মাঝে মাঝে উল্লিখিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ভাবাবেগ-সম্পন্ন লেখক ছিলেন, কোন কোন সময় এই ভাবের আবেগ মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মীর উপর অতি-নির্ভরতা, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর গোকুলের অতি-সারল্য, 'নিষ্কৃতি'র কৃতি ব্যবহারজীবীরূপে পরিচিত গিরিশের সাংসারিক জ্ঞানের অভাব,* —এইরূপ দৃষ্টান্তের সহজেই উল্লেখ করা যায়। শরৎচন্দ্রের গতিশীলা নায়িকা কিরণময়ীর ভাবাবেগ এত বেশি যে সে হিস্টিরিয়া রোগীর মত বারবার উত্তেজনায় মূর্ছিতা

ও হোরেস যেরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের আকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ পূর্বক তাহাদের বাহিরের আকার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সদ্যোজাত উপন্যাস সম্বন্ধে সেরূপ বিধিনিষেধ কখনও আরোপিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনেকটা যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।"—(বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৪১)।

*গিরিশের বেকার খুড়তুতো ভাই রমেশ ব্যবসা করিয়া চার হাজার টাকা লোকসান দিয়াছে। গিরিশ বসিয়া খাওয়াইতে পারিবে না জানাইয়া দিয়া বলে, "একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুচ পরওয়া নেই। আবার চার হাজার নাও। তা বলে আমি খেটে মরব আর তুমি বসে খাবে!...সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে আর চার হাজার টাকা জমা রাখবে।

হইয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রী বা সরযূর মত দৃঢ়চিত্তা নায়িকাকেও ভাবাবেশে মূর্ছিতা হইতে দেখা যায়। শরৎচন্দ্র দারিদ্র্য বা অভিজাত-ধনাঢ্যতা—কোনটিই ভালভাবে আঁকিতে পারেন নাই। তাছাড়া সমগ্রভাবে তাঁহার বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির, তথা অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টির হিসাবে শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিতে কেমন বৈচিত্র্য নাই, অনেক চরিত্রই এক ধরণের। পুরুষের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হৃদয়বোধ সত্ত্বেও একরূপ গতিহীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে চলমানতা বা সক্রিয়তা সত্ত্বেও একরূপ দুঃখ-বিলাস ও মমতার আবরণে পুরুষমুখিতা শরৎসাহিত্যে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। কাজেই শরৎচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্রের সার্থকতার সীমারেখাও মনে রাখা দরকার। তাছাড়া শরৎচন্দ্র সমাজ-সচেতন শিল্পী ছিলেন বলিয়া কোন কোন জায়গায় কোন চরিত্রকে উজ্জ্বল করিতে অথবা আপন উদ্দেশ্যবহ করিতে অস্বাভাবিক সুযোগ দিয়াছেন, কখনও কখনও একই উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ চরিত্রের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত হীন চরিত্র আঁকিয়া তুলনামূলকভাবে চরিত্রটির দীপ্তি বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী, 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শী, 'পল্লীসমাজ'-এর বিশ্বেশ্বরী, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর গোকুল, 'বড় দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ প্রভৃতি লেখকের নিকট অতিরিক্ত রকম সুযোগ পাইয়াছে।* 'চরিত্রহীন'-এর

এটা নষ্ট হলে তবে ও টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না।"—রমেশ নিজে ব্যবসা জানে না বলিয়া ব্যবসায় নামিতে তথা টাকা নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক, খড়ের ব্যবসায় তাহার কিছুই অভিজ্ঞতা নাই, এভাবে আনাড়ি ব্যবসা করিলে লোকসান হইবার সমূহ সম্ভাবনা, তবু গিরিশ প্রায় গঙ্গার জলে ঢালিবার জন্যই টাকা আগাইয়া দিতে চায়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হইয়াও অর্থের এই প্রায়-নিশ্চিত অপচয়-সম্ভাবনা বোঝে না, এ দৃষ্টান্ত বাস্তবে সত্যই দুর্লভ।

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ১৩৩৪ সালের ৫ই ফাল্গুনে লেখা এক চিঠিতে শরৎচন্দ্রের প্রশংসনীয় সৃজনী শক্তির নিরিখে তাঁহার ষোড়শী চরিত্রকে "সে এখনকার কালের ফরমাসের জিনিস, সে

সাবিত্রী মেসের ঝি, মেসের সদস্যদের সঙ্গে তাহাকে হালকা কথাবার্তা কহিয়া কাজ চালাইতে হয়, কিন্তু সে বিধবা মনে করে নিজেকে এবং পূজা-আহ্নিকাদি আচার পালন করিয়া থাকে। প্রথম দিকটি তাহার প্রাত্যহিকতার হিসাবে যত স্পষ্ট, দ্বিতীয় দিকটি ব্যক্তিগত এবং বিরলে অনুষ্ঠিত হিসাবে ততটা স্পষ্ট হইতে পারে না। অথচ সাবিত্রী চরিত্র-বিন্যাসে তাহার এই শুদ্ধাচারের পরিচয় দিতে হইবে, সুতরাং শরৎচন্দ্র মেসের ঠাকুর ও চাকর বেহারীকে সাবিত্রী সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাবান করিয়া তাহাদের দিয়া গদগদ ভাষায় সাবিত্রীর শুচি জীবনরূপ প্রচার করাইয়াছেন। স্থষ্ট চরিত্রকে আপন উদ্দেশ্য অনুযায়ী উজ্জ্বল করিতে শরৎচন্দ্র 'দত্তা'য় নরেন্দ্রের বিপরীতে বিলাস, 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশের বিপরীতে বেণী, 'মেজদিদি'তে হেমাঙ্গিনীর বিপরীতে কাদম্বিনী, 'বামুনের মেয়ে'তে প্রিয়নাথের বিপরীতে

অন্তরে বাহিরে সত্য নয়" বলিয়াছিলেন। এই মন্তব্যটি অবশ্য শরৎচন্দ্রের নিজের দেওয়া 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী'র ষোড়শী চরিত্র প্রসঙ্গে তবে নাটকের ষোড়শীর সঙ্গে উপন্যাসের ষোড়শীর বিশেষ তফাৎ নাই। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থে আছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪) শরৎচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতার যে সব অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে অতিশয়োক্তি হইলেও 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বিশ্বেশ্বরী প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য চিন্তাযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন: "শরৎচন্দ্র দেখলেন না যে রমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কে সমাজের যে বাধাকে তিনি আতিশয্যে বড়ো করে তুললেন সেই একই বাধাতো জ্যাঠাইমার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। সমাজপতি বেণী ঘোষালের মা আর রমেশের জ্যাঠাইমায়ে যে দ্বন্দ্ব তাও তো অল্প শক্তির দ্বন্দ্ব নয়। বেণী ঘোষালের ছক থেকে জ্যাঠাইমার বেরিয়ে আসার মতো স্বাতন্ত্র্যের উৎস কোথায় তাও রয়ে গেল অস্পষ্ট। জ্যাঠাইমাও তো পল্লীসমাজেরই মা। কী করে তিনি এড়িয়ে এলেন সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পিছুটান? আলোচনাকালে দেখা যাবে যে এতাদৃশ সহস্র কৃত্রিমতায় ও অসঙ্গতিতে শরৎসাহিত্য পরিপূর্ণ।"

গোলক, 'নববিধান'-এ উষার বিপরীতে বিভা, 'ছবি'তে বা থিনের বিপরীতে পো থিনকে আঁকিয়াছেন। শেষোক্ত চরিত্রগুলিকে মোটামুটি তাহাদের আপেক্ষিক হীনতার উপর জোর দিয়াই ফুটান হইয়াছে। তাহাদের যাহা কিছু ভাল দিক তাহা যেন লেখক ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া দিয়াছেন। অথচ মানুষ তো দোষে গুণে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের বিপরীতে সন্দীপকে যতটা হীন করিয়া আঁকা হইয়াছে তাহা বহুলাংশে নিখিলেশকে জিতাইয়া দিবার জন্য, সন্দীপের এই হীনতা-লাঞ্ছিত রূপের অন্তরালে সমগ্রভাবে তাহার কিছু ভাল দিক অবশ্যই ঢাকা পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, এই গঠনরীতিতে চরিত্রের স্বাভাবিকতা অপেক্ষা লেখকের সুবিধাবোধই অধিকতর কার্যকরী হয়। শরৎচন্দ্র মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়া 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ীর বিপরীতে সুরবালা, 'কাশীনাথ'-এ কমলার বিপরীতে বিন্দু, 'দর্পচূর্ণ'-এ ইন্দুর বিপরীতে বিমলা, 'গৃহদাহ'-এ অচলার বিপরীতে মৃণালকে আঁকিয়াছেন, 'বিপ্রদাস'-এ বন্দনার বিপরীতে সতী অথবা অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এ আলেখ্যের বিপরীতে ইন্দুও কিছুটা এই ভূমিকাই লইয়াছে,—এসব জায়গায়ও মাঝে মাঝে মনে হয় শরৎচন্দ্র একজনের চরিত্রের দুর্বলতা বা অন্ধকার দিক স্পষ্ট করিতে এবং তাহার উপর প্রতিক্রিয়ার চাপ সৃষ্টি করিতে আর একজনের বিশেষ ভাল দিকের উপর জোর দিয়াছেন, ইহাতে চরিত্রটির খণ্ডিত রূপের প্রকাশ ছাড়াও লেখকের নিজের মতবাদের পক্ষপাতিত্ব কোন কোন সময় কাজ করিয়াছে। অবশ্য এইভাবে বৈপরীত্য সংস্থাপন দ্বারা চরিত্রের অগ্রগতি সাধনের বা সম্যক রূপায়ণের চেষ্টার কলাশিল্পগত একটা দিকও আছে এবং সে হিসাবে শরৎচন্দ্রের এই গঠনরীতির মূল্যও অনস্বীকার্য। একথা ঠিক যে শরৎচন্দ্র এই রীতির সাহায্যে উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণে লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

শরৎসাহিত্যে কোথাও কোথাও চরিত্র অতি-কথন-দোষ-যুক্ত হইয়াছে, কোথাও কোথাও বর্ণনায় তিনি পাঠককে সহজে বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যার বা বিস্তারিত বিবরণদানের দিকে ঝুঁকিয়াছেন, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সমগ্রভাবে জনচিত্ত-বিজয়ী শরৎচন্দ্র কাহিনীর কৌতূহল বজায় রাখায় সার্থক হইয়াছেন এবং সে হিসাবে শিল্পকলা-সুলভ সংযত ইঙ্গিতে

বক্তব্যকে পাঠকের রসবোধের কাছে তুলিয়া ধরিতে তিনি নিঃসন্দেহে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। পাঠকদের রসগ্রহণের শক্তি সম্পর্কে আপন ধারণায় শরৎচন্দ্র বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি একখানি পত্রে বলিয়াছেন: "কেবল লেখাই ত নয় লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শত মুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গম্ভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। পাঠকের দল এমনি কুঁড়ে যে তারা শতযোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজি খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২ হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনার বা চিত্রিত চরিত্রের অগ্রগতির দ্বারা কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া (উপন্যাসে যেমন সাধারণত করা হইয়া থাকে) চরম সংঘাত সৃষ্টি করেন নাই, জটিলতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছে এবং প্রত্যাশিত সময়ের আগেই এই সংঘাত আসিয়াছে। তারপর গ্রন্থ জুড়িয়া গ্রন্থিমোচনের পালা। তাঁহার অনেকগুলি হৃদয়-প্রধান প্রেমের কাহিনীতে দেখা যায় প্রেমোৎকর্ষ উপন্যাসের প্রথম দিকেই হইয়াছে, ইহার ফলে প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালের জন্য অন্তরলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদিগকে নানা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইয়াছে। তখন চারিদিকের ঝড়ের মুখে তাহাদের সম্পর্কের বন্ধন দোল খাইয়াছে, কিন্তু কখনই ছিঁড়িয়া পড়ে নাই। বিশেষ করিয়া অসামাজিক প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপে প্রত্যয় যেমন উজ্জ্বল, সংঘর্ষের চাপ আবার সেই অনুপাতেই বেশি। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংঘর্ষের উদ্ভব বাহিরের প্রতিকূলতার চেয়ে চরিত্রের আপন সমাজ-অনুভূতি বা সংস্কারের জন্য অধিক হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' চারি পর্বেও সমাপ্ত হয় নাই, এই উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার আন্তরিক অন্তরঙ্গতা সংসারজীবনে মিলনে বা বিচ্ছেদে পরিসমাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ', 'পরিণীতা', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি অধিকাংশ প্রেমমূলক উপন্যাসে মিলনেই হউক আর বিচ্ছেদেই হউক, শেষ পর্যন্ত পরিণতি একটা আসিয়াছে। উপন্যাস একজায়গায় না একজায়গায় শেষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়;

অসমাপ্ত কাহিনী যত মধুর হউক, পাঠকের তাহাতে তৃপ্তি হয় না, একথা জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অবশ্য বুঝিতেন। শিল্পকলা বা আর্টের দিক হইতে ব্যঞ্জনাধর্মী উপন্যাসে নির্দিষ্ট পরিণতি না থাকিলেও হয়তো রসিক পাঠকের কাছে তেমন আসিয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ পাঠক, বিশেষ করিয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঠক গল্পের একটা সমাপ্তি চায়। অবশ্য শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'র মত সমাপ্তিহীন উপন্যাস আর লেখেন নাই; 'জাগরণ', 'আগামীকাল' প্রভৃতি যে সব উপন্যাস তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেগুলির কথা এখানে উঠে না। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, শরৎচন্দ্র গল্প শেষ করিয়া একটা নির্দিষ্ট সমাপ্তি আনিয়াছেন বটে, তবে তিনি সর্বত্র গল্পের গতি-প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়া এই সমাপ্তি আনিতে পারেন নাই, ফলে কোথাও কোথাও এজন্য শেষদিকে কিছুটা ক্ষতিও হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ দুইখানি উপন্যাস 'গৃহদাহ' ও 'দেনাপাওনা'র উল্লেখ করা যায়। এই উপন্যাস দুইটিতে শরৎচন্দ্র প্রধান চরিত্রগুলির মনের গভীরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়-রহস্য উন্মোচিত করিয়াছেন, এ হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব বিস্ময়কর, কিন্তু এমন আশ্চর্য সুন্দর চরিত্রও উপন্যাসের যথাযথ সমাপ্তির অভাবে প্রথম অংশের তুলনায় শেষাংশে কেমন যেন ঝুলিয়া গিয়াছে। উপন্যাস দুইখানির নায়িকা চরিত্র দুটি—অচলা ও ষোড়শী—উপন্যাসের প্রথম দিকের মত প্রশস্ত পটভূমিতে আত্মবিকাশের সুযোগ না পাইয়া শেষদিকে যেন একটু স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের এই গ্রন্থ শেষ করিবার চেষ্টার ফলেই 'অরক্ষণীয়া'র অতুলের হৃদয়-পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছে মনে হয়, 'দত্তা'র বিজয়ার হিন্দুমতে বিবাহের মত জোড়াতালি-দেওয়া ঘটনা গোপনে ঘটান হইয়াছে, 'বড়দিদি'তে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরেন্দ্রনাথ-মাধবীর সাক্ষাৎ ঘটান হইয়াছে।

আখ্যান বা প্লটের বিন্যাসে শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। অনেক ঔপন্যাসিক কাহিনী ঠিক করিয়া তারপর চরিত্র সৃষ্টি করেন, শরৎচন্দ্র বিপরীত ভাবে চরিত্র পরিকল্পনা করিয়া লইয়া তাহার পর আখ্যান-বিন্যাস করিতেন। বলা বাহুল্য, এ হিসাবে তিনি যে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল এদিক হইতে তাঁহার সহজাত ক্ষমতা। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার ৫৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্লটের জন্য তাঁহাকে কোনদিন ভাবিতে হয় নাই, তিনি

কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া লইতেন, সেগুলি ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়িত।) শরৎচন্দ্র একবার উপন্যাস রচনা সম্পর্কে মত প্রকাশ করিতে গিয়া একখানি চিঠিতে লেখেন যে (চরিত্র উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া চরিত্র ফুটাইতে যাহা কাজে লাগে না, সে সম্পর্কে লেখকের বেশি মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।) এই হিসাবেই যে চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহার অনুরূপ কোন চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা লেখকের থাকিলে খুব ভাল হয়। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত এই চিঠিতে (বাজে শিবপুর, ৭ই ভাদ্র, ১৩২৬) (শরৎচন্দ্র আরও বলিয়াছেন: "অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ একথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।")

"তারপরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দিবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব ভালো জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তারপরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়।...প্রথমেই প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।"*—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৮১-৮৬।)

(শরৎচন্দ্রের পাঠকেরা জানেন যে, শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে পাত্রপাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের গতিপ্রকৃতিতে অগ্রসর হয়, লেখকের অস্তিত্ব বা আত্মপ্রকাশ অনুভূত হয় কম ক্ষেত্রেই। ইহাই শিল্পসম্মত রচনারীতি। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখার মধ্যে অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করিয়া গল্পের রস বা গতি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, ইহাতে শিল্পধর্ম

*শরৎচন্দ্রের কাহিনী প্রথম হইতেই চমৎকার জমিয়া যায়, ইহা তাঁহার গঠনকৌশলের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। আলোচ্য চিঠিখানির গোড়ার দিকে এ সম্পর্কে তিনি শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন: "আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।"

অবশ্যই ব্যাহত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র এ হিসাবে অনেক সংযত। তাঁহার সমাজবোধ যেখানে চাপ সৃষ্টি করিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করিয়াছে কাহিনীর পরিণতিতে, কাহিনীর মধ্যে বড় একটা করে নাই। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে ঘটনা যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, চরিত্র মনের তরঙ্গে যে পথে চলিয়াছে বা যে বাঁকে ঘুরিয়াছে, তিনি তাহা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বড় একটা করেন নাই। তবে একথা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কেই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। পার্শ্বচরিত্র বা সহায়ক চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি গল্প, মূল চরিত্র বা আখ্যানের মুখ চাহিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের গতি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে শিল্পকলার ক্ষতি হয় নাই, বরং শিল্পকলার মর্যাদা রক্ষার জন্যই তাঁহাকে একাজ করিতে হইয়াছে। 'পল্লী-সমাজ'-এর মত জনবহুল উপন্যাসে রমা-রমেশের প্রেমকে পল্লীসমাজের সমস্যাসমূহের সমান্তরাল রাখিয়া ভাল করিয়া ফুটাইতে হইলে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রকে বাধ্য হইয়াই সঙ্কুচিত করিতে হয়। 'শ্রীকান্ত'র মত বিরাট পটভূমিকার এবং বহুসংখ্যক চরিত্র ও চলমান জীবনের রেখাচিত্রে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর প্রেমকাহিনীর অতিরিক্ত চরিত্রগুলির সঙ্কোচন সম্পর্কে একই কথা।

সমাজ-চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার জন্যই শরৎচন্দ্র সবক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, নচেৎ শিল্পকলার দিক হইতে এই সংযমের গুরুত্ব তিনি বুঝিতেন। যাহা হউক, পাঠককে বুঝাইবার জন্য অথবা অভিমত প্রকাশের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যেখানে তিনি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির দিক হইতে সাফল্য-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইলেও শিল্পকলা বা আর্টের হিসাবে ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। 'অভাগীর স্বর্গ'-এ আছে, জমিদারের হিন্দুস্থানী দরোয়ানের নিকট হইতে সুবিধা না পাইয়া কাঙালীচরণ কাছারী বাড়ীতে গোমস্তা অধর রায়ের কাছে গেল। "সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ নেয়; তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল এতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়া পারে না।"

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কাঙালীর পুনর্ব্যর্থতা হইতেই রসবোধী পাঠক শরৎচন্দ্রের তথা কাহিনীর বক্তব্য বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু পাঠক সাধারণের

এই উপলব্ধি নিশ্চিত করিতে এখানে শরৎচন্দ্র শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ করিয়া আপন মনোভাব উন্মুক্ত করিয়া লিখিয়া বসিলেন: "হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।"

শরৎচন্দ্র জনচিত্ত-বিজয়ী কাহিনী লিখিতে চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই, এজন্য ঘরোয়া মনোমুগ্ধকর গল্প ও হৃদয়াবেগসম্পন্ন প্রকাশভঙ্গির দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী, ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি দ্বারা পাঠকমন উত্তেজিত করিয়া জয় করার সুযোগ অবশ্য আছে, তবে এভাবে জনপ্রিয় হইতে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। 'পথের দাবী' অথবা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে তিনি এই উত্তেজনার দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু শরৎসাহিত্যের সামগ্রিক রূপের হিসাবে 'পথের দাবী' বা 'শেষপ্রশ্ন' প্রতিনিধি-স্থানীয় উপন্যাস নয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখা তথ্য-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত করিতে চাহিতেন না, এ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার সারল্য লক্ষণীয়। তবে শরৎচন্দ্র তথ্য চাহিতেন না এমন নয়, তিনি তথ্যের ভারে রচনাকে ভারগ্রস্ত করিতে চাহিতেন না,—তাঁহার ধারণা ছিল ইহাতে লেখার ক্ষতি হইবে। মোটের উপর রচনাকে হাল্কা না করিয়াও সহজ সরল জীবনছন্দে প্রবাহিত করিয়া শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাস লিখিতে ভালবাসিতেন। ১৩৪০ সালের ২৪শে ভাদ্র কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন: "উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোশাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্য পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন সহানুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখন মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে, এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষণীয়, হৃদয়বৃত্তির অপরিমিত

বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার।"* (১৩৪০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

শরৎচন্দ্রের লেখা পরিচ্ছন্ন। তাঁহার হৃদয়প্রধান রচনায় মানুষের মনোধর্ম প্রকাশের চেষ্টায় সমাজের বিধানের বিরুদ্ধেও মানুষের মনের দাবী আঁকা হইয়াছে, কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে বিস্তারিতভাবে দেহজ কামনা-বাসনার ছবি ফুটাইতে তাঁহার দ্বিধা ছিল।** শরৎচন্দ্রের লেখায় কিছুটা পবিত্রতামুখিতা ছিল সত্য, কিন্তু তাহা পরিচ্ছন্নতায় স্নিগ্ধ। রবীন্দ্রনাথেরও এই পরিচ্ছন্নতাগুণ বিশেষভাবে ছিল, শরৎচন্দ্র সেই ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আচার্য যদুনাথ সরকার কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহার এই পরিমার্জিত স্নিগ্ধভাবের ('Refined delicacy') কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ভাষা রবীন্দ্রনাথের মত ~~অত্যধিক~~ অলংকৃত ছিল না, কিন্তু তাহা সহজ সারল্যের প্রসাদগুণ-সমন্বিত ছিল। শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা সাধারণ পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার সহজ-

---

* শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যে অধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশের কিরূপ বিরোধী ছিলেন তাহা ১৩৩১ সালের ৪ঠা ফাল্গুন সামতাবেড়, পাণিত্রাস হইতে দিলীপকুমার রায়কে লেখা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে বুঝা যাইবে: "অ-প দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,— ছাখো তোমরা, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোন মতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ৬৪-৬৫)।

**বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই রেঙ্গুন হইতে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গল্প এবং একটি কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তাহাতে এই দেহজ রূপ ব

বোধ্য অথচ আবেদনশীল ভাষা এ হিসাবে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। শরৎচন্দ্র ১৩৪০ সালের ২০শে মাঘ তারিখের এক পত্রে স্নেহাস্পদ দিলীপকুমার রায়কে "কথোপকথন (dialogue) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার" করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাষা সহজ করা ছাড়াও পাঠক যাহাতে বিষয়বস্তু সহজে বুঝিতে পারে এবং কাহিনীর অগ্রগতি যাহাতে অনায়াসে অনুভব করিতে পারে, তজ্জন্য কার্য-কারণ-সম্পর্কিত পরিচিত পরিবেশ, ঘটনা বা চরিত্র সংস্থানে শরৎচন্দ্র যত্নবান ছিলেন। দিলীপকুমার রায়কে লেখা উপরোক্ত পত্রে একস্থানে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: "এখানে logic যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে show-case সাজানোর রুচি এক নয়। এ-কথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্যভার যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই জানে।" শরৎচন্দ্রের পুরাতনকে সংস্কার বশে আঁকড়াইয়া থাকিবার দুর্বলতা ছিল না, প্রয়োজন ক্ষেত্রে নূতনকে বরণ করিতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। তবে এই প্রয়োজনের সম্পর্কে নিশ্চিত

কামনা প্রকাশে সাহিত্যিকের সংযত হইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। গল্পটি সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন: "কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের driftটা কি? অনাবৃত রূপ যে শুধু জানিয়া শুনিয়া (নায়িকা সুরজ কওর) মঙ্গল সিংকে দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে। সাবাস!!" কবিতাটি কালিদাস রায়ের 'বৃন্দাবন অন্ধকার।' ইহার "করে না দধি-মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রাহার" পংক্তিটির তীব্র সমালোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি-মন্থ করলে দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধি-মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখছি!"

হওয়ার দরকার পূর্বাহ্নেই, একথা তিনি মানিতেন। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে খুবই শক্তিশালী লেখক বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু তিনি পরিবর্তিত কালানুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে এই সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন: "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধাবোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাংলাসাহিত্য আজ মরিত।"

শরৎচন্দ্রের ভাবাবেগ ছিল, বিশদ বিবরণ দিয়া বাস্তবরূপ ফুটাইতে তিনি কোথাও কোথাও চেষ্টা করিয়াছেন, আবেগে উচ্ছ্বাসে কোথাও কোথাও তাঁহার লেখা অতিভাষণ-দোষদুষ্ট। কিন্তু তিনি কোন কোন সঙ্কটক্ষণে স্তম্ভিত পাঠক হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত অতি সংযত দু'চারটি কথায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবেই বক্তব্য রাখিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার ক্ষমতা বুঝা যায়। 'দেবদাস শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অপরিণত রচনা, কিন্তু এই দেবদাসেই তাঁহার এই সংযত বলিষ্ঠ ভাষার সন্ধান মিলে। রাত একটায় কুমারী পার্বতী অন্যের সহিত বিবাহের যূপকাষ্ঠ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রেমাস্পদ দেবদাসের কাছে গিয়াছে। দেবদাস যখন তাহাকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক রটিবার সম্ভাবনার কথা বলিল, পার্বতী উত্তর দিয়াছে: "দেবদা, নদীতে কত জল? অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?" 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে সুনন্দা যখন রাজলক্ষ্মীর অসীম-শ্রদ্ধা এমন কি ভক্তির পাত্রী, তখনও তাহার অন্তরে শ্রীকান্তর সত্যকার আসন কোথায় তাহা সে সুনন্দার ছেলেটিকে শ্রীকান্তর আশীর্বাদের প্রসঙ্গে বলিয়াছে: "ওর ছেলেকে এই আশীর্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।"

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে থাকিতেই বাল্যকাল হইতে কিছু কিছু সাহিত্য-চর্চা করিতেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি জীবিকার্জনের আশায় রেঙ্গুন গেলেন তখন হইতে তাঁহার লেখার ছেদ পড়িল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের স্বনামে ও বেনামীতে যে সকল লেখা প্রকাশিত হয় সেগুলি তাঁহার প্রথম জীবনের রচনা। ১৯১৩ সালের

ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা (ইংরেজি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে) 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হয়। ইহাই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম সৃষ্টি বলা চলে। তাহার পরই শরৎ-সাহিত্যের প্লাবন বহিয়া যায়। এই সঙ্গে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'রামের সুমতি'তে শরৎচন্দ্রের গল্পকার প্রতিভারই সম্যক স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহার ভাষাও এই গল্প হইতেই যেন দাঁড়াইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে ভাষা যেরূপ এলোমেলো', উচ্ছ্বাসবহুল এবং শব্দচয়নে ও উপমা নির্বাচনে যে কাঁচা হাতের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়, 'রামের সুমতি'তে সেই ত্রুটি বিদূরিত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালের লেখাগুলিতে শরৎচন্দ্রের ভাষার যে রূপ তাহা মোটামুটি 'রামের সুমতি'তেই দেখা গিয়াছে।

শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি'র পূর্বেকার ভাষার দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'বোঝা' গল্পটি হইতে যে উদ্ধৃতিটি নিম্নে রাখা হইল, তাহা হইতেই কথাটির যথার্থতা বুঝা যাইবে। 'বোঝা' গল্পটি ১৩২৪ সালে (ইংরেজি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত 'কাশীনাথ' গল্প-গ্রন্থের অন্তর্ভূত হইলেও গল্পটি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগলপুরের বাল্যজীবনে বাগান-খাতার লেখার অন্তর্ভুক্ত। 'কাশীনাথ' গল্প-গ্রন্থের 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ'—এই সাতটি গল্পকেই শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল "শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা বা শরৎসাহিত্যের আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত" বলিয়াছেন (শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩)। 'বোঝা' গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২১ বৎসর বয়স্ক এফ্.এর ছাত্র সত্যেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী সরলা মারা গিয়াছে, সত্যেন্দ্র উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, পরিচ্ছেদটি আরম্ভ হইয়াছে উচ্ছ্বাসবহুল ভাষায় তদুপরি তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অপটু অনুকরণ-প্রয়াস সুস্পষ্ট। এখানে আছে: "কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্বের সুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাঙিয়া দিয়াছে। অর্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে—আমার আজীবন সহচর সেই অর্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাঁদিব না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া

যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উলটাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে। কিছুই যেন আর ঠাহর হয় না। এ কি হইল! নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানালায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছগুলা কি একটা নিস্তব্ধভাব সত্যেন্দ্রের সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈ-কি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সেই এক কথা বলিয়া বেড়ায়। হইয়াছে? পাপিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে বৌ মরে গেছে। সব জিনিস ওই একই কথা বারবার কহিয়া বেড়ায় কেন? সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস যেন ঐ কথাই কহে—নেই নেই, সে নেই!

কেমন আছ সত্য? মাথাটা কি বড় ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সে ত আজ অনেকদিন হইল! একটু শোও না ভাই। চিরকাল কি একই ভাবে ঐ জানালায় বসিয়া থাকিবে? সত্যেন্দ্র অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিতেছিল। যেটি সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ সেটিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।"

এই ভাষার তুলনায় ১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'আঁধারে আলো'র অনুরূপ আবেগোচ্ছল ভাষার অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাইজী বিজলী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আপন পতিতা-পরিচয় গোপন রাখিয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছিল। সেদিন সে গঙ্গাস্নান সারিয়া সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এইখানে আছে: "আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ, ওরে অন্ধ যুবক, সাবধান! এ সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।"

শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই সাধু ভাষায় বর্ণনা এবং চলতি ভাষায় সংলাপ লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী, সংলাপের ভাষাও যে মনোরম তাহা গল্পগুলির সমস্ত পাঠকই স্বীকার করিবেন, তাছাড়া শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সংলাপ অনেকক্ষেত্রে হুবহু

ইহাদের নাট্যরূপে স্থান পাওয়ায় এবং তজ্জন্ম নাট্যরূপ দর্শকদের অধিকতর মনোহারী হওয়ায় ইহা প্রমাণিত হয়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে লেখা 'ছবি' গল্পে* বর্ণনার সহিত সংলাপও সাধু ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ইহার ফলে সংলাপের সাবলীলতা বা স্বাভাবিকতা ভাষার ও কাহিনীর মিষ্টতার জন্য খুব বেশি না হইলেও নিঃসন্দেহে কিছুটা ক্ষুন্ন হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রকে ঠিক ভাষা-শিল্পী বলা যায় না, অর্থাৎ ভাষার উৎকর্ষের জন্য তিনি উৎসাহ করিয়া সবিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তবে ভগবৎ দত্ত শক্তিতেই তিনি সুন্দর সুখপাঠ্য ভাষায় লিখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র আবেগসম্পন্ন লেখক ছিলেন এবং ভাষার দিক হইতে শরৎচন্দ্রের আবেগ যে খুব কম ক্ষেত্রেই বাহুল্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা তাঁহার শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি বারবার দাগ দিয়া পড়িয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব তাঁহার উপর পড়া বিচিত্র নয়। সমগ্রভাবে 'চোখের বালি'র ভাষার সহিত শরৎচন্দ্রের ভাষার মোটামুটি মিল লক্ষ্য করা যায়, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' 'চতুরঙ্গ'-এর মত শেষ দিকের লেখার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষা শরৎচন্দ্রে দেখা যায় না। যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের মত কারুকার্যমণ্ডিত ভাষা ব্যবহার না করিলেও শরৎচন্দ্রের ভাষাও সরলতার সহিত লাবণ্যমণ্ডিত ছিল এবং কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহারে তিনিও অনেকস্থানে ভাষা হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার গল্প-উপন্যাসের ভাষা পাঠকদের মনে দাগ কাটিতে পারে।

অবশ্য শরৎচন্দ্রের ভাষা প্রশংসাযোগ্য হইলেও ইহা যে সর্বত্র সমমানের হইয়াছে একথা বলা যায় না। ইহার কারণ শরৎচন্দ্র গল্প ও আখ্যানের দিকে অধিক জোর দিবার ফলে সব সময় ভাষার প্রতি নজর রাখিতে পারেন নাই। তথাপি উচ্চশ্রেণীর শিল্পী বলিয়া তাঁহার ভাষার হৃদয়গ্রাহিতা

*শরৎচন্দ্রের বাগান-খাতায় 'ছবি'র মূল নাম ছিল 'কোরেলগ্রাম'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাবে (শরৎ-পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮) ইহা ১৮৯৩ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

মোটের উপর প্রায় সর্বত্রই বজায় থাকিয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভাষার ত্রুটি হিসাবে একটি কথা বিশেষভাবে বলিতে হয়। শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষ লইয়া অধিকাংশ চরিত্র আঁকিয়াছেন কিন্তু বাস্তবসম্মতভাবে ঠিক চরিত্র-অনুযায়ী সকলের মুখে উপযুক্ত ভাষা বসাইতে পারেন নাই। ঝি-চাকর, চাষী-মজুর, গাড়োয়ান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ হিসাবে তিনি সবসময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন বলা যায় না। 'দেনাপাওনা'র সাগর সর্দার ভূমিজ প্রজা, ডাকাতির অপবাদে জেল খাটিয়াছে। অতি সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষী সে। কিন্তু সে যে ভাষায় কথা বলিয়াছে তাহা স্বাভাবিক তদ্ভব শব্দবহুল গ্রাম্য ভাষা নয়, মোটামুটি মার্জিত ভাষা। 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর কাছে নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সাগর বলিয়াছে: "কেন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেনে ডাঙ্গাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরীর বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা বাগানে, কিন্তু আমি দেখেছি ছেলেবেলায় তাদের জমি জমা, হাল-বলদ, দুমুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায় মশায়ের।" 'শুভদা'র কাত্যায়নী গ্রাম্য দেহোপজীবিনী, অশিক্ষিতা সাধারণ নারী, তাহার মুখেও শরৎচন্দ্র অনুরূপ ভাষা বসাইয়াছেন। কাত্যায়নী শুভদার স্বামী হারাণকে তাহার রুগ্নপুত্রের কথা শুনিয়া দশ টাকা সাহায্য করিয়া বলিয়াছে: "ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোট লোকের মেয়ে, ছোট লোক, কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রীপুত্র বাড়ি ঘর, তারপর আমরা; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তারপর সখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি এখানে আর এসো না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘর বাড়ি স্ত্রী পুত্র দেখো গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেপুলের মুখে দুটো অন্ন দাও।" সাবিত্রী, কিরণময়ী, কমল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বড় চরিত্র, শরৎচন্দ্র তাহাদের লেখাপড়া জানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যে মার্জিত ভাষায় কথা বলিয়াছে, তাহা তাহাদের গ্রন্থে উল্লিখিত শিক্ষার চেয়ে উচ্চস্তরের বলিয়াই পাঠকের মনে হয়। কিরণময়ী এক উঁচু ধরণের বিদুষী মহিলা,* কমলের বিদ্যাবুদ্ধি

---

*দিবাকরকে কিরণময়ী বেদ, আত্মা, মৃত্যু, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে কঠিন কঠিন তথ্য শোনায়, উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে শকুন্তলা, রোমিও-জুলিয়েটের

এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বলতা অপরিসীম।* সাবিত্রীর ঘরে কয়েকখানি বই রাখা হইয়াছে, তাহাকে পদস্খলিতা ভদ্রকন্যারূপে পরিচিত করানো হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তিতে সে মেসের ঝি। তাহার ঘর যে বাড়ীতে তাহা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ী বলা যায় না। সেই সাবিত্রীর মুখে পরিচ্ছন্ন মার্জিত ভাষা শুনিলে পাঠকের

কথা, জীবজগতের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কিরণময়ী মুগ্ধ তরুণ শ্রোতা দিবাকরের কাছে বক্তৃতা করে: "বিশ্ব চরাচরের যে দিকে খুসী চেয়ে দেখ, ওই এক কথা ঠাকুরপো, সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে, এর প্রতি অণু-পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্তন; এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোন মতেই থামাতে পারে না।"

* তাজমহলে আশুবাবুর সঙ্গে কমল তর্ক করে: "সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি সম্পদ এবং ধৈর্য দিয়ে এত বড একটা বিরাট সৌন্দর্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে এমন সুন্দর সৌধ তিনি যে কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র লক্ষ মানুষ বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এম্‌নি চলে যেতো। এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকের দান।" ইহার পর আশুবাবু একথা স্বীকার না করিয়া যখন বলিলেন যে, মানুষের অন্তরে সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসার স্মৃতি ছাড়া তাজমহলের শ্রদ্ধার আসন আর থাকিবে না, কমল উত্তরে কঠিনভাবে বলিয়াছে, "যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসছে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড় ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।"

মনে একটু ধাক্কা লাগেই।* সত্য হউক মিথ্যা হউক, সত্যরূপে, সম্ভাব্যরূপে পাঠকের কাছে বক্তব্য রাখা শিল্পকলার বড় দিক।

কিন্তু উপযুক্ত ভাষা চরিত্রের মুখে না বসাইয়া অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষা বসাইবার অভিযোগ এসব ক্ষেত্রে সত্য হইলেও কবিশেখর কালিদাস রায় এ সম্পর্কে যে কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি বলিয়াছেন; "শরৎচন্দ্রের অনেক চরিত্রই সাহিত্যের ভাষায় কথা বলিয়াছে। শিক্ষিত লোকেরা তাহাদের সংসদে পরিষদে হয়ত সে ভাষায় কথা বলে। প্রকৃত জীবনে তাহারাও এত সুরভিত বক্রোক্তিঘন ভাষায় কথা বলে না।"—(শরৎসাহিত্য, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৬০।) প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যাপক অভিযোগ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। অনেক তলার শ্রেণীর চরিত্রে শরৎচন্দ্র বাস্তবিকই সুন্দর ভাষা বসাইয়াছেন। এইরূপ উপযুক্ত ভাষা সংস্থাপনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে রাখা হইতেছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মী তাহার স্বামী বিরিঞ্চি দত্তের পাচক কুলীন ব্রাহ্মণের কথা শ্রীকান্তকে বলিয়াছে। লোকটি দেখিতে বোকা হইলেও কাজের সময় খুবই চালাক। রাজলক্ষ্মী ও তাহার বোন সুরলক্ষ্মীকে একান্ন টাকা পণে একসঙ্গে বিবাহ করিবার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ পাত্রোচিত দম্ভে সে বলিয়াছে; "অত সস্তায় হবে না মশাই, বাজার যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ এক টাকায় ভাল একজোড়া রামছাগল পাওয়া যায় না তা জামাই খুঁজচেন। একশো একটি টাকা দিন—একবার এ পিঁড়িতে বসে, আর একবার ও পিঁড়িতে বসে দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি। দুটি ভগ্নিই একসঙ্গে পার হবে। আর একশোখানি

*উপেন্দ্র সাবিত্রীকে লইয়া যাইবে, সতীশ বাঁকিয়া বসিল, তা হইবে না, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। সাবিত্রী পরম স্নেহে সতীশের ললাট হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল: "ছি, এমন কথা কখনো ভ্রমেও মনে কোরো না। আমি বিধবা, কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেছে, তিনি বুঝেছেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা আজ তুমি ঝোঁকের ওপর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে মিথ্যে দোষারোপ করে অপরাধী হয়ে থেকো না।"

টাকা দুটো ষাঁড় কেনার খরচটাও দেবেন না ?") 'আঁধারে আলো' গল্পে বিজলীর পতিতালয়ে উপস্থিত হইয়া সত্যেন্দ্র বিভ্রান্ত, বিজলী তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে : "সুরারঞ্জিত চোখ ঢুলু ঢুলু করিতেছে, ত্বরিতপদে কাছে আসিয়া সত্যর একখানি হাত ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি ? নে ভাই, ওঠ,—ওসবে আমার ভারি ভয় করে ." 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয়-পর্বে রেঙ্গুনে নামিয়া শ্রীকান্ত জাহাজে পরিচিত নন্দ মিস্ত্রীর খোঁজ করে, অচেনা জায়গায় তবু কিছু ভরসা। 'হরিপদ' নামে এক মিস্ত্রীর কাছে নন্দর খোঁজ করিলে হরিপদ নিজের ভঙ্গিতে জবাব দেয় : "ওঃ মিস্তিরী ! অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়। মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়। মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে তখন বড সাহেবের কাছে কতখানি উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন ?—একশখানি। আরে কাজের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম ?—কেটে যে জোডা দিতে পারি।" 'অরক্ষণীয়া'য় কুরূপা হৃদয়বতী গ্রাম্যরমণী ভামিনী স্বামীকে তাহার দুশ্চরিত্র ভাইয়ের সহিত ভাগ্নী জ্ঞানদার বিবাহের চেষ্টায় ভর্ৎসনা করে : "মামা ! মামাত্ব ফলাতে এসেছেন ! নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেবে ! তাহলে একশো টাকা সুদে আসলে শোধ করা যায়, না ? তাই সে সুপাত্তর ? বটে ! আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে ? তাড়ি গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে মেরে ফেললে কি না—তাই অমন সুপাত্তর আর নেই। গলায় দড়ি জোটে না তোমার ? ধিক্ ধিক্ !" এই প্রসঙ্গেই 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনে বর্মী স্ত্রীর নিকট হইতে ছোট ভাইকে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টায় আগত সাধারণ বাঙ্গালী স্বার্থপর গৃহস্থ বড় ভাইয়ের শ্রীকান্তকে বলা কথাগুলি উদ্ধৃত করা চলে। কথাগুলির মধ্যে লেখকের ব্যঙ্গ মিশিয়া থাকিলেও এগুলি জীবন্ত :—"শোন কথা একবার ! বর্মী বেটীদের আবার কষ্ট ! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে জাত জন্ম। বেটীরা সব নেপ্পী খায় মশাই নেপ্পী খায়। গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা-বেটীদের আবার কষ্ট ! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা···পুরুষ-বাচ্চা বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন।···মশাই এ বা কি ! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে

ঢুকে মুরগী পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর-তাই করে, না করলে চলে ?”

শরৎচন্দ্রের ভাষা খুব বেশি অলঙ্কৃত নয় এ কথা ঠিক, কিন্তু অলঙ্কার তিনি নানা জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার লেখায় উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কার-সমাবেশও দেখা যায়। উপমা, রূপক, বক্রোক্তি প্রভৃতি, অর্থালঙ্কার এবং শব্দালঙ্কার উভয় সমাবেশেই মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট, প্রাণবান ও গতিশীল হইয়াছে। ‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসে হৈম ষোড়শীর যে ভাবে মূল্যায়ন করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না: “আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধূলোবালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা তেমনি খাঁটি—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশশুদ্ধ লোক সবাই ভুল করচে, কেউ কিছুই জানে না—তুমি ইচ্ছা করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো।” ‘শ্রীকান্ত’ দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনগামী জাহাজে সাইক্লোনের পরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে: “মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে।” ‘শ্রীকান্ত’ তৃতীয় পর্বে সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ গঙ্গামাটির বাড়ী হইতে বিদায় লইয়াছে। তাহার চলিয়া যাইবার পর চারিদিকে যে বিষণ্নতা পরিব্যাপ্ত হইল তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীকান্ত বলিতেছে: “স্বামী বজ্রানন্দ তাহার ওষুধের বাক্স ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন শুধু যে সে এবাড়ীর সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয়, আমার মনে হইল যেন সে এই শূন্যতাটুকু ছিদ্রহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জনামুক্ত ছিল, সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।” ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসে উপেন্দ্র কলিকাতায় কিরণময়ীদের বাড়ীতে থাকিয়া দিবাকরের কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিরণময়ীর আদর-যত্নের সীমা নাই। দিবাকরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: “অযত্নপালিত টবের গাছ দৈবাৎ ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া অপর্যাপ্ত রসের আস্বাদে তাহার বুভুক্ষু শীর্ণ শিকড়গুলো

যেভাবে মাটির মধ্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিতে থাকে, কিরণময়ীর আশ্রয়েও দিবাকরের ঠিক সেই মত হইল।" এই 'চরিত্রহীন' উপন্যাসেই কিরণময়ী দিবাকরকে লইয়া আরাকানে পলাইতেছে। সমুদ্রে ঝড় উঠিল। জাহাজের কেবিনে একটির বেশি শয্যা নাই। দিবাকর বুঝিয়াছে "কিরণময়ীর দুই চোখের বাসনাদীপ্ত বুভুক্ষু দৃষ্টির মাঝে আর যাই কেন না থাক, তাহার জন্য সেখানে একবিন্দু ভালবাসা নাই।" তবু নিরুপায় হইয়া সে কিরণময়ীর পার্শ্বে শুইয়াছে। তাহার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে: "অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্র যেমন চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিল।" ('শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত দ্বিতীয়বার শ্মশানে গিয়াছে, রাজলক্ষ্মী কুমার বাহাদুরের তাঁবু হইতে স্বস্থানে ফিরিবার পথে শ্রীকান্তকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিয়াছে। শ্রীকান্ত আপত্তি করিয়াছে এজন্য সম্ভাব্য লোকনিন্দার উল্লেখ করিয়া। রাজলক্ষ্মী ম্লান হইয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তর "হঠাৎ মনে হইল সম্মুখের ওই পূর্ব আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্যে দিয়াই যেন বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। সে কহিল:

'কি করে রইলে যে?'

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, 'কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারা-জীবন শুধু জালখৎ তৈরী করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও।'

(তবে এই অলঙ্কার ব্যবহার সত্ত্বেও, আগেই যে কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের সাধারণ সরল ভাষার দিকেই অধিকতর ঝোঁক ছিল। ভাষা যাহাতে কঠিন না হয় এবং পাঠকদের বুঝিতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।* এই জন্য শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত তৎসম শব্দ, কঠিন

*শরৎচন্দ্রের এইরূপ সরল অথচ বলিষ্ঠ ভাষার কয়েকটি নমুনা:—

(১) মহিমের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। মহিম যাহা কিছু বাঁচান যায় সেই চেষ্টায় গিয়াছে। সুরেশও যাইতেছিল। গ্রন্থে এইখানে আছে: "অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, আপনি যান কোথায়?

অলঙ্কার, ব্যাপক ব্যবহার নাই এমন আঞ্চলিক অর্ধতৎসম তদ্ভব অথবা দেশী শব্দ পারত পক্ষে গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র সেই সব শব্দই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন যেগুলির সাধারণ জীবন-সামীপ্য বেশি, অর্থাৎ বাঙ্গালী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। শব্দ-চয়নে, বিশেষতঃ বৈশিষ্ট্য-বাচক বিশেষণ প্রয়োগে শৎরচন্দ্রের ক্ষমতা পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়িবে। শরৎচন্দ্র রুচিসম্মত অলঙ্কার প্রয়োগের চেষ্টা করিতেন এবং তিনি মোটামুটি সাধু-রচনারীতির পক্ষপাতী ছিলেন।) 'ছবি' গল্পে

সুরেশ টানাটানি করিয়া কহিল, মহিম গেল যে—

অচলা তিক্তস্বরে বলিল, তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দেব না।

তাহার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের লেশমাত্র ছিল না—এ যেন শুধু সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল।

মিনিট দুই তিন পরেই মহিম দুই হাতে দুটা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতেই হাতছাড়া ক'রো না। আমরা বাইরের ঘরে যদি কিছু বাঁচাতে পারি চেষ্টা করিগে।

অচলার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠোর মধ্যে তখনও সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল, তেমনি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।" (গৃহদাহ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই দৃষ্টান্তটিতে শরৎচন্দ্রের আখ্যান রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৌশল বৈপরীত্যের সংস্থাপনে মানসিক সংঘর্ষ বাড়াইয়া কাহিনীর জটিলতা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অচলার মন এখানে মহিম-মুখী, কিন্তু সুরেশের কোঁচার খুঁট তাহার হাতে দেখিয়া মহিমের বিপরীত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক

(২) সুরেশ মারা যাইতেছে। অচলাকে সরাইয়া দিয়া সুরেশ বন্ধু মহিমকে বলিল: "কেবল একটা জিনিসের জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়। অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন ঘুলিয়ে উঠল যে —যাক, এমন সুন্দর জিনিসটা মাটি করে ফেললুম না পেলুম নিজে, না পেতে

শরৎচন্দ্র সংলাপেও সাধুভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার রচনারীতি নয়। তিনি বর্ণনায় সাধুভাষা ব্যবহার করিলেও সংলাপে কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতেন।

অবশ্য শরৎচন্দ্রের লেখায় ছোটখাট ভাষাগত ত্রুটি বা শ্লথতা অনেক চোখে পড়ে। একই সঙ্গে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণে কোথাও কোথাও

দিলুম অপরকে; কিন্তু কি আর করা যাবে। পিসিমাকে একটু দেখো - শোকটা তাঁর ভারি লাগবে।"

—একটু পরেই আছে: "মহিম ক্ষণকাল চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার শেষ অনুরোধ একটা রাখবে সুরেশ?

কি?

তুমি ভগবানকে কোনদিন ভাবোনি, তাঁর কথা—

ও আমার ভাল লাগে না। বলিয়া সুরেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মহিম প্রাণপণে একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।" (গৃহদাহ)

(৩) গৃহবিবাদের পর বিপ্রদাসের সহিত সতী বলরামপুর ত্যাগ করিতেছে। ব্যথিত নিরুপায় দ্বিজদাস বৌদির পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল: "এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক। কথাটা কিছুই নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দুচোখ জলে ভরিয়া গেল।" (বিপ্রদাস)

(৪) নরেন বিজয়ার কাছে তাহার পিতার নিকট বিজয়ার পিতার লেখা পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছে। এই পত্রে নরেনের সহিত বিজয়ার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বনমালীবাবু। বিজয়া তখন বিলাসের বাগ্‌দত্তা, বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। এখানে বইয়ে আছে; "বিজয়ার মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্র নাই—এমনি একটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নরেন উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি? আমি কি সত্যি সত্যিই এই সব দাবী করতে যাচ্ছি, না করলেই পাব? বরঞ্চ আমাকেইত তাহলে ধরে নিয়ে পাগলা গারদে পুরে দেবে।

বিজয়া এসকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, কই, দেখি বাবার চিঠি?

গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটিয়াছে। তিনি ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সময় ভাষার মিষ্টত্ব ও বলিষ্ঠতার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতেন এবং প্রয়োজন বোধে বাক্যে ক্রিয়াপদ সুবিধা মত স্থানে বসাইতেন।* বিস্ময়ের চিহ্ন তাঁহার লেখায় অত্যন্ত বেশি, জিজ্ঞাসার চিহ্নও প্রচুর, পরোক্ষ উক্তিতে পর্যন্ত এই চিহ্ন অনেক। শরৎচন্দ্র আবেগপ্রবণ লেখক, আবেগ বা বক্তব্য সুস্পষ্ট করিতে বক্তব্যের উপর জোর দিতে তিনি 'কথাই না', 'থাকলেই ত', 'ফেললেই বা', 'বটেইত, 'একদিন ত', 'তাই বা', 'বিনিময়েও'—এই ধরণের ই, না, ত, বা, ও প্রভৃতি প্রত্যয় শব্দের শেষে প্রায়ই ব্যবহার করিয়াছেন। কোথাও কোথাও তিনি বহুবচনের দ্বিত্ব (যেমন সমস্ত বইগুলি) ব্যবহার করিয়াছেন। 'বোধ করি', 'বোধহয়', 'কিন্তু', 'হয়ত', 'কিম্বা', 'তারপরে', 'যথার্থই', 'সবিশেষ', 'কি জানি', 'এমনিই হয়', 'এমনি বটে', 'তাই হবে', 'যেমন তেমনি'—এই ধরণের কতকগুলি শব্দ তাঁহার লেখায় বহুবার দেখা যায়। এমন একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ একই গ্রন্থে তিনি একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন যাহা দৃষ্টতঃ

নরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, বেশ, আমি কি পকেটে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছি না কি? আর দেখেই বা কি লাভ আপনার?

তা হোক। দরওয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন। সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।

এত তাড়া?

হাঁ।"

স্বরূপ ইতিপূর্বে উল্লিখিত বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই রেঙ্গুন হইতে লেখা চিঠিতে এক জায়গায় আছে: "চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে।...উপানন্দের স্ত্রীটিও 'দধিমন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন।" একখানি চিঠিতে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫৭) শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: "এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।"

বক্তব্য স্পষ্ট করিবার আশায়, কিন্তু পাঠক সংশ্লিষ্ট ঘটনার সহিত পরিচিত হইবার পর ব্যাপারটা এমনিই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে বলিয়া এই ব্যাখ্যাসূচক শব্দের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে।* সমগ্রভাবে বক্তব্য যাহাতে পাঠক পরিষ্কার বুঝিতে পারে সেদিকে নজর ছিল বলিয়াই শরৎচন্দ্রের ব্যাখ্যা বা বিশদ বিবরণ সংস্থানের দিকে এক ধরণের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।† শরৎচন্দ্র কোন কোন জায়গায় শব্দ-ঝঙ্কারের মোহে অথবা বিশেষ ধরণের রস বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একগোছা সমার্থক শব্দ বা সমভাবব্যঞ্জক বাক্য ব্যবহার করিয়া লেখা ভারি

* 'পরিণীতা'র ১০ম পরিচ্ছেদে ললিতার দুরবস্থায় ভুবনেশ্বরীর আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিবার পর আছে "ললিতাকে যথার্থ তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।" আবার এই উপন্যাসের ১২শ পরিচ্ছেদে শেখরের ললিতাকে বিবাহ করিবার সংবাদ জানিয়া ভুবনেশ্বরীর চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িবার পর আছে: "তিনি ললিতাকে সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন", কিন্তু গ্রন্থের পাঠক সংশ্লিষ্ট ঘটনার সহিত পরিচিত হইলে ভুবনেশ্বরীর ললিতাকে এই ভালবাসার কথা স্বতঃই বুঝিতে পারে, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা, অন্ততঃ দ্বিতীয়বার বুঝাইবার চেষ্টা, বাহুল্যমাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ ভাবেই 'চরিত্রহীন'-এ ৪২তম পরিচ্ছেদে দিবাকর যখন আরাকানে কামিনী বাড়ীউলির কথায় উত্তেজিত হইয়া কিরণময়ীকে ধাক্কা দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল, তাহার পর সে "লজ্জায় অনুশোচনায় পুড়িয়া যাইতেছিল।" এই পর্যন্ত পড়িলে যে কেহই বুঝিতে পারে দিবাকর কিরণময়ীকে গভীরভাবে ভালবাসিত, কিন্তু শরৎচন্দ্র পাঠককে বুঝাইবার জন্য লিখিলেন: "সে সত্যই কিরণময়ীকে ভালবাসিয়াছিল।"

†'দত্তা' উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিজয়া নরেনকে তাহার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীর দুর্গোৎসবের অনুমতি দিল। নরেন বিদায় লইবার পর বিলাস-বিহারী ইহাতে তাহার পিতার অপমান হইয়াছে এই অজুহাতে রাগ দেখাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিল: "মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম।" বিজয়ার কানে কথাটা যাইতেই সে একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণেই আপন মর্যাদা রক্ষার জন্য 'এই বর্বরটার মুখের প্রতি তাকাইয়া' নীরবে ভিতরে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি পরিষ্কার এবং এখানে বিলাসের আচরণে জটিল এমন কিছুই নাই যাহা পাঠক বুঝিতে পারে না। কিন্তু পাছে পাঠক না বুঝে

করিয়া ফেলিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও রাখা যায়।* তিনি আবেগপ্রবণ হৃদয়বাদী লেখক ছিলেন বলিয়া বাস্তব-অনুগামী লেখার ফাঁকে ফাঁকেই কোথাও কোথাও তাঁহার লেখা বাস্তবের সীমা ছাড়াইয়া কল্পনার রঙ্গমহলে ঢুকিতে চাহিয়াছে। ইহা কাব্যিক শক্তির কথা নয়, সে কথা পরে আলোচিত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের কথা। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের ন্যায় জীবনশিল্পীর লেখায় এই মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস কেহ আশা করে না।**

সেজন্য অথবা এমনিই শরৎচন্দ্র বিলাসের ব্যবহার ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন: "সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্য বশতঃই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্বলকে পীড়া দিতে, ভীতকে আরও ভয় দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে—তা সে যাই হোক, এবং হেতু যত অসংলগ্নই হোক।"—ইত্যাদি।

*'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর শ্মশানে অবস্থানের দৃশ্যে আঁধারের রূপ বর্ণিত হইয়াছে: "অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে।" এই সঙ্গে আঁধারের রূপের দার্শনিক ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার তাত্ত্বিক মূল্য যাহাই হউক, ইহাতে কাহিনীতে নিবিষ্ট পাঠকের মন বাধা পায় বলিয়া গল্পরস স্তিমিত হইয়া যায়। শিল্পকলার হিসাবে এজন্য উপন্যাসের গতিতে শ্লথতা আসে। তাছাড়া এই ১ম পর্বেরই ২য় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তর মাছ চুরির দৃশ্যে অন্ধকারের রূপ আর একবার বর্ণিত হইয়াছে: "বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।"

**এই মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের তিনটি দৃষ্টান্ত নিম্নে রাখা হইল, প্রথম দুইটি 'পথের দাবী' ও তৃতীয়টি 'শ্রীকান্ত' হইতে:—

(১) 'পথের দাবী'তে গোয়েন্দা নিমাইবাবু রেঙ্গুনে জাহাজ-যাত্রীদের মধ্যে আত্মগোপনকারী সব্যসাচীর সন্ধান করিতেছেন, অপূর্বর আশঙ্কা হইল হয়ত এখনি সব্যসাচী ধরা পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। এখানে অপূর্বর আন্তরিক

কিন্তু এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও সহজে বোধগম্য, শ্রুতিমধুর ঝরঝরে ভাষার জন্য শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট। ভাষার গৌরব তাঁহার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের বর্ণনা যেমন জীবন্ত, সংলাপ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ভারহীন পরিচ্ছন্ন তাঁহার উপন্যাসের সংলাপ সহজেই নাট্যরূপে গৃহীত হয়। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে অনেক স্থলে পাত্র-পাত্রী

আবেগ শরৎচন্দ্র সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন, কিন্তু এই বর্ণনা মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভরপুর: "চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, এত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

(২) আবেগে শশীকে সব্যসাচী বলিয়াছেন: "শশি হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি হবে কবি তাদেরই কবি।" ইহার পর শশী সব্যসাচীর প্রশংসায় পুলকিত হইয়া যখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিবার প্রস্তাব করিয়া বসিল, সব্যসাচী যেন ভাব-জগতের আরও গভীরে ঢুকিয়া গেলেন: "না, না, ইংরাজী নয়, ইংরাজী নয়, শুধু বাঙলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা! শশি, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময় ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এদেশে কবে কে এনেছিল?"

একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু এই সংলাপ-বাহুল্য 'শেষপ্রশ্ন' (এবং কিছুটা 'বিপ্রদাস') ছাড়া আর কোথাও লেখাকে বিশেষ ভারগ্রস্ত করে নাই। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন, লেখায় ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তব জীবনের স্পর্শ আনাই তাঁহার কাজ। এই হিসাবে তাঁহার সাফল্য কম নয়।*

শরৎচন্দ্র পাত্রপাত্রীর মুখে কথা বসাইয়া কাহিনী ও চরিত্রের অগ্রগতি সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সংলাপ-বাহুল্যের ইহা অন্যতম কারণ তিনি পরিবেশ এমন করিয়া রচনা করিয়াছেন যাহাতে পাত্র-পাত্রীর সক্রিয়তা

(৩) 'শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্ত অসুস্থ অবস্থায় রাজলক্ষ্মীর সহিত পাটনা যাইতেছে। বিধবা রাজলক্ষ্মীর স্বামীরূপে পরিচয় দিতে গিয়াই শ্রীকান্তকে গ্রামছাড়া হইতে হইল। শ্রীকান্ত আপন মনের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে: "দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ীর চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ পিতামহের সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলা-বালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহু কোটি অকৃতি সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায়, তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।"

* "শরৎচন্দ্রের শব্দ-প্রয়োগের এই নিপুণতার গুণেই তাঁর ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল গতিতে চলে শান্ত স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দের ন্যায় যেন এক মনোরম সুরের সৃষ্টি করেছে।

শরৎচন্দ্রের এই ভাষা সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন: "শরৎচন্দ্র তাঁহার এই ভাষা নির্মাণে এমন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ, তিনি স্ব-সমাজের একেবারে বুকের নিকটে কান পাতিয়া ছিলেন—তাহাদের মুখের বুলিই শুধু শোনেন নাই, সেই বুলির প্রাণ-সঞ্চারী রসধ্বনিও শুনিয়াছিলেন; তাই কথ্য ভাষার রূপ, তাহার 'এ্যাকসেণ্ট' বা স্বর-বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতম ধ্বনি আর কেহ এমন করিয়া কানে ও প্রাণে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই।"—(গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৫।)

ও সংলাপ এই অগ্রগতির দ্যোতক হয়। লেখক হিসাবে তিনি যে নিজেকে সর্বত্র সরাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন তাহা নয়, আবেগবশে শিল্পকলা ব্যাহত করিয়া তিনি কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশও করিয়াছেন। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সদ্যমাতৃহীন কাঙালী গোমস্তা অধর রায়ের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে গেল। কাজ কিছুই হইল না, কিন্তু সে কথা বলিবার আগেই শরৎচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দুর্নীতি সম্পর্কে আপন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন: "হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না।" 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে ইন্দ্রনাথের নতুনদা এক অতি স্বার্থপর চালিয়াত চরিত্র, তিনি বি এ পড়িতেছিলেন, ইন্দ্র আশা প্রকাশ করিল তিনি ভবিষ্যতে ডেপুটি হইবেন। শরৎচন্দ্র বোধ হয় বাঙালী ডেপুটিদের কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না, এই সুযোগে তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন: "যাই হোক এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কিনা, সে সংবাদ জানি না, কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া?" 'বিলাসী' গল্পে শরৎচন্দ্রের এই আত্ম-প্রকাশ তো যথেষ্ট। 'মহেশ' গল্পের উপসংহার খুবই করুণ, পাঠককে অশ্রুসজল করিয়া তোলে; কিন্তু এখানে শরৎচন্দ্র কঠিনভাবে নিপীড়িত গোফুরের আল্লার কাছে ফরিয়াদের ভিতর দিয়া স্বদেশের ধনবণ্টন পদ্ধতির অসমতার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ রাখিয়াছেন: "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।"

কিন্তু এইভাবে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের স্বাভাবিক রূপ হইল পাত্রপাত্রীর মুখেই তিনি গল্প-উপন্যাসের অধিকাংশ মূলকথা বসাইয়াছেন, গল্প-উপন্যাসের পরিমণ্ডলে লেখক সর্বজ্ঞ হইলেও তিনি লেখকত্বের সুযোগ লইয়া বর্ণনা দ্বারা কাহিনীকে আগাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা বেশি করেন নাই। ইহা শরৎচন্দ্রের রচনারীতির এক বৈশিষ্ট্য। আগেই একথা বলা হইয়াছে যে, গল্প-উপন্যাস সাধারণের হৃদয় যাহাতে স্পর্শ

করিতে পারে এবং যাহাতে সাধারণের বুঝিতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য শরৎচন্দ্র সহজ সরলভাবে লেখা পছন্দ করিতেন। পাঠকদের বুঝিবার সুবিধার জন্যই তিনি বক্তব্যের স্তরবিন্যাস করিয়া অধ্যায় ভাগ করিয়া গল্প-উপন্যাস, বিশেষ করিয়া উপন্যাস লেখা দরকার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে সম্পূর্ণ করিতে পারুন বা না পারুন, তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল উপন্যাসে লেখকের নিজের কথা যেন খুব কম থাকে। শরৎচন্দ্র কানপুরের লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে (বাজে শিবপুর, ৫ই আগষ্ট, ১৯১৯) এ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন : "তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনার অধ্যায় ভাগ করিতে হয় এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চৌদ্দ আনা না দিয়া পাত্রপাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিষ ইহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', .ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ..)

বিশদ বিবরণ না দিয়া পাঠকের কল্পনার উপর কিছুটা ছাড়িয়া দিবার উপরোক্ত শিল্পকলাসম্মত অভিমত সত্বেও শরৎচন্দ্র নিজে কিন্তু কোথাও কোথাও বিশদ বিবরণের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্ভবত সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার যে আগ্রহ তাঁহার মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল তজ্জন্যই এই বিবরণ-প্রবণতা। শিল্পকলা অল্প কথায় ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে সার্থক একথা জানিলেও শরৎচন্দ্র কোন কোন জায়গায় তাহা মানেন নাই। যেখানে এইরূপ বিশদ বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেখানে লেখা যে অপেক্ষাকৃত ভারী হইয়া গিয়াছে এবং চরিত্রের গতি যে খানিকটা শ্লথ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার প্রশংসাযোগ্য দিক হইল যেখানে শরৎচন্দ্র এই বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ছাড়াও প্রায়ই সেখানকার চমৎকার চিত্ররূপ বা চিত্রকল্প পাঠকের আনন্দ বিধান করে। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর জমিদারী গঙ্গামাটির গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীর বাড়ীর বর্ণনাটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাক। ছবি হিসাবে ইহা সুন্দর। তাছাড়া এই বর্ণনায় প্রাচুর্য ও প্রশান্তির বিপরীতে কুশারী মহাশয়ের পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক

অশান্তির পরিচয় আনিয়া শরৎচন্দ্র বৈপরীত্যের সাহায্যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীকান্ত কুশারী-বাড়ীর বর্ণনা করিয়াছে: "বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলি মাটির; তথাপি মনে হইল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল তো বটেই, বোধহয় একটু বিশেষ রকম ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম। ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে। তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ হইয়াছে। একটা বাতাবী বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গোবৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে, তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী পরিবারে অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ অনটন নাই। দক্ষিণের বারান্দায় দেওয়াল ঘেঁষিয়া ছয় সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিঁড়ার উপর বসানো আছে। হয়ত গুড় আছে কি কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়ে দেখিলাম ঢেরা সমেত পাট এবং শনের গোছা বাঁধা রহিয়াছে—সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়ি-দড়ার আবশ্যক, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না।*

* 'পথের দাবী'তে ইরাবতী নদীতীরে সব্যসাচীর গোপন আশ্রয়স্থলের বর্ণনাও এমনি বিশদ। কত কষ্টস্বীকার করিয়া দেশপ্রেমিক সব্যসাচী কাজ চালান তাহা যাহাতে পাঠক সহজে অনুভব করিতে পারে সেবিষয়ে বর্ণনাটি সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ইহার শিল্পকলাগত মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। সব্যসাচীর এই গুপ্ত নিবাসটি গোটাচারেক মোটা মোটা সেগুণ কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য তক্তা মারিয়া তৈরী। জোয়ারের জল সরিয়া গেলে নীচে পাঁক ও পচা লতাপাতা দুর্গন্ধ ছড়ায়। হাত দুই পরিসর পথ ছাড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল। অল্পবয়সী এক বর্মী স্ত্রীলোক (যাহার কারারুদ্ধ স্বামী সব্যসাচীর বন্ধু) ও তাহার তিন চারটি শিশু সেখানে থাকে। একজন 'অপকর্ম' করিয়াছে, 'খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই,' দুঃসহ দুর্গন্ধে বাতাস

শরৎচন্দ্র মনে করিতেন লেখকের সবচেয়ে বড় সার্থকতা সেই লেখা দ্বারা যত বেশি সম্ভব পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করা। সব পাঠক হয়ত সব কথা বুঝে না, সব কথা সবাই উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু লেখক প্রাণ ঢালিয়া লেখা রচনাটির রস ও ভাব সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের মনে সর্বাধিক পরিমাণে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিবেন। বড় কথা বলিলেই বড় লেখক হওয়া যায় না, বড লেখক বড় কথা বলিলেও সেই বড কথা যেন সাধারণ পাঠক-হৃদয় স্পর্শ করিবার মত হয়। শরৎচন্দ্র মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখা ভাল বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে আপন ভাব-কল্পনার সহিত যথাসম্ভব পরিচিত করিবার জন্য এই মহা-মনীষীর প্রচেষ্টার আন্তরিকতাটুকু স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই দরদের অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন বিখ্যাত লেখক এইচ্ জি ওয়েলসের মধ্যে. তাই এইচ জি ওয়েলস্ প্রসিদ্ধ লেখক হইলেও শরৎচন্দ্র তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা ঠিক নাও হইতে পারে, হয়ত ইহা বাড়াবাড়ি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের শিল্প-চেতনার উপলব্ধিতে এই সমালোচনার মূল্য আছে। সামতাবেড, পাণিত্রাস হইতে ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন : "সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের An Outline of Philosophy বইখানি পড়লাম। এ বই-খানি শক্ত, অঙ্ক শাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সকল কথা বোঝা যায় না, বুঝতেও পারিনি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের উপর এঁর অশেষ করুণা। আহা এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,—সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা

বিষাক্ত। সর্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছের কাঁটা, পেঁয়াজ রসুনের খোলা, কালি-মাখা দু-তিনটে হাঁড়ি, ছেলেগুলো হাত ডুবাইয়া খাবলাইয়া ভাত খাইয়াছে। আসবাবহীন ঘর। সব্যসাচী একটি ছেলেকে বলায় দু চাঙড়া ভাত, পেয়ালায় ঝোল এবং পাতায় করিয়া খানিকটা মাছপোড়া আনিল। এই খাদ্যবস্তুটির প্রতি চাহিয়া ভারতীর গা বমি করিতে লাগিল, সে কিছুতেই খাইতে চাহিল না, ক্ষুধার্ত সব্যসাচী কিন্তু তাহাই 'পরম পরিতোষ সহকারে' খাইতে লাগিলেন।

যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়-দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি H. G. Wells-এর লেখা পড়লে। এঁর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা চালাকি আর ফুকুড়ি করে মেরে দেবো।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৫

('শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সূচনায় শ্রীকান্ত বলিয়াছে ভগবান তাহার মধ্যে কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই।* অনেকে 'শ্রীকান্ত'কে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীবৎ রচনা ভাবিয়া শ্রীকান্তের এই উক্তিকে শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি ধরিয়া লন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় হইতে কবি রাধারাণী দেবীকে ১৩৩· সালের ২০শে বৈশাখ এক পত্রে তাঁহার 'লীলাকমল' কাব্যের প্রশংসা করিয়া কবিরা কি করিয়া কাব্যসৃষ্টি করেন তাহা ভাবিয়া তিনি অবাক হইয়া যান লিখিয়াছিলেন।† শরৎচন্দ্রের রচনাবলী পড়িলে কিন্তু দেখা যায় যে, নিজের কবিত্ব সম্পর্কে তাঁহার এসব কথা যথার্থ নয় এবং সব সময় না হইলেও মাঝে

*"ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা কবিত্বের বাষ্পটুকু দেন নাই। এই দুই পোড়া চোখ দিয়া আমি যাহা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারও মুখ-টুখ ত নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি ত করা চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাই করিব।"—('শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব, ১ম অধ্যায়)

†"কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে।"—(গোপালচন্দ্র রায়, 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', ১৩৬১ হইতে উদ্ধৃত।)

মাঝে তিনি লেখায় কবিত্বের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।* বাস্তব জীবনশিল্পী ঔপন্যাসিকের অতিরিক্ত কাব্যাশ্রয়ী রচনারীতি অস্বাভাবিক, এ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা'র সমগ্রভাবে কবিত্বপূর্ণ ভাষা ঠিক উপন্যাসের উপযুক্ত নয়। শরৎচন্দ্রের ভাষায় সুষমা থাকিলেও এইরূপ কাব্যধর্মী ভাষা অবশ্য তিনি কমই ব্যবহার করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র মোটামুটি সংযত ভাষার সাহায্যে কাহিনী রূপায়িত করিতেন, তাঁহার লেখায় যে সব জায়গায় কবিত্বপূর্ণ ভাষা আসিয়া গিয়াছে, সেখানেও নিতান্ত দু'এক জায়গা ছাড়া লালিত্য বড একটা কোমলতায় তরল হইয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, ইহা শরৎচন্দ্রের ভাষাশিল্পগত শক্তিরই পরিচায়ক। যাহা হউক, একথা মনে রাখিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্রের কবিত্ব যেটুকু ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হৃদয়াবেগেরই ফল, চেষ্টা করিয়া ভাষার কারুকার্য সম্পাদনের দিকে তাঁহার প্রবণতা ছিল না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিভাবান শিল্পী বলিয়া শরৎচন্দ্রের ভাষায় যেখানে অল্পবিস্তর কবিত্ব দেখা যায় সেখানেও পরিবেশ এবং ঘটনা ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা প্রায়ই বেশ খাপ খাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'পথের দাবী' উপন্যাসে 'পথের দাবী' কার্যালয়ে ভারতী যখন সভানেত্রী সুমিত্রার পরিচয় করাইয়া দিল, অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া গেল সুমিত্রার রূপের উজ্জ্বলতায়: "বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনিল। নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরাণী।...এই ত চাই! ললাট, চিবুক, নাক চোখ ভ্রূ, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—এ কি ভয়ঙ্কর

*শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুন-গামী জাহাজে ঝড়ের দৃশ্য: "ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়, ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল!"

আশ্চর্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু কাব্য যাঁহারা লেখেন কেন যে তাঁহারা এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না।" এই রূপ বর্ণনায় উপন্যাসগত মূল্য এই যে, এত রূপসী হইয়াও সুমিত্রা বিপ্লবী সব্যসাচীর ইস্পাত-দৃঢ় হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা রূপসী হইলেও রূপবর্ণনা তিনি কম করিয়াছেন, জোর দিয়াছেন তাহাদের মনের সৌন্দর্যের উপর, সুমিত্রার ক্ষেত্রে দৈহিক রূপবর্ণনার শিল্পকলাগত মূল্যও যথেষ্ট। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার শূন্য হৃদয়ের আশ্চর্যসুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন শরৎচন্দ্র, পরিবেশের সঙ্গে বর্ণনাটি চমৎকার মানাইয়া গিয়াছে: "ভয় নাই, ভাবনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই,—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।"*

*শরৎচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা অধিকাংশক্ষেত্রে কাহিনী, ঘটনা ও পরিবেশের সহিত খাপ খাইয়া লেখার শিল্পকলাগত মূল্য বাড়াইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই কবিত্বমণ্ডিত বর্ণনার জন্য রচনা শ্লথগতি হইয়াছে এবং গল্প থামিয়া গিয়াছে বা সরিয়া গিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও কিছু কিছু দেওয়া যায়। সাধারণভাবে ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা কালে এই ত্রুটির কথা আগেও বলা হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব হইতে এই ত্রুটির আর একটি দৃষ্টান্ত রাখা হইল। বালক ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত মাছ চুরি করিয়া নৌকায় ফিরিতেছে। ইন্দ্রনাথ বালুচরে নৌকা বাঁধিয়া শ্রীকান্তকে "তোর কিছু ভয় নাই" ভরসা দিয়া মাছের ক্রেতা ডাকিতে গেল। এখানে একাকী শ্রীকান্তর অসহায় অবস্থা, ভয় পাওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া শ্রীকান্তের জবানীতে শরৎচন্দ্র এখানে উচ্ছ্বাসভরে কবিত্ব ও দার্শনিকতার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এই বর্ণনার একমাত্র অজুহাত এই যে ঘটনা ঘটিয়াছে শ্রীকান্তর শৈশবে এবং সে পরিণত বয়সে অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া ঘটনাটির বিবরণ দিতেছে: "সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল্ করিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষত মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ

কবিত্বের একটা বড় দিক প্রকৃতি-প্রীতি। প্রকৃতি-প্রীতি অল্পবিস্তর সকল জীবন-শিল্পীরই থাকে, কারণ জগৎ ও জীবন লইয়া যিনি লেখেন, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে বাস্তব জীবনের সমস্যা লইয়া যাঁহাদের কারবার, তাঁহারা নিসর্গ-সৌন্দর্য লইয়া আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশের অবকাশ পান কদাচিৎ। অবশ্য ডব্লিউ এইচ হাডসনের 'গ্রীন ম্যানসনস্' অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র মত উপন্যাসে প্রকৃতির রমণীয় পটভূমিতে জীবনকে বিন্যস্ত করিবার সাধনা করা হইয়াছে, সে হিসাবে এ ধরণের উপন্যাসে প্রকৃতির স্থান মুখ্য। শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা-নির্ভর উপন্যাসে প্রকৃতির স্থান গৌণ সন্দেহ নাই, জগতের ও জীবনের নানা বিচিত্রা সমস্যার আলেখ্যই তিনি যত্ন করিয়া ফুটাইয়াছেন, প্রকৃতি আসিয়াছে অনুকূল সুযোগের ফাঁকে। তবু শরৎচন্দ্র যেখানে প্রকৃতিকে

করি সংসারে নাই। এমনিই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড় দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহাকে কেহ কহিল ভাল, কেহ কহিল মন্দ—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া কাঁদিয়া গান গাহিয়া, সব একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলা গারদ বানাইয়া ছাড়িল। কিন্তু যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিল খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল, সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন বৃন্দাবনের বনে বনে কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র—মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ, তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স!"—ইহার পর ইন্দ্রনাথ ফিরিয়াছে এবং শ্রীকান্তও পুনরায় বাস্তবে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফুটাইয়াছেন, সেই প্রস্ফুটন প্রায়ক্ষেত্রেই শুধু যে বিষয়বস্তুর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে তাহাই নয়, প্রকৃতির রূপবিন্যাসে লেখকের যে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠক তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারে না। 'পরিণীতা'য় শেখর ললিতার সহিত মালাবদল করিয়া তাহাকে প্রণয়-চুম্বনে অভিষিক্ত করিল। এ কাজ সমাজ-অনুমোদিত নয়। পুরোহিত নাই, শালগ্রাম নাই, মন্ত্র নাই, ললিতা বা শেখর কাহারও অভিভাবক ঘটনাটি জানেন না। কিন্তু প্রেমের যে দুর্বার আকর্ষণে দুটি তরুণ হৃদয় পরস্পর হইতে আর দূরে থাকিতে পারিল না, তাহাদের সেই কাজে যে গ্লানি নাই, একথাই যেন শরৎচন্দ্র সেই মিলন-সন্ধ্যার শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্না-প্লাবিত রূপটির মধ্যে তুলিয়া ধরিলেন: "তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল—জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল।" 'দত্তা' উপন্যাসে বিজয়ার বিবাহ-দৃশ্য। বিজয়ার অন্তর পিতৃস্মৃতির সৌরভে ভরপুর। বিজয়ার হিন্দুমতে বিবাহ হইতেছে, ভালবাসার কাছে, সত্যের কাছে সংস্কার বিসর্জিত হইয়াছে, তবু বিজয়ার মনে এজন্য দ্বিধাবোধ স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র বিজয়ার বিবাহ-দৃশ্যে প্রকৃতির মধুর স্পর্শ বুলাইয়া শুধু যে সমগ্র পরিস্থিতির অস্বস্তি বিদূরিত করিলেন তাহাই নহে, বিজয়ার চঞ্চল মনটিকেও যেন শান্ত করিয়া দিলেন।* 'পল্লীসমাজ'-এ জেল হইতে প্রত্যাগত রমেশের মন স্বভাবতঃই বিষণ্ণ, কিন্তু গ্রামের বিবাদে বিবদমান দুই পক্ষ তাহাকে সালিশী মানিবার পর উপন্যাসের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে রমেশের মনই শুধু প্রফুল্ল হইল না, বসন্ত-জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগেরও সে সুযোগ পাইল।

এই 'দত্তা'র অন্যত্র (৩য় পরিচ্ছেদ) স্মৃতিচারণা করিতে করিতে বিজয়া তাহার স্বর্গত পিতার নিসর্গপ্রীতির কথা আবেগের সহিত স্মরণ করিয়াছে। পিতা বনমালী ব্রাহ্ম হইবার জন্য সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। গ্রামে বাস করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতায় থাকেন। সুষমামণ্ডিত স্বগ্রামের প্রতি বনমালীর অনুরাগের অন্ত ছিল না। বিজয়ার

* "ঘণ্টা দুই পরে তাহাকে ফুলে ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখের বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গগত মাতা-পিতার আশীর্বাদের মত আসিয়া পড়িল।"

স্মৃতিতে এই অনুরাগ স্বর্ণোজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে: "গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ীর আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া তাহার পিতার সঙ্গে তাহার কত কথা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই চেয়ারের উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া আমার দেশের বাড়ীতে কখনও এ দুঃখ পাইনি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা-ছাদই আমার শেষ সূর্যাস্তটুকুকে এমন ক'রে কোনদিন আড়াল ক'রে দাঁড়ায়নি। তুই তো জানিসনে মা, কিন্তু আমার যে চোখ দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুলবাগানের ধারে ছোট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টল্‌টল্ করে উঠেছে। আর তার পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনও সূর্য ঠাকুর যাই যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি।"

'দত্তা'র ২১তম পরিচ্ছেদে আছে বিজয়া দয়ালের বাড়ীতে সন্দেহ করিল নলিনীকে নরেন ভালবাসে। বিজয়ার মন বিষাদে শূন্য হইয়া গেল, নরেন তাহা হইলে তাহার নয়। বিজয়া মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর দিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির রূপ তাহার মন স্পর্শ করিল না, তাহার রিক্ত মনের কাছে সব কিছু বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। এখানে মানব-মন ও প্রকৃতির সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশেষ বাস্তব দৃষ্টিপাত ঘটিয়াছে। 'দত্তা'র এই জায়গায় আছে: "বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল—সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল, এবং মুছিতে মুছিতে বারবার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।"

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তর তখন কমললতার নিকট হইতে বিদায়ের ক্ষণ সমাগতপ্রায়। দাক্ষিণ্যের প্রসাদে ও অনিবার্য বিচ্ছেদের বেদনায় শ্রীকান্তর মন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে শ্রীকান্তর ঘুম ভাঙিল, বিদায়ী রাত্রির সঙ্গে আসন্ন দিনের মিলন মুহূর্তের নিসর্গ-বর্ণনায় শ্রীকান্তর অন্তর-আলেখ্য যেন উদ্ভাসিত হইল: "কখনও এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টায় চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতন কাটিয়া যায়,—আজ যে কি ভাল লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায়, শোভায়-সৌরভে, ফুলে-ফলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অবরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।"

এই 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্বেই শ্রীকান্তর বাল্যবন্ধু কবি গহর শ্রীকান্তকে বর্মায় না গিয়া তাহার বাড়ীতে তাহার সঙ্গে বরাবর গ্রামে থাকিয়া যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। সেখানে মৌলে মৌলে আমগাছ ছাইয়া যায়, মালতী লতায় থোকা থোকা কুঁড়ি, মাধবী ফুলে সম্মুখের জামগাছ ভরা। কত দোয়েল, কত বুলবুলি, কত কোকিলের গান, জ্যোৎস্নায় রাত ভরা। গহর বলিয়াছিল, দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া রাখিলে শ্রীকান্তর চোখে আর পলক পড়িবে না। সেদিন শ্রীকান্ত হাসিয়া নিজের কবিত্বহীনতার কথাই বলিয়াছিল, এই বনের মধ্যে বাস করিতে সে দুদিনেই হাঁপাইয়া উঠিবে। এই শ্রীকান্তই কিন্তু আবার মনের দিক হইতে পরিবর্তিত হইয়া গহরের মৃত্যুর পর তাহার বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছে: "আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জাম গাছটার মাথার উপর। ইহারই শাখায় জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতীলতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক

আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল,...আজ তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষ দান মনে করিয়া।"*

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতির সর্বাধিক পরিচয় বর্তমান। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে শ্মশানে রাত্রির রূপ বর্ণনায় নিসর্গ চিত্রের সহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। শ্রীকান্তর চোখ দিয়া শরৎচন্দ্র রাত্রির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কবিতাও বলা চলে, দর্শনও বলা চলে। শরৎচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি ও তত্ত্বানুভূতির সহিত তাঁহার চিন্তা-শক্তির গভীরতা এই অংশে আশ্চর্য সমন্বিত হইয়াছে। এইখানে আছেঃ "রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে —আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে

---

*শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে গহরের গভীর প্রকৃতি-প্রীতি বর্ণনা করিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছেঃ "পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আটা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।"

যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসী-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয় আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার। কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো,·· এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই।"*

বৈষ্ণব কবিকুল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের কবিত্ব সে ধরণের বা ততখানি না হইলেও মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ স্থাপনে তিনিও যে কবিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষ ও প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গ দেখিয়াছেন, সেরূপ অন্তরঙ্গতা-বোধ শরৎসাহিত্যে দুর্লভ, কিন্তু অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত রাখা যায় যেখানে এইভাবে শরৎচন্দ্রও প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন। শ্রীকান্ত ৩য় পর্বে গঙ্গামাটির গ্রাম-পথ দিয়া সুনন্দাদের বাড়ী হইতে শ্রীকান্ত পড়ন্ত বেলায় রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছিল। এই অংশটির কলাশিল্প মনবধানী পাঠকেরও চোখেও পড়িবে। যেমন ইহার ভাষা ও বর্ণনা, তেমনি

*শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে রাত্রির রূপ বর্ণনায় ভয়ঙ্করের মধ্যে সুন্দরের আরতিতে যেমন দার্শনিক তত্ত্বের আরোপ হইয়াছে, শরৎসাহিত্যে ইহা অবশ্য খুবই বিরল ঘটনা। 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ী-দিবাকরের আরাকানে পলায়ন-পথে সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে, সেও ভয়ঙ্কর সুন্দরের রূপায়ণ, কিন্তু তাহা এই দুইটি তরুণ তরুণীর হৃদয় রূপায়ণেই অধিকতর সাহায্য করিয়াছে, প্রকৃতি সেখানে সহায়িকা মাত্র। শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তর ব্রহ্মদেশে যাত্রার পথে যে সমুদ্রে ঝড়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য, তাহা আবার প্রকৃতির রূপ বর্ণনার দৃশ্য, দার্শনিক তত্ত্বের আরোপ তাহাতে শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের রাত্রির রূপবর্ণনার দার্শনিকতার মত প্রাধান্য পায় নাই।

ইহার ভাব। শ্রীকান্ত এখানে বর্ণনাকারী : "আজ সারা দিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়া ছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙ নয়; হয়ত যে আলো আর এক রমণীর কাছ হইতে একমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বলত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে।"

মানবমনের গভীর বেদনার মুহূর্তে প্রকৃতিতে কিভাবে তাহার ছায়া পড়ে, বেদনার্ত মানুষ কিভাবে প্রকৃতির মধ্যে আপন ব্যথার ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিয়া বিচিত্র এক ধরণের সান্ত্বনা পায়, শরৎসাহিত্য হইতে তাহার তিনটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াই প্রকৃতিপ্রীতি-সংক্রান্ত বর্তমান আলোচনা শেষ করিব। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির সহিত মানবমনের এই যোগসাধন প্রকৃতি-প্রেম ও কবিত্ব-শক্তির সমন্বয় না ঘটিলে হয় না। ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'দত্তা' উপন্যাসের ২১তম পরিচ্ছেদে দয়ালের বাড়ী হইতে নরেন সম্পর্কে বুকভরা অভিমান লইয়া ফিরিবার সময়কার বিজয়ার মনোভাবে শরৎচন্দ্রের এই প্রকৃতি-বোধ চমৎকার ফুটিয়াছে। বর্তমান দৃষ্টান্ত তিনটির দুইটি 'গৃহদাহ' এবং, তৃতীয়টি, 'চরিত্রহীন' হইতে উদ্ধৃত—প্রথম দুইটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কলাশিল্পসম্মত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত, কিন্তু ইহার মাধুর্যের তুলনা হয় না। প্রথম দৃশ্যটি ডিহিরিতে রামবাবুর বাড়ীতে সুরেশের কাছে অচলার আত্মদানের রাত্রির। সেদিন বাহিরে প্রচণ্ড দুর্যোগ, রামবাবুর কাছে আগে দেওয়া মিথ্যা পরিচয় আঁকড়াইয়া থাকিতে সুরেশের সহিত অচলা এক ঘরে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইল। রুদ্ধ ঘরের অভ্যন্তরে সারারাত্রি ধরিয়া সুরেশ ও অচলার মনে যে

ঝড়ের তাণ্ডব চলিতে লাগিল, বাহিরের মত্তপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ রূপায়ণে শরৎচন্দ্র তাহারই সার্থক ছবিটি ধরিয়াছেন : "বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।"

'গৃহদাহ' উপন্যাসেই অচলা-সুরেশের জীবনের আর এক ক্লেদাক্ত রাত্রিকে বাহিরের এই দুর্যোগের সঙ্গে এক করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সুরেশ অচলাকে অসুস্থ মহিম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মোগলসরাই স্টেশনে নামাইয়া লইয়াছে, তারপর ডিহিরির দিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। অচলা আকুল হইয়া মহিমের খোঁজ করিতেছে সুরেশের কাছে, হয়ত বা সুরেশ মহিমকে খুনই করিয়া ফেলিল! এই সময় বাহিরে প্রচণ্ড ঝড জল হইতেছিল, এ যেন অচলার ও সুরেশের মনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রূপের বহিঃপ্রকাশ : "বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড় জল তেমনি ভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিল।"

'চরিত্রহীন'-এর দৃষ্টান্তটি নিম্নরূপ। উপেন্দ্রের অসুখ খুবই বাড়িয়াছে, মৃত্যুর বিলম্ব নাই। হৃদয়বান, রুচিমান, শিক্ষিত, সৎ মানুষটি শান্তভাবে পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সাবিত্রী তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী। তখন মেঘের সময় নয়, আকাশ অকস্মাৎ মেঘে ভরিয়া গেল। বিদায় বেলায় সুন্দরী ধরণীর এই মেঘমেদুর শ্যামল রূপটি দুচোখ ভরিয়া দেখিয়া লইবার জন্য উপেন্দ্রের হৃদয় তৃষিত হইয়া উঠিল। উপেন্দ্র অনুনয় করিলেন সাবিত্রীকে : "মেঘ! আহা অসময়ের মেঘ দিদি, খুলে দে, খুলে দে—একবার দেখে নিই, আর ত দেখতে পাব না।" তারপরেই তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া সাবিত্রী যখন দ্বিধা করিতেছে, সাবিত্রীর বুক দলিত-মথিত করিয়া উপেন্দ্র আকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন : "ভাল চাস্‌ত খুলে দে সাবিত্রী, নইলে বর্ষার দিনে যখন মেঘ উঠবে, তখন কেঁদে কেঁদে মরবি তা বলে যাচ্ছি। আমি আর দেখবার সময় পাব না।"

—এ অনুনয় মরণাপন্ন প্রিয়জনের। শেষ সাধ। সাবিত্রী ভাল করিয়া জানালা খুলিয়া দিল। "সেই খোলা জানালার বাহিরে উপেন্দ্র নির্নিমেষ

চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। আকাশের কোন এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল, তাহারই আলোকচ্ছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া উপেন্দ্রের যেন কিছুতেই আর সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল।"

(শরৎচন্দ্রের হাস্যরস লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, শরৎচন্দ্র যদিও ঘরোয়া এবং প্রসন্ন মেজাজের মানুষ ছিলেন, তবু তাঁহার লেখায় কৌতুক হাস্য বা মুক্ত হাস্যের চেয়ে ব্যঙ্গ বা বক্রহাস্য উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়াছে। উন্নত ধরণের নির্মল শুভ্র কৌতুকহাস্য সৃষ্টিতে লেখকের মানসিক ঔদার্যের সহিত এক ধরণের দার্শনিক নির্লিপ্ততার প্রয়োজন হয়, শরৎচন্দ্রের পক্ষে এই নির্লিপ্ত ভাব রক্ষা করা প্রায়ই সম্ভব হয় নাই। তাঁহার মনে ঔদার্য কম ছিল না, কিন্তু সমাজ-সচেতন, দেশপ্রেমিক সাহিত্যরথী রূপে দুর্নীতি ও হীনতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বারবার রুখিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গের আশ্রয়ে অন্যায়-কারীর মুখোস খুলিয়া দিবার দিকে তাঁহার আপেক্ষিক প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। তিনি সমগ্রভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের সাহায্য বেশি লইয়া-ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে হৃদয়ের তুলনায় তাঁহার বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অধিক সক্রিয় হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের অনেক কাহিনী বিষাদান্ত, এইরূপ কাহিনীতে ভারী আবহাওয়ায় বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় মুক্ত হাস্যের চেয়ে বক্রহাস্যের সুযোগ বেশি। অবশ্য ইহা সত্ত্বেও নির্মল কৌতুকহাস্য শরৎচন্দ্র ফুটান নাই এমন নয় এবং সেক্ষেত্রে হাস্যরসিক হিসাবে তাঁহার মর্যাদাও রসিক পাঠক সমাজে কম নয়। তাঁহার সম্পর্কে যে সব বৈঠকী গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলিতে শরৎচন্দ্রের হাস্যরসিক রূপটি সহজেই চোখে পড়ে, তাঁহার চিঠিপত্রেও এই রসিক মানুষটির সন্ধান দুষ্প্রাপ্য নয়। কাহাকেও আঘাত না করিয়া আনন্দ পরিবেশনই মুক্তহাস্যের উদ্দেশ্য। সামাজিক কথাসাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে সমাজের সমস্যা আঁকিতে ইহার গ্লানি কদর্যতা তাঁহাকে উন্মোচিত করিতে হইয়াছে, এইসব ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় আঘাতমূলক ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যে নির্মল কৌতুকবোধ ছিল সেকথা ভুলিবার নয়। শরৎচন্দ্রের মুক্তহাস্য

রসিক রূপটি প্রথমে দেখা যাক, পরে তাঁহার বক্রহাস্যের কথা আলোচিত হইবে।

যে কথার জের টানিলে পরিস্থিতি গুরুতর হইতে পারিত, শরৎচন্দ্র রসালাপ করিয়া কিভাবে তাহা তরল করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছেন, গোপাল-চন্দ্র রায় তাঁহার শরৎজীবনী 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩৪) তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে একদিন একজন বন্ধু শরৎচন্দ্রকে বলিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে যাহাদের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহাদের একজন। কথাটা আশঙ্কার এবং রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব হইলে শরৎচন্দ্রের ক্ষুব্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্র হালকাভাবে লইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিলেন: "কবি এই বলে আমার কি করবেন শুনি? আমি তাঁর যে ক্ষতি করে দিয়েছি তার তুলনায় এ কিছুই না।"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিলে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, গিরিজা বোসের সহিত তিনি কবির আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

"তাতে আর কি হবে?"—কেহই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন না।

"—সে তোমরা আর কি বুঝবে?"—শরৎচন্দ্র ব্যাখ্যা করিলেন: "যাঁর ক্ষতি হবে তিনিই জানতে পারবেন। জানতো গিরিজা বোস চিরকাল গল্পে লোক। তার ওপর কবিতা লেখার রোগ আছে। এখন দুবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, আর গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব তো জানই, নিজের অসুবিধা হলেও লোককে মুখের ওপর কথা বলে তাড়িয়ে দিতে পারেন না। গিরিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার এই ফল হ'ল যে, গিরিজা অনবরত রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না।"

শরৎচন্দ্র এমন ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে উপস্থিত সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, ফলে ইতিপূর্বের ভারী আবহাওয়া একেবারে চলিয়া গেল।

শরৎচন্দ্র ঘরোয়া বৈঠকে ও চিঠিপত্রে হাস্য-পরিহাসে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। অবশ্য এইরূপ চিঠি লেখার বা আড্ডার উপযুক্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

জগৎ তাঁহার বহু প্রসারিত ছিল না, বলিতে গেলে বাছাই কিছু লোকের মধ্যেই তাহা সীমায়িত ছিল। সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের এইরূপ এক অসমবয়সী প্রীতিভাজন বন্ধু। দিলীপকুমার রায় তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে থাকেন। স্নেহাস্পদ দিলীপকুমারের এই সন্ন্যাসী হওয়াটা শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। ব্যাপারটি ধর্মসংক্রান্ত, কাজেই সরাসরি প্রতিবাদ করাও মুস্কিল, অথচ প্রতিবাদ একটু না জানাইলে মন বোঝে না। শরৎচন্দ্র তাই হাস্যরসের আশ্রয় লইয়া এমনভাবে বক্তব্য রাখিলেন যাহাতে কাহারও মনে আঘাত না লাগে, অথচ দিলীপকুমার তাহা বুঝিতে পারেন। ১৩.৬।১৯২৯ তারিখে সামতাবেড়, পাণিত্রাস হইতে দিলীপকুমারকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চমৎকার চিঠিখানি নিম্নরূপ: "মণ্টু (দিলীপকুমারের ডাকনাম),—তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চ'লে আসবে। আবার না হয় দিনকতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও-অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী··দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাকলে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আসচো লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটা কথা। বারীণ শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে ব'লে এটা সে কর্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিনকতক তার 'আন্দামানের বাঁশী'র খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং, এ-বই যে এতদিন পড়োনি এই বলে মাঝে মাঝে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হলেই 'বিভূতিটা' হস্তগত ক'রে নিতে পারবে। উত্তর ভারত বেড়াবার সময় এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

...অনেক কাল তোমায় দেখিনি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান

শোনবার সাধ হয়। কবে আসবে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ —... শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মন্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিছু মজা নেই। কবে আসবে লিখো।"
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭)।

এই দিলীপকুমার রায় এবং কাশীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লইয়া শরৎচন্দ্র একবার দিল্লীতে কংগ্রেসের সভা সারিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন ভ্রমণের কাহিনীটি অপূর্ব হাস্যরসে নিষিক্ত করিয়া তিনি পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বৃন্দাবনে তাঁহার কষ্টই হইয়াছিল। কিন্তু সে কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া তিনি হাল্কাভাবে কাহিনীটি পরিবেশন করিয়া সকলকে অনাবিল আনন্দ দান করিয়াছেন। 'শরৎসাহিত্যসংগ্রহ' দশম সম্ভারে 'দিন কয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী' শীর্ষক রচনায় শরৎচন্দ্রের বৃন্দাবন ভ্রমণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেই নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি উপস্থাপিত হইল :

"মথুরা ষ্টেশনে নামিতে সমস্ত জিনিষ ভিজিয়া গেল, এবং বৃন্দাবনের ছোট গাড়ীতে যখন উঠিলাম তখন টিকিট কেনা হইল না। আধ ঘণ্টা পরে সাধের বৃন্দাবনে নামিয়া গাড়ী পাওয়া গেল না, কুলিরা অত্যধিক দাবী করিল, টিকিট মাষ্টার জরিমানা আদায় করিলেন, একগুণ মোটঘাট ভিজিয়া চতুর্গুণ ভারি হইয়া উঠিল এবং পায়ের জুতা হাতে করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ক্লান্ত দেহে যখন সেবাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল তখন সন্ধ্যা হয় হয়; এবং ওয়াকিবহাল এক ব্যক্তিকে আশ্রমের সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় সে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিল যে, সে একটা জঙ্গলের মধ্যে ব্যাপার, তথায় যাইবার কোন নির্দিষ্ট রাস্তা নাই এবং দূরত্ব যেমন করিয়া হউক ক্রোশ দুয়ের কম নয়। মধু কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল এবং আমার বাহন ভোলা প্রায় হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু উপায় কি? জলের মধ্যে এই পথের ধারেও ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, কোথাও ত যাওয়া চাই, অতএব চলিতেই হইল। বৃষ্টি থামার নাম নাই, প্রভূত রজ ছিটকাইয়া মাথায় উঠিয়াছে, শ্রীকণ্টকে পদতল ক্ষত-বিক্ষত, রাত্রি সমাগত-প্রায়; এমনি অবস্থায় দেখা গেল, শ্রীমান সুরেশচন্দ্র একটা চালার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে।

…সুরেশ ছেলেটির বয়স কম, কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে সংসার দুঃখময়, এখানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবার অধিক অবকাশ নাই। সে গম্ভীর ও সংক্ষেপে সংবাদ দিল যে, বৃন্দাবন কলেরায় প্রায় উজাড় হইয়াছে এবং যে দু চারজন অবশিষ্ট আছে তাহারা ডেঙ্গুতে শয্যাগত। কাল সে সেবাশ্রমেই ছিল, সেখানে বামুন নাই, চাকর পলাইয়াছে, ব্রহ্মচারীরা সব জ্বরে মর মর। গোটা সাতেক কুকুর আছে, একটার ল্যাজে ঘা, একটা মস্ত রামছাগল আছে তার নাম রামভকৎ, সে রাজ্যশুদ্ধ লোককে গুঁতাইয়া বেড়ায়।… যথাকালে সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অধ্যক্ষ স্বামীজী বেদানন্দ আমাদের সানন্দে ও সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গরম চা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কারণ চাকর না থাকিলেও একজন নূতন দাসী আসিয়াছে। বামুন ঠাকুর কি একটা অছিলায় দিন-দুই পলাতক ছিল, সেও ভাগ্যক্রমে আজ বিকালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। সাতটা কুকুরের কথা ঠিক। একটার ল্যাজেও ঘা আছে বটে। রামভকৎ গুঁতায় সত্য, কিন্তু সে কেবল মেয়েদের—পুরুষদের সহিত তাহার খুব ভাব। সুতরাং আমাদের আশঙ্কা নাই। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী পুরানো ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, কাল তিনি পথ্য পাইবেন। একজন বৈষ্ণবী নব-পরিক্রমা হইতে ফিরিবার পথে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল, দিন-দুই হইল তাহার শ্রীবৃন্দাবন লাভ হইয়াছে, এ খবর যথার্থ। সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এ শহরেও ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে, এ সংবাদও মিথ্যা নয়। অতএব শ্রীমান সুরেশকে দোষ দেওয়া যায় না।”

শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক বন্ধু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত চিঠিপত্রে হাস্য-পরিহাস করিতেন। একবার মোটর দুর্ঘটনায় তিনি জখম হন। এই উপলক্ষে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন (১২।১০।১৯২০): “তাহার উপরে আবার একদিন মোটর স্লিপ করায় কোমরেও দারুণ হেঁচকা লাগিয়া আছে। তবে আফিম্ ভরসা। ইহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দিন কাটিবেই কাটিবে।”

(গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে মুক্ত হাস্যের বা নির্মল হাস্যরসের যোজনা করিয়াছেন। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে শ্রীকান্তর দত্তদের বাড়ী কালীপূজা উপলক্ষে মেঘনাদ-বধ থিয়েটার দর্শন এমনি এক কাহিনী। মেঘনাদের কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া

পেন্টুলানের মুঠ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে শুধু তীর ঘুরাইয়া মেঘনাদ লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছে। 'ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অবশেষে তাহাতেই জিৎ। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।'

এই 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বেই ছিনাথ বউরূপীর বা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাস্যময় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহারও পূর্বে আছে পাশের পড়ারত মেজদার শ্রীকান্ত, যতীন প্রভৃতি ভাইদের পড়ার উপর অপূর্ব অভিভাবকত্ব। এই পর্বেই ইন্দ্রনাথের দরজিপাড়ার নতুনদার চমৎকার হাস্যরসাত্মক কাহিনী। এই প্রথম পর্বেই শেষ দিকে শ্রীকান্ত 'সর্বদর্শী' সাধুবাবাকে তুষ্ট করিয়া ধুনির ছাই মাখিয়া ও গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, পিতলের তাগা পরিয়া সাধুজীর তৃতীয় চেলা বনিয়া গিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বে রেঙ্গুনগামী জাহাজে নন্দ-টগরের ঘর-সংসারে এবং তৃতীয় পর্বে মধু ডোমের কন্যার বিবাহ দৃশ্যে চমৎকার হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে।)

'পথের দাবী'র মত রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে শরৎচন্দ্রের এই হাস্যরসের সার্থক সংস্থান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। 'পথের দাবী'র তখন শোচনীয় অবস্থা, শশি আন্তরিক দুঃখিতভাবেই সব্যসাচীকে বলে, নবতারা গেল, সুমিত্রা যাইতেছে, ভারতী যাইবে, সব্যসাচীও যাইবেন, 'পথের দাবী'র এ্যাক্টিভিটি বার্মায় অন্তত শেষ হইয়া গেল, কে আর চালাইবে! কথাটা অত্যন্ত বেদনার, কবির এই উক্তি অবশ্যই সব্যসাচীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী বীর নায়ক কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই যে হার মানিতে পারে না, এই মহান আশ্বাস রাখিয়া শরৎচন্দ্র হাস্যরসের দক্ষিণা বাতাসে নৈরাশ্যের গুমোটভাব কাটাইয়া দিলেন। ডাক্তার শশির অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসে বিচলিত না হইয়া হাসি মুখে বলিলেন, "ওকি কথা কবি? এতকাল এত দেখে শুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট। তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে 'পথের দাবী' শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হ'ল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।"

এই 'পথের দাবী'তেই অপূর্ব ভামোতে চার স্বাধীনা কন্যার চার ভিন্ন দেশীয় জামাতার শ্বশুর এক ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পায়। সেদিন উৎসবের দিন, জামাতারা শ্বশুরালয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া রক্তারক্তি উৎসব উপভোগ করিল।

'শেষ প্রশ্ন'-এর আশুবাবুর নিম্নোক্ত প্রসঙ্গটি নির্মল হাস্যরসের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আশুবাবু মোটা মানুষ। সদাশয়, সদাহাস্যমুখ ভদ্রলোক তিনি। কন্যা মনোরমা ও আগ্রার বন্ধুদের সঙ্গে আশুবাবু তাজমহল দেখিতে গিয়াছেন। তিনি চাহেন মাঠে বসিয়া থাকিতে, তাজমহলে ঢুকিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। মনোরমা পিতাকে একা ফেলিয়া যাইতে চায় না। 'আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন : "ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

'অবিনাশ বলিল, না সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল, লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

'মনোরমা বলিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

'অবিনাশ বলিলেন, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে একথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হোতো না।"*

মানুষের আচার-আচরণের আপাত অসঙ্গতির মধ্যে নির্মল হাস্যরসের চমৎকার আশ্রয়, যদিনা লেখকের আঘাত করিবার আকাঙ্ক্ষা সেই অসঙ্গতি চিত্রণে কার্যকরী হয়। লেখকের এই আঘাত করিবার ইচ্ছা পিছনে থাকিলে মুক্তহাস্যকে স্থানচ্যুত করে বক্রহাস্য। বক্রহাস্যে বুদ্ধির প্রাধান্য। নির্মল

* 'সতী' গল্পে বিষণ্ণ পরিবেশে গম্ভীর ভাবের সঙ্গে হালকাভাব মিশাইয়া শরৎচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। সতী নির্মলা স্বামীর প্রতি মিথ্যা সন্দেহে বিষ খাইয়াছিল, তাহাকে অতি কষ্টে বাঁচান হইল। স্বামী হরিশের জীবন স্ত্রীর সন্দেহ ও খবরদারীতে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় বৈষ্ণব ভিখারীরা হরিশের বাড়ী আসিয়া শ্রীরাধার প্রতি ব্রজনাথের নিষ্ঠুরতার বার্তা দূতীসংবাদ গাহিতেছিল। এই উপলক্ষে হাস্যরসের ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্র হরিশের সমস্যাটি সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল করিয়া পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন : "সে (হরিশ) ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো দূতি, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝবে না—বললেও না। আমিও জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশো বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হয়নি। কংস-টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম।"

হাস্যরসের সৃষ্টি চরিত্রের অসঙ্গতির সাহায্য না লইয়াও করা যায়, তবে অসঙ্গতির সাহায্য লইলে এই সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। বাক্‌চাতুর্যে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কৃতিত্বের অধিকারী নন, তবে তিনিও মাঝে মাঝে বর্ণনা প্রসঙ্গে অথবা সব্যসাচী-শ্রীকান্ত বজ্রানন্দের মত কয়েকটি চরিত্রের উক্তির সাহায্যে কৌতুকহাস্যের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন।* কিন্তু

---

*ইতিপূর্বে 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে নন্দ মিস্ত্রীর অনুসন্ধানী শ্রীকান্তকে রেঙ্গুনের হরিপদ মিস্ত্রীর মিস্ত্রী হওয়া কিরূপ কঠিন এবং তাহার নিজের মিস্ত্রীত্বে কিরূপ কৃতিত্ব সে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সুন্দর হাস্যরসের নিদর্শন। এমনি আর এক নিদর্শন এই ২য় পর্বেই রেঙ্গুনের জাহাজে শ্রীকান্ত বর্ণিত নন্দ মিস্তিরীর 'জাত বোষ্টম' সঙ্গিনী টগরের সঙ্গে কথোপকথন, যে টগর বিশ বছর এক সঙ্গে ঘর করিয়াও ছোট জাত (কৈবর্ত) বলিয়া তাহার মানুষ নন্দকে হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় নাই। টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছে: "হলোই বা বিশ বছর। পোড়া কপাল। জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি, হলুম কৈবর্তের পরিবার। কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি! সে কথা কারও বলবার জো নেই। টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাত জন্ম খোয়াবে না—তা জানো?" 'চরিত্রহীন'-এ সতীশ প্রসঙ্গে গ্রাম্য কম্পাউণ্ডার এককড়ি উপেন্দ্রকে যে কথা বলিয়াছে, তাহাও উপরোক্ত হরিপদ মিস্তিরীর উক্তির মত হাস্যরসাত্মক: "দিন রাত থাকো বাবার সঙ্গে মদ আর মদ, গাঁজা আর গাঁজা। কি না কালী-সিদ্ধ হচ্চে। ওসব কি আমরা ডাক্তারেরা বিশ্বাস করি মশায়? আমরা সায়েন্টিফিক মেন। কিন্তু গিন্নিমা এসেই থাকো বাবার বাবাজিত্ব বের করে দিলেন—টান মেরে ত্রিশুল-ফ্রিশুল ফেলে দিয়ে দূর করে দিলেন। ব্যাটা দিন কতক কি কর্মকাণ্ডই করলো।" 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের ৫ম পরিচ্ছেদে মধু ডোমের কন্যার সহিত ভগবতী ডোমের পুত্রের বিবাহ দৃশ্যটিও এইরূপ উপভোগ্য। কন্যাপক্ষের পুরোহিত দুর্বল ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিত, বরপক্ষের পুরোহিত প্রবল ও স্থূলকায় শিবু পণ্ডিত বিবাহ দিতেছে,—দুজনেই অব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারা পুরোহিত, কারণ ডোমেদের বিয়ে-শ্রাদ্ধ দশকর্ম করায়। শিবু পণ্ডিতের প্রচণ্ড দাপটে রাখাল পণ্ডিতের ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবিয়া গেল, রাখাল বরকে মন্ত্র পড়াইয়াছিল: "মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।" শিবুর নির্দিষ্ট মন্ত্র

অসঙ্গতির সাহায্যে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব তাঁহার 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ, 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর গোকুল, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ প্রভৃতি আত্মভোলা চরিত্রগুলিতে বুঝা যাইবে। সারল্য ও সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি করিয়াই তিনি গিরিশকে আঁকিয়াছেন। গিরিশ রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃষ্টি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠকে মনে করাইয়া দেয়।

(কৌতুক হাস্য শরৎসাহিত্যে অনেক স্থানে থাকিলেও এই হাস্যরস সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র উচ্চাঙ্গের কৌতুক হাস্যও সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই শ্রেণীর অধিকাংশ সৃষ্টির মানই মাঝামাঝি ধরণের। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ-যোগ্য যে, কোন কোন স্থলে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কৌতুক হাস্য নিতান্ত মামুলি ধরণের, বা বলিতে গেলে, নিম্ন শ্রেণীর হইয়াছে। এই ত্রুটির দৃষ্টান্ত হিসাবে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে শ্রীকান্তর সাধু হইবার পূর্বাহ্ণে 'শ্রীকান্ত'র সাধুবাবার সহিত কথোপকথনের উল্লেখ করা যায়। সাধু-সন্ন্যাসী জীবনের কাঠিন্যের বা সাধনার দুর্গম পথে শ্রীকান্তকে আসিতে নিরুৎসাহ করায় শ্রীকান্ত করুণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিয়াছে: "বাবা, মহাভারতে লেখা আছে জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তি পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।"—বলা বাহুল্য, এখানে শ্রীকান্তর ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে তো বটেই, কৌতুক হিসাবেও, এরূপ উক্তি সমর্থনীয় নয়।*

শেষ পর্যন্ত পরাজিত রাখাল বরকে আবৃত্তি করাইতে বাধ্য হইল: "মধু তোমায় কন্যায় ভুজ্য পত্রং নমঃ।" এবং সভায় উপস্থিত উভয় পক্ষের ত্রিশ-ত্রিশ ষাট জনের মত লোক এক বাক্যে স্বীকার করিল যে শিবু একজন শাস্তর-জানা লোক বটে। মন্তর পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত এতকাল তাহাদের কেবল ঠকাইয়াই খাইতেছিল।"

* সামতাবেড়, পাণিত্রাস হইতে ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৩ তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক পত্রে সারল্য ও অন্তরঙ্গতায় ভরপুর হইলেও শরৎচন্দ্র এমনি মামুলি হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন: "মণ্টুরাম,—তোমার বই এবং ছোট্ট চিঠিখানা পেলাম। কাল দিনে-রেতে বইখানা পড়ে শেষ করলাম। চমৎকার লাগলো। তবে দু-একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হলাম। তবে

শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও এমনভাবে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন যাহা মুক্তহাস্য ও বক্রহাস্যের মাঝামাঝি স্তরে পড়ে। ইহাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ আছে, কিন্তু কি অন্যায়কারীকে, কি অন্যায়-সমর্থককে—কাহাকেও ইহাতে বিশেষ আঘাত করা হয় নাই। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব হইতে এমনি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়। গহর আত্মভোলা গ্রাম্য কবি, জাতিতে সে মুসলমান, সীতাহরণের উপর সে কাব্য লিখিয়াছে, গ্রামের সংসার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নয়ন চক্রবর্তী তাহা শুনিতে আসে। অপহৃতা সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে পুষ্পকরথে লঙ্কায় চলিয়াছে, রামচন্দ্র যাহাতে তাহার যাত্রা-পথের নিশানা পায় তজ্জন্য সীতা আপন গহনা খুলিয়া খুলিয়া পথের উপর ফেলিয়া দিতেছে। এই কাব্য শুনিয়া নয়ন চক্রবর্তী গদগদ হইয়া গহরকে বলে: "বাবা তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।" গহর খুবই খুশি হয়; তাহার পিতা নয়নের যে পুকুর-ভিটা দেনার দায়ে নিলাম করাইয়া লইয়াছিলেন, গহর নয়নকে ফিরাইয়া দেয়। তাহার আম-বাগানের আম খায় নয়ন চক্রবর্তীর ছেলে মেয়ে, গহর বাগান জমা দেয় না। শ্রীকান্ত বন্ধু গহরের এই বদান্যতায় কটাক্ষ করে। ইহা তাহার মতে দান নয়, রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কেদার কর্তৃক প্রতারিত বৈকুণ্ঠের বোকামির মতই ইহা বোকামি। শ্রীকান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বগতোক্তি করে: "বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ লইতে পারে হানি কি? তাছাড়া গহর কবি। কবি মানুষের অত বিষয় সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে।"*

নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতঃই হয়ে গেছে; এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম তুমি যে শুধরে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই।"

* শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মকে ভালবাসিতেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের বাড়াবাড়ি তাঁহার ভাল লাগিত না। একথা 'ধর্ম-চেতনা' পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। একবার তাঁহার এক মামার এই ধরণের দুর্বলতা লইয়া শরৎচন্দ্র আঘাতের মনোভাবহীন চমৎকার হাস্যরসের অবতারণা করেন। শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন: "একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়াছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরিতে প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। স্টীমার থেকে গঙ্গার

এতক্ষণ নির্মল হাস্যরসের কথা হইল, এইবার বক্রহাস্যের কথায় আসা যাক।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের একদল সাহিত্যিক (ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ) সাহিত্যের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে জেহাদ শুরু করিয়াছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সাহিত্য-ধর্ম' প্রবন্ধ লিখিয়া তার বিরোধিতা করেন। কবিগুরুর মতে এইসব তরুণ সাহিত্যিকের প্রতিভা থাকিলেও ইহারা বিলাতী সাহিত্য-রসে বিমুগ্ধ হইয়া বিলাতী কারি পাউডারে ভারতীয় খানা বানাইতে চান, অর্থাৎ ইহারা বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে মেলে না এমন বিলাতী জীবনরূপ বাংলা সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিগুরুর এই মত সমর্থন করেন নাই, তিনি নিন্দিত তরুণ সাহিত্যিকদেরই পক্ষ লইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ইহাদের যৌনমনস্কতার বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেন না, তবে বাস্তব জীবন অঙ্কনে ইহারা সাহসের সহিত যে চেষ্টা করিতেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেন। এই সময় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী নামে এক শিক্ষিত ব্যক্তি নীতিবোধের উপর জোর দিয়া উপরোল্লিখিত তরুণ সাহিত্যিকদের বিরোধিতা করিলেন। পণ্ডিতদের এই গুরুতর বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটির আসরে শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাবানুযায়ী অনেকটা পাশ কাটাইয়াই থাকিতেন, কিন্তু তরুণদের প্রতি তাঁহার অন্তরের যে সহানুভূতি ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে নীরব থাকিতে দিল না। অবশেষে তিনি আত্মপ্রকাশের সুযোগ নিলেন বক্র হাস্যের আবরণে। ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪ তারিখে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদককে তিনি এ সম্পর্কে যে চিঠি লেখেন, তাহা 'শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ'-এর ৯ম সম্ভারে 'রস সেবায়েত' নামক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত

তীরে নেমেই মামা আঃ করে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত মুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হল ?

বড্ড কাঁচা শ্রী-গু মাড়িয়ে ফেলেছি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না।"

হইয়াছে। প্রবন্ধটির একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাসহ সাহিত্যের সামগ্রী সম্পর্কে তাঁহার অভিমত অনেকটা বুঝা যাইবে :

'রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশ দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য—তেমনি যুক্তি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যাস্, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দী লইয়া এত লাঠি ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী মহাশয় সীমানা বিচারের রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাস বুনানী বিশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত। বাপরে বাপ! মানুষ এত পড়েই বা কখন, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!

ইহার পার্শ্বে লাল শালু-মণ্ডিত বংশ খণ্ড নির্মিত ক্রীড়া-গাণ্ডীব-ধারী নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন।..নরেশ বাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি যেন যুক্ত হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।"*

*অবশ্য দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচীর লেখার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এরূপ কটাক্ষ প্রকাশ করিলেও এবং তিনি নিজে এরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ সাধারণভাবে পছন্দ না করিলেও তাঁহার অন্ততঃ একটি লেখায় এই পাণ্ডিত্য প্রকাশে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এটি তাঁহার বিখ্যাত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ। 'নারীর মূল্য'তে এই পাণ্ডিত্য আবার পল্লব-গ্রাহিতা দোষ-দুষ্ট কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, কারণ শরৎচন্দ্রের এই শ্রেণীর রচনা নাই বলিলে চলে এবং সাধারণভাবে সকল পাঠকের জন্য সহজ সরল করিয়া লিখিবারই তিনি প্রবণতা দেখাইয়াছেন। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উদ্ধৃত কয়টি পংক্তিতেই কথাটা বুঝা যাইবে :

দেশকর্মী ও সামাজিক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন দেশ বা সমাজের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন স্বভাবতই অন্যায় ও দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁহার মনের তীব্র বিক্ষোভ নানাভাবে লেখায় প্রকাশ পাইত। এই মনোবেদনা প্রকাশে তিনি ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতিরও সাহায্য লইয়াছেন। অন্যায় যাহারা করে, পাপ ও প্রবঞ্চনা যাহাদের আশ্রয়, তাহারা জাগতিক অর্থে দুর্বল বা অশক্ত নয় এবং সাংসারিক জটিল বুদ্ধি তাহাদের যথেষ্ট। তাহারা জানে বাধা কোথা হইতে আসে, প্রতিবাদ কোথায় ধ্বনিত হইতে পারে, পূর্বাহ্ণে সময় থাকিতে তাহারা সেই বাধা বা প্রতিবাদ প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহারা উপদেশে কর্ণপাত করে না, নীতিবাক্য ইহাদের কাছে মূল্যহীন। ইহারা স্বীকার করে শুধু আঘাতকে, ভয় করে শুধু আঘাতকেই। অথচ শক্তি-ব্যূহের মধ্যে সতর্কভাবে আত্মরক্ষা করে বলিয়া ইহাদের সরাসরি আঘাত করা খুবই কঠিন। শরৎচন্দ্র ইহাদের পতন কামনা করিতেন, শোষণ অনাচার ও হীনতার হাত হইতে দেশ অথবা সমাজ রক্ষা করিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। কিন্তু সরাসরি ইহাদের আঘাত করিবার মত পরিবেশের আনুকূল্য তিনি পান নাই বলিয়া জীবনশিল্পী হিসাবে কষ্টকল্পনা করিয়া সে পথে তিনি বড় একটা যান নাই। পক্ষান্তরে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী অসত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া ও সত্যকে অভ্যর্থনা জানাইয়া তিনি এ হিসাবে পাঠক সমাজকে

"ভগবান শঙ্করাচার্য স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evils, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইউরোপ প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, Thou art the devil's gate, the betrayer of the true, the first deserter of the divine law. ধর্মযাজক সেণ্ট অগাস্টিন, যিনি সেণ্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it is in the person of mother or sister ; we have to be beware of the Eve in every woman. সেণ্ট আমব্রোস—ইনিও সেণ্ট, তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body, not a part of his soul to make her."

সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। নিজের দিক হইতে তিনি অনাচারীর মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে যে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন, পাঠক মনে প্রতিক্রিয়ার নিরিখে তাহার ফলও অবশ্যই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মুক্ত হাস্যরস বা হিউমার আনন্দ-বিধায়ক, শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ বা বক্রহাস্য দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্দীপনা সৃষ্টির হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের কত শক্তি তাহা যাঁহারা 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীর তথা লেখক শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক উক্তিগুলি অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। সেদিন সব্যসাচী অপূর্বর রেঙ্গুন ত্যাগের পর বিষণ্ণা ভারতীকে নিজের নৌকায় তুলিয়া লইয়া ইরাবতী তীরে তাঁহার গুপ্ত বাসস্থানে চলিয়াছেন। এইখানে গ্রন্থে আছে, "এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী' আন্দোলন ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিতেছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধার কল্পে আইন বাঁচাইয়া যে সব জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত।" নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতাহীন সংকীর্ণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ লেখক শরৎচন্দ্রের এই ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের পরই সব্যসাচী বলিয়াছেন: "আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোনদিন কোন কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চুরাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরেজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনি প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব একে সওয়া দু হাত করে দেওয়া হোক।"

শরৎচন্দ্র নিজে স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক ছিলেন, স্বাধীনতা মানেই পূর্ণ স্বাধীনতা, বিদেশী রাজশক্তির পীড়ন হইতে পূর্ণ মুক্তি, ইহাই তিনি বুঝিতেন। এজন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরমপন্থী মনোভাব তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার 'পথের দাবী'র নায়ক খণ্ডিত স্বাধীনতা কামনার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসের শেষ দিকের ঘটনা। অপূর্ব সংবাদপত্র হইতে এক সংবাদ শুনাইল, ভারত-গভর্ণমেণ্ট শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার করিতে

প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সব্যসাচী এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। উদ্বেগ দেশের নেতাদের জন্য, যদি তাঁহারা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করিয়া বসেন! ক্ষুব্ধস্বরে তিনি ভারতীকে যে কথাগুলি বলিলেন, ব্যঙ্গের আড়ালে স্বাধীনতা-কামী সর্বস্ব ত্যাগে স্বীকৃত সৈনিকের তাহা অন্তরের বাণী। সব্যসাচী ভারতীকে বলিলেন: "ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল কতটুকু মেকি—কি পেলে শশির ধাপ্পাবাজী হয় না, এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে: বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি, আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দে মাতরমের দিব্বি ক'রে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়! এ যে কি প্রার্থনা এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত।"

'পথের দাবী'র আর এক জায়গায় সব্যসাচী ভারতীকে লইয়া শশিকবির বাড়ি যাইতেছেন। পথে ডোবা, লতাগুল্ম, ভাঁটা গাছের জঙ্গল। ভারতী এখানে সপের ভয়ের কথা তুলিল। বিপ্লবী সব্যসাচীর কাছে সাপের কামড়ের মত বিপদ তুচ্ছ; তিনি ভারতশাসক ইংরেজকে যতখানি বিরূপতার চোখে দেখেন, সাপকে ততটা দেখেন না। এই ইংরেজ সাপের চেয়ে ক্রুর, ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখের হাসিটি বজায় রাখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন: "সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।"

শিল্পকলার হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটির একটু গুরুত্ব আছে। এখানে সমাজকর্মী শরৎচন্দ্র শিল্পী শরৎচন্দ্রকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়াছেন। গল্প শেষ হইয়া যাইবার পরও এই গল্পের শেষে প্রাবন্ধিকের মত শরৎচন্দ্র বিবাহ সম্বন্ধে, ভালবাসা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখক শরৎচন্দ্রের মতামতের ভারে

গল্পটি সত্যই ভারগ্রস্ত।* আপন অভিমত প্রকাশের সুযোগ হিসাবে শরৎচন্দ্র এই গল্পে ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতিরও আশ্রয় লইয়াছেন। হিন্দু-সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষার নামে গ্রামের অনেকের সঙ্গে সঙ্গে বক্তা 'আমি' চরিত্রটিও সাপুড়ে মালো কন্যা বিলাসীকে কায়স্থ সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী হইতে তাড়াইতে গিয়াছিল। সকলে মিলিয়া মেয়েটিকে মারধর করিতে লাগিল। এইখানে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন: "সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অতবড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষু লজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহার গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়—তা সে নর নারী যাই হোক্ না কেন।"

'বিলাসী'তে এই পীড়ন-পর্বের পর আবার আছে: "আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইবেন। এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা —এ ত একটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা। কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁটার

*অবশ্য গল্পটির পাদটীকায় বলা হইয়াছে ইহা "জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল। তাহার আসল নামটা জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাক নামটা না হয় ধরুন ন্যাড়া।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্রের নিজের ডাক নাম ছিল ন্যাড়া, এবং এ হিসেবে এই বক্তব্য-প্রধান গল্পটির কথকের নাম 'ন্যাড়া' হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য থাকিতে পারে।

মাংস নয়—ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক এত সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যে সব ছেলের পেটে তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!"

শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এ এক জায়গায় আছে সমাজকর্মী ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অমরনাথ আসিয়াছে জমিদার রে সাহেবের (রাধানাথ রায়ের) বাড়ীতে। আলেখ্য 'রে' সাহেবের আধুনিকা কন্যা, সে ঠাট্টা করিয়া পিতাকে একটু লুকাইয়া অমরনাথের বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য করিতে বলিল, কারণ জমিদারের দেবদ্বিজে ভক্তি রাষ্ট্র হইয়া গেলে বিপদ আছে।

মিঃ রে সরল মানুষ। কন্যার কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "বিপদ হবে?"

এবার অমরনাথের ফিরাইয়া দিবার পালা। বিলাস-বহুল জমিদারত্বের উপর শরৎচন্দ্রের বিতৃষ্ণা এবার অমরনাথের ব্যঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। উচ্চহাস্য করিয়া অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন: "বিপদ হবে না,—আপনি ভয় পাবেন না। ড্রেসিং টেব্‌ল আর কাঁটা চামচে ডিসের নীচে সমস্ত চাপা পড়ে যাবে।"

'দেনাপাওনা'র জনার্দন রায় ঘুঘু ব্যক্তি, অসাধারণ বিষয়ী লোক। স্বার্থপরতা ও হীনতায় তিনি গ্রামের দরিদ্র মানুষের বিভীষিকা। বাহিরে কিন্তু জনার্দন ধার্মিক সাজিয়া থাকে। এই হীন মানুষটি অন্তরে অন্তরে যে কত দুর্বল, কত ভীরু, শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া জনার্দন রায়ের সে ছদ্মবেশ খুলিয়া দিয়াছেন। প্রজারা নালিশ করিয়াছে, জমিদার জীবানন্দকে সে কথা জানাইতে হইবে। জনার্দন গোমস্তা এককড়িকে বলিয়াছিলেন, এককড়ি হুজুরকে জানায় নাই। অগত্যা জনার্দনকেই জমিদার সমীপে গিয়া ঘটনা জানাইতে হইবে। খেয়ালী, দুর্দান্ত, দুশ্চরিত্র জমিদারের কাছে যাইতে হইবে, কি দুর্গতি কপালে আছে কে জানে! কিন্তু না যাইয়াও উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত জনার্দন নিজে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এখানে জনার্দন রায়ের ব্যঙ্গাশ্রিত চিত্রটি নিম্নরূপ: "সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রী৺চণ্ডী মাতার নাম লাল

কালি দিয়া কাগজের উপর লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি, টিকটিকি, শূন্য কুম্ভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।*

'সতী' গল্পে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক লিপিকুশলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'সতী' নামকরণের মধ্যেই এই ব্যঙ্গের সুর নিহিত। নির্মলার কঠিন সতীত্ব স্বামীর কাছে কাম্য নয়, জুলুম। প্রথম যৌবনে স্বামী হরিশ চিত্তের দুর্বলতায় ব্রাহ্ম-কন্যা লাবণ্যকে ভালবাসিয়াও পিতৃ ইচ্ছা পালনের জন্য নির্মলাকে বিবাহ করিয়া প্রেমের অমর্যাদা করিয়াছিল, তাহার ট্র্যাজেডি লইয়াই গল্প। লাবণ্যের পিতা হরকুমারবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, মানুষ হিসাবে তাঁহার মহত্ত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দুয়ানীর দাপটে হরিশের পিতা রায়বাহাদুর রামমোহনবাবু তাহা নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। হরিশের

---

*নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনীতেও ব্যক্তিগত হীনতার প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন। 'বড়দিদি' উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথের সপত্নীপুত্র-বিদ্বেষিণী বিমাতাকে ধিক্কৃত করিতে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন: "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর পূর্ব হইতেই তাহাকে (সুরেন্দ্রনাথকে) সমগ্র রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত। আহা, সপত্নী-পুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে। পাড়া প্রতিবাসীরা এক মুখে রায় গৃহিণীর সুখ্যাতি করিয়া উঠিতে পারে না!

সুরেন্দ্রের প্রতি তাহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না—তিরস্কার লাঞ্ছনার পর মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছলছল করিত, রায় গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্ব লক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া তিনদিনের জন্য সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার সখ এবং বাবুয়ানা করিবার ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রনাথের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।"

বিবাহ প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়া শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া হরিশের দুর্বলতা ও তাহার পিতার হীনতার প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। হরিশ ব্রাহ্মকন্যা লাবণ্যকে ভালবাসে একথা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াই রামমোহনবাবু পুত্রের বিবাহ দিনাজপুরের এক নিষ্ঠাবান হিন্দুর কন্যা নির্মলার সঙ্গে স্থির করিয়া আসিলেন। তিনি জোর গলায় ঘোষণা করিলেন, "মেয়ে ডানা কাটা পরী না হোক ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।" ইহার পরই এই হিন্দুয়ানীর সংস্কারের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গের তীর। তিনি প্রথমে হরিশকে তাহার ভীরুতার জন্য এবং পরে হরিশের পিতা রামমোহনবাবুকে তাহার সহনশীলতাহীন উগ্র হিন্দুয়ানীর জন্য আঘাত করিলেন। গল্পে এইখানে আছে :

"খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশ শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া, কিছু না জুটে টিউশনি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন এবং আশীর্বাদের কাজটাও এইসঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে রায় বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন এবং ইংরাজী-শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ কীর্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাকে হাজার টাকার মাহিনার চাকুরী দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোন গুণ নাই। আজকাল দিনক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজী না পড়াইলে চলে না। যে মূর্খ এই ম্লেচ্ছ-বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ-সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।"

শেষ পংক্তিটির লক্ষ্য নিরীহ হরকুমারবাবু, তাহা না বলিলেও চলিবে। বলা বাহুল্য, নিতান্ত অনবধানী পাঠকও আচারগত হিন্দুয়ানীর সংস্কারের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ-সূচক ব্যঙ্গরস উপরের উদ্ধৃতিটিতে উপলব্ধি করিবে।

উপন্যাস : গল্প : নাটক

এইবার মোটামুটি শিল্পরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, ছোটগল্প এবং তাঁহার নিজের দেওয়া স্বীয় উপন্যাসের নাট্যরূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইতেছে। উপন্যাসগুলির নাম উল্লেখের সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশের সময় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শরৎ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবনে কিছুটা সুবিধা হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই সময়ের তালিকা হইতে শরৎচন্দ্রের লেখার কালানুক্রমিক হিসাব মিলে না। ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনের নিম্নোক্ত কথাগুলি এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য :—"প্রকাশের তারিখ হইতে শরৎচন্দ্রের গল্প এবং উপন্যাসের রচনা কালের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা চলে না। পূর্বেকার অনেক লেখা পরে প্রকাশ করা হইয়াছে। রচনারীতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহা ধরা পড়ে।"—(বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮১।) অবশ্য এখানে আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ কোন কোন লেখার প্রকৃত রচনা-কালেরও হদিশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

'বড়দিদি' শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১৩২০ সাল) ইহা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহারও ছয় বৎসর পূর্বে ১৩১৪ সালের বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় 'বড়দিদি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বড়দিদি' শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা। শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের পর জীবিকার্জনের আশায় রেঙ্গুন যান, তৎপূর্বে অনেকগুলি গল্প উপন্যাস লিখিয়া তিনি তিনখানি খাতা পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই খাতাগুলি 'বাগান' খাতা নামে বিখ্যাত। 'বড়দিদি' 'বাগান খাতা'র অন্যতম রচনা।* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই রেঙ্গুন যাত্রার পূর্বেকার

---

* 'বাগান খাতা'য় 'বড়দিদি' নাম ছিল না, নাম ছিল 'শিশু'। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি অনুযায়ীই এই নামকরণ হয়। পরে সম্ভবত

লেখাগুলিকেই শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের লেখা বলা চলে, রেঙ্গুনে তিনি যাহা লেখেন তাহার মধ্যে রামের সুমতি' গল্পটিই প্রথম ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কাজেই তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় রচনার মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান ছিল।

'বড়দিদি' যে কাঁচা হাতের লেখা তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। তবে এই উপন্যাসের মধ্যে বড় লেখকের সম্ভাবনারও যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। এত অল্প বয়সের লেখাতেও জটিল মানব মনের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে। আখ্যান-বিন্যাসেও মাঝে মাঝে শক্তির পরিচয় আছে।

'বড়দিদি'তে ভাবোচ্ছ্বাস প্রচুর। উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বাস্তব-অনুভূতি—ইহা পাঠে তেমনভাবে মনে জাগে না। বরং ইহা পড়িয়া ধারণা জন্মে যে, শরৎচন্দ্র যেন কষ্ট-কল্পনা করিয়া ইহার গল্পটি সাজাইয়াছেন। গ্রন্থশেষে সুরেন্দ্রনাথ যেভাবে মাধবীর সহিত মিলিত হইল তাহা বিশেষভাবে অবাস্তব মনে হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা মাধবীর আত্মভোলা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও করুণার। এই স্নেহ-করুণা প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া প্লাবনী রূপ ধরিতে পারে না তাহা নয়, কিন্তু উপন্যাসটিতে যথাযথ আখ্যান-বিন্যাস না করিয়াই সেই প্রেমরূপ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথকে মাধবীদের বাড়ীতে দেখানো হইয়াছে শিশুর মত আপনভোলা করিয়া, মাঝে অনেক দিনের ব্যবধান রাখা হইয়াছে তাহাকে মাধবী-প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শেষে একরূপ হঠাৎ মাধবীর প্রতি অত্যাচার দূর করিবার জন্যই হউক, আর মাধবীর সহিত মিলিত হইবার জন্যই হউক, সুরেন্দ্রনাথ জীবন বাজি ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথকে বিধবা মাধবীর কোলে মাথা রাখিয়া যেভাবে মৃত্যুবরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই চরম ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয়।

অপরিণত রচনার দুর্বলতা 'বড়দিদি'তে স্পষ্ট হইলেও তৎকালীন বাংলা উপন্যাসের অবস্থার হিসাবে এই 'বড়দিদি'ও 'ভারতী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গল্প, আখ্যান, চরিত্র বা ভাষাগত

নারীহৃদয়ের রহস্য-উন্মোচনের স্বাভাবিক প্রবণতায় মাধবী চরিত্রের উপর একটু জোর দিতেই শরৎচন্দ্র উপন্যাসটির 'শিশু' নাম পরিবর্তন করিয়া 'বড়দিদি' রাখেন।

যেটুকু শক্তির পরিচয় ছিল, তাহাতেই অনেকে লেখক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠেন। 'ভারতী'তে প্রকাশের সময় দুই সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই, কেহ কেহ মনে করেন রবীন্দ্রনাথই বুঝি 'বড়দিদি'র লেখক। রবীন্দ্রনাথও 'বড়দিদি'র প্রশংসা করেন।*

'বড়দিদি'র মধ্যে শরৎসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কিছুটা ইঙ্গিত অবশ্যই মিলে। বিধবা নারীর চিত্ত-ক্ষুধার রূপায়ণ শরৎচন্দ্রের প্রিয় বিষয়বস্তু, মাধবীর মধ্যে তাহা দেখানো হইয়াছে। আত্মভোলা বা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় পুরুষের বিপরীতে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা সক্রিয় হইবার যে সুযোগ পায়, সুরেন্দ্রনাথের বিপরীতে মাধবীও সে সুযোগ পাইয়াছে। অসামাজিক প্রেমের পথে শরৎচন্দ্রের প্রেমিকা সমাজের নিকট হইতে বাধা পাক বা নাই পাক, বড় বাধা আসে তাহার নিজের অন্তর হইতে, নিজের স্বামী-সংস্কার বা সমাজ-সংস্কার হইতে, মাধবীর ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য হইয়াছে। কাহিনীর কোমলরূপ এবং ভাষার কমনীয়তা শরৎসাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায়, নিপুণতার কিছুটা অভাব থাকিলেও 'বড়দিদি'তেও উভয় গুণই বর্তমান।

শরৎচন্দ্রের **'বিরাজ বৌ'** ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পুস্তকাকারে

*অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী'তে (প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১-২) 'বড়দিদি' সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "এই লেখাটি প্রকাশিত হ'তে এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে এমনি বিভ্রান্তি ঘটায় যে লেখকের নাম প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বলা যায়, 'ভারতী' সম্পাদিকার ইচ্ছে না থাকলেও নাম প্রকাশ করতে তিনি বাধ্য হন। প্রধান কারণ হচ্ছে এই।—

রবীন্দ্রনাথ তখন 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক। একদিন তাঁর কর্মাধ্যক্ষ তাঁর কাছে এই ব'লে অভিযোগ করেন যে, নিজের কাগজ থাকতে তিনি পরের কাগজে উপন্যাস লিখতে গেছেন কেন? অভিযোগটি শুনে রবীন্দ্রনাথ তো অবাক। এ আবার কি কথা! তখন সমস্ত ব্যাপারটি শুনে তিনি বলেন যে, ও লেখা তাঁর নয়, কিন্তু যাঁরই হোক, লেখাটি অতি চমৎকার।"

প্রকাশিত হয়। এ হিসাবে ইহা শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়-মুদ্রিত উপন্যাস। 'বড়দিদি'র মাত্র এক বৎসর পরে প্রকাশিত হইলেও 'বিরাজ-বৌ'-এর গল্পে এবং আখ্যান-বিন্যাসে বড়দিদির চেয়ে অনেক উঁচুদরের শিল্পকলার সাক্ষাৎ মিলে। ইহার কারণ অবশ্য বড়দিদি সত্যই শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা এবং সে অর্থে প্রথম পর্যায়ের রচনা, 'বিরাজ-বৌ' শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা এবং এই সময় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের হাত অনেকটা পাকিয়াছে। মানুষের সহস্র শুভবুদ্ধি ও শুভেচ্ছা থাকিলেও দৈব শত্রুতা করিলে মানুষ যে কিভাবে নিজেকে বিপন্ন করিয়া ফেলে, রাগের মাথায় মানুষ কত অন্যায় করিয়া শেষ পর্যন্ত অনুশোচনার মর্মদাহে পুড়িয়া মরে, সতী সাধ্বী বিরাজের দুঃখময় জীবন-কাহিনী পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। নীলাম্বর নেশা করিত, কিন্তু তাহার হৃদয়ে উদারতার অভাব ছিল না। স্নেহের বোন হরিমতির (পুঁটির) বড়ঘরে ভাল বিবাহ দিয়া সুখী করিতে নীলাম্বর দেনায় জড়াইয়া পড়িল, তাহার ছোটভাই পীতাম্বর স্বার্থপরতা বশে নিজেকে সে বিপদে জড়াইল না। ফলে নীলাম্বরের সংসারে প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। বিরাজ সতীলক্ষ্মীর মত নীলাম্বরকে সেই অভাবের মধ্যেও সেবা করিতে প্রাণপণ করে, কিন্তু পীতাম্বরের হীনতায় এবং নীলাম্বরের অভাব-জীর্ণ দুর্বল-চিত্ততায় অপমানিতা হইয়া সুন্দরী বিরাজ মনোবেদনায় গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়া শেষপর্যন্ত অভিমানবশে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া তাহার রূপলুব্ধ জমিদার রাজেন্দ্রকুমারের নৌকায় উঠিয়া পড়ে। নৌকায় কিন্তু বিরাজের সম্বিৎ ফিরিয়া আসে, সে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহার পর হাসপাতালে, পথে বহুদুঃখে বিরাজের অনেকদিন কাটে এবং কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তারকেশ্বরে পথে একদিন যখন সে পড়িয়া ছিল হঠাৎ সেখানে স্বামী নীলাম্বর ও আদরের ননদ পুঁটির সাক্ষাৎ পায়। নীলাম্বর পরম স্নেহভরে হতভাগিনী বিরাজকে গৃহে আনিয়া তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ করিয়া দেয়।

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবারের ভাঙ্গনের রূপ নীলাম্বর ও পীতাম্বরের বিপরীতমুখী চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটান হইয়াছে, এই ভ্রাতৃবিরোধের বিপরীতে দুই জা বিরাজ ও মোহিনীর

ভালবাসা শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছে। বিরাজ নৌকা হইতে ঝাঁপ দিবার পর দীর্ঘদিন কাটিয়া গেলেও সে সময় তাহার জীবন কিভাবে কাটিয়াছে সে কথা উপন্যাসে ভাল করিয়া আলোচনা হয় নাই, কিন্তু বিরাজের সাধ্বীত্ব, রাজেন্দ্রকুমারকে স্বামীগৃহ ত্যাগের আগেও তীব্র ভর্ৎসনা, উত্তেজনায় স্বামীগৃহত্যাগের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া নৌকা হইতে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া, স্বামীর কাছে শেষ আশ্রয় গ্রহণ,—এসব কাহিনী দাম্পত্য জীবনের ছোটখাট পার্থক্য সত্ত্বেও স্বামীস্ত্রীর প্রীতিপূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মিলিয়া মিশিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া ঘর করার আবশ্যকতার দিকে লেখকের আগ্রহ পরিস্ফুট করিয়াছে।* বিরাজ-বৌ উপন্যাসে যৌথ পরিবার প্রথার জন্য লেখকের দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুভব করা যায় এবং পীতাম্বর হীন স্বার্থপর হইলেও তাহার স্ত্রীকে উদার-হৃদয়া ও বিরাজের প্রতি প্রীতিপরায়ণা করিয়া এইদিকে শরৎচন্দ্র কাহিনীর একটি বাঁক সৃষ্টি করিয়াছেন বলা চলে। পীতাম্বরের মৃত্যু ঘটাইয়া শেষ পর্যন্ত মোহিনীকে নীলাম্বরের দেখাশোনার জন্য এক সংসারে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া শরৎচন্দ্র এই পরিবারটিকে যৌথ পরিবার হিসাবেই টিকাইয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য পীতাম্বরের মৃত্যু এ হিসাবে কাহিনীর জোড়াতালি বলা চলে।

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসের সহিত শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পের (১৯১৮) কিছুটা মিল আছে, উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকা পরপুরুষের সঙ্গে স্বামীগৃহ-ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু উভয়তঃই তাহাদের চারিত্রিক পবিত্রতা

---

*'বিরাজ-বৌ'-এর গল্পের প্রশংসা করিয়া অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন : "বঙ্কিমের যুগে পতিপত্নীর সুখময় মিলনই ছিল সাধারণ নিয়ম; বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যই ছিল ব্যতিক্রম। আধুনিক যুগে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের বীজ ওতপ্রোতভাবেই উপ্ত দেখান হয়; দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই যেন উহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। স্থায়ী বন্ধনমাত্রেই আনে অতৃপ্তি ও বন্ধনচ্ছেদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—দাম্পত্য শান্তি ঝটিকার ক্ষণবিরতিমাত্র, এক অনিশ্চিত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। শরৎচন্দ্র নীলাম্বর ও বিরাজের আদর্শ ও ঐকান্তিক প্রেমমূলক দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিয়া বঙ্কিমের ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন।"—(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩৬)

রক্ষিত হইয়াছে, মনের ক্ষোভ বা ভুল ভাঙ্গিবামাত্রই তাহাদের অন্তর্নিহিত অম্লান স্বাধ্বীত্ব-মহিমা তাহাদের আত্মরক্ষার সার্থক প্রেরণা দিয়াছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে এবং 'স্বামী' গল্পে হিন্দু-বিবাহের মন্ত্র দ্বারা দৃঢ়-সংবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর সংসার জীবনের মিলিত রূপটির প্রতি লেখক শরৎচন্দ্রের আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, বিবাহিত নরনারী পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল বোঝাপড়ার দ্বারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাক, বাহিরের কোন প্রলোভন, কাহারও আকর্ষণই যেন সেই মিলিত জীবন-রূপটিকে ম্লান করিতে না পারে এইরূপ একটি আকুতি এই উপন্যাস-গল্পে তিনি রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রতাপের মত মহান্ ব্যক্তির প্রতি শৈবলিনী আকর্ষণ অম্লান সত্ত্বেও চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের দাম্পত্য-জীবনের আপেক্ষিক মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রতাপকে সরাইয়া শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত করাইয়াছেন।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে রাজেন্দ্রকুমারের নৌকা হইতে বিরাজ জলে ঝাঁপ দিয়া নিজেকে বাঁচায়, 'স্বামী'র সৌদামিনী নরেনের সহিত কলিকাতায় গিয়াও এমন শীতল আচরণ করে যে নরেন দু তিন দিনের মধ্যেই তাহার অমলিন স্বামীপ্রেম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয় এবং স্বামী ঘনশ্যামকে খবর দিলে বৈষ্ণব ঘনশ্যাম অখণ্ড আস্থায় স্ত্রীকে ঘরে লইয়া আসে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র 'পণ্ডিত মশাই'-এর বৃন্দাবন, 'স্বামী'র ঘনশ্যাম এবং 'শেষের পরিচয়'-এর ব্রজবাবুকে বৈষ্ণব করিয়া আঁকিয়াছেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গে তিনজনকেই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে এবং তিনজনই সহনশক্তির গৌরবে সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে ঘনশ্যামের কুলত্যাগিনী সৌদামিনীকে সহজ বিশ্বাসে ঘরে ফিরাইয়া লওয়ার পিছনে সমস্যার জটিলতা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল, কিন্তু ঘনশ্যাম বৈষ্ণবী বিশ্বাসে স্ত্রীকে মানুষ হিসাবে ভালবাসার আলোকে চিনিবার শ্লাঘাতেই যেন সে জটিলতা এড়াইয়া গিয়াছে।

'দেবদাস' শরৎচন্দ্রের অপরিণত প্রতিভার সৃষ্টি, কিন্তু সমগ্রভাবে ইহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর মিলে। ভাগলপুরে অল্পবয়সে শরৎচন্দ্র যে সব গল্প উপন্যাস লিখিয়া তাঁহার তিনখণ্ড 'বাগান খাতা' ভর্তি করেন

'বড়দিদি' তাহার অন্তর্ভুক্ত একথা আগেই বলা হইয়াছে। 'দেবদাস', 'কাশীনাথ', 'শুভদা', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'ছবি' (বাগান খাতার ইহার নাম ছিল 'কোরেল গ্রাম') এই 'বাগান খাতা'তেই সঞ্চিত হইয়াছিল। 'দেবদাস' ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাল্যকালে লিখিত 'দেবদাস' রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।*

'বড়দিদি'র মতই 'দেবদাস'-এ আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি, 'বড়দিদি'র চেয়ে উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলাগত প্রতিভার পরিচয় থাকিলেও দেবদাসের কাহিনীও বড়দিদির মতই করুণ। ব্যর্থ প্রেমের যে কাহিনী 'দেবদাস'-এ স্থান পাইয়াছে, 'বড়দিদি'র কাহিনীর চেয়ে তাহা অধিক মর্মস্পর্শী এবং বাস্তবতার নিরিখে ত্রুটি থাকিলেও ইহা 'বড়দিদি'র চেয়ে অধিক বাস্তব বলিয়া পাঠকের নিকট অনুভূত হয়। প্রেমের বহিরঙ্গ অভিব্যক্তির বলিষ্ঠতায়, ব্যর্থ প্রেমের আঘাতের তীক্ষ্ণতায় ও আত্মবিস্মৃতির কঠিন সাধনা বর্ণনায় এবং সর্বোপরি সুগভীর প্রেমের মর্যাদা রক্ষার দিকে উপসংহার বিন্যস্ত করার মুন্সীয়ানায় শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'দেবদাস' প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। 'বড়দিদি'তে সুরেন্দ্রনাথের আপনভোলা প্রকৃতি এবং সুরেন্দ্রনাথের মত অন্যমনস্ক মানুষের সঙ্গে মাধবীর

*'দেবদাস' ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (চৈত্র, ১৩২৩, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩২৪) প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র নিজে পতিতার প্রেম ও বিবাহিতা নারীর পরপুরুষকে প্রেম সমন্বিত এই উপন্যাসখানিকে সমাজবোধের দিক হইতে প্রচারে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। 'ভারতবর্ষ' দেবদাস চাহিলে শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ'-এর কর্মী বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লেখেন (৮ই এপ্রিল, ১৯১৩): "দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।"—(শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯।) 'দেবদাস' সম্পর্কে এই প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকেই শরৎচন্দ্র ১৯১৩, ২৫শে জুন আর একখানি পত্রে লেখেন: "শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা তাই নয়, ওটার জন্য আমি নিজেও লজ্জিত।"—(গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭১।)

স্নেহজ প্রেমের স্বাভাবিক বর্ণহীনতা, তদুপরি সম্ভ্রান্ত ঘরের বুদ্ধিমতী বিধবার প্রত্যাশিত সংযম,—সব মিলাইয়া দুইটি চরিত্রই শীতল, প্রেমের উত্তাপ তাহাদের মধ্যে জমিয়া উঠিতে পারে নাই। অপরপক্ষে 'দেবদাস'-এ প্রেম ব্যর্থ হইলেও সেই প্রেমের উত্তাপ প্রেমিক-প্রেমিকা দেবদাস-পার্বতীকে অতিক্রম করিয়া পাঠক হৃদয়ও উত্তপ্ত করিয়া তোলে। উভয় উপন্যাসের উপসংহারে লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়া হতভাগ্য সুরেন্দ্রনাথ ও দেবদাসের জন্য পাঠকের সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছেন, এই আত্মপ্রকাশ অবশ্য শিল্প-কলা-সম্মত নয়। মনে হয় লেখকের অপরিণত শিল্পী মনই এজন্য দায়ী।

ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতা সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু দেবদাস দুটি নারীকে ভালবাসিয়াছে, পার্বতীকে ও চন্দ্রমুখীকে। তরুণ ভাব-প্রবণ লেখক গৃহস্থবধূ পার্বতী, পতিতা দেহোপজীবিনী চন্দ্রমুখী এবং ভদ্র জমিদার-সন্তান দেবদাস,—তিনজনকেই প্রেমের যাত্রাপথে দুঃসাহসী অভিযাত্রী করিয়াছেন, তাহাদের জীবনায়নের স্বাভাবিক গণ্ডীগত সংযম ভালবাসার বন্যায় শেষ পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। অন্য কোন অবলম্বনহীনা বা জীবিকার্জনে অন্য কোন যোগ্যতাহীনা চন্দ্রমুখী এই প্রেমের আবেগে পতিতাবৃত্তি ছাড়িয়া অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াইয়াছে। দেবদাস মৃত্যুর আগে পার্বতীর সঙ্গে দেখা করিবার কথা দিয়াছিল—সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে শুধু মরিবার জন্যই যেন সে বিশ্বস্ত ধর্মদাসকে ফাঁকি দিয়া পাণ্ডুয়া স্টেশন হইতে গরুর গাড়ীতে দুর্দিনের পথ কাটাইয়া হাতিপোতায় পার্বতীর শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, জমিদার-গৃহিণী পার্বতী দেবদাসের মৃত্যুসংবাদে আকুল হইয়া 'দেবদা'কে শেষ দেখা দেখিবার আশায় স্বামী-পরিজনের চোখের উপর দিয়াই পাগলের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিতে গিয়া মূর্ছিত হইয়াছে।

প্রেমের গভীরতা দেখাইতেই এই উচ্ছ্বাস-বহুল কাহিনী-বিন্যাস তবু পার্বতী-দেবদাসের এই প্রেম কিছুটা মানাইয়া যায়, চন্দ্রমুখীর প্রেম ও সেই প্রেমের জন্য সর্বস্ব-ত্যাগ একটা ফাঁপা প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অতিশয়োক্তি বলিয়াই পাঠকদের মনে হয়। এই ধরণের গভীর প্রেম সম্যক ভাবে জমিয়া উঠিবার অবকাশ গ্রন্থে রাখা হয় নাই বলিয়াও উচ্ছ্বসিত প্রেমরূপ পাঠক হৃদয়ে প্রত্যাশিত তরঙ্গ সৃষ্টি করে না। চন্দ্রমুখী চরিত্রে প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের যে চিত্র আছে, তাহার আড়ম্বরটুকু বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের প্রখ্যাতা নায়িকাদের এক

ধরণের ছাপ চন্দ্রমুখীর মধ্যেও অনুভব করা যায়, ইহা অল্প বয়সের রচনা 'দেবদাস'-এর এক উল্লেখযোগ্য দিক। পার্বতী চরিত্রটিতে অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া লইবার নারীর স্বাভাবিক প্রবণতা এবং প্রেমের মূল্য দিতে প্রস্তুতি এক সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া পার্বতী চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অল্পবয়সী লেখকের এই পার্বতী চরিত্রটির বিন্যাসও প্রশংসাযোগ্য।

'দেবদাস'-এর মত প্রথম বয়সের লেখাতেও শরৎচন্দ্রের পল্লীসমস্যার প্রতি এবং জাতিভেদ প্রথার কুফলের প্রতি মানবতামূলক সতর্কদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদিও অভিজ্ঞতার বা রচনা-কুশলতার অভাবে এই দৃষ্টি সার্থক রূপ পায় নাই। দেবদাস উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, মুখোপাধ্যায় দেবদাস-এর সঙ্গে 'বেচা-কেনা চক্রবর্তী' ব্রাহ্মণের মেয়ে পার্বতীর বিবাহ হইল না। দুজনেই ব্রাহ্মণ হইয়াও ছোট বড় বংশের জন্য এমনি বিবাহ হয় নাই 'পল্লীসমাজ'-এর রমা রমেশের, 'বামুনের মেয়ে'র অরুণ সন্ধ্যার। বর্ণ-পার্থক্য কোন মহৎ ব্যাপার নয়, অথচ ইহার ফল কিরূপ ভয়ঙ্কর, মানুষের মূল্যবান জীবনের এজন্য কিরূপ অপচয় ঘটে শরৎচন্দ্র দরদের সহিত তাহা আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কিভাবে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হয় দেবদাসের শেষ-কৃত্যের করুণ দৃশ্যটিতে তিনি তাহাই আঁকিয়াছেন। দেবদাস সম্ভ্রান্ত, অবস্থাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহার হাতে আংটি, গায়ে শাল এবং পকেটে দ্বিজদাস মুখুজ্যের চিঠি; কিন্তু তাহার শবদেহ সংকারের লোক হাতিপোতা গ্রামে পাওয়া গেল না।*

শিল্পকলার দিক হইতে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গৃহদাহ'। 'গৃহদাহ' উপন্যাসখানি আধুনিক কালের আবহাওয়ায় লেখা নয়, ইহাতে ব্রাহ্ম-হিন্দু সংঘর্ষের যুগের ছাপ আছে, কিন্তু 'গৃহদাহ'-এ যে জীবন-সমস্যা, যে ত্রিকোণ

* 'দেবদাস' এর শেষকৃত্য: "ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও পাড়া গাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না, কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তারপর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল—কাক শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল, কুকুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল।"

প্রেমের কথা রূপায়িত হইয়াছে তাহা আধুনিক কালের সমাজেও ৰ
সমস্যা। একজন নারীর মনে যে একই সঙ্গে দুইজন পুরুষ দাগ ৰ
স্থান করিয়া লইতে পারে, একজন স্বামী ও একজন পরপুরুষ,—
কেই একটি বাঙালী মেয়ে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াও এ
সঙ্গে যে অন্তরে প্রশ্রয় দিতে পারে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এই বিচিত্র প্রেমের
আঁকা হইয়াছে। আগে বাঙ্গালী নারী মনে যাহাই ভাবুক, এইভ
একসঙ্গে স্বামী ও পরপুরুষকে তাহার ভালবাসার কথা বাংলা সাহি
বিবৃত করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। স্বামী থাকিতে ন
কুলত্যাগ করিতেছে—সাহিত্যে এ ঘটনার অভাব নাই, কিন্তু বু
মধ্যে স্বামীকে অতন্দ্র প্রেমে জাগাইয়া রাখিয়া পরপুরুষের আকর্ষ
স্বীকার করিবার যে বলিষ্ঠ কাহিনী 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ফুটান হইয়
তাহা বহুলাংশে নূতন জিনিস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলি
মহান্ চন্দ্রশেখরকে, সাধুপ্রকৃতির স্বামী চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা করিত, ি
যে জলন্ত প্রেম প্রতাপের জন্য তাহাকে পাগল করিয়াছে তাহার প
ধিতে চন্দ্রশেখরের স্থান ছিল না বলিলেই হয়। বিবাহের মন্ত্রের ব
সমাজ-জীবনের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে,—এই বিশ্বাস বাংলা ক
সাহিত্যে প্রথম হইতে চলিতেছে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত 'বিরাজ ে
'স্বামী' প্রভৃতি রচনায় এই ধারণার অগ্নিপরীক্ষা নিষ্পন্ন করিয়াছে
এমনকি তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যিকদের সহিত পাল্লা দিবার প্রয়া
জাত তাঁহার রচনা-ধারার অতিরিক্ত 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসেও স্বামী যত
স্ত্রীর স্বামী আছে ততক্ষণ স্ত্রীর মনে পরপুরুষ ঢুকিতে পারে নাই
'গৃহদাহ'-এ নায়িকার অন্তরে কিন্তু দুজনেই এক সঙ্গে বিরাজ করিয়াছে
'গৃহদাহ' উপন্যাসেও অবশ্য বাঙ্গালী নারীর স্বামী-সংস্কারের আপেক্ষিক জে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তবু স্বামীর সহিত নারীর পরপুরুষকে ভাল
বাসিবার যে বাস্তব রূপ ইহাতে রাখা হইয়াছে, সমকালীন বাং
সাহিত্যে তাহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অন্তর-দ্ব
ক্ষত-বিক্ষত নায়িকার জীবনে যে অসহায় ব্যর্থতা নামিয়া আসিয়াছে
নায়কের জীবনে যে ধূসর রিক্ততা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, বেদনার যে বর্ণালি
ফুটিয়াছে, তাহা রসিক পাঠকের মন সহজেই হরণ করিয়া লয়।

গঠন-রীতির দিক হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় নায়িকার হৃদয়

সমস্যা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে গ্রন্থের প্রথম দিকেই। 'গৃহদাহ'-এর নায়িকা অচলা নিজে ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দু মহিমকে ভালবাসিয়া বিবাহের বাগ্দান করিয়াছে, এইসময় মহিমের ধনী বন্ধু সুরেশ প্রবল আকর্ষণী শক্তি সমেত ধূমকেতুর মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুরেশের আকর্ষণ সত্ত্বেও অচলা কথা রাখিয়া মহিমকেই বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহের পর স্বামীকে ভালবাসিয়াছে ও কর্তব্য হিসাবে আরও ভাল-বাসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুরেশ তাহার বিবাহিত জীবন হইতেও সরিয়া যায় নাই বলিয়া সুরেশের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বিবাহিতা অচলা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, এইভাবে অচলার হৃদয়-তন্ত্রীতে জট পাকাইয়া গিয়াছে। এই জট আরও ঘোরালো হইয়াছে সুরেশ যখন তাহাকে অসুস্থ মহিমের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বায়ু-পরিবর্তনে গন্তব্যস্থল জব্বলপুরের পথে মাঝ রাস্তায় ট্রেন হইতে নামাইয়া লইয়া ডিহিরিতে লইয়া গিয়াছে, আর শিক্ষিতা আধুনিকা ব্রাহ্ম তরুণী হইয়াও সে সুরেশকে অস্বীকার করিয়া ও আপন পারিবারিক এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করিয়া স্বামীর বা পিতার কাছে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। এইভাবে অচলার মনে যে জটিলতা স্থায়ী হইয়াছে তজ্জন্য তাহার ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে দুর্যোগের ঘন অন্ধকার। উপন্যাসের এই আখ্যান বিন্যাসে লেখকের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় আছে। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসটিতে (যাহার গল্প বাস্তব জীবন সম্মত, আখ্যান কলা-সমৃদ্ধ, ছোটবড় সকল চরিত্রই সুন্দর), সম্ভবতঃ শেষ করার তাগিদেই, গুরুতর সমস্যার অপেক্ষাকৃত সুলভ সমাধানের চেষ্টা দেখা যায়। সুরেশের মৃত্যু ঘটাইয়া ও অসহায়া অচলার সম্মুখে অপ্র-ত্যাশিতভাবে মহিমকে উপস্থিত করিয়া, শরৎচন্দ্র গ্রন্থের প্রথম হইতে শিল্প-কলার যে উচ্চমান রক্ষা করিতেছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে কিছুটা নামাইয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর অচলার মনে দুইজন পুরুষের আক-র্ষণের দ্বৈরথ একজনের মৃত্যুতে অবশ্যই স্তিমিত হইয়া যাইবে এবং মহিম-মুখিতার বা স্বামী-সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণের প্রশ্নে তাহাকে আর বড় বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। উপন্যাসের শেষদিকে মহিম অচলাকে ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই অচলার কাতর আবেদন উপেক্ষা করিয়া সে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিতে

পারিয়াছে, কিন্তু মহিম যে শেষ পর্যন্ত অচলাকে গ্রহণ করিবে না এমন কোন স্পষ্ট কথা উপন্যাসের উপসংহারে বলা হয় নাই। বরং ইহার বিপরীতে গ্রন্থশেষে মৃণাল অচলা প্রসঙ্গে মহিমকে যে বলিয়াছে: "আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এখবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।"—এই কথাগুলির ভিতর দিয়া মহিমের কাছেই আবার অচলার স্থান হইবে এরূপ আশ্বাসই যেন ধ্বনিত হইয়াছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে ত্রিকোণ প্রেমের আশ্রয় তিনটি চরিত্র—অচলা, মহিম ও সুরেশ। ইহার মধ্যে নায়ক মহিমের চরিত্রটি শান্ত, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের মত। অবশ্য নিখিলেশের উদার প্রশান্তি সর্বাংশে মহিমের মধ্যে নাই, তাহার মানুষের উপর আস্থাভাব অপেক্ষাকৃত কম, মাঝে মাঝে তাহার বিরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শ্লেষাত্মক বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে অচলার মনের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করিয়া তাহাকে সুরেশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। মহিম যদি সুরেশের অর্ধেক আবেগসম্পন্ন হইত এবং স্ত্রী অচলার প্রতি সহানুভূতিশীল মন লইয়া নূতন দাম্পত্য-জীবনের স্বাভাবিক আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাহার মন ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে অন্তরের প্রেম ও স্বামী-সংস্কার এবং নব-বিবাহিত জীবনের পরিতৃপ্তির জোরে অচলার পক্ষে সম্ভবতঃ সুরেশের উগ্র আকর্ষণ কাটাইয়া উঠা অসম্ভব হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে 'কপালকুণ্ডলা' স্বামী নবকুমারের নিকট হইতে উচ্ছ্বসিত আবেগ-মথিত প্রেম-স্পর্শ পাইলে তাহার সংসারজীবনে আসক্তি সম্ভব হইত বলিয়া যেমন মনে করা হয়, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে যেমন চন্দ্রশেখরের নিরাসক্তি শৈবলিনীর মনে শূন্যতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অধিকতর প্রতাপ-মুখী করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, এক্ষেত্রে অনুরূপভাবেই মনে করা যাইতে পারে যে মহিমের নিরাসক্ত ব্যবহারে অচলার অন্তরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, মহিমের প্রতি অচলার গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও সেই শূন্যতার রন্ধ্রপথেই অপেক্ষাকৃত সহজে সুরেশ তাহার হৃদয়ে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। মহিম এই নিরাসক্তি না দেখাইয়া স্বাভাবিক আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখাইলে অচলার মন তাহাকে ঘিরিয়াই ভরিয়া যাইত, সেখানে সুরেশ হয়ত আর প্রবেশ-পথ পাইত না।

আগেই বলা হইয়াছে, অচলা-চরিত্র-পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিকের শক্তি এবং আধুনিকতা একই সঙ্গে কার্যকরী হইয়াছে। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই চরিত্রে সক্রিয়, ইহাতে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। অচলার মনে মহিম ও সুরেশের জন্য যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, ঘটনা-বিন্যাসে তাহা গতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। অচলা মহিমের সহিত সুরেশকে ভালবাসে বলিয়াই সুরেশের ছলনায় হীনতা সে মানাইয়া লইয়াছে, সুরেশের দুর্দম আকর্ষণ অস্বীকার করিতে পারে নাই বলিয়াই মিথ্যা পরিচয়ের বোঝা বহিয়াও সে তাহার সহিত ডিহিরিতে বাস করিয়াছে, না হইলে এইভাবে সুরেশের কাছে থাকিতে অস্বীকার করিবার মত শিক্ষা বা সাহস আধুনিকা, শিক্ষিতা ব্রাহ্ম তরুণী অচলার অবশ্যই ছিল। সুরেশ তাহাকে প্রভাবিত করিয়া মোগলসরাইতে নামাইয়া লইল, ইহাতেই অন্তত: অচলার মত মেয়ের ক্ষেত্রে সাধ্বীত্বের সমাধি-রচনা অবশ্যম্ভাবী ছিল না। ডিহিরিতে এই আকর্ষণের ফলও ফলিয়াছে, মহিমের স্ত্রী হইয়া থাকিবার আবেগ সত্ত্বেও সুরেশের কাছে অচলা আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে নাই। উপন্যাসের ৩২তম পরিচ্ছেদে সুরেশ অচলার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে, এই আচরণে অচলার 'উৎকট ঘৃণা বোধ' হয় নাই। ৩৫তম পরিচ্ছেদে সুরেশ অচলাকে নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, এবারও 'অচলা বাধা দিল না'; ৩৭তম পরিচ্ছেদে 'বাহিরের মত্ত প্রকৃতির মাতলামির' মধ্যে অচলা নিশা-যাপনের জন্য 'নিঃশব্দে ধীরপদে সুরেশের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত' হইয়াছে। অবশ্য এই চরম ঘটনার পরদিন প্রভাতে মহিমের ধর্মপত্নী অচলা পিতৃপ্রতিম রামবাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারে নাই, একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া মুখ লুকাইয়াছে। তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, চোখের কোলে কালিমা এবং অশ্রুর দাগ।

সুরেশ অচলাকে দুর্দম বেগে টানিয়াছে অথচ অচলার অন্তরে মহিমের প্রতি প্রেমাকর্ষণ সুতীব্র। সুরেশ তাহার জীবনে আসিবার পূর্ব হইতেই অচলা মহিমকে ভালবাসিত, সে ভালবাসা তো আছেই, তদুপরি মহিম তাহার স্বামী হইবার পর স্বামী-সংস্কারের আবেগের শক্তিও কম নয়। এ অবস্থায় সুরেশের প্রতি অসামাজিক আকর্ষণে এই বিপজ্জনক পথে

মিথ্যা পরিচয়ে চলার ফলে একরূপ অনিবার্যভাবেই অচলাকে কঠিন দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইয়াছে এবং জানিয়া শুনিয়াও স্রোতের টানেই যেন ব্যর্থ-জীবনের পথে চলিতে হইয়াছে। এই ট্র্যাজেডি অচলার সমাজবোধ, স্বামী-সংস্কার অথবা মহিমের প্রতি প্রেম কম হইলে অবশ্যই লঘু হইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে অনুপস্থিত মহিমের আকর্ষণই অশরীরী মহিম-রূপ লইয়া সুরেশের ডিহিরির বাড়ীতে সংসার-জীবনের বিবিধ উপকরণ-প্রাচুর্য সত্ত্বেও অচলাকে নিঃস্ব হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র অচলার স্বামী-সংস্কারকে বরাবরই এমন একটা মর্যাদার আচ্ছাদন দিয়াছেন যাহাতে অচলার হৃদয়-জয়ের প্রতিযোগিতায় সুরেশ এমনই কিছুটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। লেখকের সমাজ-চেতনার আনুকূল্যই 'গৃহদাহ'-এ স্বামী মহিমকে সুরেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে জয়ী করিয়া দিয়াছে, প্রতিযোগিতা ঠিক সমানে সমানে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের উপর নিখিলেশের জয়ের সহিত ইহার মিল আছে, কিন্তু সেখানে সন্দীপ যতখানি হীন-চরিত্র, সুরেশ ত তাহা নয়।

আপাত-দৃষ্টিতে সুরেশ চরিত্রটিও হীনতা-কলঙ্কিত। সুরেশ বন্ধুকে প্রতারিত করিয়া বন্ধুপত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। এই অন্যায়, অসামাজিক কাজের জন্য তাহাকে ধন, মান, এমন কি বলিতে গেলে প্রাণ পর্যন্ত খোয়াইতে হইয়াছে। কিন্তু সুরেশ স্বভাব-দুর্বৃত্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের সহিত সুরেশের তুলনা চলে। কিন্তু সন্দীপের চেয়ে সুরেশ অনেক সহৃদয় চরিত্র। সে প্রেমিক, অচলাকে সে ভালবাসে; অচলাও তাহাকে ভালবাসে। সুরেশের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল অচলা ঘটনাচক্রে বা সাময়িক ভ্রান্তিবশে মহিমকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিবাহ নয়, বন্দিত্ব। দুর্ভাগ্যক্রমে মহিমের সহিত বিবাহিত তাহার প্রেমিকা অচলা নিরুপায় হইয়াই দুঃখবহন করিতেছে, তাহাকে মুক্তি দেওয়া অবাধে বাঁচিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া সুরেশ আপন পৌরুষের দিক হইতে কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। সুরেশের এ ধারণা শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে, সে এই ভুলের কঠিন মূল্য দিয়াছে, কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই সুরেশ সর্বস্ব বাজি ধরিয়া জীবন-জুয়ায় মাতিয়াছে। তাহার এ ভ্রম অচলার দ্বারা নিঃসন্দেহে কিছুটা লালিত

হইয়াছে। মহিমের প্রতি অভিমানবশে হইলেও মাঝে মাঝে বিবাহিতা অচলা এমন কথা বলিয়াছে যাহাতে সুরেশের ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে, অচলা মহিম সম্পর্কে ক্লান্ত, সে মুক্তি চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মহিমের গ্রামের বাড়ী হইতে সুরেশ তখন ফিরিতেছে, অচলা উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল: "তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু, কিন্তু তুমি ছাড়া আর অসময়ের বন্ধু কেউ নেই, তুমি বাবাকে গিয়ে বোলো এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়োনা।" রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ সুরেশের চেয়ে বুদ্ধিমান, নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষমতাও তাহার বেশি, পুরুষোচিত আকর্ষণ-শক্তি তাহার প্রচুর, কিন্তু সে সুরেশের মত সত্যকার প্রেমিক সুরেশ চরিত্রের অন্তর্লীন মহিমাও তাহাতে নাই।*

'গৃহদাহ' উপন্যাসে মৃণাল চরিত্রটিকে সহায়িকা চরিত্ররূপেই অঙ্কন করা হইয়াছে, অচলাকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইতেই মৃণাল চরিত্রের সৃষ্টি। কিন্তু শরৎচন্দ্র আপন হিন্দু ঐতিহ্যবোধকে এমনভাবে মৃণাল চরিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, ইহার বাহুল্য রসিক পাঠকের চোখে না

*রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ চরিত্রের এবং তাহাদের প্রেমরূপের সহিত মহিম, অচলা ও সুরেশ চরিত্রের এবং তাহাদের প্রেমরূপের অনেক মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড' গল্পের সহিতও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের গল্পাংশের কিছুটা মিল আছে। 'নষ্টনীড' গল্পে যেমন ভূপতি-চারুলতার দাম্পত্য জীবনে ভূপতির পিসতুতো ভাই অমলের অস্তিত্বের জন্য ভাঙন ধরিল, 'গৃহদাহ'-এ তেমনই সুরেশের অস্তিত্ব মহিম-অচলার সংসারটি অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে মহিমের গৃহদাহ 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মূল বক্তব্যের সংকেতবাহী, ঘটনা-সংস্থানটি তাই শিল্পকর্মের হিসাবে প্রশংসনীয়। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন: "'গৃহদাহ' উপন্যাসটির নামকরণ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর ন্যায় পারিবারিক সুখশান্তি ধ্বংসেরই প্রতি ইঙ্গিত করে।"—(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৬)

পড়িয়া পারে না। মৃণালের গ্রাম্যতা, হিন্দুয়ানী, ধর্মপরায়ণতা, আচারনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা, সাধ্বীত্ব, সপ্রতিভ ভাব, বুদ্ধির দীপ্তি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব কিছুতেই যেন শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ নয়নের আনুকূল্য রহিয়াছে। সহায়িকা চরিত্র হইলেও বিজয়িনী মৃণালের কাছে নায়িকা অচলা মাঝে মাঝে এমন নিষ্প্রভ হইয়াছে যে, শিল্পকলার দিক হইতে চরিত্রটির মূল্য বাড়িবার পরিবর্তে কমিয়াছে। গ্রন্থে মৃণালের গৌরব এমনভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অচলার পিতা অসহায় বৃদ্ধ কেদারবাবু মৃণালের সেবায় বাঁচিবার মত আশ্রয় পাইয়া পরম পরিতৃপ্তিভরে আপন ব্রাহ্মধর্মের সর্ববিধ সংস্কার ভুলিয়া ব্রাহ্মদের নিন্দা করিয়াছেন এবং পট্টবস্ত্র-পরিহিতা মৃণালের পূজার ঘরে যাইবার দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেও পুনরায় পৈতা পরিয়া কোশাকুশি লইয়া পূজায় বসিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উপন্যাসের উপসংহারে সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা নিরুপায় হইয়া অতঃপর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে মহিমের কাছে যখন নির্দেশ চাহিয়াছে মহিম নিজে সে নির্দেশ দেয় নাই, মৃণালই তাহার হইয়া অচলাকে সে নির্দেশ দিবার ভার লইয়াছে। এ নির্দেশ পদস্খলনের শাস্তিরূপে রিক্ত জীবনের লাঞ্ছনায় ঠেলিয়া দেওয়া নয়, উদার মানবিক মহিমায় ভুলভ্রান্তি সংশোধনান্তে সম্ভাবনাময় মানবজীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগদানের দিকেই ইহার গতি,—এই মহত্ত্বের স্পন্দন মৃণালের উক্তির ভিতর হইতে যেন ধ্বনিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক সহানুভূতি না থাকিলে মৃণাল চরিত্র এতখানি মহৎ হইতে পারিত না।

প্রকৃতপক্ষে মৃণাল চরিত্রের সংগঠনে শিল্পকলার কৃতিত্ব কম হইলেও লেখক শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ ও ধর্মচেতনার প্রশ্রয় চরিত্রটির উপর অত্যধিক থাকায় অচলা মৃণালের কাছে করুণভাবে পরাজয় বরণে বাধ্য হইয়াছে। অচলা ব্রাহ্ম এবং মৃণাল হিন্দু, সূক্ষ্মভাবে লেখকের স্বধর্মপ্রীতি মৃণালকে বিজয়িনী করার পিছনে কার্যকরী হইয়াছে এমন কথাও পাঠকের মনে জাগা অসম্ভব নয়। অচলাকে নামেই ব্রাহ্ম করা হইয়াছে, অচলার ধর্মানুরাগ মোটেই প্রকাশমান নয়, তাহার চলার পথে ধর্মবোধ আলো ফেলে নাই, দুঃখের সময়ই শুধু ব্যথাক্লিষ্ট অচলা ভগবানকে স্মরণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে হৃদয়বতী, সতীসাধ্বী কল্যাণী মৃণালকে আচারনিষ্ঠ হিন্দু করিয়া আঁকা হইয়াছে। মৃণালের জীবনের সহিত ধর্মকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিয়া

দেখানো হইয়াছে, সে জয়ী হইয়াছে। মৃণালের বিপরীতে অচলার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়া শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে তাঁহার ধর্ম-চেতনায় বিশেষ স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, মানবজীবনে ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।*

'গৃহদাহ'-এ মৃণাল ও অচলা দুজনেই বহু দুঃখ পাইয়াছে, কিন্তু ধার্মিক মৃণালকে দুঃখ মহৎ মর্যাদার পথ হইতে সরাইতে পারে নাই, অচলার উঁচু মাথা ক্রমে ধূলায় নামিয়া আসিয়াছে। দুঃখ মৃণালের আভরণ, ইহা তাহাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্বে শ্রীকান্ত অভয়ার প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও যেমন নিজ মুখেই বলিয়াছে তাহার অন্নদাদিদি অভয়ার মত স্বামী ত্যাগ করিয়া কিছুতেই পরপুরুষকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না, মৃণাল চরিত্রকেও শরৎচন্দ্র মুখে না বলিলেও অনুরূপ কিছুটা দৃঢ়তায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। অচলার মত মৃণাল কোন লাভের লোভেই নামিতে পারে না, মৃণাল চরিত্রের এই মহৎ ব্যঞ্জনাই শরৎচন্দ্র আগ্রহ করিয়া পাঠকদের হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র বিপরীতমুখী ভাব, ঘটনা বা ক্রিয়ার সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া চরিত্রের মানসিক আলোড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটাইয়া কাহিনীর গতি-সৃষ্টির ও আখ্যানভাগের আকর্ষণ-বৃদ্ধির চেষ্টায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এই রীতি সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রধান চরিত্রের চরম ব্যর্থতা বা সার্থকতার উপর যবনিকা টানিয়া গল্প-উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটাইবার দিকে শরৎচন্দ্রের প্রবণতা ছিল না, চরিত্রের সংস্কার ও আকাঙ্ক্ষার হৃদয়গত দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষমুখর গতি ও মানসিক দোদুল্যমানতা ফুটাইবার উপরই তিনি অধিক জোর দিয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সর্বোত্তম সম্পদ এবং এই চরিত্রের প্রবহমাণতা উপন্যাসের পরিণতির চেয়ে অনেক সময় অধিক আকর্ষণীয়। অবশ্য উপন্যাসের পরিণতি চাই এবং রসসমৃদ্ধ

* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, 'গৃহদাহ'-এর সুরেশ ধর্মকে গ্রাহ্য করে নাই, তাহার ব্যর্থজীবনের পিছনে এই ধর্মানুরাগের অভাব বুঝিবা শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। সুরেশ মৃত্যুকালেও মহিমের একবার ভগবানকে ডাকিবার অনুরোধ তাহার ভাল লাগে না বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে।

পরিণতি চাই, ইহাও পাঠক-চিত্তজয়ী শরৎচন্দ্রের বিস্মৃত হইবার কথা নয়। সাধারণ উপন্যাসগুলিতে দুই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া শরৎচন্দ্র লেখনী চালনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে—'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত'-এ,—বিশেষ করিয়া শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গৃহদাহ'-এ চরিত্রের সংঘর্ষ-তরঙ্গিত রূপোজ্জ্বলতার উপরই শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'গৃহদাহ'-এর পর **'দেনা-পাওনা'র** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ১৯২৩) নাম করিতে হয়। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মতই 'দেনা-পাওনা'র নামকরণ ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ। হৃদয়গত দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশের উপর 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মুখ্য চরিত্র চণ্ডীগড় গ্রামের দেবী চণ্ডীর ভৈরবী ষোড়শী এবং জমিদার জীবানন্দ। জীবানন্দ মাতাল, দুশ্চরিত্র, অর্থলোভী। চণ্ডীগড়ে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া জীবানন্দ গ্রামের মানুষের জীবন অত্যাচারে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। লোভবশে সে হাত বাড়াইয়াছে দেবী চণ্ডীর সম্পত্তির দিকে। প্রজাদের মাতৃস্বরূপা দেবীর ভৈরবী ষোড়শী এই দুঃসহ অবস্থার অবসান চাহিল। সে জমিদারের কাছারিতে গেল দুশ্চরিত্র পাষণ্ড জমিদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে। গ্রামের অসহায় মানুষকে যে রক্ষা করিবে, দেবীর সম্পত্তি নিরাপদ করার দায়িত্ব তো তাহার বটেই! জীবানন্দের কাছারি বাড়ী শান্তিকুঞ্জে পৌঁছাইয়াই কিন্তু ষোড়শীর জীবনে সব কিছু ওলটপালট হইয়া গেল। জীবানন্দের মধ্যে ষোড়শী যখন তাহার হারানো স্বামীকে আবিষ্কার করিল তখনই শুষ্ক ভৈরবী ষোড়শী ম্লান হইয়া গেল, সেখানে শান্তশ্রী অলকার পুনরাবির্ভাব ঘটিল। প্রজাদের অভিভাবিকা ও দেবীর ভৈরবী হইয়া এতদিন যে আত্মতৃপ্তির মণিকোঠায় কর্মিষ্ঠা ষোড়শীর দিন কাটিতেছিল, হারাইয়া-যাওয়া স্বামী জীবানন্দকে এবং নিজের মধ্যে বহুকাল আগে পিছনে ফেলিয়া আসা নারীরূপ অলকাকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পে সে মণিকোঠা চূর্ণ হইয়া গেল। ষোড়শীর সংসার-জীবনে নাম ছিল অলকা। তাহার পদস্খলিতা মায়ের সামাজিক মর্যাদা ছিল না, কিন্তু সে স্বপ্ন দেখিত তাহার আদরের কন্যার সুখী গার্হস্থ্যজীবনও। তাই বোধ হয় অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান জীবানন্দকে টাকার লোভ দেখাইয়া জীবানন্দের সহিত অলকার মালাবদল করাইয়া সে মনের সাধ

পূরণ করিতে চাহিয়াছিল। তারপর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। ষোড়শীর মা নাই, প্রচলিত বিধি অনুসারে ষোড়শী পদ লাভের অব্যবহিত পূর্বে তাহার আর একবার আর একজনের সহিত বিবাহ হইয়াছে এবং সেই স্বামীও চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে, ষোড়শী এখন দেবী চণ্ডীর ভৈরবী। আজ এতদিন পরে জীবানন্দের সান্নিধ্যে আসিলে ষোড়শীর মধ্যে সেই বিস্মৃত-প্রায় অলকা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু নিজের মধ্যে নারীত্বের এই জাগরণকে ষোড়শী দুহাত বাড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলেও তাহার অভ্যস্ত জীবন-যাপন প্রণালী, দেবীর প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য, দ্বিতীয় বিবাহের স্মৃতি ও সংস্কার, অন্যায় ও পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি পূর্ববর্তী ভৈরবীদের চারিত্রিক দুর্নামের জন্য ভৈরবী হিসাবে তাহারও কিছুটা সামাজিক নীতিগত মর্যাদা হানির ধারণা, সর্বোপরি তাহার ভালবাসার ধন ভদ্রসন্তান, ব্রাহ্মণ, জমিদার জীবানন্দের তাহার মত সাধারণ নারীর সহিত মিলনে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ও জীবানন্দের সম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ষোড়শীর পুরোপুরি অলকায় ফিরিবার পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল। তবে ইহার পর যে ঘটনাই ঘটিয়া থাকুক, অলকা থাকিয়া গেল, ষোড়শী তাহাকে অনেকখানি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষে যে সমস্যার উদ্ভব হইল, তাহার টানা-পোড়েনই দেনা-পাওনা উপন্যাসের কাহিনী। এই কাহিনী-বিন্যাস জীবানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ষোড়শীর চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘি যাত্রা পর্যন্ত চমৎকার হইয়াছে। উপন্যাস এইখানে শেষ হইলে ব্যঞ্জনা উপসংহারকে প্রাণবন্ত করিতে পারিত, শিল্পকলার দিক হইতে তাহাতে উপন্যাসটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু সম্ভবতঃ সাধারণ পাঠকদের দিকে চাহিয়া ও গ্রন্থের আয়তনের কথা বিবেচনা করিয়া শরৎচন্দ্র 'দেনা-পাওনা'র শেষাংশ লিখিয়াছেন এবং ষোড়শীকে আবার পুলিসের হাত হইতে জীবানন্দকে রক্ষা করিবার জন্য শৈবালদীঘি হইতে চণ্ডীগড়ে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এই শেষাংশটুকু উপন্যাসের পূর্ববর্তী অংশের তুলনায় নিঃসন্দেহে দুর্বল। 'দেনা-পাওনা'র সংগঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সাধারণতঃ উপন্যাসে যেমন কাহিনীর বেশ কিছুটা ঊর্ধ্বগতির পর চরম সঙ্কট দেখা দেয়, এ উপন্যাসে সেরূপ না ঘটিয়া তাহা একরূপ প্রথম দিকেই ঘটিয়াছে, ইহার ঊর্ধ্বগতি সামান্য, সংগ্রামের সূচনায় হারানো স্বামীকে আবিষ্কার করিয়া ষোড়শী আপন বিস্মৃতপ্রায় অলকা-সত্তাকে ফিরিয়া পাইয়াছে এবং তাহার পর সারা উপন্যাসে

ষোড়শী অলকার আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব বা কাহিনীর নিম্নগতি এবং পরিশেষে অলকার জয়। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নির্মল-হৈমবতীর যে কাহিনীটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তোলেন। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "নির্মল-হৈমবতীর আখ্যান মূল গল্পের সহিত নিবিড় ঐক্যলাভ করে নাই।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৬।) তবে এ প্রসঙ্গে একথাও ঠিক যে, যদিও ষোড়শী-জীবানন্দের মুখ্য কাহিনীর হিসাবে এই দ্বিতীয় কাহিনীটি অপরিহার্য নয় এবং মুখ্য কাহিনীর সহিত ইহা সত্যই নিবিড় ঐক্যলাভ করে নাই, তথাপি এই কাহিনীটিকে অনাবশ্যক বলাও চলে না। ইহা মূল কাহিনী বা ষোড়শী-জীবানন্দের প্রেমোপাখ্যানের অগ্রগতিকে এক হিসাবে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। বিশেষ করিয়া যখন কর্তব্যবোধের চাপে ষোড়শীর স্বামী-সংস্কার বা জীবানন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রবল ধাক্কা খাইয়াছে, তখন হৈম-নির্মলের সাজানো সংসারের ছবি তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার নারী-সত্তাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে।* নির্মল ষোড়শীর প্রতি দুর্বলতা দেখাইয়াছে, নীতিগতভাবে ইহা অন্যায় এবং ষোড়শীও নৈতিক দিক হইতে ইহা অবশ্যই সমর্থন করে না; কিন্তু তাহার প্রতি মুগ্ধ পুরুষের এই আকর্ষণ ব্যক্তি নির্মলকে অতিক্রম করিয়া ষোড়শীর নারী-হৃদয়ে সঙ্গীত-মূর্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে। ভৈরবী-সংস্কার কাটাইয়া উঠিয়া প্রেমিকার সার্থক ভূমিকাগ্রহণে এই আবেগের মূল্য সন্দেহাতীত। তাছাড়া নির্মলের মত শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপন শ্বশুরালয়ের গ্রামে এই যে পরনারীর, বিশেষ করিয়া তাহার মত সন্ন্যাসিনী ভৈরবীর প্রতি দুর্বলতা দেখাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বজনবিহীন, পঙ্কিল পরিবেশে নিপতিত দুর্ভাগ্য জীবানন্দের সকল হীনতা-দৈন্য সহানুভূতির সহিত ক্ষমা করিবার উদার প্রেরণাও ষোড়শী লাভ করিয়াছে। আপনার সমৃদ্ধ জীবন-রূপ ভুলিয়া কৃতী ব্যারিষ্টার নির্মল যদি চারিত্রিক দুর্বলতা দেখায়, রিক্ত-জীবনের

*অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জীবানন্দ যখন আবেগে ষোড়শীকে নিজের সব ভার দিতে চাহিয়াছে, ষোড়শীর মন দেবীর ভৈরবীত্বের চেতনা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য উচ্ছলিত হইয়াছে: "ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজীর মত খেলিয়া গেল।"

অভিশাপগ্রস্ত জীবানন্দ যে অধঃপতিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? জীবানন্দ ষোড়শীর প্রিয়জন, জীবানন্দকে ঘৃণায় অস্বীকার করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিবার পরিবর্তে তাহার চারিদিকে প্রেম-মমতার স্নিগ্ধ বেষ্টনী রচনা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করাই তো প্রেমিকা নারী ষোড়শীর কর্তব্য। এই আবেগ বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবানন্দের প্রতি তাহার অনুরাগকে টিকিয়া থাকিতে সাহায্য করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীর মত ষোড়শী প্রাণের আবেগে বারবার জীবানন্দের কাছাকাছি গিয়াও সংস্কারবশে, আপন হৃদয়ের, আপন মহৎ প্রেমের প্রেরণায় বারবার ফিরিয়া আসিয়াছে, শেষ পর্যন্ত জীবানন্দকে বাঁচাইয়া আপনার প্রেমিকা সত্তাকে বাঁচাইতে ষোড়শী চণ্ডীগড় ছাড়িয়া শৈবাল-দীঘি পলাইয়াছে। নারীর এই বিশিষ্ট প্রেমরূপ শরৎচন্দ্রের অনুপম সৃষ্টি। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ষোড়শীর জীবানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শৈবালদীঘি যাত্রার পরের অংশ শিল্পকলার হিসাবে দুর্বল সে কথা আগেই বলা হইয়াছে, কিন্তু উপসংহারে হৈমকে দিয়া ষোড়শীকে চণ্ডীগড়ে ফিরাইয়া আনার মধ্যে আবার শিল্পকলাগত কিছুটা সাফল্য ঘটিয়াছে বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যে হৈম সংসার জীবনের রসঘন আস্বাদ যোগাইয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তাহাকে দেনার দায়ে আবদ্ধ করিয়াছে, পিতা জনার্দন রায়ের বিপদে সেই হৈম তাহাকে চণ্ডীগড়ে ফিরাইয়া আনিতে গেলে ষোড়শী তাহার পাওনা পরিশোধের ব্যগ্রতায় আর কিছু না ভাবিয়াই হৈমের অনুরোধ রাখিয়াছে। চিন্তা করিলে প্রজাদের জীবন-সংগ্রামের পথে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া জীবানন্দকে এইভাবে সরাইয়া আনা, হীন জনার্দন রায়কে শাস্তি দিবার সুবর্ণ সুযোগ এইভাবে নষ্ট করা ষোড়শীর পক্ষে হয়ত সম্ভব হইত না। একটু ভাবিলেই ষোড়শী অবশ্য বুঝিতে পারিত যে এভাবে চণ্ডীগড় হইতে জীবানন্দকে সরাইয়া লইয়া গেলেই 'কে' সাহেবের বা রাজশক্তির রোষ হইতে তাহাকে চিরকালের জন্য বাঁচান যায় না। তাছাড়া গ্রন্থের শেষাংশে ষোড়শীর চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া আসা এইভাবে মানাইয়া না গেলে, আগেই যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মহৎ প্রেমের সুরভিতে বুক ভরিয়া লইয়া প্রিয়তম জীবানন্দের মর্যাদা বাঁচাইয়া যে ষোড়শী আপনিই সরিয়া গিয়াছিল, জীবানন্দের আত্মত্যাগের ও প্রজাকল্যাণের আর সেই সঙ্গে জনার্দন রায়কে শায়েস্তা করিবার

চেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে আপনা হইতে সেই ষোড়শীর আবার চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া আসা শিল্পকলার হিসাবে আরও নিম্নশ্রেণীর হইত।

ষোড়শী-জীবানন্দের পারস্পরিক হৃদয়-শূন্যতা পূরণে অবদান 'দেনা-পাওনা' নামকরণের মূলে রহিয়াছে। হৈম-ষোড়শীর দেনা-পাওনা হিসাব নিকাশের যে কথা এইমাত্র আলোচিত হইল তাহাও নামকরণের দ্বিতীয় কারণ বলা যায়। তাছাড়া জমিদার জীবানন্দ প্রজাদের শোষণ করিয়া তাহাদের কাছে যে ঋণ করিয়াছিল, প্রজাকল্যাণে তাহা পরিশোধের নৈতিক বাধ্যতাও 'দেনা-পাওনা' নামকরণের আর একটি কারণ। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের উপসংহারে ষোড়শীর কথামত তাহার সঙ্গে পলাইবার পূর্বে জীবানন্দ ষোড়শীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিয়াছে: "কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ?" ষোড়শী এ প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছে: "পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।" বলা নিষ্প্রয়োজন, হৃদয়ের দিক হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত জীবানন্দের কথাটা ভারি ভাল লাগিয়াছে, সে খুসি হইয়া বলিয়াছে: "ঠিক কথা অলকা। কিন্তু দেরি করলে ত চলবে না। এখন থেকে ত আমাদের দুজনকে এভার মাথায় নিতে হবে।"

'দেনা-পাওনা'র ষোড়শী ও জীবানন্দ নায়ক ও নায়িকা, দুটি চরিত্রই শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ সৃষ্টি। ষোড়শীর মধ্যে সংগ্রামী কর্মীসত্তার সহিত স্নিগ্ধ নারীসত্তার, শুদ্ধাচারিণী শুষ্ক ভৈরবীরূপের সহিত কোমলহৃদয়া প্রেমিকারূপের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। মন্দির পরিচালনায় এবং জনসেবার ক্ষেত্রে বহু মানুষের সহিত মেলামেশার ফলে ষোড়শী স্বাধীনসত্তার সাবলীল বহিঃপ্রকাশের যে ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাও তাহার নায়িকারূপের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'দেনা-পাওনা'র শরৎচন্দ্রের নিজের দেওয়া নাট্যরূপ 'ষোড়শী'র ষোড়শী চরিত্রটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে চরিত্রটি 'এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।' (শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ তারিখের পত্র, অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮৭)। এ মন্তব্য বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ষোড়শীদের বাস্তবরূপের সঙ্গে ষোড়শীর পার্থক্যের নিরিখে কিছুটা সত্য হইলেও শিল্পকলার হিসাবে এবং ক্রান্তিদর্শী লেখকের

সত্যসুন্দর জীবনবোধের নিরিখে অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। প্রেম-কাহিনীর নায়িকা হিসাবে ষোড়শীর এই মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য, ইহার অবাস্তবতা কিছু থাকিলেও তাহা ঔজ্জ্বল্যে ঢাকিয়া গিয়াছে, শিল্পকলা বা আর্টের হিসাবে তাহা সাফল্যের নিদর্শন।

'গৃহদাহ'-এর সুরেশের মত 'দেনা পাওনা'র জীবানন্দ গতিশীল পুরুষ চরিত্র, শরৎসাহিত্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষের ভিড়ে এইরূপ সক্রিয় পুরুষের সাক্ষাৎ পাঠক হৃদয়ে তৃপ্তিকর অনুভূতির সঞ্চার করে।* জীবানন্দ রিক্ত জীবনের পরিপূর্ণতার স্বপ্নে দুর্লভ প্রাপ্তি হিসাবেই ষোড়শীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং তাহাকে পাইবার জন্য সাগ্রহে দুহাত বাড়াইয়াছে। তাহার ষোড়শীর মত সংস্কার নাই, সমাজের প্রতিকূলতায় নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখিবার সাহস জমিদার জীবানন্দের আছে, তাই সে ষোড়শীকে ঘরণীরূপে নিজের ক্লান্ত জীবনের সব ভার দিবার জন্য একান্তভাবে চাহিয়াছিল। ষোড়শী তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিল না, কিন্তু ষোড়শীকে কেন্দ্র করিয়া জীবানন্দের বিশুষ্ক হৃদয়ে যে প্রেমের ধারা নামিল, যে আশার আলো জ্বলিল, তাহাই জীবানন্দকে পুরাতন অভ্যস্ত বিলাস-ক্লিন্ন পথ ছাড়িয়া ষোড়শীর আরব্ধ জনকল্যাণের কঠিন পথে চলিবার প্রেরণা দিয়াছে। এত পরিশ্রমের অভ্যাস জীবানন্দের ছিল না, তাহার অসুস্থ শরীর ইহাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জীবানন্দ কিন্তু প্রাণের মায়ায় কর্তব্য হইতে সরিয়া আসে নাই।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার জীবন-বিবর্তনে একটা সুস্থ নৈতিকতার, একটা সূক্ষ্ম ধর্মবোধের আবেগ স্পন্দিত হইয়াছে, তাছাড়া ভূমিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় উন্নততর জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার একটা আগ্রহও ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। দেবী চণ্ডীর মন্দির ঘিরিয়া গড়িয়া উঠা এ কাহিনী, দেবীর ভৈরবী ইহার নায়িকা, ফকির সাহেবের মহৎ প্রাণধর্ম ও কর্তব্যতন্ত্র ইহাতে গতিসঞ্চার করিয়াছে। দেবীর প্রচুর সম্পদ আছে বলিয়াই সেই সম্পদের রক্ষাকারী ভৈরবী পদটির জন্য এত লোকের

*জীবানন্দ ও সুরেশের চরিত্র বর্তমান গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ১০০-১০২) তুলনামূলকভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আগ্রহ, জমিদার জীবানন্দ, জোতদার জনার্দন রায়, সমাজ-অধিনায়ক ব্রাহ্মণ শিরোমণি, জমিদারের গোমস্তা এককড়ি, এমনকি ষোড়শীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তী পর্যন্ত কড়া ভৈরবী ষোড়শীকে সরাইবার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে। জমিদার জীবানন্দ শোষকদের শীর্ষদেশে, তাহার নীচে জোতদার জনার্দন, জনার্দনের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণ শিরোমণি, গোমস্তা এককড়ি, —ইহাদের বিপরীতে হরিহর সর্দার, বিপিন প্রভৃতি প্রজাদের অসহায় শোষিত রূপ। ক্রম-নিঃশেষিত-প্রাণরস গ্রামের ধূসর বিবর্ণতা পল্লীবাংলার অধঃপতিত অর্থনীতি ও সমাজনীতির পরিচায়ক। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান দুই মহান্ ধর্মসম্প্রদায়ের দুজন সন্ন্যাসিনী-সন্ন্যাসী ষোড়শী ও ফকির সাহেব ইহাতে নবজীবনের আশ্বাস ছড়াইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে আশ্বাসে শোষকপ্রধান জীবানন্দের চেতনা জাগিয়াছে। 'দেনা-পাওনা'র ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিতে হয়তো জীবানন্দের জীবন-প্রস্তুতি এই প্রধানোচিত নয়, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী পাইয়া সে একটা অর্থনৈতিক চক্রে জড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই প্রধানের ভূমিকা স্বতঃই তাহাতে বর্তাইয়াছে। সুতরাং জীবানন্দের মহৎ ভাবজীবনে উত্তরণ বিরাট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। লেখক শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনার ও অর্থনৈতিক চেতনার সম্যক্ উপলব্ধিতে বিষয়টির মূল্য অনস্বীকার্য। এই উপন্যাসে বড় প্রেমের জয় হইয়াছে, রসিক পাঠক তাহা অবশ্যই উপভোগ করিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আলোচ্য তত্ত্বের দিকটিও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

শরৎচন্দ্রের **'চরিত্রহীন'** উপন্যাসখানি (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯১৭) কলাশিল্পের দিক হইতে মোটামুটি উন্নতধরণের রচনা এবং উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাস হিসাবে 'গৃহদাহ' ও 'দেনা-পাওনা'র পরেই ইহার স্থান। 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা' ও 'শ্রীকান্ত'র মতই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট সৃষ্টি; ঘরোয়া সাধারণ সিদ্ধরসের কাহিনীর অতিরিক্ত জটিল মনস্তত্ত্বসমন্বিত মানবচরিত্রের আলেখ্য ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র

অল্পবয়সেই লিখিতে আরম্ভ করেন।* সম্ভবতঃ গ্রন্থটি শেষ হয় নাই বলিয়াই তাহা অপ্রকাশিত অবস্থায় রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বাসায় আগুন লাগায় অন্যান্য অনেক জিনিসের সহিত 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপিটিও পুড়িয়া যায়। পরবর্তীকালে অনেকটা স্মৃতির উপর এবং সংগৃহীত পুরাতন কাগজপত্রের উপর নির্ভর করিয়া শরৎচন্দ্র পুনরায় 'চরিত্রহীন' লেখেন। আগুন লাগার কথা শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা চিঠিতেই আছে।‡ 'চরিত্রহীন'-এর এই পরিবর্তিত রূপও শরৎচন্দ্রের ঠিক পছন্দ হয় নাই, পরিণত রচনাশক্তি ও অভিজ্ঞতায় তিনি পঞ্চম সংস্করণে পুনরায় 'চরিত্রহীন' সংশোধন করেন। 'চরিত্রহীন' অল্প বয়সে প্রথম লেখা হইলেও মনে হয় বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থে মূল রচনার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই; চরিত্র কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে, আখ্যান বিন্যাসে 'চরিত্রহীন'-এ পরিণত প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী বিদুষী, নানা তত্ত্বকথা সে আলোচনা করিয়াছে,

*অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী'তে (পৃষ্ঠা ৫৬) আছে : ১৩৪৪ সালে মুদ্রিত 'চরিত্রহীন'-এর পঞ্চম সংস্করণের জন্য শরৎচন্দ্র একটি ভূমিকা লেখেন। দপ্তরীর ভুলে এই ভূমিকাটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ভূমিকাটি এইরূপ :—"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখিয়াছিলাম অল্প বয়সে। তারপরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হ'ল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানাস্থানে নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ওইভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।" গ্রন্থকার ১৪।৭।৩৭।

‡রেঙ্গুন হইতে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ২২।৩।১৯১২ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন : "আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript ; 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।"—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬)

কিরণময়ী চরিত্র এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থের গঠন লক্ষ্য করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র যে পড়াশুনার সুযোগ পাইয়াছিলেন, বর্তমান 'চরিত্রহীন' সেই বিদ্যার পরিচয় বহন করিতেছে। এই সময় শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' লিখিতেছিলেন,* নারীর মনস্তত্ত্ব, অধিকার এবং অধিকার-বোধ সম্বন্ধে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে যে চিন্তার পরিচয় আছে তাহা 'চরিত্রহীন'-এও লক্ষণীয়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে।

'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হইবার পর বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু অসামাজিক প্রেমরূপ এবং মেসের ঝি সাবিত্রী ও বিধবা কিরণময়ীর প্রেমিকারূপের জন্য নীতি-বিবর্জিত গ্রন্থ হিসাবে অনেকে ইহার নিন্দা করেন। 'চরিত্রহীন' প্রথম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইলেও 'ভারতবর্ষ' কর্তৃপক্ষ ইহা "অত্যন্ত অশ্লীল" মনে করিয়া অমনোনীত করেন। (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য', পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য।) 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিল এবং 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে কেহ বিরূপ সমালোচনা করিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। ইহা লইয়া তিনি কাহারও কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্কও করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' 'চরিত্রহীন' অমনোনীত করিলে শরৎচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া রেঙ্গুন হইতে 'ভারতবর্ষ' পরিচালনায় যুক্ত তাঁহার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) লেখেন: "প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ। এ একটা Scientific Psych. and Ethical Novel: আর কেউ এরকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই (নায়িকা সাবিত্রী মেসের ঝি বলিয়া)? কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রেজারেকসন' পড়েছ কি? His Best Book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া।"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬১)

*'যমুনা' মাসিক পত্রিকায় ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায় 'চরিত্রহীন'-এর প্রথম অংশ প্রথম প্রকাশিত হয়, 'নারীর মূল্য' 'যমুনা'তেই ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

আগেই বলা হইয়াছে, বিষয়বস্তু, কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র, এসব দিক হইতে বাংলা সাহিত্যে 'চরিত্রহীন' নূতন ধরণের উপন্যাস। 'চরিত্রহীন'-এর কাহিনী যদিও ঘন-সংবদ্ধ নয় তবু ইহা অত্যন্ত জটিল এবং শিল্প-কলাগত কৃতিত্বের স্বাক্ষর ইহাতে যথেষ্ট। 'চরিত্রহীন' নামকরণেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। সাধারণ সমাজবোধ লইয়া পাঠক চরিত্রহীনতা বলিতে যাহা বুঝে, তাহার উপর জিজ্ঞাসার চিহ্ন চাপাইয়া ইহাতে যেন মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়া আপাত-চরিত্রহীনতা বা আপাত-সচ্চরিত্রতার অন্তরালে চিত্ত-ক্ষুধার স্বরূপ-সন্ধানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।* সহজদৃষ্টিতে মনে হয় সতীশ চরিত্রহীন, সে ভদ্রসন্তান হইয়াও আত্ম-সংযমে ব্যর্থ হইয়া মেসের ঝি সাবিত্রীর সহিত প্রেম করিয়াছে। বিধবা কিরণময়ীর সঙ্গে পলায়িত দিবাকরও চরিত্রহীন। ইহা স্থূল ঘটনা। কিন্তু এই উপন্যাসে যাহাকে সতীশ 'দেবতা' বলিয়াছে, সাবিত্রী 'আজন্মশুদ্ধ' বলিয়াছে, সেই উপেন্দ্রের অন্তরের গভীরে পরস্ত্রী কিরণময়ীর প্রতি মোহের একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও এই উপন্যাসে রাখা হইয়াছে এবং সে অর্থে 'উপেন্দ্র'কে চরিত্রহীন বলিয়া চিহ্নিত করিলে শিল্পকলার দিক হইতে একধরণের তৃপ্তি হয়। উপেন্দ্রের প্রেমময়ী স্ত্রী সুরবালা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, উপেন্দ্রের শিক্ষা-সংস্কৃতি আত্ম-সংযমের অনুকূল, তাহার আচার-আচরণে, কথাবার্তায় সভ্য, সংযত, সংস্কৃতিমান মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দিবাকরের সহিত তাহার কলঙ্ক-কাহিনী যে মিথ্যা রচনা মাত্র, সে কথা বুঝাইতে কিরণময়ী যখন উপেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, উপেন্দ্র ঘৃণাভরে তাহার মাথা

* অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণে শরৎচন্দ্র যেন আমাদের প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকে প্রকাশ্যভাবেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন —সমাজ বিচারের মানদণ্ডকে যেন স্পর্ধিত বিদ্রোহের সহিতই অতিক্রম করিয়াছেন। সতীশ-সাবিত্রীর অপরূপ প্রেমলীলাই গ্রন্থের প্রধান বিষয়—ইহার চতুষ্পার্শ্বে উপেন্দ্র দিবাকর কিরণময়ী আপন আপন দুশ্ছেদ্য জাল বয়ন করিয়া প্রেমের রহস্যময় জটিলতাকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২০)

সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কিরণময়ীকে 'নাস্তিক, অপবিত্র, ভাইপার' বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই উপেন্দ্র কিরণময়ী সম্পর্কে সুপবিত্র, এমনই একটা ধারণা পাঠকের হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উপেন্দ্রের কিরণময়ীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর ব্যভিচারের কথায় বিশ্বাসের ফল, তাহার নিজের সরাসরি কিরণময়ী সম্পর্কে আচরণ নয়। বরং কিরণময়ী একদিন রাত্রে তাহাকে আপন ভালবাসা নিবেদন করিতে করিতে লুচি ভাজিয়া খাওয়াইয়াছে, তাহারা দুইজন ব্যতীত অন্য কাহারও উপস্থিতিহীন সেই ঘরে ম্লান প্রদীপালোকে উপেন্দ্র সুন্দরী বিধবা তরুণীর প্রেম-স্বীকৃতি একরূপ উপভোগ করিয়াই তাহার পরিবেশিত খাবার তৃপ্তি করিয়া খাইয়াছে, সেদিন তাহার মুখ হইতে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় নাই। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, তাহার প্রতি কিরণময়ীর ভালবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই প্রিয় তরুণ ভ্রাতা দিবাকরকে অখণ্ড বিশ্বাসে উপেন্দ্র বিধবা যুবতী কিরণময়ীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। কিরণময়ীর প্রেমে সম্মতি যদিও উপেন্দ্র মুখে স্বীকার করে নাই অথবা এজন্য চিত্তচাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই, তাহাতে মৌন সম্মতির অনুমান দূর হয় না; ইহার সম্ভাব্য কারণ স্নিগ্ধ সুরবালার প্রতি উপেন্দ্রের নিজের ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ ছাড়াও তাহার নিজের ভদ্রতাবোধ ও সভ্যতাবোধ সম্পর্কে গর্ব। দিবাকর-কিরণময়ী প্রসঙ্গ উপেন্দ্র যখন বিশ্বাস করিয়াছে, তখনই তাহার কিরণময়ীর উপর আস্থা চূর্ণ হইয়াছে, সে নিজেকে কিরণময়ীর দ্বারা প্রতারিত ভাবিয়াছে। ঈর্ষা হইতে ক্রোধ জন্মিয়াছে, ক্রোধ হইতে ঘৃণা জন্মিয়াছে, স্বভাবতঃ শান্ত উপেন্দ্র ক্ষেপিয়া গিয়া কিরণময়ীকে তীব্র কটূক্তি, দৈহিক আঘাত পর্যন্ত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে প্রথমে পদস্খলিতা নারী সাবিত্রীতে অনুরক্ত চরিত্রহীন সতীশকে অতিক্রম করিয়া সাধারণভাবে মহৎ উপেন্দ্রের রূপসী পরনারী বিধবা কিরণময়ীর প্রতি সূক্ষ্ম আসক্তি এবং সেই প্রশ্রয়ে উদ্বেল হইয়া উপেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা কিরণময়ীর বহির্মুখী পতঙ্গবৎ আচরণ দেখানো হইয়াছে, তারপর দিবাকরকে ঘিরিয়া তাহার কলঙ্ক রটিলে উপেন্দ্রের চরম দুর্ব্যবহারে আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্তা নারীর প্রচণ্ড বিচিত্র প্রতিশোধ প্রয়াস এবং ভুলের মাশুল দিতে হতাশা, অবসাদ

ও শেষ পর্যন্ত উন্মাদিনী হওয়ায় কাহিনী বিন্যস্ত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' নামকরণে এই কিরণময়ী-উপেন্দ্র প্রসঙ্গের গুরুত্ব যথেষ্ট।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী ও কিরণময়ী এই দুই প্রেমিকাকে কেন্দ্র করিয়া দুই নায়িকার দুটি পৃথক গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুজনেই উপন্যাসের হিসাবে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র। দুটি পৃথক কাহিনীকে বেদনার সমতলে মিলাইয়া দিয়া নায়িকা দুইজনকে বহুদূরের ব্যবধান হইতে কাছাকাছি লইয়া আসা হইয়াছে, কিন্তু সুযোগের অভাবে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয় নাই। দুই শক্তিময়ী নায়িকার একই সঙ্গে অগ্রগতির জন্য 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের আয়তন যেভাবে বাড়িয়াছে কাহিনীর সাবলীলতা তদনুযায়ী রক্ষিত হয় নাই এবং রসের ঘনতা গল্পের জমাটভাবের অভাবে আশানুরূপ হয় নাই। মরণপথযাত্রী উপেন্দ্রকে মাঝখানে রাখিয়া সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে একত্র করা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই নায়িকাকে লেখক সমমানে সামলাইয়া তীরে তুলিতে পারেন নাই। কিরণময়ীর কাহিনী শরৎচন্দ্র যেরূপ যত্ন করিয়া গ্রথিত করিয়াছেন, যেভাবে তিনি তাহার হৃদয়-অরণ্যে ঢুকিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়াছেন, সাবিত্রীর প্রতি সমভাবে মনঃসংযোগ করা একই সঙ্গে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য কিরণময়ীর কাহিনীর পাশে রাখিয়া পৃথক কাহিনীরূপে দেখিলে সাবিত্রীর কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণও কম নয়। স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপনে বঞ্চিতা নারী তাহারা দুজনেই, দুজনের নারী-হৃদয়ই আশা বাসনায় উদ্বেল, দুজনেই বিধবা হইয়া পরপুরুষকে ভালবাসিয়াছে। শরৎচন্দ্র দুজনের মস্তকেই দুঃখের পসরা তুলিয়া দিয়াছেন, সাবিত্রী ও কিরণময়ী উভয়েই ভাগ্যের বলি হইয়া গিয়াছে। কিরণময়ীর শিক্ষার ও সংগ্রামী প্রকৃতির চোখ-ঝলসানো উগ্রতা সাবিত্রীর নাই, তবু সাবিত্রীর জীবনও কম ঘটনাবহুল নয় এবং কিরণময়ীর বিপরীতে স্নিগ্ধ, ধীর, কল্যাণী, প্রেমিকা সাবিত্রী আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। চরিত্র দুইটির সাংগঠনিক উপাদান এবং তাহাদের উপর পরিবেশের প্রভাবও সমান নয়, সাবিত্রী এদিক হইতে কিরণময়ীর মত লেখকের সহায়তা পায় নাই। উপন্যাসের উপসংহারে কিরণময়ী উন্মত্তা হইলেও নায়িকা থাকিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে উপন্যাসে প্রকৃতই নায়িকা হইবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সাবিত্রী যেন উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পাশে সেবিকা-

রূপের অন্তরালে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, পাঠকের কাছে তাহার এই অনুজ্জ্বল পরিণতিতে তাহার জীবননাট্যের ট্র্যাজেডি উপলব্ধির সুযোগ সত্যই কমিয়া গিয়াছে।

সাবিত্রী ও কিরণময়ী দুটি চরিত্র পরিকল্পনাতেই শরৎচন্দ্র শক্তি ও আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সমাজনীতির দাপট স্বীকার করিয়াও চরিত্র দুইটিকে তিনি আত্মস্বাতন্ত্র্যের মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অঙ্কনে এই প্রয়াস মূল্যবান। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ী যেন মশালের আলো, উগ্রতাও যেমন দাহিকা-শক্তিও তেমনি, এই উগ্র দাহিকা-শক্তি তাহার চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেও সেই আগুনে পুড়িয়াছে। সাবিত্রী প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো, সে চারিদিক আলোকিত করিয়া আপন স্নিগ্ধ মহিমায় একপ্রান্তে সরিয়া আসিয়া অপরের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কিরণময়ী বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় বাহিরকে নিজের দিকে সাধ্যমত আকর্ষণ করিয়াছে। সাবিত্রী সংযত দাক্ষিণ্যে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে। দুজনেই বিধবা, দুজনেই পরপুরুষকে ভালবাসিয়াছে; কিন্তু কিরণময়ী যেখানে নিজের পাওয়ার প্রশ্নকে বড় করিয়া দেখিয়া অপ্রাপ্তির ক্ষোভে উপেন্দ্রকে আঘাত করিতে গিয়া তরুণ চপলমতি দিবাকরকে পাঁকে ডুবাইয়াছে, সাবিত্রীর সে ভূমিকা নয়; সাবিত্রীর প্রেমের আলোকে আপনাকে যথার্থ চিনিয়া ভালবাসার ধনকে বাঁচাইয়াছে। কিরণময়ী নয়, সাবিত্রীই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নায়িকাদের সগোত্রা, তাহার জীবনবোধের সঙ্গে রাজলক্ষ্মী ষোড়শীর একান্ত মিল। সাবিত্রী কিরণময়ীর চেয়ে কিছু বেশিই পাইয়াছে, অসামাজিক প্রেম হইলেও সতীশের ভালবাসার সুরভিত স্মৃতিতে বুক ভরিয়া সে শ্রদ্ধাস্পদ উপেন্দ্রের ভগ্নীত্বের গৌরব লইয়া শান্তি খুঁজিয়াছে। চিত্তক্ষুধার নিরিখে এই শান্তি সে পাইয়াছে কি না সে কথা গ্রন্থে লেখা নাই, কিন্তু সতীশের নিকট হইতে শেষ বিদায়ের দৃশ্যে এবং উপেন্দ্রের রোগশয্যার শেষ দৃশ্যে তাহার জৈব হাহাকারও ধ্বনিত হয় নাই। সাবিত্রীর সীমাবদ্ধ সঙ্গতির হিসাবে তাহার পরাজয় কিরণময়ীর মত শোচনীয় নয়, কিরণময়ী শুধু পাগল হইয়া গিয়াছে তাহাই নহে, তাহার নাস্তিক্য-দর্শনেরও সমাধি রচিত হইয়াছে। দিবাকরকে সে একদিন

বলিয়াছিল: "আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে', সেই কিরণময়ীই উপেন্দ্রের শেষ সময়ে চোখের জলে ভিজিয়া তিন দিন ধরিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছে, উন্মত্ততার সাময়িক বিরতির ফাঁকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছে: "আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে? হয়ত ভাল হয়ে যাবে। শুনেছি এমন কত লোক ভাল হয়ে গেছে।*

কিরণময়ীর মত আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত তীব্রগতি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমলের সঙ্গে এদিক হইতে কিরণময়ীর মিল আছে, কিন্তু কমলের তর্ক নূতনত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যেখানে অধিক ছটফট করে, কমল যেখানে তর্কের জন্যই বেশী তর্ক করে, কিরণময়ী সেখানে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবেশে অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলে। বিদ্যার দীপ্তি দুজনেরই আছে, দুজনের জীবনায়নই স্পর্ধিত, কিন্তু কমলের সৃষ্টির সময় শরৎচন্দ্র যে আধুনিকতামুখী মনোভাব লইয়া কমলকে অবলীলাক্রমে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, কিরণময়ীর জীবনের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবে তাহা অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে অঙ্কিত। এই গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' অধ্যায়ে কমলের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে কমলকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবনের ভারসাম্যচ্যুত চঞ্চল তর্ক-বিতর্ক-প্রবণ স্থিতিহীন শিক্ষিত

* এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, কিরণময়ীর মত 'গৃহদাহ'-এর সুরেশও নাস্তিক ছিল। দুইজনেই দুঃখ পাইয়াছে। হয়ত নাস্তিকতার জন্য তাহাদের প্রতি আস্তিক লেখকের সহায়তা সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু সুরেশ আপন ভুল বুঝিয়া তাহা উদারভাবে স্বীকার করিয়াও ভগবানে আত্মসমর্পণ ছাড়াই যেভাবে বিদায় লইয়াছে, তাহাতে তাহার জীবন-দর্শন কিরণময়ীর মত পরাজিত হয় নাই। কিরণময়ীর সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত তার্কিক কমলের ('শেষপ্রশ্ন') মিল আছে, কিন্তু ভগবানের দিকে কমলও শেষ পর্যন্ত কিরণময়ীর মত ঘুরে নাই। বলা বাহুল্য, উন্মাদিনী হওয়া এবং এইভাবে ভগবৎমুখী হওয়ায় কিরণময়ীর ট্র্যাজেডি সুরেশের ট্র্যাজেডির তুলনায় অনেক তরল হইয়া গিয়াছে। সুরেশ ভুল করিয়াছে এবং কিরণময়ী পাপ করিয়াছে, তাহাদের জীবনের পরিণতিতে পাঠকের এই ভাবে পৃথক ধারণা জন্মায় বলিয়া সুরেশের জন্য পাঠক যতখানি ট্র্যাজেডির গভীর বেদনা বোধ করে, কিরণময়ীর জন্য ঠিক ততখানি করে না।

বাঙালী মানসের প্রতীক বলা হইয়াছে, কিরণময়ী কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আলোচ্য চঞ্চল কালের পূর্বেই পরিকল্পিত আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় আবেগাকুল ভ্রান্ত পথানুসারী চরিত্র। সে ভুল করিয়াছে, অনেক দাম দিয়া শেষ পর্যন্ত সেই ভুলের কথা সে স্বীকারও করিয়াছে। কমল আপন চিন্তার কেন্দ্রে স্থিতিশীল চরিত্র, তাহার ভুল ভ্রান্তির প্রশ্ন উঠে নাই, চলমান রূপ তাহার, সারা পথে আপনার সুস্পষ্ট পদচিহ্ন আঁকিয়া কমল স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের ভাবদৃষ্টির প্রতীক নয়, তাঁহার সৃষ্টি হিসাবে ইহা ব্যতিক্রম —একথা আগেই বলা হইয়াছে। সেজন্য কিরণময়ীর জীবনের ব্যর্থতার বা ট্র্যাজেডির হিসাবে কমলের জীবনকে বিচার করিয়া লাভ নাই।

ব্যক্তি-জীবনে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী কিরণময়ী তাহার উপরে চাপাইয়া দেওয়া সমাজের কঠিন শৃঙ্খল চূর্ণ করিতে জীবনপণ সংগ্রাম করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহার হার হইলেও সংগ্রামের এই ইতিহাস অত্যুজ্জ্বলতায় অভিনব। উপেন্দ্রের জন্য অসামাজিক ভালবাসায় সে নিঃশেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রথমে সে উপেন্দ্রকে নৈতিকভাবে ভালবাসে নাই, প্রেমিকা সুরবালার স্বামী উপেন্দ্রকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিয়া সুরবালার আদর্শে আপন জীবনকে নূতন করিয়া বিন্যস্ত করিতে কিরণময়ী অনঙ্গ ডাক্তারের কামনাবহ্নি হইতে নিজেকে একেবারে সরাইয়া লইয়া রুগ্ন স্বামী হারাণের সেবায় কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কিরণময়ীর দুর্ভাগ্য তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হারাণ চলিয়া গেল। তারপর বিধবা কিরণময়ী নিজের পানে তাকাইয়া, চিত্তক্ষুধার বাস্তব দাবী স্বীকার করিয়া উপেন্দ্রকে কামনা করিল। উপেন্দ্র তাহার সূক্ষ্ম দুর্বলতা দেখাইয়া ছিল, তাহার এই দুষ্প্রয়াসের ইহাও ভিত্তি। যাহা হউক, উপেন্দ্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া কিরণময়ী একরূপ ক্ষেপিয়া গেল এবং উপেন্দ্রের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে উপেন্দ্রের তাহার নিকট গচ্ছিত রাখা স্নেহের ভাই দিবাকরকে আপন রূপমুগ্ধ করিয়া কিরণময়ী আরাকানে পলাইতে জাহাজে উঠিল। তারপর অদ্ভুত মনের জোরে কিরণময়ী জাহাজে এক শয্যায় শয়ন করিয়াও উপেন্দ্রের ছোটভাইকে ছোটভাই করিয়াই রাখিল, দিবাকরের জাগ্রত পশুপ্রবৃত্তিকে পাশ কাটাইয়া তাহাকে ও আপনাকে শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা করিল। কিরণময়ীর এ পথই ভুল পথ, ইহাই শরৎচন্দ্রের জীবন-দৃষ্টি। এজন্য কিরণময়ী দারুণ লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিরণময়ী যে কাজ করিয়াছে তাহা অসামাজিক, বিধবা কিরণময়ীর সুরবালার

স্বামী উপেন্দ্রকে এইভাবে কামনা করা সমাজদেহের উপর কঠিন আঘাত, শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা তাহা ক্ষমা করে নাই। কিন্তু তবু মনে হয় কিরণময়ী যে শাস্তি পাইয়াছে, তাহা পাপের চেয়ে যেন বেশি হইয়াছে। শিল্পকলার দিক হইতে, ট্র্যাজেডির হিসাবে 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী এবং 'গৃহদাহ'-এর সুরেশ তুইটিই আকর্ষণীয় চরিত্র, তুজনেই কঠিন দুঃখ পাইয়াছে। কিন্তু এই দারুণ দুঃখ দিবার পশ্চাতে তাহাদের প্রতি লেখকের সহৃদয়তার অভাবও কিছুটা কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখক শরৎচন্দ্র তাহাদের জীবন বা জীবনবোধ সমর্থন করেন না বলিয়া তাঁহার নিজের ভাবদৃষ্টি এই শাস্তিদানে কতটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় হইয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়। আগেই বলা হইয়াছে, সুরেশ ও কিরণময়ী তুজনেরই ভগবানে বিশ্বাস ছিল না, শরৎচন্দ্র ভগবৎ শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন, এই বিপরীত মুখী ভাব বিজয়ী হওয়ার জন্য অন্ততঃ লেখক শরৎচন্দ্রের সাহায্য পায় নাই। পক্ষান্তরে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ধর্মপ্রাণা ষোড়শী নায়িকার উজ্জ্বলতা লইয়াই শুধু ফুটে নাই, প্রেমে ও জীবনে ষোড়শী যে বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার পিছনে লেখকের সহানুভূতি কিছুটা কাজ করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিরণময়ীর পাশে 'চরিত্রহীন'-এর অপর নায়িকা সাবিত্রীর কথাও বিবেচ্য। সাবিত্রীর বিদ্যা কম, বিদ্যার অহঙ্কার কিছুই নাই, তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ নায়িকার উপযুক্ত কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যের স্পর্ধা সাবিত্রী দেখায় না। প্রশান্ত স্ফুরণে সাবিত্রীর স্বাতন্ত্র্য পাঠক হৃদয়ে আপনি স্থান করিয়া লয়। সাবিত্রী চরিত্রে বাঙ্গালী মেয়ের স্নিগ্ধ রূপটি বহুলাংশে বিধৃত হইয়াছে বলিয়া সাবিত্রীকে কিরণময়ীর তুলনায় আমাদের অনেক কাছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তবু সাবিত্রীর চরিত্রের স্বাভাবিকতার একটা প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। মেসের ঝি বলিতে আমরা যে সাধারণ স্ত্রীলোক বুঝি, সাবিত্রী তদপেক্ষা অনেক মার্জিত-রুচি, অনেক বুদ্ধিমতী, অনেক মনোবল-সম্পন্না। এই মেসের ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোকের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা কেহ আশা করে না। মেসের মেম্বার সতীশ সাবিত্রীকে তাহার 'বাবুর' কথা ইঙ্গিত করিয়াছে, সাবিত্রী হালকাভাবে তাহার পয়সায় বসিয়া বসিয়া খাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু এসবই হাল্কা কথা। নৈতিক পবিত্রতা, অন্ততঃ দেহের ক্ষেত্রে, সাবিত্রীর উপর লেখক উৎসাহের সঙ্গে চাপাইয়াছেন এবং সমাজের ভ্রষ্টাচারের ও প্রতারণার চাপে সম্ভাবনার শিখর হইতে তাহাকে পাঁকের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সেই পাঁকের

মধ্যে পঙ্কজের মত সাবিত্রীর চরিত্র-সুরভি বিস্তার করাইয়া তাহাকে সহানুভূতি-ধন্য বেদনা-ম্লান ট্র্যাজিক চরিত্র করিয়া তোলা হইয়াছে। সতীশের অসুখের পর সাবিত্রী যখন উপেন্দ্রের সেবা করিবার জন্য বিদায় চাহিল, সতীশ উত্তেজিত হইয়া তাহাকে ছাড়িতে অস্বীকার করিয়া বলিল সে তাহাকে বিবাহ করিবে। এই সময় সাবিত্রী সতীশকে বলিয়াছে যে যদিও তাহার দেহ তখনও নষ্ট হয় নাই, তবু এই দেহ দিয়াই সে অনেককে ইচ্ছা করিয়া যখন ভুলাইয়াছে, তখন ইহা দ্বারা আর যাহারই সেবা চলুক, ভালবাসার ধন সতীশের পূজা সে করিতে পারিবে না। সাবিত্রীর যে পরিবেশ তাহাতে তাহার নিজের উক্তি না হইলে তাহার দেহ যে নষ্ট হয় নাই একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন হইত। সাবিত্রী যেখানে রাত্রিবাস করে সেই বাসায় ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীর আবহাওয়া নাই। সেখানে সাবিত্রীর অনুপস্থিতিতে মাতাল হইয়া ইয়ার বন্ধুদের লইয়া মেসের বিপিন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মোক্ষদাকে ২০ টাকা দিয়া সাবিত্রীর ঘরে আস্তানা গাড়ে। তারপর তাহারা আরও মদ খায়। বিপিনের পয়সায় মদ খাইয়া বাড়ীর দুই প্রবীণা ভাড়াটে মোক্ষদা ও বিধু হুল্লোড় করে এবং তজ্জন্য লজ্জা পায় না। মোক্ষদা সাবিত্রীকে জাঁক করিয়াই শুনাইয়া দেয়: "আমরা হঠাৎ খাইয়ে মেয়ে মানুষ নই। জিজ্ঞাসা কর গে তোর বাবুকে, যে এক গেলাস খেয়ে উল্টে পড়ে আছে, তাকে। ওরে, আমরা মরি, তবু মর্যাদা হারাইনে—আঁচলে দুখানা নোট বেঁধে দিয়েচে, তবে গেলাস ধরেচি।" সাবিত্রী এখানে অবশ্য অবাক হইয়াছে, মোক্ষদার এ রূপ সে দেখে নাই, ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিয়াছে: "মাসি, তুমি মদ খাও? তুমি মাতাল?" ইহাতে ঘটনাটি নূতন এরূপ ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা হইয়াছে। যাহা হউক, সাবিত্রীর সচ্চরিত্রতা মোক্ষদা যদি জানিতই, তবে টাকা খাইয়া মাতাল বিপিনকে ও তাহার বন্ধুদের সাবিত্রীর ঘর খুলিয়া দিল কি বিবেচনায় এবং কোন সাহসে? অন্ততঃ পরিবেশের আনুকূল্য তাহাকে এ ভরসা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাড়ীউলির কথাগুলিও তুচ্ছ নয়। 'বাড়ীময় মুড়ি, কড়াই ভাজা, হাঁসের ডিমের খোলা, কাঁকড়া চিবানো, চিংড়ি মাছের খোলা ছড়াছড়ি যাইতেছে—পা ফেলিবার স্থান নাই।' বাড়ীউলি সাবিত্রীকে সব মুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছে: "না বাছা, স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই, আমার বাড়ীতে এ-সব অনাচার চলবে না। যে যার ঘরে বসে যা ইচ্ছে করো, আমি বলতে যাব না, কিন্তু বাইরে বসে এ সব কাণ্ড হবে না।" (৯ম

পরিচ্ছেদ।) সাবিত্রী নিজেও সতীশকে বলিয়াছে ; "একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালি মাখিও না।" নিজের দেহগত পবিত্রতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত মানুষ নিজেকে এতখানি ছোট করিয়া দিবে, সতীশকে এড়াইয়া তাহাকে গ্লানিমুক্ত রাখার চেষ্টার সম্ভাব্যতা মনে রাখিলেও সাবিত্রীর মত আত্মমর্যাদাশীলা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী মেয়ে শুধু সংস্কার বশেই এতখানি হীনমন্যতা অনুভব করিবে, ইহা ঠিক মানিয়া লইতে মন চায় না। 'অস্পৃশ্য' এবং 'কুলটা' দুইটি অতি কঠিন কথা, সাবিত্রীর দেহগত পবিত্রতা থাকিলে এই দুটি শব্দের রূঢ়তার অনেক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। সাবিত্রী ৯ বছর বয়সে বিধবা হইয়াছিল. ভগ্নীপতি ভুবন মুখুজ্যে তাহাকে বিবাহ করিবে ভরসা দেওয়ায় বিবাহিত জীবন যাপনের আশায় সাবিত্রী কুলত্যাগ করে, ভুবনের সহিত একমাস একঘরে বাস করিয়াছিল একথা গ্রন্থেই আছে। এক মাস কম সময় নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রত্যয় লইয়াও সাবিত্রী পুরুষ ভুবনের কামনা এড়াইয়া দেহ পবিত্র রাখিল—একথা মানিয়া লওয়া সহজ নয়। 'গৃহদাহ'-এর অচলা রামবাবুর বাড়ীতে একটি রাত্রের ঝড়েই তো ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।)

'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর মত 'শ্রীকান্ত'-র রাজলক্ষ্মীর দৈহিক পবিত্রতার প্রশ্ন। সাবিত্রীর মতই* রাজলক্ষ্মীকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যেরূপ আচার পরায়ণা ব্রাহ্মণ মহিলা রাখা হইয়াছে এবং যেভাবে সে গাড়ীতে খায় না, কমললতার হাতে খায় না, ব্রতাদিতে উপবাসে থাকে, এবং যেভাবে সপত্নী-পুত্র বঙ্কুর মুখে মায়ের শুধু গান-বাজনার পেশার প্রশংসা শুনানো হইয়াছে, তাহাতে তাহার দৈহিক পবিত্রতা সম্পর্কে সাবিত্রীর মত নিজের মুখে ঘোষণা না থাকিলেও কিছুটা ইঙ্গিত অবশ্যই আছে। রাজলক্ষ্মী জমিদার, বড়লোক, রাজা-মহারাজার বাড়ী গান গাহিতে যায়, সে বাইজী, দোর্দণ্ড প্রতাপ বিলাসী, ধনীর মুঠার মধ্যে সৌন্দর্য, প্রতিভা ও যৌবন লইয়া সে রাত কাটায়, তাহার দৈহিক পবিত্রতা এই প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘদিন রক্ষিত হইয়াছে, একথা ভাবিতেও পাঠক নিঃসন্দেহে অসুবিধাবোধ করে। শ্রীকান্ত প্রথম

* মেসের চাকর বেহারী সাবিত্রী সম্পর্কে সশ্রদ্ধভাবে সতীশকে জানাইয়াছে যে, সাবিত্রী রোজ আহ্নিক করে, সে মাছ খায় না, রাত্রিতে একটু জলটল ছাড়া খায় না, "ভদ্দর লোক কি না তাই।" (৮ম পরিচ্ছেদ)

পর্বে রাজলক্ষ্মীর কাশীতে মরিয়া শিবত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে এই মৃত্যু রটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভদ্র গৃহস্থ জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। শ্রীকান্ত যখন রাজলক্ষ্মীর উত্তরে বলিল, তাহাকে আটকাইলে লোকনিন্দা হইবে ('শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব, ১০ পরিচ্ছেদ), বিষণ্ণ রাজলক্ষ্মী নিজেই শ্রীকান্তকে বলিয়াছে, "কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারাজীবন শুধু জাল-খত তৈরী করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও।" বলা বাহুল্য, এই উক্তি স্মরণ রাখিলে রাজলক্ষ্মীর দেহগত পবিত্রতার কথাটা অস্পষ্ট হইয়া যায়। রাজলক্ষ্মী সঙ্গীতে পারদর্শিতা পরে লাভ করিয়াছে, কিন্তু আগে তো আশ্রয়ের কথা, উদ্ভিন্ন যৌবনের কথা। ভদ্রসংসারে আশ্রয় পাইয়া বাইজী জীবনের প্রস্তুতি হইয়াছে একথা আন্দাজ করার অর্থ হয় না এবং যদি উপযুক্ত স্থানে বাইজী-জীবনের প্রস্তুতি হইয়া থাকে তাহা হইলে সুন্দরী রাজলক্ষ্মীর দেহগত পবিত্রতা সংরক্ষিত হইয়াছে, একথাও অনুমান করা সহজ নয়।

মোটের উপর, সাবিত্রী বা রাজলক্ষ্মী দুজনকেই দেহগত অপবিত্রতার দায় হইতে শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের পরিধিতে অন্ততঃ মুক্তি দিয়াছেন। তাহাদের পদস্খলনের ইঙ্গিত আছে অথচ দেহগত কলুষতার কথা নাই। এই দেহগত কলুষতা-লিপ্ত না দেখাইয়া প্রেমের প্রশ্নে শরৎচন্দ্র তাহাদের নায়িকা করিয়াছেন এবং মধ্যবিত্ত-সুলভ রোমান্টিকতায় তাহাদের মন ভরিয়া দিয়া ব্যর্থ ভালবাসার দুঃসহ দুঃখে তাহাদের দহন করিয়াছেন। লেখক ও পাঠকদের সহানুভূতি পাইয়া এই নিরুপায় দুঃখদহনের বেদনাক্লিষ্টা প্রেমিকা সাবিত্রী ট্র্যাজেডির নায়িকা হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীও এইরূপ গৌরব কিছুটা পাইয়াছে, তবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস অসমাপ্ত বলিয়া ইহা পুরোপুরি তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। ৫ম পর্ব লেখা হইলে হয়ত পাঠক তাহার জীবন-কথা সবিস্তারে শুনিতে পাইত। দেহগত পবিত্রতার আমেজ না থাকিলে পাঠকদের কাছে এই রোমান্টিক নায়িকাদের প্রেমের ব্যর্থতা-জনিত দুঃখ সমাজ-বোধের চাপে ফিকে হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা অবশ্য লেখকের থাকা স্বাভাবিক এবং এই জন্যই সাবিত্রী-রাজলক্ষ্মীর এই দৈহিক পবিত্রতা উপন্যাসের পরিমণ্ডলে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব এই যে, নিজের দুর্বল দিক সে যথাসম্ভব লুকাইবার বা স্মৃতির পথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করে। এ অর্থে রাজলক্ষ্মীর

বা সাবিত্রীর যদি পদস্খলনের পর দেহ নষ্টও হইয়া থাকে এবং বর্তমানে পবিত্র জীবনবোধের প্রতি অনুরাগ পবিত্র জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টির সহিত তাহাদের মনে সত্য হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে দেহগত অপবিত্রতার প্রচারে অনর্থ হইতে পারে, সেখানে সেই গোপন কথা প্রচার না করা এমন কি চাপিয়া যাওয়া মানুষ হিসাবে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহাদের অন্তর্মনই এরূপ তাগিদ দিতে পারে। সাবিত্রী নিজের দেহের পবিত্রতার কথা সতীশকে এই হিসাবে বলিয়া থাকিলে আশ্চর্য হইবার খুব বেশি কিছু নাই। তাছাড়া সাবিত্রী চিরকালের জন্য সতীশকে ছাড়িয়া যাইতেছে, সতীশকে সে ভালবাসে তাহার ভালবাসার স্মৃতি অম্লান হউক, সতীশের মনে তাহার আসন অক্ষয় হউক, যেখানে সে নূতন আশ্রয় লইতে যাইতেছে, সেখানে মর্যাদার সহিত সে স্থান পাক, ইহাও সাবিত্রীর পক্ষে অবশ্যই কাম্য। বলা বাহুল্য, সাবিত্রীর দেহ যদি কখনও কলুষিত হইয়া থাকে এবং সে কথা সে এই বিদায় বেলায় স্বীকার করিয়া বসে, তাহা হইলে হয়ত তাসের ঘরের মত তাহার বর্তমান ভাঙিয়া পড়িবে এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে। কুলত্যাগের অগৌরব, হাল্কা কথা বলিয়া পুরুষকে খুশি করিয়া মেসে ঝি-গিরি করার অগৌরবের লজ্জা তো তাহার আছেই, সেই গ্লানিই তাহাকে নিজেকে অস্পৃশ্য কুলটা ভাবাইয়াছে, সে কথা সে স্বীকারও করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেহ তাহার পবিত্র আছে একথা নিজ মুখে বলিয়া সে সতীশ-সংশ্লিষ্ট পরিমণ্ডলকে তাহার প্রসঙ্গে উদার উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যদি কখনো তাহার দেহ অপবিত্রই হইয়া থাকে, সে তো এখন বিস্মৃত-প্রায় অতীতের কথা, সেই ঘটনা তাহাকে নিজ মুখে জানাইয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্প সৃষ্টি না করিলে জগতে কাহার ক্ষতি হইবে? অবশ্য শরৎচন্দ্র যে ধরণের রোমান্টিক লেখক এবং কার্য-কারণ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁহার আলগা ভাব যেমন অনেক সময়ই দেখা যায়, সে হিসাবে তাঁহার নিজের কল্পনায় রাজলক্ষ্মী সাবিত্রীর অন্তত সাবিত্রীর দৈহিক পবিত্রতা সম্পর্কে প্রত্যয় থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং হয়তো সেই প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই শিল্পকলাসম্মত ভাবে তাহাকে তিনি ট্র্যাজেডির নায়িকা গড়িয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সততাবোধ ও সমাজবোধ এমন যে, তাঁহার যত্ন করিয়া আঁকা স্ত্রী চরিত্র, প্রিয় নায়িকা সাবিত্রী ইচ্ছা করিয়া নিজের দৈহিক অপবিত্রতা

চাপিয়া নিজমুখে পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া পরিবেশ আয়ত্তে রাখিবে, এরূপ পরিকল্পনা তাঁহার পক্ষে না করাই সম্ভব।

'চরিত্রহীন'-এর প্রধান দুইটি পুরুষ চরিত্র, সতীশ ও উপেন্দ্র, ঠিক শ্রীকান্তর মত নিষ্ক্রিয় নয় আবার জীবানন্দ, সুরেশ, রমেশের মত অতখানি সক্রিয় নয়। তবে দুজনেরই নিজস্ব উজ্জ্বলতা আছে। অবশ্য উজ্জ্বলতর নারী-চরিত্র দ্বারা উভয় চরিত্রই কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে, উপেন্দ্র কম, সতীশ বেশি। কিরণময়ী ছাড়া সুরবালাও শান্ত-প্রেমরূপে উপেন্দ্র-চরিত্রের স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। সাবিত্রীর দ্বারা সতীশের সক্রিয় ভাব পরিচিতি অনেকটা স্তিমিত হইয়াছে। তবে সতীশ আরাকানের নরকের পথ হইতে কিরণময়ীকে সোদরোপম ক্ষমতায় উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, এই কল্যাণরূপ সতীশ চরিত্রের সম্পদ। সতীশ মেসের ঝি সাবিত্রীর সঙ্গে ভালবাসায় জড়াইয়া পড়া ছাড়াও শুদ্ধজীবন যাপন করিত না, সে মদ্যপান করিত, চঞ্চল চরিত্র ছিল, কিন্তু তাহার চরিত্রে লেখকের সহানুভূতি কাজ করিয়াছে। সতীশ সাবিত্রীর কাছে আদর্শ প্রেমিক, উপেন্দ্র-কিরণময়ীর কাছে আদর্শ ছোট ভাই, দিবাকরের কাছে ক্ষমাশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সাবিত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াও সরোজিনী যে তাহার স্নিগ্ধ রূপে সতীশের মনে বিশেষভাবে দাগ কাটিয়াছিল, সে কথা সতীশ সংযত মাধুর্যে অকৃপণভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। দেওঘরে সতীশের অজ্ঞাতবাস-ভবনে ঝড় জলের সন্ধ্যায় তাহার লাল জরিপাড় ধুতি পরিহিতা সরোজিনীকে সতীশ যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অভ্যর্থনা করিয়াছে তাহা সত্যই মাধুর্যমণ্ডিত। সতীশ বেশি লেখাপড়া শেখে নাই, তাহার জীবন-যাপনও প্রথম দিকে খুব রুচিসম্মত নয়, কিন্তু চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র বহুগুণান্বিত করিয়াই যত্ন করিয়া আঁকিয়াছেন। সতীশ পূজা-আহ্নিক করে, সে নাস্তিক নয়। সতীশ-সাবিত্রীর ভালবাসার যে ছবি 'চরিত্রহীন'-এ ফুটান হইয়াছে তাহা বাস্তব নহে বলিয়া মনে হইতে পারে, তবে সাবিত্রী মেসের ঝি বলিয়াই পূর্ব হইতে তাহার চরিত্র রূপায়ণে অবাস্তবতা কল্পনা করিয়া লইলে এই প্রেমচিত্রের অবাস্তবতা-বোধ আরও যে বৃদ্ধি পাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর সাবিত্রীর মত মোটামুটি শিক্ষিতা ভদ্রঘরের তরুণী অদৃষ্টচক্রে যদি মেসের ঝি-গিরি করিতে বাধ্য হয় এবং অপরিসীম মানসিক শক্তিতে পঙ্ক-

সুলভ নির্লিপ্তি লইয়া মেসের কাজ চালাইয়া যায়, তাহা হইলে সতীশ তাহার সহিত যেভাবে প্রেম করিয়াছে এবং সাবিত্রী তাহাতে যেভাবে সাড়া দিয়াছে, তাহার সঙ্গতিতে অবিশ্বাস কবিবার তডটা কারণ ঘটে না।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে দিবাকর ও সরোজিনী দুইটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্ব-পূর্ণ সহায়ক চরিত্র। দুজনেই ভালবাসিয়াছে, দিবাকরের ভালবাসায় দেহের ক্ষুধার আধিক্য তাহাকে দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় টানিয়া নামাইয়াছে; সরোজিনীর দেহ-নিরপেক্ষ প্রেম তাহার চারিদিকে স্নিগ্ধ আশ্বাস রাখিয়াছে। সুস্নিগ্ধা সুরবালাকে সকলেরই ভাল লাগে, 'চরিত্রহীন'-এর আঘাত-সংঘাত-মুখর পটভূমিতে সরোজিনীকেও পাঠকের ভাল না লাগিয়া পারে না।

শরৎচন্দ্রের '**শ্রীকান্ত**' উপন্যাসখানি (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১ম পর্ব ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭; ২য় পর্ব—সেপ্টেম্বর, ১৯১৮; ৩য় পর্ব—এপ্রিল, ১৯২৭; ৪র্থ পর্ব—মার্চ, ১৯৩৩) বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র সংযোজন। ইহাকে পুরোপুরি উপন্যাস বলা যায় না, ইহার একটি মূল কাহিনী অবশ্য আছে, তবে টুকরো টুকরো অনেকগুলি কাহিনী স্ব-স্ব-প্রধানভাবে ইহাতে স্থান করিয়া লওয়ায় উপন্যাসের ঘন সন্নিবদ্ধ রূপ ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাছাড়া ইহাতে কিছুটা ভ্রমণ-কাহিনী, কিছুটা দিনলিপি বা ডায়েরীর ছাপ আসিয়া গিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' চারি পর্বে লেখা দীর্ঘায়তন উপন্যাস। ৪র্থ পর্ব শেষ করিয়াও পাঠক উপলব্ধি করিবে কাহিনী পরিসমাপ্ত হয় নাই এবং আরও নূতন পর্ব লিখিবার কথা অবশ্যই লেখকের মনে ছিল। বাস্তবিকই শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তিনি ৫ম পর্বে 'শ্রীকান্ত' শেষ করিবেন। দিলীপকুমার রায়কে ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ তারিখে লেখা এক পত্রে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে ৫ম পর্বে তিনি অভয়ার কথা বলিবেন। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৪।)

সমগ্রভাবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দুইটি নরনারীর প্রেমের কাহিনী অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। এই প্রেম সমাজের অনুমোদিত নয় এবং প্রধানতঃ এই কারণেই প্রেমিক-প্রেমিকা বারবার অন্তরের একান্ত আকর্ষণে কাছাকাছি আসিয়াও সামাজিক সংস্কার বশে নিজেরাই দূরে সরিয়া গিয়াছে। বাহিরের কেহ তাহাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করে

নাই, অর্থনৈতিক ও সামাজিক হিসাবে তাহারা মোটামুটি স্বাধীন, কিন্তু তবু তাহাদের নিজেদের সংস্কার ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা মনের ক্ষুধা বাস্তব সুযোগ সত্ত্বেও পূরণ করিতে পারিল না। শৈশবে কোন সুদূর অতীতে পাঠশালায় পড়িবার সময় শ্রীকান্ত তাহার সহিত বৈঁচির মালা বদল করিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী স্বাভাবিক গৃহস্থবধূ-জীবন যাপনের সুযোগ পাইলে হয়ত শ্রীকান্তর কথা তাহার স্মৃতি হইতে আপনি মুছিয়া যাইত, কিন্তু কলঙ্কিত বাইজী-জীবনে পদচারণ-ক্লান্ত রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তকে খুঁজিয়া পাইল এবং যখন সে জানিল যে শ্রীকান্ত অবিবাহিত ও পারিবারিক বন্ধনহীন, তখন গোপন মনে সংসার জীবনের জন্য তৃষিতা নারী রাজলক্ষ্মীর পুঞ্জীভূত সাধ-স্বপ্ন শ্রীকান্তকে ঘিরিয়া মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। খেলার ছলে হইলেও শ্রীকান্ত একদিন মাল্যদানের ভিতর দিয়া তাহাকে বধূরূপে স্বীকার করিয়াছে, বিস্মৃতপ্রায় অতীতে হইলেও তাহারা একদিন পরস্পরকে ভালবাসিত, বাইজী-জীবনের ধূসরতা-শ্রান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্তই অমূল্য সম্পদ হইয়া উঠিল এবং অন্তরের তাগিদে এই শ্রীকান্তকেই রাজলক্ষ্মী একান্তভাবে পাইবার জন্য আকুল হইল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ধর্ম-সংস্কার ছিল, সমাজবোধ ছিল, বুদ্ধিমতী সে, বঙ্কু সপত্নী-পুত্র হইলেও বঙ্কুর মা হিসাবে তাহার একটা বিশেষ জীবনানুভূতি ছিল, শ্রীকান্ত যত স্বাধীন হউক, তাহার নিজের বাইজী রূপ এবং শ্রীকান্তের সামাজিক সম্ভ্রমের কথা রাজলক্ষ্মীর স্মরণ ছিল,—অন্তর চাহিলেও সমাজের ও ধর্মের পানে তাকাইয়া রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে লইয়া ঘর বাঁধিবার উৎসাহ নিজের মনের ভিতর হইতেই পাইল না। মন একান্তভাবে চায় বলিয়া, দুর্বার আকর্ষণ করে বলিয়া তাহারা বারবার পরস্পরের কাছে আসে, সমাজ-সচেতনতা তাহাদের বারবার বিচ্ছিন্ন করে। দেবী চণ্ডীর সম্পদের প্রতি দৃষ্টি এবং অসহায়দের শোষণের অভ্যাস 'দেনা-পাওনা'-র জীবানন্দকে ষোড়শীর দুর্বার আকর্ষণ হইতে কিছুটা সংযত করিয়াছে, ষোড়শীর ধর্মসংস্কার, কর্তব্যবোধ ও বাস্তববুদ্ধি জীবানন্দের আকর্ষণকে অবশ্যই কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর আকর্ষণ-বিকর্ষণ সে তুলনায় আরও মনস্তত্ত্ব-জটিল। ইহারা প্রেমের আকর্ষণে অন্তরে মিলন গ্রন্থি বাঁধিয়াও বাহিরে বারবার সংস্কারবশে কাছে আসিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই আখ্যানভাগে

সমাজ-সচেতন সামাজিক নরনারীর মানস-গতির চমৎকার বিশ্লেষণ দেখা যায়।

মনোমুগ্ধকর রচনা হিসাবে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বটি সার্থক, তবে ইহার প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের সামঞ্জস্য সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম অংশে শ্রীকান্ত বালক এবং অন্নদা দিদি অল্প সময়ের জন্য বিশেষ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমণ্ডলে ফুটিয়া-উঠা এক উপমাহীন স্নিগ্ধরূপবতী সতী নারী। বন্ধু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্ত ঘটনাচক্রে অন্নদা দিদির বাড়ীতে আসিয়াছে। উজ্জ্বল, চঞ্চল, দুঃসাহসী কিশোর ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথমাংশ অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছে, সাধারণ বালক শ্রীকান্ত তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বিহ্বল হইয়াছে। এখানে শ্রীকান্তের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রস্ফুটিত নয়, সে যেন নূতন নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে আপন ভাব-ভাবনার পুনর্মূল্যায়ন করিয়াছে। শ্রীকান্ত এই অংশের নায়ক নয়, নায়ক ইন্দ্রনাথ। তারপর ইন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে। প্রথম পর্বের দ্বিতীয়াংশে কুমার বাহাদুরের তাঁবুতে রাজলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাতের সময় হইতে চতুর্থ পর্বের শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্ত নায়ক। শ্রীকান্ত চলমান চরিত্র, তাহার অনুভূতি সূক্ষ্ম, কাজকর্ম করুক বা না করুক তাহার মনোরথেই উপন্যাসের জগৎ চলিয়াছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের বক্তা, তাহার চোখে বা মনে যে বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয় যেমন ধরা পড়িয়াছে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তাহা তেমনই ফুটিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম অংশের (যেখানে শ্রীকান্ত নায়ক নয়) গুরুত্ব হইল যে, এই অংশে গৃহস্থ-ঘরের যে ভীরু বালকটি সংসারী ছাপোষা জীবনের জন্য গড়িয়া উঠিতেছিল, অকস্মাৎ ইন্দ্রনাথ ঝড়ের মত এবং অন্নদাদিদি বিদ্যুৎ-সঞ্চারের মত তাহার পরিচিত অভ্যস্ত জীবনে ওলটপালট ঘটাইয়া দিল, শ্রীকান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহার চোখ এবং মন নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল—তারপর হইতে সমগ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শ্রীকান্তের চেতনার রঙে উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রথম পর্বের প্রথমাংশে শ্রীকান্ত যেমন দেখিয়াছে তেমনি বলিয়াছে, সে প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু প্রথম পর্বের শেষ অংশ হইতে তাহার আলোতেই যেন সব কিছুই আলোকিত হইয়াছে। দৃশ্য, বর্ণনা, ভাষা ও চরিত্রের আকর্ষণে শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব চমৎকার, তাছাড়া শ্রীকান্তর মানস-গঠনের

হিসাবেও এই পর্বের মূল্য স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পর্বের প্রথমাংশে অন্নদাদিদির সহিত পরিচয়ের পর শ্রীকান্তর মনে নারী জাতি সম্পর্কে যে অক্ষয় শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত হইয়াছে, প্রথম পর্বের শেষাংশে বাইজী রাজলক্ষ্মীকে সহৃদয়তার সঙ্গে সহজভাবে গ্রহণে সেই অনুভূতি নিঃসন্দেহে কার্যকরী হইয়াছে।

প্রথম পর্বের প্রথমাংশে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে বলা চলে। শ্রীকান্ত যাহা হইয়াছে এবং যাহা সে গ্রন্থারম্ভে ছিল, এই বিকাশ আপনা হইতে হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ইন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পর ইন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই তাহার মন এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবন্ত কিশোর ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথ খুবই চঞ্চল, তাহার কাজকর্ম সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নয়, পরের হিতার্থে হইলেও সে চুরি করে, সামাজিক নীতিবোধ অনেকক্ষেত্রেই তাহার নাই, সে শিক্ষকের অমর্যাদা করে, সিগারেট সিদ্ধি খায়; কিন্তু সে দুঃসাহসী, হৃদয়বান, প্রচণ্ড গতিশীল চরিত্র। তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীকান্ত তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। অন্নদাদিদিকে ইন্দ্রনাথই শ্রীকান্তর চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে, ইহাও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের এক বড় অবদান। ইন্দ্রনাথের চরিত্র-বিন্যাসে শরৎচন্দ্র একহিসাবে সুন্দর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইন্দ্রনাথকে তিনি ততক্ষণ পাঠকের সম্মুখে রাখিয়াছেন যতক্ষণ তাহার দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য তাহার বয়সের বিবেচনায় পাঠকের ভাল লাগে, তারপর যখন ইহা অস্বস্তিকর লাগার কথা, শরৎচন্দ্র তখন ইন্দ্রনাথকে একেবারে সরাইয়া লইয়াছেন। তবে ইন্দ্রনাথ একটু অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তর্হিত হইলেও শিল্পকলার দিক হইতে সঙ্গতি এই যে, অতঃপর ইন্দ্রনাথ একরূপ শ্রীকান্তর মধ্যেই বাঁচিয়া থাকে উত্তরকালের শ্রীকান্ত চরিত্রে তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রীকান্ত ঘর বাঁধিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াও সারাজীবন ঘরের বন্ধন অস্বীকার করিয়াছে সে বরাবর ভ্রাম্যমাণ, সৌন্দর্যপিয়াসী, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত। শ্রীকান্ত সব কিছু দেখিয়া যায়, রসগ্রহণ করে রসসঞ্চারে সাহায্যও করে, কিন্তু নিজের সুখের জন্য বন্ধন স্বীকার করিয়া সে ঘরে বন্দী হয় না। সে ভদ্র, ব্যক্তিগত আবেগে তাহার দুর্বলতা মাঝে মাঝে পাঠকের চোখে পড়ে, কিন্তু নীতির প্রশ্নে, সত্যের প্রশ্নে, রুচির প্রশ্নে

তাহার মনের দৃঢ়তা অটুট থাকে। রাজলক্ষ্মীর প্রাচুর্যের অন্তর্লীন দম্ভ রাজলক্ষ্মীর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া সে মনে করে, প্রেমিকার প্রেমকে সম্বর্ধনা করিয়া রাজলক্ষ্মীকে একান্তভাবে গ্রহণ করিলেও রাজলক্ষ্মীর সহিত নিজের দূরত্ব সে অন্তর্মনে বাঁচাইয়া চলে, ফলে সংঘাতের পূর্বেই সে অনায়াসে সরিয়া যাইতে পারে, জড়াইয়া থাকিয়া নিজেকে (এবং রাজলক্ষ্মীকে) সে নষ্ট করিয়া ফেলে না। এই মানসিক শক্তির জোরেই অভয়াকে শ্রীকান্ত সংস্কার অতিক্রম করিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর সুন্দর হৃদয়রূপে সুনন্দার উজ্জ্বল বহিরঙ্গ আকর্ষণ যে ফাটলের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীকান্ত তাহা অনুভব করিয়া ব্যথিত হইয়াছে, কমললতার ভাবসমৃদ্ধ অন্তরকে সে অভিনন্দিত করিয়াছে। তাহার জন্য রাজলক্ষ্মীর নিরুপায় কাতরতা শ্রীকান্ত রসিকের দৃষ্টিতে উপভোগ করিয়াছে, কবির দৃষ্টিতে ব্যথিত বোধ করিয়াছে, মানবিক দৃষ্টিতে রাজলক্ষ্মীর কাছে রাজলক্ষ্মীর মত করিয়াই হৃদয়গত বন্ধন স্বীকার করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত রাখিয়াছে। তাই পুঁটুকে বিবাহের প্রশ্নে সে রাজলক্ষ্মীর বাধাদানের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া রাজলক্ষ্মীর কথা সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লইয়াছে, রাজলক্ষ্মী তাহাকে বিবাহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রকাশ করিলেও মন তাহার শ্রীকান্তকে হারাইবার বেদনা সহিতে চাহে না; সুনন্দার দুর্নিবার আকর্ষণের ব্যূহে রাজলক্ষ্মী ঢুকিয়া গেলেও শ্রীকান্ত প্রশান্ত ধৈর্যে ব্যূহের বাহিরে রাজলক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করিয়াছে, উচ্ছল কমললতার কাছে একাকী তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজলক্ষ্মীর আতঙ্ক মনে মনে উপভোগ করিয়া মুরারিপুরে রাজলক্ষ্মীর সহযাত্রিণী হইবার আর্জি সে সহজভাবেই মানিয়া লইয়াছে। শ্রীকান্ত জীবনরসিক, কিন্তু একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তিতে সে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে।

প্রধানতঃ রাজলক্ষ্মীকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইতে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারিটি পর্বে শরৎচন্দ্র চারিটি জীবন্ত নারী চরিত্র আঁকিয়াছেন,—প্রথম পর্বে অন্নদাদিদি, দ্বিতীয় পর্বে অভয়া, তৃতীয় পর্বে সুনন্দা এবং চতুর্থ পর্বে কমললতা। রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত সমৃদ্ধ চরিত্র, সক্রিয়তা তাহার যথেষ্ট, এমনকি অন্যের বিকাশ-সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিয়াও আত্মকেন্দ্রিক চলমানতা তাহার মধ্যে দেখা যায়। রাজলক্ষ্মী নিজের জীবন-সমস্যার সমাধানে নিজেই অগ্রসর হইয়াছে, নিজের গোপন-হৃদয়ের প্রেমকামনা তাহার সক্রিয়তায়

অনেকখানি উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল এবং 'দেনা-পাওনা'র ষোড়শীর মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহারা তিনজনেই ব্যক্তিগত জীবনে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। জীবিকা-সংস্থানের প্রশ্নে রাজলক্ষ্মী বহু অভিজ্ঞতার অধিকারিণী। বাইজী জীবনে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে। ষোড়শীও প্রজাসাধারণের অভিভাবিকার মত, দেবী চণ্ডীর ভৈরবীরূপে তাহাকেও বহু মানুষের সংসর্গে আসিতে হইয়াছে। পুরুষ প্রসঙ্গে ইহাদের সঙ্কোচের জড়তা কম। এই জীবনরূপ রাজলক্ষ্মী বা ষোড়শীর আত্মপ্রকাশের সাবলীলতায় শরৎচন্দ্রের বড় যুক্তি। কমলকে তো শরৎচন্দ্র সক্রিয় স্বাধীন চরিত্র ধরিয়া লইয়া সযত্নে আঁকিয়াছেন।* 'মন্দির'-এর অপর্ণা, 'পল্লীসমাজ'-এর রমা, 'পরিণীতা'র ললিতা, 'চন্দ্রনাথ'-এর সরযূর মত নায়িকার, এমন কি 'দত্তা'র বিজয়া বা 'গৃহদাহ'-এর অচলার মত অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতা নায়িকার জীবনবৃত্ত ও আত্মপ্রকাশের পার্থক্য এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিকে উত্তরকালে যে আর্থিক স্বাধীনতার পটভূমিতে আঁকা হইয়াছে, তাহার বিপরীতে চরম আর্থিক অভাবের মধ্যেই তাহার জীবনের প্রথম দিকটিকে রাখা হইয়াছিল। দরিদ্র রাজলক্ষ্মী কৌলীন্য প্রথারও বলি হইয়াছে,‡ তখন আর্থিক সচ্ছলতা থাকিলে তাহার জীবন

*শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নায়িকা চরিত্রগুলি খুবই উজ্জ্বল সন্দেহ নাই, তবে রাজলক্ষ্মী, কমল ও ষোড়শীর মত আত্মনির্ভরশীল ও আপন বুদ্ধিতে মাথা উঁচু করিয়া চলিবার মত মানসিক শক্তিসম্পন্ন চরিত্র সেখানে বেশি নাই। রাজলক্ষ্মী, কমল ও ষোড়শী তাহাদের সচলতার অনুরাগী পুরুষ-চরিত্র শ্রীকান্ত, অজিত ও জীবানন্দের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাও এই সূত্রে লক্ষ্য করা দরকার।

‡এইভাবে রাজলক্ষ্মীকে কৌলীন্যের বলি করিয়া শরৎচন্দ্র এক হিসাবে সামাজিক কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাখিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ প্রতিবাদ তিনি রাখিয়াছেন 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্যার কাহিনীতে। উঁচু কুলীন ঘরের মেয়ে বলিয়াই 'বামুনের মেয়ে'তে কৌলীন্য রীতির দাপটেই সন্ধ্যাকে অরুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে।

হয়তো ভদ্রকন্যার স্বাভাবিক জীবনখাতেই প্রবাহিত হইত, উপন্যাসের নায়িকা না হইতে পারিলেও স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া সে সুখে জীবনযাপন করিতে পারিত। এই গৃহস্থ-সংসার-জীবনের জন্য লোভ রাজলক্ষ্মীর বরাবর ছিল, 'বাইউলি' (বাইজী) হওয়ার চেয়ে দরিদ্র হইলেও সে জীবন অনেক কাম্য, একথা রাজলক্ষ্মী ব্যথাভরে শ্রীকান্তের নিকট নিজেই বলিয়াছে। অর্থাভাবেই কুলীন-কন্যার উপযুক্ত ঘর-বর জুটিল না। উত্তরকালে রাজলক্ষ্মীর অর্থ-প্রাচুর্য তাহার জীবনের রিক্ততা আটকাইতে পারে নাই, এইভাবে যে দুঃখ-প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে, উত্তর জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধি তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে নাই, শ্রীকান্তকে হাতের নাগালের মধ্যে পাইয়াও যুবতী রাজলক্ষ্মীর জীবনে ট্র্যাজেডির বেদনা ঘনীভূত হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে সমগ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতার উপরই লেখা হইয়াছে। শ্রীকান্ত চোখে যাহা দেখিয়াছে, মনে যাহা অনুভব করিয়াছে, তদনুসারে বর্ণনা করিয়াছে। শ্রীকান্তই উপন্যাসের নায়ক আবার সে-ই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে চিত্রিত জীবনরঙ্গের ভাষ্যকার। স্বভাবতঃই 'শ্রীকান্ত'র মনের আলো সব কিছুর উপরই অল্পবিস্তর পড়িয়াছে এবং সে নিজেও পরিদৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়সমূহের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছে। অন্নদাদিদি প্রথম পর্বে বালক শ্রীকান্তর মনে নারীজাতি সম্পর্কে যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাব স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত করিয়াছেন, নারী সম্পর্কে সেই ধারণা 'শ্রীকান্ত'র উত্তরজীবনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি চরিত্রটিকে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের নারী চরিত্রের আলোকস্তম্ভ স্বরূপ বলা চলে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা প্রায়ই সুন্দরী, প্রেমে নিষ্ঠাবতী, কমনীয় হৃদয়ধর্মে সমৃদ্ধা। অন্নদাদিদি এ বিষয়ে অনন্যা। এই মহীয়সী মহিলার সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীকান্ত উপলব্ধি করিয়াছে যে, নারীর বাহিরের জীবন যাহাই হউক, অন্তরে তাহার অমৃতপ্রবাহ বিদ্যমান। বাইজী বৃত্তি সত্ত্বেও শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে এই শ্রদ্ধাবোধের সাহায্যে। বাস্তবিকই স্নিগ্ধরূপা অন্নদাদিদির হৃদয়বোধ, বুদ্ধি, সংযম, কর্তব্যানুরক্তি, অপরিসীম মনোবল, সর্বোপরি তাঁহার পাতিব্রত্য শরৎচন্দ্রের সক্রিয় স্ত্রী-চরিত্রগুলির পরিচিতির ও মূল্যায়নের সবিশেষ সহায়ক। অন্নদাদিদির পতি-প্রেম ও পতি-নিষ্ঠা শরৎসাহিত্যের নায়িকাদের সুগভীর স্বামী-

সংস্কারের ভাব-উৎস বলা চলে। স্বামী দুশ্চরিত্র ও বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত হিন্দুধর্মবোধ ও হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া অন্নদা কুণ্ঠাহীন সেবায় ও প্রেমে দুশ্চরিত্র স্বামীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দিক হইতেই, বলিতে গেলে, পরিবেশ তাঁহার প্রতিকূল ছিল। অন্নদাই ইন্দ্রনাথের হাত হইতে স্বামীকে বাঁচাইয়াছেন, সর্পাঘাতে মৃত স্বামীকে শেষ বিদায় দিবার সময় 'শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সম্মুখেই' গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছেন। স্বামী শাহজীকে অন্নদা যখন মুসলমান বলিয়া কবর দিতে বলিয়াছেন তখন ইন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছে অন্নদা নিজে মুসলমান কিনা, সাধ্বী অন্নদা উত্তরে কুণ্ঠাহীন ভাবেই বলিয়াছেন "হাঁ, মুসলমান বৈকি।" তখনও তাঁহার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া হিন্দু এয়োতীর সব চিহ্ন। তাহার পর শাহজীকে কবর দিয়া অন্নদা ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, মাটি দিয়া সিঁথির সিঁদুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।* (১ম পর্ব, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

* অন্নদাদিদির স্বামীপ্রেম খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু এ সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সেই স্বামীপ্রেম ব্যক্তি-স্বামী শাহজীর প্রতি প্রেম নয়, স্বামী অনুভূতির প্রতি সাধ্বী স্ত্রীর ভাবাবেগ। ইহার ফলে অন্নদা চরিত্র আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবে যে নায়িকা ব্যক্তিগত ভাবে ঘর সংসার করিতে করিতে স্বামীর দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতিতে আঘাত পাইয়া তাহার সহিত বিরোধ করে এবং স্বামী বলিয়া অন্তরে তাহার প্রতি অপরিসীম দুর্বলতা পোষণ করে বলিয়া সেই বিরোধের ফলে আপন মর্যাদা রক্ষার উপযোগী পথ বাছিয়া লইতে প্রায়ই প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করে, সেইরূপ বেদনাক্লিষ্ট নায়িকার সক্রিয় বাস্তবরূপ অন্নদাদিদির মধ্যে নাই। 'গৃহদাহ'-এর অচলা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেই অন্নদাদিদি চরিত্রের এই উপন্যাসে বা নাটকে নায়িকা হইবার যোগ্যতার অভাব বুঝা যাইবে। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬) গ্রন্থে অন্নদাদিদির মত চরিত্রের নাটকীয়তার অভাব উল্লেখ করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়া রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তর সম্পর্কে গতির সঞ্চার করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর প্রেম-জীবনে অভয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই, পরোক্ষ সংযোগও খুবই কম, কিন্তু তাহার আত্মমর্যাদাশীল জীবনবোধ ও সমাজ সম্পর্কে সাহসী চেতনা রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তকে অসামাজিক ভালবাসার বন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। এইভাবে প্রধান চরিত্রদের সাহায্য করা ছাড়াও অভয়া চরিত্র নিজেই শরৎসাহিত্যে তথা বাংলাসাহিত্যে উজ্জল চরিত্র, সমাজের প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অভয়া যে সংগ্রামী রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রে সে দৃঢ়তা অতি দুর্লভ। অভয়া হীন স্বামীকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত সত্যকেই সংস্কারের উপরে স্থান দিয়াছে এবং ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করিয়া রোহিণীবাবুর সহিত মাথা উঁচু করিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। সে জানে সমাজ এই বন্ধন মানিবে না, বাধা আসিবে নানা দিক হইতে, তাহার সন্তান-সন্ততির পরিচয় বিপন্ন হইবে, তবু অভয়া সে সব প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করিয়াছে। অভয়া রাজলক্ষ্মীর, এমন কি কমললতার মত মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র নয়, তাহার মনে বিদ্রোহের পরবর্তীকালের সংস্কার ও সত্যের দ্বন্দ্ব বড় করিয়া ফুটাইবার সুযোগ লেখকই চাপিয়া দিয়া তাহাকে বিদ্রোহে প্রত্যয়শীলা করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত

"বাংলার নারীর স্বামী সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে আদর্শবাদ যে কত প্রবল তাহা রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কমলা ও শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদাদিদির চরিত্রের কথা স্মরণ করিলেই বুঝা যাইবে। অতএব স্বামী যেখানে একটি আদর্শমাত্র হইয়া রক্তমাংসের সম্পর্কের বহু উর্ধ্বে বাস করিয়া থাকে সেখানে স্ত্রীর সহিত তাহার দ্বন্দ্বের সংঘাত প্রবল ও সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে না। সেখানে যে ভাবেই হউক সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া ব্যতীত উপায় নাই, সেখানে দ্বন্দ্বই বাধুক কিংবা সংঘাতেরই সৃষ্টি হউক, তাহার ফল কার্যকরী হয় না। দ্বন্দ্ব সংঘাতের কার্যকারিতা যেখানে সুদূরপ্রসারী নহে, সেখানে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন সার্থক নাট্যিক চরিত্র সৃষ্টি করাও সম্ভব নহে।"

একমুখী চরিত্র হইলেও অভয়া তাহার ব্যক্তিত্ব এবং জীবনায়নে ঋজুতার জন্ম পাঠককে মুগ্ধ করে। তাহার মনে প্রথম দিকে সংঘর্ষ ছিল না এমন নয়, তাহার স্বামী-সংস্কার ও দুর্নীতি-পরায়ণ স্বামী সম্পর্কে ক্ষোভ হয়তো তাহার মনে ঝড় তুলিত, কিন্তু সেই মানসিক সংঘর্ষের কথা না উঠাইয়া শরৎচন্দ্র সেখানে তাহার স্বামী-সংস্কারকেই বড় করিয়া স্বামীর সন্ধানে উপযাচিকা করিয়া অভয়াকে সুদূর রেঙ্গুনে লইয়া গিয়াছেন। এই সময় অভয়ার স্বামী-সংস্কার তাহার মানবতাবোধকেও যেন কিছুটা আচ্ছন্ন করিয়াছিল, রোহিণীবাবুর তাহার প্রতি দুর্বলতা অন্যায় মনে যদিই বা হয়, রোহিণীবাবুর উপকার তো প্রত্যক্ষ,—সেই উপকারের বিপরীতে শান্তশিষ্ট রোহিণীবাবুকে একা বিদেশ বিভুঁই রেঙ্গুনে ছাড়িয়া দিয়া অভয়া স্বামীর খোঁজে রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়াছে। অভয়া রেঙ্গুনে পৌঁছাইবার পর প্রথম দিকে স্বামীকে পাইতে অনেক দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বর্মী পত্নী ও তাহার সন্তান-পরিবৃত স্বামীর সংসারেই হৃদয়হীন স্বামীর হীনতা সহ্য করিয়া সে বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ পর্যন্ত অভয়ার মধ্যে হিন্দু সধবা নারীর স্বাভাবিক স্বামী-সংস্কারই বড় ছিল। তারপর স্বামীর পশুবৎ দুর্ব্যবহারে অভয়ার স্বামীর ঘর করিবার সাধ নিঃশেষ হইল, মানুষ হিসাবে সে উপলব্ধি করিল নিজেকে, তাহার প্রতি অসহায় রোহিণীর গভীর প্রেম অনুভব করিয়া দুর্বল রোহিণীর প্রতি সহানুভূতি হইতে তাহার ভালবাসা জন্মিল, অভয়ার জীবনদৃষ্টি পালটাইয়া গেল। রোহিণীর সহিত অতঃপর বিবাহের মন্ত্র নয়, ভালবাসার মূলধন লইয়াই অভয়া পথ চলিয়াছে। ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে। শ্রীকান্ত প্রথমটা সংস্কার বশতঃই সমাজের বিরুদ্ধে অভয়ার বিদ্রোহে অস্বস্তিবোধ করিয়াছিল, পরে সে অভয়ার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাই জানাইয়াছে। এই অভয়ার চরিত্র-চিত্রণে, বলা বাহুল্য, শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। সহায়িকা চরিত্র হিসাবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অভয়া যতটুকু আসিয়াছে তাহার মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু এই বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত ৫ম পর্বে যে আরও ফুটাইবার আশা করিয়াছিলেন, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। অভয়া 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী নয়, দেহের ক্ষুধা তাহার বড় কথা নয়, হৃদয়বোধই তাহার চরিত্রের প্রধান দিক। দৈহিক সুখ নয়, মনের তৃপ্তিই তাহার লক্ষ্য। এই জন্যই অসহায় দরিদ্র

রোহিণীবাবুকেই বিদ্রোহিণী অভয়া আশ্রয় করিয়াছে, এইজন্যই প্লেগের রোগী শুনিয়াও শ্রীকান্তের ভার লইতে অভয়া কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

অভয়ার প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার এই যে, অভয়ার বিদ্রোহী ভাবের আশ্রয়স্থল রেঙ্গুন করিয়া শরৎচন্দ্র সমস্যাটিকে অনেকখানি পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মনে হয়, কারণ রেঙ্গুনে ইহার সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইবে কম লোক, সেখানে বাঙ্গালী সমাজ শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ নয়। এই ঘটনা বাংলা দেশে ঘটাইতে পারিলে এবং ইহার সম্বন্ধে লেখকের সমান সহানুভূতি বজায় থাকিলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অবশ্যই বাড়িত এবং তাহাতে শরৎচন্দ্রের সাহস ও আধুনিকতা দুইই আরও বেশি প্রকাশ পাইত।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দা এক বিদুষী ব্রাহ্মণবধূ। তাহার ভাসুর কাশীনাথ কুশারীকে সে ও তাহার স্বামী খুবই ভক্তি করে, কিন্তু কাশীনাথ কানাই বসাকের সম্পত্তি অন্যায় উপায়ে গ্রাস করিয়া তাহার বিধবা ও নাবালক পুত্রকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া সত্যানুরক্তির গৌরবে সেই পাপের অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক সুনন্দা স্বামী-পুত্র লইয়া পৃথক হইয়াছে এবং কঠিন দুঃখের পথ স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছে। গঙ্গামাটিতে সদ্যরোগমুক্ত শ্রীকান্তকে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় লইয়া গিয়া রাজলক্ষ্মীর সুনন্দার সহিত আলাপ হয় এবং সুনন্দার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী একরূপ সুনন্দার শিষ্যা হইয়া যায়। সুনন্দা চরিত্রের স্বকীয় দীপ্তির ভাস্বরতা ছাড়াও উপন্যাসে সুনন্দা সহায়িকা চরিত্র হিসাবেও মূল্যবান। নীতিগত মূল্যবোধ সক্রিয়তায় তাহার চরিত্রে দুর্লভ দীপ্তি সঞ্চার করিয়াছে। সুনন্দাই প্রকৃতপক্ষে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের গঙ্গামাটির জীবনে কৃত্রিম দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার পথে বাধার প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গামাটিতে বিলম্বিত লয়ের নিরুপদ্রব জীবনে রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তকে একান্ত করিয়া পাইবার স্বপ্ন হয়ত বাস্তবে পরিণত হইত। হয়ত বাঞ্ছিতকে আয়ত্ত করিবার আনন্দে সে সমাজবোধ বলি দিয়া বসিত। কিন্তু সুনন্দার সাহচর্যই তাহাকে এইভাবে ভাঙিয়া পড়িতে দেয় নাই। সুনীতি এবং কর্তব্য যে নিজের পার্থিব সুখের চেয়ে বড়, রাজলক্ষ্মীর এই জীবনবোধ সুনন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য

দানা বাঁধিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মধ্যস্থতায় সুনন্দাদের পারিবারিক বিরোধ-বিচ্ছেদের অবসান ঘটে, কাহিনীর এ অংশটুকুও প্রীতিপ্রদ।

কমললতা 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের মনোমোহিনী বৈষ্ণবী চরিত্র। মুরারিপুরের আখড়ায় কমললতার কোমল হৃদয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীকান্ত জড়াইয়া পড়িয়াছে, রাজলক্ষ্মীর প্রতি আকর্ষণও যেন কমললতার দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে। কমললতা তরঙ্গিত নদীর মত, শ্রীকান্তর মুসলমান বন্ধু গহর তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীকান্তও আকৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই আকর্ষণ গহরকে যতটা প্রবাহিত করিয়াছে শ্রীকান্তকে ততটা করে নাই, রাজলক্ষ্মীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সে প্রবাহকে অনেকটা সংযত রাখিয়াছে। কমললতা সহায়িকা চরিত্র এই অর্থে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহার আকর্ষণীয় কমনীয়তার সংঘর্ষেই শ্রীকান্তর জন্য রাজলক্ষ্মীর উন্মুখতা নূতন গতি লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শুধু কমললতাকে দেখিবার জন্যই নয়, কমললতার কূলপ্লাবী আকর্ষণ হইতে তাহার দুর্লভ সম্পদ শ্রীকান্তকে বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর সঙ্গে মুরারিপুরে গিয়াছে। যাহা হউক, কমললতা ঘটনাচক্রে আখড়াতে অসম্মানিত হইয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে স্বেচ্ছায় বৃন্দাবনের পথ ধরায় তাহাকে উপলক্ষ করিয়া রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তকে লইয়া সমস্যার একটা সমাধান হইয়া গিয়াছে। অবশ্য কমললতার বিদায়ের পর শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের কাহিনীকে আর টানিতে পারেন নাই, শ্রীকান্ত উপন্যাসের নূতন পর্ব আর লেখা হয় নাই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানি নানা দিক হইতে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের নিদর্শন। রচনারীতি বা গঠনরীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট, কারণ এইভাবে ভ্রমণকাহিনী ও দিনপঞ্জী ধরণের রচনাকে সুন্দর দীর্ঘায়তন উপন্যাসের পর্যায়ে লইয়া যাওয়া সামান্য প্রতিভার কর্ম নহে। প্রেম ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে বিচিত্র মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতির চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। নায়ক-নায়িকার এই সান্নিধ্য-বিচ্ছেদের মধ্যে কলাশিল্পের হিসাবে উপন্যাসের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ষোড়শী-জীবানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'শ্রীকান্ত' চরিত্রের

সংগঠনে ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি ও অভয়াকে যেভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে সত্যই শরৎচন্দ্রের শক্তির পরিচয় মিলে।

'শ্রীকান্ত'র মত দীর্ঘায়তন উপন্যাসে স্বভাবতঃই বহু চরিত্র আসিয়া ভিড করিয়াছে এবং ব্যক্তিগত উজ্জ্বল চরিত্র হিসাবে, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার আভাসবাহী হিসাবে, আদর্শের প্রতীক হিসাবে, মূল চরিত্র বা ঘটনার সাহায্যকারী হিসাবে, সঙ্কটে বা জটিলতায় ক্লান্ত পাঠক মন লঘু করিয়া দিতে,—নানা কারণে চরিত্রগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত, অভয়া, সুনন্দা, কমললতার মত বড চরিত্রগুলির কথা বাদ দিলেও ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, বজ্রানন্দ, গহর, দ্বারিকাদাস বাবাজী, এইরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য কম নয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কাহিনীর তেমন জমাটভাব নাই, অনেকক্ষেত্রে টুকরো টুকরো ভাবে গল্পটি সাজানো হইয়াছে, এই অসংলগ্নতার কিছুটা ত্রুটি মানিয়া লইলেও বিভিন্ন অংশে নূতন নূতন চরিত্রের ও ঘটনার সহায়ক ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

বাস্তবিক 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সবটা গঠনরীতি, রচনাশৈলী বা কাহিনী-বিন্যাসের হিসাবে সমান উপভোগ্য নয়। বিভিন্ন পর্বে বা খণ্ডে উপন্যাসের মূল কাহিনীটি নূতন নূতন বাঁকে সরিয়া সরিয়া গিয়াছে বলিয়া এবং মাঝে মাঝে শাখা-কাহিনীর ঔজ্জ্বল্যে মূল কাহিনী কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া রসের ঘনতা সর্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই। প্রথম পর্বের প্রথমাংশের গল্পরসের সহিত প্রথম পর্বের শেষাংশের, প্রথম পর্বের শেষাংশের সহিত দ্বিতীয় পর্বের, দ্বিতীয় পর্বের সহিত তৃতীয় পর্বের, তৃতীয় পর্বের সহিত চতুর্থ পর্বের গল্পরসের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সমগ্রভাবে প্রথম পর্বের শিল্পকলা দ্বিতীয় পর্বে কতকটা প্রসৃত হইয়াছে, সে তুলনায় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের শিল্পকলার ম্লানরূপ অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়িবে। চতুর্থ পর্বে রোমান্টিক ভাবপ্রবাহে তৃতীয় পর্বের গতিহীনতার ত্রুটি ঢাকিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়, গতির বা বৈচিত্র্যের দিক হইতে এই চেষ্টা কিছুটা সফল হইলেও চতুর্থ পর্বের কষ্টকল্পনাজাত সৃজনপ্রয়াসে পাঠকের অনুধরণের ক্লান্তি জন্মায়। ভাষার মাধুর্য মোটের উপর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সম্পদ, কিছু কিছু কাব্যোচ্ছ্বাস থাকিলেও প্রথম পর্বের ভাষা কমনীয়তায় বিশিষ্ট। প্রথম পর্বের এই ভাষালালিত্য কমিতে কমিতে

তৃতীয় পর্বের বিলম্বিত লয়ের কাহিনী ও জীবনায়নে অনেকটা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পর্বে অবশ্য এই ভাষার গতি খানিকটা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, 'শ্রীকান্ত' পঞ্চম পর্ব বা শেষ পর্ব লিখিবার ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের ছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পূর্ণতার হিসাবে এই পঞ্চম পর্বের প্রয়োজনও ছিল। শেষ পর্ব লিখিত না হওয়ায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শিল্পকলার বা রসের বিচার পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

যাহা হউক, মোটের উপর 'শ্রীকান্ত' সুখপাঠ্য গ্রন্থ। বিচিত্র ধরণের মনোরম উপন্যাস বলিয়া 'শ্রীকান্ত' কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মর্যাদা বহুলাংশে বাড়াইয়া দিয়াছে।

'দত্তা' শরৎচন্দ্রের একখানি অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রদ উপন্যাস। পাঠক মাত্রেই প্রেমের চিত্র হিসাবে 'দত্তা'র মাধুর্য স্বীকার করিবেন। বিলাসবিহারী আগে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তাহার সংসারাভিজ্ঞ পিতা বিজয়ার সহিত বিলাসের বিবাহ দিবার জন্য সবসময় সচেষ্ট, বিজয়াকে রাসবিহারী সর্বদা তুষ্ট রাখিতে চায়, বিজয়া জমিদার হইলেও জমিদারী দেখাশোনার ব্যাপারে রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর উপর তাহাকে বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইয়াছে, সর্বোপরি হিন্দুপ্রধান গ্রামের স্বাভাবিক ব্রাহ্মবিরোধী পরিবেশে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী তরুণ বিলাসবিহারীর প্রতি বিজয়া সহজেই আকর্ষণ বোধ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নরেন্দ্র উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বিলাসবিহারীর ঈর্ষাভাব ও রূঢ়তা অনেকটা ঢাকা ছিল এবং অনুকূল পরিবেশে স্বতঃপ্রকাশমান ছিল তাহার কর্মোৎসাহ, ধর্মোৎসাহ, সারল্য এবং ভালবাসা। কাজেই রাসবিহারীর পুরো এবং বিলাসের কিছুটা স্বার্থবোধ তাহার ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবার কথা বুদ্ধিমতী বিজয়া যদিই বা উপলব্ধি করিয়া থাকে, অন্য সকল দিকের বিবেচনায় ও তাহার বয়োধর্মে প্রেমের আশ্রয়-স্বীকৃতির স্বাভাবিকতায় বিজয়া বিলাসবিহারীকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিল। তারপর নাটকীয়ভাবে নরেন্দ্র বেনামীতে উপস্থিত হইল; তাহার চরিত্রমাধুর্য, উচ্চশিক্ষা, দৈহিক-শক্তি, পৌরুষব্যঞ্জক রূপ বিজয়াকে মুগ্ধ করিল। ইহার উপর নরেনের প্রতি রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর হীন ব্যবহার রুচিমতী তরুণী বিজয়াকে

ব্যথিত করিয়া নরেনের প্রতিই অধিকতর প্রসন্ন করিয়া তুলিল। তবু ব্রাহ্ম বিজয়া কূটকৌশলী রাসবিহারীর জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, বিলাসের সহিত তাহার বিবাহের কথা বহু-প্রচারিত হইয়াছিল, হিন্দু নরেনকে পাইবার জন্য মনের গোপন কোণে যে ক্ষীণ আশাই জাগাইয়া থাক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মত মুখ বিজয়ার ছিল না। রাসবিহারী সর্বসমক্ষে বিবাহ ঘোষণা করিয়া কাজ অনেক আগাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই সঙ্গে নলিনীর সহিত নরেনের মেলামেশায় মিথ্যা সন্দেহ ও ঈর্ষাবশে বিজয়া এত অস্থির হইয়া উঠিল যে সে বিলাসবিহারীর সহিত বিবাহের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর দিয়া বসিল। ইহার পর নলিনী প্রসঙ্গে সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও হয়তো কিছু হইত না, বলির পশুর মত বিজয়াকে বিলাসবিহারীর সহিত বিবাহের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতে হইত, কিন্তু হৃদয়বান, সত্যসন্ধী, প্রকৃত ধার্মিক, বিজয়া-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-মন্দিরের আচার্য দয়াল অসমসাহসে বিজয়াকে নরেন্দ্রের সহিত বিবাহবন্ধনে মিলিত করিয়া দিলেন। কাহিনীর বাস্তব সম্ভাব্যতার হিসাবে দয়ালের এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজনে হয়তো একটু ফাঁক আছে, কিন্তু পাঠকের প্রসন্ন মন সেই ফাঁকটুকু উপেক্ষা করিয়াই গল্পের রসাস্বাদনে আনন্দ-লাভ করে।

'দত্তা' উপন্যাসের প্রথম দিকে হিন্দু-ব্রাহ্ম ধর্মমতের সংঘর্ষের ইঙ্গিত ছিল, নরেন বিজয়ার বাড়ীতে তাহার মামার দুর্গোৎসবের অনুমতি চাহিতে গিয়া সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। সমগ্র উপন্যাসেই ব্রাহ্ম জমিদার বিজয়ার নামে বিলাসবিহারী-রাসবিহারীর মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে ব্রাহ্ম-ধর্মপ্রচারের প্রয়াস এবং হিন্দু নরেন্দ্রের ব্রাহ্ম বিজয়ার মনে ক্রমেই অধিকতর স্থান লাভের কাহিনী ছড়াইয়া আছে। এই সংগঠনের ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মহা-উৎসাহী বিলাসবিহারীর উগ্র কার্যকলাপ মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করিলেও উপন্যাসে কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘর্ষের সম্ভাবনা দানা বাধে নাই। শেষ পর্যন্ত, আগেই উল্লিখিত হইয়াছে, বিজয়ার ব্রাহ্মমন্দিরের পুরোহিত হৃদয়বান দয়ালের মহত্ত্বকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। দয়াল আপন শুভবুদ্ধিতে ও দায়িত্বে বিজয়ার পিতা বনমালীর প্রতিশ্রুতি বা ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং দুইটি প্রেম-বিমুগ্ধ তরুণ-তরুণীর জীবন সার্থক করিবার জন্য হিন্দু নরেন্দ্রের সহিত ব্রাহ্ম বিজয়ার বিবাহ হিন্দুমতে

সম্পন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিবাহ হওয়াই এখানে বড় কথা; হিন্দুমতে বিবাহ হওয়ার পিছনে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে, আপন হিন্দুসমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সামান্য সুযোগটুকুও এখানে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'শ্রীকান্ত'র মতই নরেন চরিত্র আকর্ষনীয়, শ্রীকান্তের চেয়ে নরেনের বাস্তবতাবোধ কিন্তু কম। শ্রীকান্ত যেমন জীবনরসিক, নরেন ঠিক তাহা নয়। অবশ্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নরেন উজ্জ্বল বলিয়া এবং তাহার আকৃতি-প্রকৃতি বিজয়ার চিত্তাকর্ষক হওয়ায় রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত কথাবার্তায় বা আচারে আচরণে যতটা গতি দিয়াছে, বিজয়াকে নরেন তাহা না দিয়াও বিজয়ার অন্তরলোকে ক্রমেই অধিকতর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিজয়া রাজলক্ষ্মীর মত অতটা সক্রিয় না হইলেও শরৎচন্দ্রের নায়িকা চরিত্রের স্বাভাবিক চলমানতা তাহার মধ্যেও আছে এবং চরিত্রের গতি-প্রকৃতি-পরিণতিতে এই সুন্দরী আর্থিক-স্বাতন্ত্র্য-সমৃদ্ধা চরিত্রটি ঘটনা ও পরিবেশের হিসাবে লেখকের বহু সাহায্য পাইয়াছে।

'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা, 'চরিত্রহীন'-এর মত না হইলেও বাগ্‌দত্তা নায়িকা বিজয়ার জীবনকথার নিরিখে 'দত্তা' উপন্যাসের নামকরণও মোটা-মুটি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। এই উপন্যাসে আর একটি লক্ষণীয় দিক হইল ইহাতে শরৎচন্দ্র রাসবিহারীর যে চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বক্রহাস্য-বোধের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রটিকে তিনি হীন, স্বার্থপর এবং ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁহার সূক্ষ্ম অ-পছন্দের প্রতীক হিসাবে আঁকিয়াছেন, তাহাকে তিনি আপন হীনকুলোদ্ভবতা-সচেতন করিয়াছেন।* কিন্তু তবু এই চরিত্রকে

*অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিজয়া চরম বিরক্ত হইয়া নরেন-প্রসঙ্গে বিলাসকে সোজাসুজি অপমান করিয়াছে একথা শুনিয়া রাসবিহারী ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের গোড়ায় বিলাসবিহারীকে "তিক্ত কটুকণ্ঠে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে বাপু, হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই—কৈবর্ত ত? বামুন-কায়েতের ছেলে হ'লে ভদ্রতাও শিখতিস, নিজের ভাল-মন্দ কিসে হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম ক'রে বেড়াওগে।"

শরৎচন্দ্র 'অরক্ষণীয়া'র গোলোক চাটুয্যে, 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষাল, অথবা 'হরিলক্ষ্মী'র শিবচরণের মত হীনতার গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত রাখেন নাই, সহস্র দোষ সত্ত্বেও সংসার-অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, স্বার্থপর, বৃদ্ধ পিতারূপে তাহাকে আঁকিয়াছেন। ইহার ফলে উপন্যাসের শেষে বিজয়ার বিবাহ দৃশ্যে সরল বিলাসবিহারীর দুর্ভাগ্য পাঠককে যেমন কিছুটা ব্যথা দেয়, তেমনি সাধারণ পিতা রাসবিহারীর হতাশ মানসিক অবস্থার করুণ দিকটিতেও তাহার কিছুটা সহানুভূতি না গিয়া পারে না।

শরৎচন্দ্র বাংলার পল্লীগ্রামের সমস্যা লইয়া যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছেন তন্মধ্যে **'পণ্ডিত মশাই'** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪), **'পল্লীসমাজ'** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯১৬), **'অরক্ষণীয়া'** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯১৬) এবং **'বামুনের মেয়ে'** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯২০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই উপন্যাসগুলিতে পল্লী-বাংলার নিসর্গ-শ্রী আলোচ্য বিষয় নয়, পল্লীগ্রামের মানুষের সারল্য বা দয়া-মায়া-মানবতা-বোধের মত মহৎ দিকও এখানে অনেকখানি উপেক্ষিত, পক্ষান্তরে পল্লীবাসীর চিত্ত-দৈন্য, সামাজিক বিধিবিধানের চাপে মানুষের সংকীর্ণতা, সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদীদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের অপচেষ্টা, শোষিত মানুষের দুঃখময় জীবনরূপ,—এইসবই এখানে অধিকতর গুরুত্ব পাইয়াছে। এইসঙ্গে গ্রামের এইসব সমস্যার সমাধানে শরৎচন্দ্রের আন্তরিকতাও উপন্যাসগুলিতে স্পন্দিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে এবং বক্তব্য উপস্থাপনের সার্থকতার হিসাবে এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ'-এর স্থান নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে।

'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিত মশাই' এই দুখানি উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, পল্লীবাসীর অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষার অভাব। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটিলে পল্লীর জনসাধারণ অবশ্যই নবজীবন লাভ করিবে। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ ও 'পণ্ডিত মশাই'-এর বৃন্দাবনকে এই মহৎ-আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ করিয়া আঁকা হইয়াছে। আলোচ্য চারখানি উপন্যাসেই প্রেমের কথা স্থান পাইয়াছে, তবে সমাজের ও পারিপার্শ্বিকের নানা সমস্যা এই প্রেমের কমনীয়তা ও সুরভি অনেকখানি চাপিয়া দিয়াছে। 'পল্লীসমাজ'-এ রমা-রমেশ, 'পণ্ডিত মশাই'-এ বৃন্দাবন-কুসুম, 'অরক্ষণীয়া'র

জ্ঞানদা-অতুল এবং 'বামুনের মেয়ে'তে অরুণ-সন্ধ্যার প্রেমকথা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য প্রথম তিনখানি উপন্যাসের তুলনায় চতুর্থ উপন্যাসখানিতে বা 'বামুনের মেয়ে'তে প্রেমের কথা সংক্ষিপ্ত এবং প্রেমের স্থানও কম গুরুত্বপূর্ণ। 'পল্লী-সমাজ'-এ উল্লিখিত প্রেম সমাজ-অনুমোদিত নয়; রমা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবা, রমেশের সহিত তাহার বাল্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকিলেও এবং তাহাদের বিবাহের কথা হইলেও 'দেবদাস'-এর দেবদাস-পার্বতীর মত অসম কুল-কৌলীন্যের জন্য সে বিবাহ-প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। 'বামুনের মেয়ে'র অরুণ ও সন্ধ্যার ক্ষেত্রে এই কৌলীন্যের প্রতিবন্ধকতা যথেষ্ট, তাছাড়া অরুণ বিলাত ফেরৎ, একঘরে, ডাক-সাইটে কুলীনকন্যা সন্ধ্যার মা জগদ্ধাত্রী এ সম্ভাবনা চোখ রাঙাইয়া অঙ্কুরেই দাবাইয়া দিয়াছেন। 'পণ্ডিত মশাই'-এ বৈষ্ণব সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদিও বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর কুসুমের একবার আর একজনের সহিত কণ্ঠিবদল হইয়াছিল, তথাপি সেই স্বামী মারা গিয়াছে বলিয়া বৃন্দাবনের কুসুমকে সামান্য সামাজিক অনুষ্ঠান সারিয়া বধূরূপে ঘরে তোলায় সমাজের দিক হইতে বিশেষ অসুবিধা ছিল না, কিন্তু কুসুমের নিজের রুচি ও সংস্কার, তাহার উপর ভদ্র গৃহস্থদের সহিত মেলামেশার প্রভাব এই ধরণের বিবাহ বা কণ্ঠিবদলের বিরুদ্ধে গিয়াছে। 'অরক্ষণীয়া'র অতুল-জ্ঞানদার প্রেম অসামাজিক ছিল না, আর্থিক অসমতার ক্ষেত্রে এই প্রেমবীজ উপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সার্থকতাই শুধু বিলম্বিত হয় নাই, করুণার আবেগে শেষ পর্যন্ত যে সার্থকতা আসিল তাহা অন্তর্বর্তীকালীন বিষাদে অনেকখানি জীর্ণ। রূপহীনা দরিদ্রা বয়স্থা কুমারীর বিবাহ-সমস্যার উপরও 'অরক্ষণীয়া'র লেখকের সহানুভূতির আলো পড়িয়াছে।

'পল্লীসমাজে'-এ রমা-রমেশের অসামাজিক প্রেম শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং বিধবা রমাকে মর্যাদার হিসাবে বাঁচাইবার জন্যই যেন লেখক তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র এই প্রেমচিত্রে সমাজ-সচেতন হইয়া পরিণতিতে ব্যর্থতা আনিয়াছেন, কিন্তু প্রেমের স্বাভাবিকতা এবং মধুর রূপটি তিনি যত্ন করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পল্লীসমাজ' তাঁহার প্রিয় বই, যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে 'পল্লীসমাজ'-এর বিধবা রমাকে বিদ্রূপ করিয়া লেখেন: "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কি না তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ

রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছি:।" শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এই ধিক্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে বলিলেন: "এ ধিক্কার আর্টের নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন।" এই 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থেরই 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বিধবা রমা স্বামীর স্মৃতি অতিক্রম করিয়া যে অসামাজিক প্রেম করিয়াছে সেইরূপ প্রেমের স্বাভাবিকতা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, তবে এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র আনন্দময়ীর কিছুটা অনুরূপ জমিদার গৃহিণী বিশ্বেশ্বরীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের আগে বিশ্বেশ্বরী একবার পুত্র বেণীর সম্পর্কে দুর্বলতা দেখাইয়া রমেশকে অন্যায় আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র-ভাবে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে তিনি মহৎ মর্যাদায় রূপায়িত হইয়াছেন। ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে বিশ্বেশ্বরী শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে এই চমৎকার আদর্শ-উজ্জ্বল চরিত্রটি সম্পর্কে একথাও সত্য যে, এই চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নয়, আদর্শের যে সব বড় কথা তাঁহার মুখে শোনা গিয়াছে, সেগুলি গ্রামোন্নয়নে শরৎচন্দ্রেরই কথা, কিন্তু সংগ্রামী বলিষ্ঠ চরিত্র হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার মর্যাদা তিনি পাইতেই পারেন না। সমাজের হীনতায় তিনি ব্যথিতা, রমার মানুষী প্রেমের স্বাভাবিকতার তিনি সমর্থন করেন, দুর্নীতিপরায়ণ পুত্র বেণীর জন্য তিনি লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু এই সব দুঃখের অবসান ঘটাইয়া শুভ্রসুন্দর উদার জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি প্রতিকূল সমাজের বিরুদ্ধে দু একটি সামান্য ক্ষেত্রে ছাড়া রুখিয়া দাঁড়ান নাই। বিশ্বেশ্বরী অন্যায়কে অন্যায় বলিয়াই জানিয়াছেন, কিন্তু আপন জীবনের বিনিময়ে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সংগ্রাম না করিয়া তিনি শক্তিমান অন্যায়ের কাছে হার মানিয়া নিজেকে সরাইয়া লইয়াছেন। এই তাঁহার কাশী যাত্রার ইতিকথা। একই কারণে তিনি রমাকেও কাশীতে লইয়া গিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরীর আপন সামাজিক পরিবেশের অতিরিক্ত দৃঢ়-চরিত্রের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নটির উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। এই প্রশ্ন পাঠকের চিন্তা দাবী করিতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে বিশ্বেশ্বরীকে হার মানিয়া সরিয়া

খাইতে দিলেন, ইহা তাঁহার সমাজ-শক্তির বলিষ্ঠতার কাছে ব্যক্তি-শক্তির পরাজয় সম্পর্কে বাস্তববোধ জাত, ইহা উচ্চশ্রেণীর ট্র্যাজেডির উপকরণ এবং রমার ক্ষেত্রে এই ট্র্যাজেডি অধিক সত্য হইলেও বিশ্বেশ্বরীর ক্ষেত্রেও ইহার কার্যকরিতা লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রের নায়ক বা প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলির অনেকে অল্পবিস্তর নিষ্ক্রিয়, তাহারা জীবনের রসবোধী হইলেও তাহাদের কর্মিষ্ঠ অগ্রগতিশীলতা প্রায়ই কম; শ্রীকান্ত, নরেন, অপূর্ব, সুরেন্দ্রনাথ, মহিম, শৈলেশ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সে হিসাবে 'পথের দাবী'র সব্যসাচী, 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দ, 'গৃহদাহ'-এর সুরেশের মত 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ সক্রিয় বলিষ্ঠ পুরুষ। 'পণ্ডিত মশাই'-এর বৃন্দাবন চরিত্রও বলিষ্ঠ এবং ক্রিয়াশীল, কিন্তু রমেশের বলিষ্ঠ সক্রিয়তার যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পরিচয় উপন্যাসে আছে, তাহার যোগফলের হিসাবে বৃন্দাবন অনেক শান্ত চরিত্র। রমেশ অবশ্য বৃন্দাবনের তুলনায় পটভূমিকার সাহায্য বেশি পাইয়াছে, বিরোধ মীমাংসায় বিবদমান কৈলাস নাপিত ও সেখ মতিলাল আদালতে না গিয়া সাক্ষীসাবুদ লইয়া তাহার বিচার মানিয়া লইতে আসায় কর্মী রমেশের জীবন ধন্য হইয়াছে। তাছাড়া রমেশ নায়িকা রমার অধিক নৈকট্য লাভের ফলে অধিকতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হইয়া অধিকতর গতিলাভ করিয়াছে। বৃন্দাবনকে বৈষ্ণব করিয়া আঁকা হইয়াছে, নৈতিক ধর্মরূপে তাহার যে সহিষ্ণু মনোভাব প্রত্যাশিত, তজ্জন্যও বৃন্দাবন চরিত্র অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়া স্বাভাবিক। এই ধর্মীয় প্রশান্তি শরৎচন্দ্র যেন ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবন-কুসুমের মিলনের পটভূমিতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কুসুম অনেক মূল্য দিয়া বৃন্দাবনের সহিত মিলিত হইয়াছে, কিন্তু সে মিলন আসিয়াছে চরণের মৃত্যুর পর, বেদনার রক্তরাগ প্রেমের জৈবিকতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও যেন বৈরাগ্য-ধূসর করিয়া দিয়াছে।

পল্লী সমাজের বাস্তব রূপ রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনুপম ভঙ্গিতে বিবৃত হইয়াছে। ধনী শক্তিমানের হীনতার কাছে দুর্বল দরিদ্র কত অসহায় এবং কি ভাবে সে আপন মনুষ্যত্ব বিকাইয়া দেয়, ভৈরব আচার্যের রমেশ সম্বন্ধে কৃতঘ্নতা তাহার দৃষ্টান্ত। উদার মনুষ্যত্ব মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে সম্প্রসারিত করে, রমেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত সাধারণ প্রজাদের জাগরণে, বিশেষ করিয়া কৃপণ ধনী জাফর আলির গ্রামকল্যাণে দরাজ-হস্ত হইয়া উঠায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অন্যায়কারী ধনী ও সমাজপতিদের

লাঞ্ছিত করিয়া এবং তলার শ্রেণীর দরিদ্র মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ ও আপন অধিকার বোধে সচেতন করিয়া শুধু শোষিত নিপীড়িত দরিদ্রদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিই প্রকাশ করেন নাই, ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজরূপের প্রতিও যেন অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন।

'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসেও পল্লীসমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবে তাহার আকৃতি-প্রকৃতি 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের মত বলিষ্ঠ নয়। পুকুরে কলেরা রোগীর কাপড় কাচিতে না দেওয়ার জন্য কৈবর্ত বৃন্দাবনের সহিত ব্রাহ্মণ তারিণী মুখুজ্যের বিরোধ, মামার অপমানের অজুহাতে তারিণীর ভাগিনেয় গোপাল ডাক্তারের অমানুষিকতা, চরণের বিনা চিকিৎসায় করুণ মৃত্যু 'পল্লী-সমাজে'র হীন কঠিন রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তবে বৃন্দাবনের আন্তরিক চেষ্টায় এবং কেশবের উপস্থিতিতে এই উপন্যাসে গ্রামের মানুষের মনে আলো জালার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিস্তারের যে কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই আদর্শবোধের দিক দিয়া উপন্যাসের সবচেয়ে বড় কথা। 'পণ্ডিত মশাই' শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকের সৃষ্টি এবং শিল্পকলার হিসাবে তাঁহার হাত যে ক্রমশঃই অধিকতর পাকা হইয়া উঠিতেছিল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর পর প্রকাশিত বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতার পরে 'পণ্ডিত মশাই'য়ে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আখ্যান-বিন্যাস ও মনস্তত্ত্ব-সংস্থান উভয় দিক হইতেই 'পণ্ডিত মশাই'-এ মুন্সীয়ানার উল্লেখযোগ্য ছাপ আছে, এই অগ্রগতি অবশ্য 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসে আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসখানিতে গ্রাম-বাংলার মধ্যবিত্ত সংসারের বাস্তব চিত্র ও দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের কঠিন কন্যাদায় সমস্যা জীবন্ত ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। শিল্পকলার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য যে, এই উপন্যাসে বিশেষভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং তাহাদের সাধারণ জীবনের পরিচিত কাহিনী আঁকা হইয়াছে, একই বৎসর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পল্লীসমাজ'-এর সহিত 'অরক্ষণীয়া'র তুলনা করিলেই কথাটা সহজে বুঝা যাইবে। এই উপন্যাসে জ্ঞানদার মামী হরিপালের ভামিনী (পোড়াকাঠ) এক অবিস্মরণীয় চরিত্র ; এই অমার্জিত, হৃদয়বতী গ্রাম্য কুরূপা স্ত্রীলোকটিকে পাঠক সহজে ভুলিতে পারে না। 'অরক্ষণীয়া'র গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের সংস্কার তাহার হৃদয়বৃত্তিকে কিভাবে কতখানি আঘাত করিতে পারে, মানবিক সত্তাকে কতখানি আচ্ছন্ন

করিতে পারে, তাহার ভয়াবহ চিত্র আঁকা হইয়াছে ; এই ভয়ঙ্কর রূঢ় বাস্তব ছবিটি সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। 'অরক্ষণীয়া'র দরিদ্রা দুর্গামণি বিধবা, জ্ঞানদা তাহার একমাত্র সন্তান, তাহার প্রাণ। কিন্তু এই জ্ঞানদাকে বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে নিশ্চিত বৈধব্যের মুখে ঠেলিয়া দিতে মৃত্যুপথ-যাত্রিণী দুর্গামণি বিস্ময়কর আগ্রহ দেখাইয়াছে। জ্ঞানদার বিবাহ হইলে তবে তাহার হাতের জল শুদ্ধ হইবে, তবে তাহার দেওয়া পিণ্ড দুর্গামণিকে স্বর্গে লইয়া যাইবে, অথচ জ্ঞানদার ইহার চেয়ে ভাল বিবাহের আশা নাই, দুর্গামণির সংস্কার তাহার বিপুল মাতৃস্নেহ আচ্ছন্ন করিয়া জ্ঞানদার সর্বনাশ সাধনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য দুর্গামণির চরম দারিদ্র্য না থাকিলে এবং সমাজ তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুকূল হইলে হয়তো দুর্গামণি আর একটু আশা করিত, কিন্তু নিজের নিঃস্ব অবস্থায়, পরের গলগ্রহ হইয়া থাকার লাঞ্ছনায়, অতুলের বিশ্বাসঘাতকতায় সম্মুখ হইতে শেষ আশার আলোটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ায় দুর্গামণিকে বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যকেই পছন্দ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, ইহাতে তাহার অবর্তমানে মেয়েটার যা হোক একটা গতি হইবে এবং জ্ঞানদার হাতের জল শুদ্ধ হইবে বলিয়া তাহারও পিণ্ড লাভের পথ হইবে। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বীভৎস ঘটনাটির আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন: "সমাজের ক্রূরতম নির্যাতন সেইখানে যেখানে তাহার বিষাক্ত প্রভাবে মাতৃস্নেহ পর্যন্ত নিষ্ঠুর জিঘাংসাতে রূপান্তরিত হয়।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৪২।) অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "সমাজ ও সংস্কারের উৎপীড়ন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিকৃত করিয়া ফেলে—এই চিত্র তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। গ্রন্থকার এই আখ্যানকে কোথাও লঘু বা কোমল করেন নাই—ইহার সমস্ত বিষ তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়াছেন ; অনুভূতির তীব্রতায়, অভিব্যক্তির অকুণ্ঠিত বাস্তবতায় এই চিত্র অনন্যসাধারণ।"—(শরৎচন্দ্র, নবম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩।)

ভয়ঙ্কর জীবন্ত বাস্তব চিত্র হিসাবে 'অরক্ষণীয়া'র আর একখানি চিত্রের উল্লেখ করা যায়। এই উপন্যাসে ম্যালেরিয়ায় রূপহীনা, ঘরে বাহিরে বাক্যবাণে জর্জরিতা জ্ঞানদা অবিবাহিত থাকিবার নিরুপায় মর্মদাহ হইতে যা হোক করিয়া মুক্তি পাইবার জন্য বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্য যখন তাহাকে

দেখিতে আসিয়াছে, কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া না আসায় পছন্দ হইবার মত নিজেকে একটু মাজা ঘষা করিবার জন্য ঠোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ দাড়িতে মাখিয়া নিজেকে সঙ সাজাইয়াছে, কন্যা দেখিবার ইতিহাসে কন্যার অঙ্গরাগ চর্চার এমন বীভৎস দৃশ্য সত্যই দুর্লভ। জ্ঞানদার দুর্ভাগ্য ষোল আনা হইয়াছে যখন বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যও তাহাকে পছন্দ না করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং জ্যাঠাইমা স্বর্ণমঞ্জরীর অমানুষিক গালি তাহাকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে : "অ্যাঁ, খানকির বেহদ্দ করলি না? একটা ঘাটের মড়া, তার মন ভুলোবার জন্যে সঙ সেজে এলি? কিন্তু পারলি ভুলোতে? মুখে লাথি মেরে চলে গেল যে!" 'অরক্ষণীয়া'র পরিসমাপ্তি অবশ্য দুর্গামণির শবদাহের পর শ্মশানে অতুলের মন করুণাদ্রব হওয়ায় মিলনান্ত হইয়াছে, কিন্তু সারা উপন্যাসে দুর্গামণি ও জ্ঞানদার লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা যে বেদনার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, একটু সংবেদনশীল যে কোন পাঠকই তাহাতে মুহ্যমান হইবে।

'বামুনের মেয়ে'তে সমকালীন বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের সমাজের কৌলীন্য-সমস্যার কাহিনী স্থান পাইয়াছে। কুলমর্যাদার সংস্কার মানবিক বৃত্তির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়া কিরূপ অনর্থ ঘটাইতে পারে তাহা এই উপন্যাসে প্রমাণিত হইয়াছে। এই কৌলীন্য-সমস্যা আজ বাংলা দেশে প্রায় নিঃশেষিত বলিয়া ইহার ভয়ঙ্কর রূপটি আমাদের প্রত্যয়যোগ্য হওয়া কঠিন, এক কালের এই বাস্তব সামাজিক সমস্যাটি এখন ইতিহাসের বা বিগত কালের সমস্যা হইয়া পড়িতেছে বলিয়া এই সমস্যা-কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসের আকর্ষণ স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে জগদ্ধাত্রী কুলীন-কন্যার মর্যাদা-বোধের প্রতীক, শুধু কৌলীন্য ঘা খাওয়ার ভয়েই জগদ্ধাত্রী একমাত্র কন্যা সন্ধ্যাকে শিক্ষিত সুপাত্র অরুণের কাছ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। অরুণ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, অকুলীন। তাছাড়া সে বিলাত গিয়াছে, অতএব সমাজে পতিত। জগদ্ধাত্রীর শ্রদ্ধেয়া কাশীবাসিনী শাশুড়ীও অরুণকে এইভাবে বাতিল করা পছন্দ করেন নাই। কৌলীন্য-সংস্কারেই জগদ্ধাত্রী স্বামী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-কলঙ্ক প্রকাশ পাইবার পর দীর্ঘদিন একত্র ঘর করিয়াও শিশুর মত অসহায় আধ-পাগল স্বামীকে এবং অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যাকে চিরকালের মত চলিয়া যাইতে দিয়াছে। এই উপন্যাসে কুলরক্ষার আগ্রহে 'অরক্ষণীয়া'র দুর্গামণির

মত না হইলেও অনেকটা অনুরূপভাবেই জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত বকাটে, নেশা-ভাঙ-করা রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের নাতির সঙ্গেই অমন চমৎকার মেয়ে সন্ধ্যায় বিবাহ দিতে চাহিয়াছে। 'বামুনের মেয়ে'তে সন্ধ্যার কুলীন ঠাকুরদা অথর্ব মুকুন্দ মুখুজ্যে টাকা দিয়া লোক সাজাইয়া তাহাকে নিজের মত তালিম দিয়া অপরিচিতা স্ত্রীদের কাছে পাঠাইয়া আধা-আধি বখরায় টাকা আদায়ের অতি জঘন্য বন্দোবস্ত করিয়াছে। এ চিত্র হৃৎকারজনক, কিন্তু কৌলীন্য-হীনতার ইহা এক জলন্ত চিত্র। এই বন্দোবস্তের বলি হইয়াছে সন্ধ্যার পিতা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথের জন্ম হইয়াছে নকল মুকুন্দ মুখুজ্যের ঔরসে।

এই উপন্যাসের প্রিয়নাথ ডাক্তারের আপনভোলা চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টি-ক্ষমতার সার্থক নিদর্শন। 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ অথবা 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর গোকুলও আত্মভোলা, কিন্তু জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই আপনভোলা ভাবের জন্য তাহারা প্রিয়নাথের মত ব্যর্থ হয় নাই। তাছাড়া গিরিশ বা গোকুল সহৃদয় হইলেও প্রিয়নাথের মত অতখানি পরার্থপর নয়, তাহাদের সহৃদয়তা অনেকটা আপন পরিবার-কেন্দ্রেই সীমায়িত। 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ আপনভোলা, কিন্তু উপন্যাসে তাহার বৃত্তিগত সাফল্যের পরীক্ষা হয় নাই। আত্মভোলা প্রিয়নাথ মহৎ মানুষ, জগতের কাছে তাহার মহত্ত্বের দাম সে কিছুমাত্র পাইল না, বরং সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে পাইল চরম লাঞ্ছনা। গোলোক চাটুয্যের বাড়ীতে প্রিয়নাথ মহত্ত্বের দৃঢ়তা দেখাইয়াই অপমানিত হইয়াছে। অবশ্য লেখক এই বেদনার্ত চরিত্রটির পাশে মমতাময়ী সন্ধ্যাকে রাখিয়া তবু তাহার করুণ অবস্থা কিছুটা সহনীয় করিয়াছেন।

'বামুনের মেয়ে'র নায়িকা সন্ধ্যার জীবন-কাহিনী অত্যন্ত দুঃখের। কুলীন-কন্যা হইয়া জন্মিবার উচ্চমূল্য নিজেকে বঞ্চিত করিবার হিসাবে সে বরাবরই দিয়াছে। অরুণকে সন্ধ্যা পায় নাই, শেষ পর্যন্ত পিতা প্রিয়নাথের জন্ম-কলঙ্কের দাম দিতে সব দিক হইতে ফতুর হইয়া অসহায় পিতার হাত ধরিয়া সন্ধ্যা বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে। সন্ধ্যার সহিত অরুণের প্রেমের যে পরিণতি উপন্যাসে আঁকা হইয়াছে, সেরূপ ট্র্যাজেডি শুধুমাত্র অরুণের মত শিক্ষিত বিলাত-ফেরৎ যুবকের গুরুতর সঙ্কট কালে সাহসের অভাবেই ঘটিয়া গেল, প্রিয়নাথের অমর্যাদাকর জন্মবৃত্তান্ত সন্ধ্যার মুখে শুনিবার পর এই পিছাইয়া যাওয়া অরুণের পক্ষে অস্বাভাবিক না হইলেও অরুণের এই ব্যবহারে সহৃদয় পাঠক খুবই ব্যথা পায়। বিয়ের পিঁড়ি হইতে উঠিয়া চেলী-পরা সালঙ্কারা

সন্ধ্যা শেষ আশ্রয়ের আশায় অরুণের দরজায় গিয়া প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ফিরিয়াছে। তখন যদি অরুণ তাহার আহ্বানে সাড়া দিত, প্রিয়নাথকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা হয়ত নূতন জীবনপথে লড়াইয়ের জন্য মনোবল পাইত, কিন্তু অরুণের প্রত্যাখ্যানের পর পিতার দেশত্যাগী হইবার সংকল্প, মায়ের কুলগৌরব-হানিতে কঠোর মনোভাব এবং নিজের বাস্তব কুলগত অমর্যাদা সন্ধ্যাকে হতাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের বিদায়ের সময় অবশ্য অরুণ ফিরিয়াছে, সন্ধ্যার ভার লইতে চাহিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যা তখন আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, অতি বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে নূতন জীবন গড়িতে যে মনের জোর অপরিহার্য, তাহা সে তখন হারাইয়া বসিয়াছে। অরুণকে সে ফিরাইয়া দিল।

সামাজিক সমস্যার বলি হিসাবে প্রিয়নাথ-সন্ধ্যার জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল সত্য, সে উদ্দেশ্য জগদ্ধাত্রীর কৌলীন্য-মর্যাদা রক্ষার দুর্বলতায় এবং গোলোক চাটুয্যের শয়তানিতে অনেকটা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যা-অরুণের প্রেমকাহিনীকে এই উপন্যাসে আরও যত্ন করিয়া আঁকার এবং সেই সূত্রে অরুণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া আঁকার প্রয়োজন ছিল। 'বামুনের মেয়ে'তে দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র জমিদার গোলোক চাটুয্যেকে শয়তান করিয়া আঁকা হইয়াছে, মানবিক গুণাবলী হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। তাহার সহায়িকা রাসমণির চরিত্রও অনুরূপ অবিমিশ্র-হীনতায় কলঙ্কিত। গোলোক সৎ ও নিরীহ প্রিয়নাথের বিপরীত চরিত্র। জগদ্ধাত্রীর মানবিক গুণাবলী পল্লীসমাজের পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে রাসমণির একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। জ্ঞানদার প্রতি গোলোক যে পশুর অধম ব্যবহার করিয়াছে তাহাতেও সে সহায়তা পাইয়াছে রাসমণির। 'পল্লীসমাজ'-এ বেণীর দুর্নীতি-চক্রে যেমন গোবিন্দ গাঙ্গুলী সরিক, 'বামুনের মেয়ে'তে গোলোকের দুর্নীতি-চক্রে রাসমণির ভূমিকাও অনুরূপ। শরৎচন্দ্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, জমিদার সমাজে ক্ষমতার যে দাপট চালায় এবং প্রায়ই যে দাপট দুর্নীতির পথ ধরে, তাহাতে জমিদারের অর্থসাচ্ছল্য বা প্রভাব তাহার চারিধারে একটা পরিমণ্ডল রচনা করে যেখানে উচ্ছিষ্টভোগীর মত গ্রামের কিছু হীন মানুষ গিয়া ভিড় করে। প্রধানতঃ হীনদের আড়ালেই আত্মরক্ষা করিয়া শক্তিমান অর্থবান সমাজপতি জমিদার তাহার স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে।

সংগঠনের হিসাবে উচ্চশ্রেণীর না হইলেও শরৎচন্দ্রের মধুর মিলনাত্মক রচনা **পরিণীতা** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—আগস্ট, ১৯১৪), **চন্দ্রনাথ** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—মার্চ, ১৯১৬) এবং **নববিধান** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯২৪)। ইহাদের সহিত **'কাশীনাথ'** ও **'দর্পচূর্ণ'** গল্প দুইটির নাম করা চলে। এই উপন্যাস-গল্পগুলির মধ্যে দাম্পত্য প্রেম নানা অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাইয়া স্থায়ী মিলনে পরিণত হইয়াছে। কাহিনী-গুলি বহিরঙ্গ সংঘর্ষে একটু জটিল হইলেও ইহাদের ঘরোয়া রূপটুকুও পাঠককে মুগ্ধ করে। 'পরিণীতা'র হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘর্ষ, 'চন্দ্রনাথ'-এ মাতার পদস্খলনের দায় পদস্খলনের পূর্ববর্তীকালে জাত পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে কতখানি বর্তায় সে সম্পর্কে মানবতামূলক বিচারবোধ এবং 'নববিধান'-এ তথাকথিত আধুনি-কতার সহিত সনাতন সুস্থ জীবনধর্মের সংঘাত দাম্পত্য প্রেমের উপর আঘাত হানিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সংসার-জীবনে ফাটল ধরাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু লেখকের মানবিক সহানুভূতিতে ও বিবাহের মন্ত্রশুদ্ধ দাম্পত্য জীবনের প্রতি আস্থায় সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। 'কাশীনাথ' গল্পে ঐশ্বর্যের দম্ভ কমলার স্বামী প্রেমকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং 'দর্পচূর্ণ' গল্পে ইন্দুর নারী হিসাবে স্বাধিকার প্রমত্ততার যে অভিশাপ মনোরম দাম্পত্য-জীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার অপচেষ্টা করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সংসাররূপের মাধুর্যের প্রতি আগ্রহের এবং বিবাহ-বন্ধনের উপর আস্থায় সেই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়াছে।

'পরিণীতা'য় উপন্যাসের ধর্ম ঠিক রক্ষিত হয় নাই, ইহাকে বড় গল্প বলা যায়। 'পরিণীতা'র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধের যুগে রুচিমান, উদারহৃদয়, ব্রাহ্ম যুবক গিরিণকে আঁকিয়া তাহার উদ্দেশ্যে ধনী-সন্তান শিক্ষিত হিন্দুযুবক শেখরকে নতি জানাইতে শরৎচন্দ্র উৎসাহিত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থের 'ধর্ম-চেতনা' অধ্যায়ে উল্লিখিত শরৎচন্দ্রের মহত্তের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধাভাবের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, নহিলে শরৎচন্দ্র স্বধর্ম হিন্দুধর্মেই অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। 'পরিণীতা'র নায়িকা ললিতার স্বামী-সংস্কারের গৌরব এবং গোপনে হইলেও যাহাকে সে স্বামীরূপে মাল্যদান করিয়াছে তাহার স্মৃতি সম্বল করিয়া সহস্র দুঃখ সহ্য করিবার দৃঢ়সংকল্প এই মধুর উপন্যাসটিতে অতিরিক্ত সুরভি-সঞ্চার করিয়াছে। সমাজ-বোধের দিক হইতে 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে শরৎ চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়। সরযুর মায়ের

কুলত্যাগের জন্য কুলত্যাগের আগে জন্মানো সরযূ দায়ী নহে, তাহার সম্ভাবনাময় জীবন এজন্য ব্যর্থ হওয়া অন্যায়, এই অভিমত পাঠকের তথা সমাজের সম্মুখে রাখিবার দৃঢ়তা শরৎচন্দ্র 'চন্দ্রনাথ'-এ দেখাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ হয়তো ভালবাসার জন্যই সরযূকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন অবশ্যই কণ্টকিত হইত যদি না শরৎচন্দ্রের ভাবদৃষ্টির বাহকরূপে চন্দ্রনাথের কাকা জমিদার মণিশঙ্কর বধূমাতা সরযূকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন। চন্দ্রনাথের প্রেম এ উপন্যাসের অনেকখানি জুড়িয়া আছে। চন্দ্রনাথ নিজে এযুগের নায়কদের মত সমাজের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে নাই সত্য. কিন্তু সরযূর প্রতি অসীম ভালবাসায় ও দরদে সে সরযূর নির্বাসনের পর আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া দুনিয়ার ভোগসুখ হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত কাশীতে গিয়া পুনরায় সরযূকে বরণ করিয়া লইয়াছে। মণিশঙ্কর, ব্রজকিশোর, হরকালী প্রভৃতি আত্মীয়-আত্মীয়াদের পুনরায় দারগ্রহণের অনুরোধ সে স্বীকার করে নাই। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে সরযূ-চন্দ্রনাথের দাম্পত্য প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে উদার-হৃদয় স্নেহময় কৈলাস খুড়োর কাহিনী স্থান পাইয়াছে। এই স্নিগ্ধ কাহিনীটির মর্যাদা রক্ষা করিতেই যেন শরৎচন্দ্র উপন্যাসের শিল্পকলা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াও চন্দ্রনাথ-সরযূর আনন্দঘন মিলন সংস্থাপনের পরেও গ্রন্থের উপসংহারে কৈলাস খুড়োর মৃত্যুর বিষণ্ণ দৃশ্যটি আঁকিয়াছেন। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে শিশু 'বিশু'র যে গুরুত্বপূর্ণ মাধুর্যময় ভূমিকা তাহা শরৎসাহিত্যের তথা বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় সম্পদ।

আগেই বলা হইয়াছে 'নববিধান' উপন্যাসে এবং 'কাশীনাথ' ও 'দর্পচূর্ণ' গল্পে শরৎচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন ও দাম্পত্যপ্রেমের প্রতি অনুরাগই সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। উষাকে, কাশীনাথকে এবং নরেন্দ্রকে জিতাইয়া দিবার জন্যই যেন শৈলেশের অভ্যস্ত জীবনচর্চার গুরুত্ব, কমলার স্বাভাবিক খাতে স্বামী-প্রেম প্রবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং ইন্দুর নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সর্বাংশে অবহেলিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যেটুকু অনুভূতিশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটুকুও যেন লেখকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'কে* রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায়। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সংগ্রামী ভারতীয়ের যে অংশ ভারতের বাহিরে বিদেশী রাজশক্তি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়াছিল, তাহাদের মহান্ প্রয়াসের এক খণ্ড কাহিনী 'পথের দাবী'তে বিধৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম দেশ ইহার পটভূমি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপন্যাসের ঘটনাকালে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। 'পথের দাবী'তে হৃদয়-প্রাধান্যের স্থান নগণ্য নয়, কিন্তু মানব-হৃদয়-রহস্য এবং প্রেমের স্নিগ্ধ সুরভি ইহাতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও সমগ্রভাবে ইহার পটভূমিতে সঞ্চারিত স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপই পাঠক-হৃদয় অধিকতর উদ্বেল করে। যে যুগে 'পথের দাবী' প্রকাশিত, বাজেয়াপ্ত এবং পুনঃ-প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই পরাধীনতার যুগের হিসাবে একথা আরও সত্য।

এই উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচী বা ডাক্তার চরিত্রটির পরিকল্পনা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহা শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সব্যসাচী সর্বত্যাগী, অসমসাহসী, শক্তিধর নায়ক। ইস্পাত-দৃঢ় তাঁহার নৈতিক চরিত্র। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি বহু বিস্তৃত, কর্মক্ষেত্র সুবিপুল, দেশপ্রেম অপরিমেয়।

* 'পথের দাবী' 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল (১৩২৯-১৩৩৩) প্রকাশিত হইবার পর ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৯২৬, আগস্ট) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার অব্যবহিত পরেই ১৩৪৬ সালে বৈশাখ মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা-কামী বাঙ্গালীর কাছে পথের দাবী 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রে প্রকাশকালেই সুবিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাজেয়াপ্ত হইবার পরও গোপনে এই গ্রন্থের ব্যাপক পঠন-পাঠন চলিতে থাকে। সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দেওয়া ইহার নাট্যরূপ কলিকাতায় 'নাট্যনিকেতন'-এ মঞ্চস্থ হয় (মে, ১৯৩৯)। ঠিক এক বৎসর পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সরকার রাজদ্রোহের ও বিপ্লববাদ প্রচারের অভিযোগে 'পথের দাবী'র নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দেন।

পরাধীনতার মর্মজ্বালায় অন্তর তাঁহার ক্ষত বিক্ষত। অন্যায়, অসত্য হীনতার বিরুদ্ধে সব্যসাচী এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। আবার এই অগ্নিগোলকের অন্তরালে একটি কোমল সুন্দর শুভ্র হৃদয় সব সময় জাগিয়া আছে। সব্যসাচীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম-সম্পর্কিত বহির্ভারতীয় ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে পরবর্তীকালের মহান্ দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করিয়া এখন 'পথের দাবী'র পাঠক নিঃসন্দেহে অধিকতর তৃপ্তি লাভ করে।

'পথের দাবী'র মূল কাহিনী সব্যসাচীর কর্মকাণ্ড, এই কাহিনীরই অংশীভূত হইয়াছে বিপ্লবী সংস্থা 'পথের দাবী'র সুন্দরী নেত্রী সুমিত্রার আকর্ষণ এড়াইয়া সংস্থা-নায়ক সব্যসাচীর কঠিন কর্তব্য-পথে পদচারণা। ভারতী সব্যসাচীর অধীনে একজন কর্মী, কিন্তু ভারতীর প্রধান পরিচয় সে অপূর্বকে ভালবাসে এবং অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী প্রকৃতপক্ষে 'পথের দাবী'র দ্বিতীয় কাহিনী। সব্যসাচীর উদার হৃদয়বোধের, মানবিক অনুভূতির পরিচিতি দ্বিতীয় কাহিনীটিকে মূল কাহিনীর সহিত এক সূত্রে গাঁথিয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'পথের দাবী'তে অপরিহার্য মনে নাও হইতে পারে, কিন্তু নায়ক সব্য-সাচীকে 'গোটা মানুষ' করিয়া আঁকিবার জন্ম লেখকের আগ্রহের ফলে ইহা গ্রন্থে একরূপ মানাইয়া গিয়াছে। তাছাড়া যদিও দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্ন এবং পরাধীনতার জ্বালা সব্যসাচীর চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপে সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের বাস্তবরূপ এই উপন্যাসে বিস্তারিত না হওয়ায় অপূর্ব-ভারতীর কাহিনী ব্যতিরেকে উপন্যাসের কাঠামোটিকে দাঁড় করানো নিঃসন্দেহে অসুবিধাজনক হইত। শশিকবি-নবতারার প্রণয় এই উপন্যাসের তৃতীয় কাহিনী। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র, কিন্তু এই কাহিনী উপলক্ষ করিয়াও সব্যসাচী চরিত্রের কোমল দিকটি ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

নানা দিকে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও 'পথের দাবী' উপন্যাসের সাংগঠনিক ত্রুটিও কম লক্ষণীয় নয়। ভারতের বাহিরে সব্যসাচী-পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপটি ইহাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে নাই এবং ভারতের অভ্যন্তরস্থ স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত ইহার প্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখান হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ

যথেষ্ট হইলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ পরিচয় সামান্য, কাজেই রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে ইহার বাস্তব মূল্যও কমিয়া গিয়াছে। তাছাড়া এই রাজনৈতিক উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ-বশে নরনারীর মনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের কথা বড় করিয়া তুলিয়া ধরায় ইহার উপন্যাস-সুলভ রসাত্মক আবেদন বৃদ্ধি পাইলেও 'পথের দাবী' রচনার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ব্যাহত হইয়াছে। সব্যসাচীর প্রতি সুমিত্রার ভালবাসার গভীরতা মোটা মোটা কয়েকটি রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া তবু মানাইয়া গিয়াছে, এই প্রেমের করুণ পরিণতিও দ্রুত অঙ্কিত হইয়াছে, সুমিত্রা যাহাকে পাইলে সব ত্যাগ করিতে পারিত সেই সব্যসাচীকে পাইবার আশা না থাকায় সে উত্তরাধিকার সূত্রে অগাধ সম্পত্তি লাভ করার অজুহাতে আপনাকে 'পথের দাবী'র সংস্পর্শ হইতে সরাইয়া লইয়াছে। ইহাতে সব্যসাচীর আত্মত্যাগের মহিমা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমের চিত্র যেমন বিস্তৃত, ইহার গুরুত্ব তেমনি ব্যাপক। অপূর্ব-ভারতীর এই প্রেমচিত্র দীর্ঘায়তন হওয়ায় 'পথের দাবী'র কাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা তরল হইয়া গিয়াছে। আগেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সম্ভবত জীবনে মানবিক বিচার-বিবেচনার সর্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে লেখকের প্রত্যয়ই এই সুদীর্ঘ প্রেম-কাহিনী সন্নিবেশের কারণ এবং ইস্পাত-কঠিন সব্যসাচীর মনেও এই মানবিক আবেদনের গভীরতা দেখাইবার আগ্রহ শরৎচন্দ্র সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই দলের সহকর্মীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ সত্ত্বেও সব্যসাচী রাজনৈতিক দলের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকতার স্বাভাবিক কঠিন শাস্তি, এমন কি কোন শাস্তি না দিয়াই তাঁহার স্নেহাস্পদা ভারতীর প্রেমিক অপূর্বকে ক্ষমা করিয়াছেন।

বাস্তবিক 'পথের দাবী' উপন্যাসকে যদি রাজনৈতিক উপন্যাস বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে অপূর্ব-ভারতীর প্রেম যে ভাবে ব্যক্তি-প্রেমের প্রাধান্য লইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ইহার মূলসুরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে না। রাজনৈতিক উপন্যাসে ব্যক্তি-প্রেম রাজনৈতিক পরিবেশের আশ্রয়ে সেই পরিবেশের গতি-প্রকৃতিতে আঘাত না করিয়াই রূপায়িত হইবে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস

'For whom the Bell Tolls'-এ রবার্ট ও মারিয়ার প্রেম-কাহিনীর সহিত 'পথের দাবী'তে অপূর্ব-ভারতীর প্রেম-কাহিনীর তুলনা করিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব ভারতীর প্রেম 'পথের দাবী'র রাজনৈতিক পটভূমিকে পিছনে ফেলিয়া আপন মাধুর্যের পরিমণ্ডলেই আশ্রয় পাইয়াছে, পক্ষান্তরে রবার্ট-মারিয়ার প্রেম যথেষ্ট গভীরতা সত্ত্বেও ব্যক্তি-কেন্দ্রে একক প্রাধান্য না পাইয়া স্পেনের ফাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের মূলরসের ঘনীভবনে সহায়তা করিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, 'পথের দাবী' উপন্যাস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আবেদন জানান, কবিগুরু কিন্তু 'পথের দাবী'র ইংরেজ রাজ-শক্তির তীব্র বিরুদ্ধতার উল্লেখ করিয়া ইংরেজ রাজশক্তির পক্ষে এই বইখানি বাজেয়াপ্ত করা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং শরৎচন্দ্রের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন। শরৎচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।* বর্তমান গ্রন্থের 'রাজনৈতিক চেতনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই মতপার্থক্য উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পালের এই মতবিরোধ 'পথের দাবী' গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া হওয়ায় এই ঘটনাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দুঃখজনক অধ্যায় হইয়া আছে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—মে, ১৯৩১) উপন্যাস

---

*"আমার 'পথের দাবী' প'ড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে ত ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায়, কবি যদি তুমি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা—কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।" (শরৎচন্দ্রের লিখিত পত্রাংশ, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, পৃষ্ঠা-৯৬ হইতে উদ্ধৃত।)

হিসাবে বিচিত্র হইলেও সার্থক নয়। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন: "উপন্যাসটি প্রধানতঃ বিতর্কমূলক মতবাদ আলোচনার ক্ষেত্র, ইহাকে ঔপন্যাসিক গুণসমৃদ্ধ বলা চলে না।" তবে একথাও ঠিক যে, কমল চরিত্রের মাধ্যমে 'শেষপ্রশ্ন'-এ বুদ্ধির যে খেলা চলিয়াছে, শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগ-সমৃদ্ধ রচনাবলীর বিপরীতে তাহাতে শরৎ প্রতিভার আর একদিক উন্মোচিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে জগৎজোড়া বিশৃঙ্খলার চাপে প্রচলিত মূল্যবোধে ভাঙন দেখা দিয়াছিল, সাহিত্যিক শিল্পীরা সনাতন জীবনাদর্শ ছাড়িয়া অবিন্যস্ত জীবন রূপায়ণের মধ্যে এই ভাঙনের বেদনাকে ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বাংলা দেশেও এই চেষ্টা কিছুটা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই চেষ্টায় মস্তিষ্ক-প্রাধান্য বা বুদ্ধি-প্রাধান্য হৃদয়-প্রাধান্যকে বহুলাংশে স্থানচ্যুত করিয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাকে আধুনিকতা বলিয়া দাবী করা হয়। এই চেষ্টার সঙ্গে রবীন্দ্র-যুগ-প্রভাব অতিক্রম করিবার একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষাও স্পন্দিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র দুজনের কাহারোই এই নূতনত্ব-প্রয়াসীদের সহিত সমাত্মতা ছিল না, কিন্তু ইহাদের পরিবর্তন প্রয়াসের স্বাভাবিকতাকেও তাঁহারা যে একেবারে অস্বীকার করেন নাই, তাহা তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন স্বীকৃতি ছাড়াও আপন রচনারীতি হইতে সরিয়া গিয়া শেষের কবিতা (১৯২৯) ও শেষপ্রশ্ন (১৯৩১) রচনার মধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুই সাহিত্যিক-প্রবরের সৃষ্টি দুইখানির মধ্যে পার্থক্য হিসাবে মনে হয় শরৎচন্দ্র যতখানি ভাবাবেগ-জাত নিষ্ঠার সহিত 'শেষপ্রশ্ন' লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যেন আধুনিক অবিন্যস্ত জীবনের লঘু চালটিকেই 'শেষের কবিতা'র ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার 'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিত জীবনকে গভীর ভাবে আঁকড়াইয়া না ধরিয়া হালকা ভাবে বীণার তারের মত ছুঁইয়া যাইতে যাইতেই সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করিতে চায়। এমনও হইতে পারে, ইহা রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্যিকদের অগভীর জীবনায়নের প্রতি এক ধরণের ব্যঙ্গ। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র আধুনিক চরিত্র কি হইতেছে তাহাই যেন কমলের মধ্যে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিত্রাস, সামতাবেড়, হইতে ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ তিনি দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "শেষপ্রশ্নে অতি-

আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। খুব কোরবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখবো এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক-সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।" (গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১ম সংস্করণ।)*

কবিগুরুর 'শেষের কবিতা'য় উপন্যাসের উপাদান অনেক আছে, স্নিগ্ধ প্রেমের সৌরভে ইহা সুরভিত। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' বুদ্ধির কচকচিতে ভারি, ইহার কাহিনীতে উপন্যাসের কাহিনীর জমজমাট ভাব নাই, আখ্যানের শিথিল গ্রন্থনও সহজেই চোখে পড়ে। বিক্ষিপ্ত ও কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে 'শেষপ্রশ্ন'-এ কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য; শেষের কবিতার মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত লালিত্য না থাকিলেও 'শেষপ্রশ্ন'-এর ভাষায়ও মাঝে মাঝে লক্ষণীয় দীপ্তি আছে, কিন্তু সমগ্র ভাবে তত্ত্বের অত্যধিক চাপে এ উপন্যাসে শিল্পকলা বিকশিত হইতে পারে নাই। সবচেয়ে মজার কথা হইতেছে এই যে, 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে মতবাদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট, কিন্তু যে মতবাদ ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের ভাবদৃষ্টির বা জীবনদর্শনের সহিত তাহার মিল অথবা যোগ নাই বলিলেই চলে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' কিছু নূতনত্ব-পিয়াসী পাঠকের ভাল লাগিয়াছিল; রাধারাণী দেবী, দিলীপকুমার রায়ের মত সাহিত্যিকরা তাঁহাদের ভাল-লাগার কথা জানাইয়া শরৎচন্দ্রকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার এলোমেলো রূপ, বড় বড় ভারি ভারি কথার বাহুল্য, সর্বোপরি নায়িকা কমলের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ-বিধ্বংসী ভয়াবহ সব মতবাদ বহু পাঠককে শরৎচন্দ্রের প্রতি অপ্রসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সংগঠনের দিক হইতেও একটি মাত্র তর্কপ্রিয় চরিত্র (কমল)-কেন্দ্রিক

*শরৎচন্দ্র সামতাবেড় হইতে কবি রাধারাণী দেবীকেও ঐ একই তারিখে (৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৮) এক পত্রে লেখেন: "অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম।"—(গোপালচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, ১ম সংস্করণ।)

মোটামুটি বৃহদায়তন এই উপন্যাস অনেক পাঠকের কাছে বৈচিত্র্যহীন ও শুষ্ক মনে হয়। উপন্যাসে কমল-শিবনাথ, শিবনাথ-মনোরমা, নীলিমা-আশুবাবু, কমল-রাজেন, প্রেমের ছবি ফুটাইবার সামান্য এই চেষ্টাগুলি প্রায়ই অপরিস্ফুট, তবু ইহারই মধ্যে বঞ্চিতা বিধবা নীলিমার সদাপ্রসন্ন অসহায় বৃদ্ধ আশুবাবুর সান্নিধ্যে হৃদয়-পদ্ম উন্মীলনের যে ক্ষুদ্র কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা উপন্যাসের সম্পদ রূপে বিবেচিত হইতে পারে। পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী-বিমুখ রাজেনকে জয়ের সক্রিয় প্রয়াসে কমল চরিত্র বিকাশেরও সুযোগ ছিল, কিন্তু সেই সুযোগ সম্প্রসারিত করিয়া জমাট কাহিনীরচনার চেষ্টা হয় নাই।

শরৎচন্দ্র আপন সৃষ্টি সম্পর্কে দুর্বল ছিলেন, 'শেষপ্রশ্ন'-এর শিল্পকলাগত মূল্য সম্বন্ধেও তাঁহার প্রথমে উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু চারিদিকে আবহাওয়া তেমন অনুকূল নহে উপলব্ধি করিয়াই বোধহয় শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন'-এর পরিমণ্ডল হইতে নিজেকে সরাইয়া লইলেন। 'শেষপ্রশ্ন'-এর (১৯৩১) পর **বিপ্রদাস** (পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫) রচনাই যেন এই পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্ত। 'শেষপ্রশ্ন'-এ হিন্দু বিবাহ প্রথার মর্যাদা ধূলিসাৎ হইয়াছে, 'বিপ্রদাস'-এ এই প্রথা বিজয়ী হইয়াছে। তথাকথিত আধুনিকতার নয়, 'বিপ্রদাস'-এ জয় হইয়াছে সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যের। বোম্বাই-প্রবাসিনী আধুনিকা তরুণী ব্রাহ্মণ-কন্যা বন্দনা কায়স্থ-সন্তান সুধীরকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াও বিপ্রদাসের মুখুয্যে পরিবারের সংশ্লেষে আসিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছে। প্রথমে বন্দনা যেভাবে বিপ্রদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়, বন্দনাকে সূক্ষ্মভাবে বিপ্রদাস যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাও নৈতিকতার দিক হইতে আপত্তিকর, কিন্তু এই বিপ্রদাস-বন্দনা উপাখ্যান দ্বিজদাস-বন্দনার মিলনে তথা বৃহৎ মুখুয্যে পরিবারের গৌরবে বন্দনার অংশলাভের সোপান মাত্র, এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শরৎ-চেতনার সম্যক্ উপলব্ধি ঘটিবে। বন্দনার আধুনিকতা মুখুয্যে পরিবারের কর্ণধার পূজারত বিপ্রদাসের সৌম্য রূপের প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে, বিবাহিত ভগিনীপতি বিপ্রদাসকে বন্দনার হীনতার পাঁকে নামাইবার ব্যাপার ইহা নয়, ঝড়ের দোলার মত মন একটু দুলিয়াই যথার্থ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, ইহাই 'বিপ্রদাস'-এর কাহিনী। শরৎচন্দ্রের হিন্দু-সামাজিকতা-অনুরাগী মনটি এই সময় এমনি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল

যে, তিনি দয়াময়ীর মত শুচিবায়ুগ্রস্তা, অনুদার-হৃদয়া জমিদার-গৃহিণীকে মানাইয়া লইয়া শ্রদ্ধার্হা করিয়া তুলিয়াছেন। বিপ্রদাসের মুখে দয়াময়ীর রূঢ় আচার-আচরণের ব্যাখ্যা শুনিয়া বন্দনা সম্মোহিতার মতই দয়াময়ী সম্পর্কে তাহার মত পালটাইয়াছে। 'বিপ্রদাস' 'শেষপ্রশ্ন'-এর তুলনায় অনেক সরস ও সুখপাঠ্য, ইহাতে প্রশস্ত ক্ষেত্রে হৃদয় খেলা করিবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়া উপন্যাসের উপাদান ইহার বেশি, কিন্তু তবু সমগ্রভাবে 'বিপ্রদাস'কে শরৎচন্দ্রের পরিণত শিল্পীমানসের সার্থক সৃষ্টি বলিতে পারা যায় না।* ইতিপূর্বে বর্তমান গ্রন্থের 'অর্থ নৈতিক চেতনা' অধ্যায়ে যেকথা বলা হইয়াছে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের প্রথম দিকে বিপ্রদাস ও দ্বিজদাসের পারিবারিক গভীর প্রীতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতবিরোধের যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল এবং এই উপন্যাসে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভে শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র ফুটাইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, উপন্যাসটি উত্তরকালে সম্পূর্ণ হৃদয়প্রধান উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইবার ফলে সেই ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে অল্পবয়সেই লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ের এই উপন্যাসখানি হয় কাঁচা লেখা বলিয়া, আর না হয় অন্য কোন কারণে, শরৎচন্দ্র জীবিত কালে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচমাস পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'শুভদা' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'ছোটদের মাধুকরী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৪৫) বাল্যস্মৃতি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন : শুভদা "প্রথম যুগের লেখা, ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।" এই বই বাহির হইলে তাঁহার স্নেহধন্যা কোন বড় লেখিকার ক্ষতি হইবে,—এই আশঙ্কাতেই শরৎচন্দ্র 'শুভদা'র প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। (এ

* অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বিপ্রদাস' সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন : "'বিপ্রদাস' যে শরৎচন্দ্রের নিকৃষ্টতম রচনা, এই বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ কম।"—('শরৎচন্দ্র', নবম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৮)

সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২০-১২২ দ্রষ্টব্য।)

'শুভদা'র মধ্যে 'বড়দিদি'র মত প্রথম দিকের লেখার উচ্ছ্বাস-আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এই অল্প বয়সের লেখা উপন্যাসটিতেও 'দেবদাস' উপন্যাস বা 'মন্দির' গল্পের মত শক্তিধর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার কিছুটা ইঙ্গিত মিলে। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শুভদা চরিত্রে দারিদ্র্য-ক্ষতবিক্ষত দুশ্চরিত্র স্বামীর সেবিকা, সতীসাধ্বী রূপের যে উজ্জ্বল ছবিটি ফুটাইয়াছেন তাহা এক হিসাবে তাঁহার 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের' অতুলনীয়া অন্নদাদিদির পূর্বাভাস বলা চলে। এই উপন্যাসে পতিতা কাত্যায়নীর ক্ষুদ্র চরিত্রটি অঙ্কনের মধ্যে পতিতা পদস্খলিতা নারীদের নারীত্ব-স্বীকৃতিতে শরৎচন্দ্রের উদারতার বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে দারিদ্র্য কত কঠোর হইতে পারে তাহার বাস্তব রূপ পাঠকমাত্রকেই সচকিত করে। শরৎচন্দ্র ব্যক্তি জীবনে কৈশোরে যে কঠিন দারিদ্র্যের মুখোমুখি হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার ছায়া পড়িয়াছে মনে হয়। জমিদারী প্রথার প্রতি শরৎচন্দ্রের যে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় এবং জমিদার মন্দ হইলে তাহাকে ধিক্কৃত ও ভাল হইলে তাহাকে অভিনন্দিত করিবার যে প্রবণতা তিনি পরবর্তীকালে দেখাইয়াছেন, 'শুভদা'র জমিদার ভগবান নন্দীকে যত্ন করিয়া সদাশয় রূপে চিত্রিত করিয়া শরৎচন্দ্র সেই মনোভাবেরই পরিচয় রাখিয়াছেন। 'শুভদা' উপন্যাসে শুভদার কন্যা ললনা দারিদ্র্যের জ্বালায় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, তাহাকে বাঁচায় জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সুরেন্দ্র চৌধুরীর রক্ষিতা জয়াবতী ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময় নৌকায় স্টীমারের ধাক্কায় জলে ডুবিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ সুন্দরী যুবতী ললনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে ও ছাড়িতে অস্বীকার করে, ললনাও কৃতজ্ঞতাবশে তাহার কাছে থাকিয়া যায়। শরৎচন্দ্র এখানে যেন ভদ্রকন্যা ললনার মান বাঁচাইতেই তাহার সহিত সুরেন্দ্র চৌধুরীর মালাবদল করাইয়া তাহাদের একসঙ্গে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নারী বিধবা হইলেই আর কাহাকেও বিবাহের অধিকার তাহার নাই, বাল্যবয়সের রচনা 'শুভদা'তে বিধবা ললনার সুরেন্দ্র চৌধুরীকে মাল্যদানের মধ্যে শরৎচন্দ্র যেন তাহার প্রতিবাদ রাখিয়াছেন। অবশ্য ললনা প্রথমে সমাজ-সংস্কার বশে এই মাল্যদানের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই, পরে সুরেন্দ্র চৌধুরীর আগ্রহে ও তাহার উপকার

স্মরণ করিয়া সম্মত হইয়াছে। তবে সমাজ-বিধি মান্য করিতেই বোধহয়-শরৎচন্দ্র নিজেও এই মালাবদলকে পুরো বিবাহের মর্যাদা দিতে পারেন নাই এবং মালাবদলের পরও ললনা সুরেন্দ্রনাথের বসত বাড়ীতে যাইতে অস্বীকার করিয়া পৃথক বাড়ীতে বাস করিয়াছে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল, শুভদাতেও হারাণের সংসারে তাহার দিদির কর্ত্রীত্বে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। হারাণ দুর্বৃত্ত, সে চাকুরি খোয়াইয়াছে, কিন্তু তাহার দরিদ্র সংসারে দিদির কর্ত্রীত্ব বা অবস্থিতি সম্বন্ধে তাহার দিক হইতে বিন্দুমাত্র বিরাগ দেখা যায় নাই।

'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস। উপন্যাসটি তিনি তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে লিখিতেছিলেন, বার্ধক্য ও অসুস্থতাবশতঃ লেখা নিয়মিত হইতেছিল না এবং উপন্যাসটি তিনি শেষও করিতে পারেন নাই। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের আষাঢ় হইতে ১৩৪২ সালের বৈশাখ পর্যন্ত এই প্রায় তিন বৎসরে 'শেষের পরিচয়'-এর মাত্র ১৫টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই ১৫টি পরিচ্ছেদই লিখিয়া গিয়াছেন। পরে কবি রাধারাণী দেবী বাকী অংশ লিখিয়া উপন্যাসটি শেষ করেন।

'শেষের পরিচয়'-এর নায়িকা সবিতা এক কুলত্যাগিনী নারী, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় সমৃদ্ধ এই চরিত্রটির অঙ্কনে শরৎচন্দ্র বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সবিতা পরপুরুষ রমণীবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছে, ব্রজবাবুর মত স্বামী থাকিতে রমণীবাবু কি গুণে তাহাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিল সে কথা অবশ্য উপন্যাসে পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু গৃহত্যাগের পরও এই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না, হৃদয়বতী নারী-চরিত্রটি শরৎচন্দ্র সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। সবিতা রমণীবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ তের বৎসর ঘর করিলেও স্বামী-সংস্কার তাহার নিঃশেষিত হয় নাই, কন্যা রেণু ও স্বামী ব্রজবাবুর জন্য মন তাহার আকুল, স্বামিগৃহে তাহার স্থান নাই, এই সচেতনতা সবিতার রূপটিকে বেদনাম্লান করিয়া রাখিয়াছে।* স্বামী ব্রজবাবুর কাছে সবিতা ফিরিতে পারে নাই,

*সবিতা একদিন স্বামী ব্রজবাবুর বাসাবাড়ীতে (পুরাতন নিজের বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রী হইয়া গিয়াছে) উপস্থিত হইয়া বাথরুমে ঢুকিয়া দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রজবাবুকে বলিয়াছে: "আমি এ

রুচিহীন রমণীবাবুর কাছে বসবাস করিয়া সে ক্লান্ত, এমন সময় রমণীবাবুর সিঙ্গাপুর-প্রবাসী ধনী বন্ধু বিমলবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া এবং বিমলবাবুর উদার, পরিমার্জিত ভদ্রমনের পরিচয় পাইয়া সবিতা যেন বিমলবাবুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিয়া তবু কিছুটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাসটি যেটুকু লিখিয়াছেন তাহাতেই সবিতার মধ্যে এক আশ্চর্য সুন্দর নায়িকার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে; গ্রন্থটি শেষ হয় নাই, ইহা শরৎসাহিত্যের রসিক পাঠকের পক্ষে দুঃখের কথা।* অবশ্য কবি রাধারাণী দেবী 'শেষের পরিচয়ে'র শেষাংশ লিখিয়া পাঠকসমাজে মোটামুটি প্রশংসা লাভই করিয়াছেন।

'শেষের পরিচয়'-এর সবিতার স্বামী ব্রজবাবু এক শান্ত আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ চরিত্র, 'স্বামী'র ঘনশ্যামের সহিত তাঁহার অনেকটা মিল আছে। ব্রজবাবু চরিত্রটি যথেষ্ট সক্রিয় বা গতিশীল নয়, শরৎচন্দ্রের সাধারণ নায়কদের মতই তাঁহার প্রকৃতি, এই নায়কদের মতই আবার ব্রজবাবু সংযত, হৃদয়বান, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, স্বধর্মানুরাগী। শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী মনটির স্পর্শ এই চরিত্রে পাওয়া যায়। ধনী, লম্পট, উদ্ধত রমণীবাবুর বিপরীতে তাহার ধনী বন্ধু বিমলবাবুর মার্জিত, ভদ্র, বিনয়ী রূপটি বৈপরীত্য সৃষ্টিদ্বারা নায়িকা সবিতা চরিত্রের অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিত বলিয়া আশা করা যায় এবং সে হিসাবে বিমলবাবুর চরিত্র পরিকল্পনায় শিল্প-

বাড়ী থেকে যদি না যাই, কি করতে পারো তুমি আমার?" সবিতাকে কিন্তু যাইতেই হইল। এ জোর তাহার টিকিল না। স্বামী ব্রজবাবু তাহাকে তাড়াইলেন না, সবিতা আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে, তিনি বৈষ্ণব, যত সামাজিক কলঙ্কই হউক, আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয়দান তাঁহার ধর্মের অনুশাসন। সবিতা অবশ্য অধিকার চাহিয়াছিল, করুণা নয়, ব্রজবাবুর প্রশান্ত আচরণে তাহার ব্যথা বাড়িয়াই গেল। মাথা নীচু করিয়া সে বিদায় লইল।

* অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের অন্তিম জীবনে লেখা 'শেষের পরিচয়'-এর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন: "শরৎচন্দ্রের শেষ অবদান যে তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তির রশ্মিজালমণ্ডিত—এই সিদ্ধান্ত শরৎ-সাহিত্যের নিকট বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে আমাদের মনে পুলকিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৮)

কলাগত কৃতিত্ব আছে। এই উপন্যাসে পরোপকারী রাখাল চরিত্রটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে, বলাই বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের লিখিত অংশ হইতে চরিত্রগুলির কোনটি সম্পর্কেই অধিক আলোচনা চলে না, কারণ কোনটিই পুরোপুরি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।

'শেষের পরিচয়'-এর মত শরৎচন্দ্রের আর একখানি উল্লেখযোগ্য অসম্পূর্ণ উপন্যাস '**জাগরণ**' মাসিক বসুমতীর কার্তিক-পৌষ, চৈত্র, ১৩৩০, বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ, ১৩৩১ এবং বৈশাখ, ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র ইহার মাত্র ৯টি পরিচ্ছেদ লিখিয়া গিয়াছেন। 'জাগরণ' যেটুকু লেখা হইয়াছিল তাহাতে উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য বা সম্ভাবনার কিছুটা ইঙ্গিত মিলিলেও প্রকৃতপক্ষে গল্প, কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র, কিছুই ভাল করিয়া জমে নাই। ইহাতে বিদেশী রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম, সনাতন পন্থার সহিত আধুনিকতার সংঘর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার অঙ্কুর দেখা যায়, কিন্তু কিছুই দানা বাঁধে নাই। তবে যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই উপন্যাসখানির 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় এবং হৃদয়াবেগসম্পন্ন লেখক অমরনাথ-আলেখ্যের অথবা অমরনাথ-আলেখ্য-ইন্দুর প্রেমে কাহিনী ভাসাইয়া না দিলে (যাহা দেওয়া শরৎচন্দ্রের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না) অমরনাথের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা প্রজা-জমিদার সংঘর্ষ উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করিত বলিয়াই মনে হয়।

'জাগরণ'-এর অমরনাথ তরুণ, ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, দেশকর্মী এবং সমাজ-সেবী। তাহার সহিত সংঘর্ষ বাধিল জমিদারের, বিশেষ করিয়া জমিদারীর পরিচালিকা জমিদার রাধামোহন রায়ের বা মিঃ রে'র কন্যা আলেখ্যের। মিঃ রে জমিদার, কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার একমাত্র শিক্ষিতা আধুনিকা কন্যা আলেখ্যই জমিদারী চালায়। আলেখ্য রাজশক্তির সহিত ঝামেলা না করিয়া জমিদারী দাপটের সহিত চালাইতে চায়, কর্মী অমরনাথ তাহাতে বাধা দিতে কৃতসংকল্প। আলেখ্য ঠিক হৃদয়হীনা নয়, কিন্তু জিদ তাহার অত্যন্ত বেশি এবং নীতি বলিয়া সে যাহা মনে করে সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর। এই কঠোরতার জন্যই সে সেরেস্তার সামান্ত বেতনের

কর্মচারী বৃদ্ধ নয়ান গাঙ্গুলীকে ছাঁটাই করিল, চাকুরী হারাইয়া দিশাহারা অসহায় বৃদ্ধ আত্মহত্যা করিয়া বসিল। নয়ান গাঙ্গুলীর আত্মহত্যা 'জাগরণ'-এর রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি বড় ঘটনারূপে রাখা হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে, রচনা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া কাহিনী সংবদ্ধ রূপ পায় নাই।

'জাগরণ'-এর অমরনাথের সক্রিয়তা লক্ষ্য করিলে অমরনাথকে 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশের বলিষ্ঠতর রূপ বলিয়াই যেন মনে হয়। যেটুকু আঁকা হইয়াছে তাহাতেই সবদিক হইতে অমরনাথকে মহান্ কর্মীরূপে ফুটাইতে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অমরনাথের প্রতি লেখকের আপেক্ষিক পক্ষপাতিত্ব উপন্যাসটিকে শিল্পকলার দিক হইতে ভারি করিয়া ফেলিতেছিল, ইহাও রসিক পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। আলেখ্য আঘাত দিয়া অমরনাথকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা লিখিত অংশে নিষ্ফল তো হইয়াছেই, উপন্যাস শেষ হইলেও যে ফলবতী হইত তাহা বোধ হয় না। বরং শরৎচন্দ্রের হৃদয়বোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পাঠকের মনে হইতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো শরৎচন্দ্র আলেখ্যকে অমরনাথের নিকট পরাজিতা করিয়া তাহাকে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী করিয়াই তুলিতেন। আলেখ্যের উগ্র আধুনিকতার বিপরীতে শরৎচন্দ্র ইন্দু নামে তাহার এক বান্ধবীকে আনিয়াছেন এবং ইন্দুর মধ্যে শান্ত লক্ষ্মীশ্রী ফুটাইয়াছেন। উপন্যাসে ইন্দু আলেখ্যের সম্ভাব্য প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিনী না হইয়া শেষ পর্যন্ত সহায়িকা হইবে, 'দত্তা'র বিজয়ার বিপরীতে নলিনীর মত তাহার এ ভূমিকাও হয়তো সম্ভব ছিল। উপন্যাসখানি অল্প লেখা হইয়াছে, ইন্দু অনেক পরে আসিয়াছে, কাজেই 'জাগরণ'-এ শান্ত কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত ইন্দু চরিত্রটির আভাসমাত্র রাখা হইয়াছে, চরিত্রটি ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। উদার জমিদার সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কোমল মনোভাব 'জাগরণ'-এর মিঃ রে'র ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পক্ষান্তরে আলেখ্য ছাঁটাই করিয়া নয়ান গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার উপলক্ষ্য হওয়ায় (যদিও জমিদারী আসলে মিঃ রে'র) উপন্যাসে যৎপরোনাস্তি ধিক্কৃত হইয়াছে। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যদিও মিঃ রে'-কে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার করিয়াছেন, তথাপি স্নেহপ্রবণ, হৃদয়বান, নির্বিবাদী বৃদ্ধরূপে উপস্থাপিত করিয়া প্রশংসার্হ করিয়া রাখিয়াছেন। মিঃ রে যেন 'শেষপ্রশ্ন'-এর আশুবাবুর অন্যরূপ। আশুবাবু রাজনীতি আলোচনার সুযোগ পান নাই, মিঃ রে রাজনীতি সম্পর্কেও

মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, রাজনৈতিক অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁহাকে কন্যা আলেখ্যের সহিত গ্রামের শিক্ষিত তরুণ দেশকর্মী অমরনাথের সংগ্রামের সাক্ষী হইতে হইয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র মিঃ রে-কে কোন গণ্ডগোলে জড়ান নাই, সহৃদয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরূপেই তাঁহাকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন। 'জাগরণ'-এর স্বল্প পরিসরের মধ্যেই নয়ান গাঙ্গুলীর আত্ম-হত্যার পর কিন্তু বৃদ্ধ নিমাই ভট্টাচার্য যেভাবে আলেখ্যের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন এবং আলেখ্যর নিন্দা ও অমরনাথের প্রশংসা যে ভাবে সে বক্তৃতায় বারবার ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় আরও লেখা হইলে হয়তো 'জাগরণ'-এ ক্রমেই তত্ত্ব-বাহুল্য ভার সৃষ্টি করিত এবং ফলে শিল্পকলা ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

শরৎচন্দ্রের **ছোটগল্প** লইয়া আলোচনার প্রথমেই একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ছোটগল্পের যে শিল্পকলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে,—ঋজু তীব্র গতি, বিশেষ ঘটনা, মানসিক অবস্থা বা পরিবেশের উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা, একমুখী ঘটনাপ্রবাহ, একটি মাত্র সঙ্কট, মূল ঘটনা ও চরিত্রের বাহিরে অতিরিক্ত, বিশেষ করিয়া অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশ যথাসম্ভব রোধ, একটু আকস্মিকতায় বা অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্তি, পরিণতি ও ফলশ্রুতিতে একটিমাত্র ভাবের ইঙ্গিতমূলক তীক্ষ্ণ অনুভূতি,—শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে ঠিক যেন এই সংজ্ঞা অনুসৃত হয় না। বরং বলিতে গেলে উপন্যাসে যেমন জীবনকথা একটু শ্লথভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়, শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া জীবনের খণ্ডিত অধ্যায় লইয়া রচিত অধিকাংশ গল্পে সেই ভঙ্গিটিই অনুসরণ করা হইয়াছে। ফলে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি ছোটগল্পে উপন্যাসের আমেজ আসিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটিতে ছোটগল্পের সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ক্ষুদ্র উপন্যাস বা ইংরেজী short novel হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'স্বামী', 'বিন্দুর ছেলে', 'দর্পচূর্ণ', 'মেজদিদি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি গল্পগুলি এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিস্তারিত রূপায়ণেও প্রায়ই ছোটগল্পের প্রত্যাশিত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'কে উপন্যাস হিসাবে বিচার করা হয়, ইহা প্রধানতঃ 'পরিণীতা'র আকৃতির জন্য, প্রকৃতিগতভাবে 'পরিণীতা'কে

ছোটগল্প বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'পরিণীতা' বড় একটি ছোট গল্প। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পে চরিত্রের আধিক্য এবং ঘটনার আধিক্যও অনেক সময় উপন্যাসের আবহাওয়া আনিয়া দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্র যে ধরণের নিটোল ছোটগল্প লিখিয়াছেন শরৎচন্দ্র সেরূপ লিখিতে পারেন নাই। তবু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক জটিল বিষয়বস্তু লইয়া লিখিয়াছেন, সাধারণ ঘরোয়া বিষয়বস্তু লইয়া রবীন্দ্রনাথ বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে ধরণের চমৎকার ছোট গল্প লিখিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে তাঁহাদের লেখার সহিত কিছুটা মিল থাকিলেও এবং বস্তুগত জীবনানুভূতি সমাপ্তি পর্যন্ত আপেক্ষিকভাবে তীক্ষ্ণ হইলেও তাঁহার ছোট গল্পগুলি সে পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। জীবনের বিশেষ একটি দিকের প্রতি নিগূঢ়ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ ছোট গল্পের ধর্ম, শরৎচন্দ্র তাঁহার ছোট গল্পে গবাক্ষ লণ্ঠনের আলোকপাতের মতও নিগূঢ় অঙ্গুলি নির্দেশে কমই সার্থক হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার নন।*

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পে প্রায়ই ছোট গল্পের অপরিহার্য সংহতি, দ্রুত গতি ও তীব্র একমুখিতা থাকে না। তাহাদের পরিণতিও অনেক সময় অত্যন্ত বিশদ ও স্পষ্ট হইয়া তত্ত্বপ্রধান হইয়া পড়ে। ইহা শিল্পকলাসম্মত নয়। মোটের উপর শরৎচন্দ্রের রচনারীতি বিস্তারিত অঙ্কনধর্মী বলিয়া ইহাতে ছোট গল্পের গতি, ঘনতা, তীক্ষ্ণতা, গভীরতা ঠিক দাঁড়াইতে পারে না। ছোট গল্প চোরালণ্ঠনের আলোর মত চারিপাশের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটুখানি জায়গায় তীব্র আলোকপাত করে। যে জীবন বহিয়া চলিয়াছে তাহারই উজ্জ্বল টুকরো তুলিয়া লইয়া গল্পকার ছোট গল্প লেখেন। শরৎচন্দ্র এইরূপ ছোটগল্প কমই লিখিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা বিস্তৃত পটভূমি প্রত্যাশী, ছোটগল্পের খণ্ডিত জীবনায়নে অখণ্ড একমুখিতা তিনি ভাল আঁকিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র ছোট গল্প লইয়াই সাহিত্যের আসরে

*অবশ্য উপরোক্ত সমালোচনার অর্থ এই নয় যে, শরৎচন্দ্র ছোট গল্প রচনায় কোথাওই সাফল্যলাভ করেন নাই। কতকগুলি গল্পে তিনি খণ্ডিত জীবনরূপও শিল্পসম্মতভাবে ফুটাইয়াছেন। এ হিসাবে অল্পস্বল্প ত্রুটিবিচ্যুতি সাপেক্ষে তাঁহার মন্দির, মহেশ, মামলার ফল, রামের সুমতি, ছবি, মেজদিদি, হরিলক্ষ্মী, একাদশী বৈরাগীর মত কয়েকটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প 'মন্দির' (গল্পটি তাঁহার সম্পর্কিত মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে বেনামীতে প্রকাশিত হয়) গল্প হিসাবে ভাল হইয়াছিল বলিয়াই জলধর সেনের মত বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিচারকরূপে গল্পটিকে ১৯০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। 'মন্দির' ১৩১০ সালের ভাদ্রমাসে মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রেমের গল্প 'মন্দির'-এর নায়িকা অপর্ণার হৃদয়রূপ ও ব্যথাভার এবং গল্পটির বিষয়বস্তু ও ফলশ্রুতি শরৎচন্দ্রের উত্তর জীবনের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রেই ছায়া ফেলিয়াছে। শরৎচন্দ্র উত্তর জীবনে ছোট গল্প অপেক্ষা উপন্যাস রচনার দিকেই অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন।

ঘরোয়া জীবনের কাহিনী শরৎচন্দ্রের যে গল্পগুলিতে বিধৃত হইয়াছে, সেগুলিতে স্নেহ, করুণা, প্রেমের মত কোমল হৃদয়বৃত্তির প্রতিষ্ঠাই বেশি দেখা যায়। সিদ্ধরসাত্মক এই গল্পগুলি সর্বশ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয়। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'মন্দির', 'কাশীনাথ', 'স্বামী', 'দর্পচূর্ণ', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পগুলিতে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রধান ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়াছেন বলা চলে।* রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এইরূপ সিদ্ধরসের গল্পই বেশি লিখিয়াছেন। পরবর্তীকালে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা জীবনবৃত্তের উপর যে ভাবে তির্যক দৃষ্টিপাতের দ্বারা অনেকগুলি বিচিত্র

*শরৎচন্দ্র তাঁহার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল আপন ছোট গল্পের রচনাকৌশল সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন: "গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। কুৎসিত ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে।...গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ!" তবে আর গল্প কি? আমি এই লাইনেই চলছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ করে যেন একটা আনন্দ হয়—শেষ করে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না!"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৩।)

ছোট গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সে পথে যান নাই।* দুঃখ-দৈন্য অঙ্কনে উৎসাহ থাকিলেও শরৎচন্দ্র বাঁকা চোখে জীবনকে দেখেন নাই, তাঁহার গল্পে পরিচিত বাঙ্গালী জীবনের রূপ এবং আস্তিক্যবাদী প্রত্যয় লক্ষ্য করিবার মত। গল্পগুলিতে অধিকাংশক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের গল্পের মত কল্যাণবোধের স্পর্শ আছে।

কি বিষয়বস্তুতে, কি রচনারীতিতে ঘরোয়া ভাব ও সারল্য শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। 'মন্দির', 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'আঁধারে আলো', 'বিলাসী' প্রভৃতি গল্পে শরৎচন্দ্র রহস্যময় মানবমন এবং সেই মনের রহস্যময় প্রেমধর্মের কিছুটা পরিচয় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই প্রেম সামাজিক অনুমোদন নিরপেক্ষভাবেই জাগ্রত হয় এবং প্রচণ্ড আবেগে ব্যক্তি-হৃদয় আলোড়িত করে। সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-হৃদয়ের উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই প্রেম জীবনের বাস্তব-রূপ, সমাজের অনুমোদন না থাকিলেও জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহসের সঙ্গে এই প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন। শরৎসাহিত্যের এই প্রেমচিত্রে সক্রিয়তার

*আধুনিককালে জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সহিত সারা পৃথিবীতে বিচিত্র বিচিত্র সব বিষয়বস্তু লইয়া ছোট গল্প রচিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যেও কেহ কেহ এ চেষ্টা করিতেছেন। তবে বাঙ্গালীর জীবনবৃত্তে বৈচিত্র্যসঞ্চার কম হওয়ায় জীবনধর্মী বাংলাসাহিত্যসেবীর এই বৈচিত্র্য আপন রচনায় ধরা খুবই কঠিন। শরৎচন্দ্র অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের পথেই সাধারণ, জীবনধর্ম ও অন্তররূপ লইয়া লিখিয়াছেন। বালজাকের 'The Fatal Skin', মোপাসাঁর 'Semillante', উইলিয়ম ফকনারের 'A Rose for Emily', টেনেসি উইলিয়ামের 'Desire and the Black Masseur', জ্যাক লণ্ডনের 'To build a fire'—এসব বিচিত্র বিদেশী গল্পের কথা দূরে থাক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' প্রভৃতির মত বিচিত্র বিষয়বস্তুর উপর ছোটগল্প শরৎচন্দ্র লেখেন নাই। এরূপ গল্প লেখার ক্ষমতা তাঁহার ছিল কি না, সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তিনি এরূপ ছোট গল্প লিখিবার আগ্রহ দেখান নাই।

হিসাবে পুরুষের তুলনায় নারী প্রাধান্য পাইয়াছে। তৎকালীন সমাজে পুরুষের আপাত-প্রভাব এবং মেয়েদের কূপমণ্ডুক অবস্থা ও তজ্জনিত মানসিক জড়তা স্মরণ রাখিলে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের সক্রিয়তায় বিস্মিত হইতে হয়। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আধুনিকতাও কিছুটা ফুটিয়াছে সন্দেহ নাই, নারীকে মানুষ হিসাবে দেখিয়া সামাজিক বিধিবিধান-নিরপেক্ষভাবে তাহার মনের আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ অবশ্যই আধুনিকতা। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব কাটাইয়া কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অন্তর দীন-দুঃখী শোষিত জনগণের মুক্তি কামনা করিয়াছিল, তাহাদের মূক বেদনাকে তিনি ভাষা দিতে চাহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার আধুনিকতা। এ হিসাবে 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'হরিচরণ' প্রভৃতি মূল্যবান সৃষ্টি, যদিও শিল্পকলার হিসাবে 'মহেশ' অধিক উল্লেখযোগ্য। 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'বিলাসী'—এ সব গল্পে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যার ছাপ আছে, এরূপ গল্প শুধু মানুষের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করে না, দেশের গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে পাঠককে ভাবাইয়া তোলে। এই গল্পগুলির বিষয়বস্তুতে যে তবু কিছুটা বৈচিত্র্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' এই গল্প-গুলিতে পারিবারিক বিরোধ ও সেই বিরোধান্তে মিলনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী যৌথ পরিবারের জন্য শরৎচন্দ্রের অনুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মামলার ফল', 'মেজদিদি', 'পরেশ',—এই গল্পগুলিতে ভ্রাতৃবিরোধ মিলনে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু এইরূপ গল্পে বিবদমান দুই পক্ষের প্রধান একজনের অপর পক্ষের কাহাকেও নিতান্ত আপন জন রূপে আঁকড়াইয়া ধরার মধ্যেও শরৎচন্দ্রের এই যৌথ পরিবারের জন্য বেশ কিছুটা আগ্রহ অনুভব করা যায়। 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনীর কাদম্বিনীর ভাই কেষ্টকে, 'মামলার ফল'-এর গঙ্গামণির প্রতিপক্ষ দেবর শম্ভুর পুত্র গয়ারামকে, 'পরেশ'-এর গুরুচরণের স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশকে কাছে ফিরিয়া পাওয়ার মধ্যে গল্প-গুলির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। নিজের সন্তান হউক আর পরের সন্তান হউক, শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের বাৎসল্যরস উপন্যাসের মত ছোট গল্পেও মাধুর্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে; বলা বাহুল্য, পরের সন্তানের প্রতি এই মধুর মাতৃত্ববোধের আবেদন পাঠকের কাছে অধিক এবং নারীচরিত্রের মহিমা ফুটনে এই চিত্র বেশী কার্যকরী। হেমাঙ্গিনী কাদম্বিনীর বৈমাত্রের

তাই লাঞ্ছিত কেষ্টকে বুকে তুলিয়াছে, গঙ্গামণি বিমাতার দ্বারা উৎপীড়িত দেবর-পুত্র গয়ারামকে স্বামীকে ছাড়িয়াও স্নেহ-সিঞ্চিত করিয়াছে, নারায়ণী সৎ-দেবর রামকে কাছে রাখিতে আপন মা-বোনকে বিদায় দিতে চাহিয়াছে, বিন্দু ভাসুর-পুত্র অমূল্যকে হারাইবার বেদনায় মৃত্যুপথে চলিয়াছিল, অমূল্য ফিরিয়া আসায় মৃত্যুকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে, বড় ঘরের ঘরণী সিদ্ধেশ্বরী সম্পর্কিত দেবর-পুত্রদের ফিরাইয়া পাইবার জন্য মান-অভিমান সব কিছু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে, ভবানী সপত্নীপুত্র গোকুলের অকল্যাণের ভয়ে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে,—শরৎচন্দ্রের সম্প্রসারিত মাতৃত্বের এসব ছবি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বাঙ্গালী যৌথ-পরিবারের আনন্দঘন শান্ত রূপটির প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতার স্পর্শ এই গল্পগুলিতে সহজেই পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র 'কাশীনাথ', 'দর্পচূর্ণ', 'স্বামী' প্রভৃতি ঘরোয়া গল্পে দাম্পত্য জীবনের মিলন-মধুর রূপটির জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছেন। বিবাহ বাকী থাকিলেও বাগ্‌দত্ত মা শোয়ে-বা থিনের কাহিনী 'ছবি'ও এই শ্রেণীর গল্প। ঘর করিতে গিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ মতান্তর হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন তাহা স্থায়ীভাবে সত্যও নয়, কাম্যও নয়। দাম্পত্য জীবনের এই মিলন-মধুর রূপটি মিথ্যা সন্দেহপ্রবণতা বা জিদের বশে স্বীকার করিয়া লইল না বলিয়া শরৎচন্দ্র 'সতী' গল্পে নির্মলাকে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে লেখা 'বোঝা' গল্পে শরৎচন্দ্র নলিনীর বেদনার্ত জীবনের কথা বলিয়া এই দাম্পত্য-মাধুর্যের জন্য আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। 'নববিধান'-এর মত প্রীতিপ্রদ গল্প 'অনুরাধা'য় শরৎচন্দ্রের সনাতন শান্ত বাঙ্গালী জীবনরূপের প্রতি আধুনিক জীবনরূপের বিপরীতে সূক্ষ্ম-ভাবে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

'আঁধারে আলো', 'পথনির্দেশ', 'আলো ও ছায়া', 'অনুপমার প্রেম', 'বিলাসী', 'মন্দির' প্রভৃতি ছোটগল্পে শরৎচন্দ্র যে অসামাজিক প্রেমের ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, তাহাতে একথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণভাবে সমাজবিরোধী প্রেমের জন্য শরৎচন্দ্রের উৎসাহ না থাকিলেও যেখানে প্রেম নির্মল সেখানে তিনি তাহার শিল্পসংযত রূপদানে চেষ্টা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সত্যকার ভালবাসার জন্য যে দুঃখ পায় সে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি-ধন্য। মানুষ যে বৃত্তি বা পরিবেশের হউক, যে জীবনই যাপন করুক, তাহার সহানুভূতি লাভের যোগ্যতা থাকিলে শরৎচন্দ্র

তাহাকে সহানুভূতি দেখাইতে যে কাতর হইতেন না, ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'একাদশী বৈরাগী' গল্পের একাদশী ও তাহার বোন গৌরীর চরিত্র-চিত্রণ। একাদশী বৈরাগী প্রচণ্ড সুদখোর মহাজন, এক হিসাবে সে গরীব খাতকের রক্ত শোষণ করে। কিন্তু মানব হৃদয়ের রহস্য-সন্ধানী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একাদশীর মনের এই কুশ্রী দিকটির বিপরীতে মহান উদার হৃদয়-বোধের আর একটি দিক আবিষ্কার করিয়া সে দিকটিও যত্ন করিয়া ফুটাইয়াছেন। গৌরীর অতীতে পদস্খলনের গ্লানি সত্ত্বেও তাহার পরোপকার প্রবৃত্তি ও নিঃস্বার্থতার এবং বর্তমান জীবনের শুচিশুভ্র রূপের পরিচয় দিয়া তাহার হাতে জল খাইবার জন্য ব্রাহ্মণ-সন্তান অপূর্বকে ফিরাইয়া আনিয়া গৌরীর মানুষ হিসাবে মহৎ মূল্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে তাঁহার খণ্ডিত অর্থনৈতিক চেতনার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, সুদখোর মহাজনত্বের হীনতা ভাল মহাজন হইবার জন্যই নিঃশেষিত হইতে পারে না, সে ত্রুটি এ গল্পে থাকিয়াই গিয়াছে। তবে শিল্প-কলার দিক হইতে গল্পটি চমৎকার হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্রের দরিদ্র শোষিত অসহায়ের প্রতি দরদের কথা আগেই বলা হইয়াছে। 'বাল্যস্মৃতি' গল্পে মেসের রাঁধুনি গদাধর, 'হরিচরণ' গল্পে চাকর হরিচরণ, 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দুলে মেয়ে অভাগী ও তাহার হতভাগ্য পুত্র কাঙালীচরণ, 'মহেশ' গল্পে দরিদ্র কৃষক গোফুর মিঞা, 'হরিলক্ষ্মী' গল্পে দরিদ্রা ভাগ্যহীনা বধূ কমলা, 'মেজদিদি' গল্পে অসহায় মাতৃহারা কেষ্ট,—ইহাদের জন্য শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পাঠক হৃদয়ও আপ্লুত করে। 'মহেশ' গল্পে দরিদ্র গোফুরের অসহায় গরুটির ব্যথা অসহায় শোষিত মানুষের ব্যথার সগোত্র হইয়াই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে।

যাহা হউক, মোটের উপর, শরৎচন্দ্র শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হইলেও কলাশিল্পের বিচারে তাঁহাকে ছোট গল্পের সার্থক স্রষ্টা বলা চলে না। তবে হৃদয়বাদী লেখকের মনোরম রচনা হিসাবে তাঁহার অধিকাংশ গল্প, বিশেষ করিয়া ঘরোয়া বিষয়বস্তুর ও অন্তরধর্মের উপর লেখা গল্পগুলি পাঠকের অত্যন্ত ভাল লাগে।

শরৎচন্দ্র ছোটদের জন্য খুবই কম লিখিয়াছেন; উপন্যাস তো লিখেনই নাই, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'র মত গল্প যদিও নৈতিকতার দিক হইতে নির্দোষ এবং ছোটরাও পড়িতে পারে, তবু এগুলি সাধারণ পাঠকদের জন্যই

লেখা হইয়াছে। তাঁহার ছোটদের জন্য লেখা সাতটি গল্প (ইহার মধ্যে 'কোলকাতার নতুন দা', 'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বের ইন্দ্রনাথের চালিয়াৎ নতুনদার কাহিনী এবং ঐ গ্রন্থ হইতে গৃহীত) 'ছেলেবেলার গল্প' নামে এক সঙ্কলন গ্রন্থে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে 'লালু' শীর্ষক গল্প তিনটির প্রথমটিতে লালু নামক কিশোরের দুষ্ট বুদ্ধিতে তাহার মায়ের গুরুদেবের সারারাত্রি দুর্ভোগের যে মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নৈতিক মূল্য কম হইলেও রসের হিসাবে গল্পটি চমৎকার। এই পর্যায়ের আর দুটি গল্পের একটিতে কালীপূজায় পাঁঠা বলির ব্যাপারে এবং আর একটিতে মড়া পোড়ানোর ব্যাপারে দুষ্টবুদ্ধি লালু পাঁচজনকে বোকা বানাইয়া প্রচুর মজা করিয়াছে। 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী'তে আগেকার দিনের গ্রামে ঠ্যাঙ্গাড়েদের নিদারুণ অত্যাচারের এবং মন্ত্রসিদ্ধ নয়ন বাগদীর কাছে ঠ্যাঙ্গাড়েদের জব্দ হইবার আকর্ষণীয় একটি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটি (এটি 'মেজদিদি' গল্পগ্রন্থেও যুক্ত হইয়াছে) উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও একটি রাস্তার কুকুরের মায়া-মমতার এই কাহিনী শরৎচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের স্পর্শ বিজড়িত। 'ছেলেধরা' গল্পটি ডাকাত সাজিয়া লাঠিয়াল লতিফ মিঞা লোকের তাড়ায় যেভাবে নাজেহাল হইয়াছে, তাহারই মজার কাহিনী। মোটের উপর, 'দেওঘরের স্মৃতি' ব্যতীত 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থের বাকী গল্পগুলিতে হাস্যরসের সংস্থান হইয়াছে, তাহাও পাঠকদের মনোহরণ করে।

* * *

শরৎচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক। মনোমুগ্ধকর গল্পের জন্য এবং জমাট আখ্যানের জন্য তিনি জনপ্রিয়। মানুষের হৃদয়ের গোপন গভীর প্রদেশে যে ভাব-কল্পনা তরঙ্গিত হয়, তাহা তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। চরিত্র সৃষ্টিতে, বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র শিল্প-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে সংলাপও খুবই হৃদয়-গ্রাহী। এইভাবে গল্প, আখ্যান, চরিত্র, সংলাপে শক্তির পরিচয় থাকায় শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে ভাল নাটক আশা করাও অসঙ্গত নয়। উচ্চ-শ্রেণীর নাটকে এইসব গুণ অপরিহার্য। কিন্তু তাঁহার মধ্যে নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপরোক্ত গুণাবলী থাকিলেও ইহার বিপরীতে শরৎচন্দ্রের এমন কতকগুলি ত্রুটি ছিল যাহার জন্য ভাল নাটক লেখা তাঁহার

পক্ষে সহজ ছিল না। অবশ্য শরৎচন্দ্র মৌলিক নাটক একখানিও লেখেন নাই বলিয়া এবং নিজেরই লেখা তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের মধ্যে তাঁহার নাট্যকৃতি সীমায়িত হওয়ায় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করা হইতেছে।* শরৎচন্দ্র বিলম্বিত লয়ের কাহিনীবিন্যাস করিতেন, নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রুতগতি তাঁহার লেখায় খুব কমই দেখা যায়। এছাড়া আবেগপ্রবণ লেখক শরৎচন্দ্রের লেখায় উচ্ছ্বাসও স্থানে স্থানে যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, নাটকে, বিশেষ করিয়া সামাজিক নাটকে আবেগের স্থান কিছুটা থাকিলেও উচ্ছ্বাস-আধিক্যে শিল্পকলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাটকে ভাল ছোট গল্পের মত গতিশীল ঘন-সংবদ্ধ কাহিনী এবং তীব্র, তীক্ষ্ণ পরিণামমুখিতা চাই। ইতিপূর্বে তাঁহার ছোট গল্প সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্রের রচনা-কৌশলে এদিক হইতে অনেক ত্রুটি ছিল। চলমান জীবনের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া শাশ্বত জীবনের প্রকৃতি ফুটান কথা-সাহিত্যিকের কাজ, শরৎচন্দ্র শ্লথ গতিতে হইলেও এক ধরণের নিজস্ব শিল্পকৃতিত্বে সে কাজ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু জীবনের দ্রুত গতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাব-ঘটনার সংঘাত-সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেলিত জীবন-রূপকে পরিকল্পিত গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া হৃদয়-সংবেদী পরিণামের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া নাটকের কাজ,—একাজ শরৎচন্দ্রের প্রতিভার যে রূপের সহিত পাঠক পরিচিত তাহার অনুকূল নয়। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে শরৎচন্দ্র চরিত্রের চিন্তা ও কর্ম দুইই ধীরে ধীরে ফুটাইয়াছেন, নাটকের সংক্ষিপ্ত

*শরৎচন্দ্র 'দত্তা' (নাট্যরূপের নাম 'বিজয়া')', 'পল্লীসমাজ' (নাট্যরূপের নাম 'রমা'), 'দেনা পাওনা' (নাট্যরূপের নাম 'ষোড়শী'), এই তিনখানি নিজের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। ১৩৪১ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় কলিকাতার নব নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠান ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিরাজ বৌ উপন্যাসের যে নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন, তাহা মুদ্রিত হইলে পুস্তকে নাট্য-কারের নাম না থাকায় অনেকে ইহাও শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপ মনে করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণীতে' (১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯৩) বলিয়াছেন যে নাট্যপরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ীই এই নাট্যরূপ দিয়াছিলেন।

পরিসরে ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে বা একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়া ইহাতে বিশেষ ধরণের শিল্প-প্রতিভা লাগে। শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষাতেই বলিতে গেলে "উপন্যাসের মত নাটকের elasticity (নম্যতা) নাই"। (পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫৬।) ভাল উপন্যাস লিখিতে পারিলেই এ কাজ করা যায় না। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বিখ্যাত 'নাট্যকার' প্রবন্ধে বলিয়াছেন: "যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাট্যকারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষ' পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যামলেট' আত্মহত্যা করিবে কি না, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িতভাব প্রসূত-হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে।" শরৎচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, নাট্যরূপ দিয়াছেন নিজেরই লেখা তিনখানি উপন্যাসের, সব নাট্যরূপেই মানুষের আধুনিক জীবন-বোধের নিরিখে প্রেমের সমস্যা ফুটানো হইয়াছে। এই সামাজিক সমস্যামূলক নাটকে বিবৃতি বা বর্ণনার সুযোগ একেবারে কম এবং যে বিশেষ মুহূর্তে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া কথা বাহির হয়, সমগ্র পরিবেশ,—মঞ্চকলা হইতে হৃদয় পর্যন্ত,—সেই মুহূর্তটির উপর যেন ভর দিয়া দাঁড়ায়। নাটকীয় মুহূর্তগুলিই নাটকের প্রাণ। শরৎচন্দ্র রসঘন নাটকীয় মুহূর্ত-সৃষ্টি যে মাঝে মাঝে করিতে পারেন নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহা কম, বরং নাটকের এই দুর্লভ সুযোগ যেন শরৎচন্দ্র ঠিক ধরিতে পারেন নাই, পরিণামের হিসাবে স্বভাবতঃই এই নাটকীয় মুহূর্তের অভাব অথবা মুহূর্তগুলির সংবদ্ধতার অভাব আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারে নাই। ইহার জন্য শরৎচন্দ্রের নাটকের পরিণামে মিলন বা বিরহ যাহাই হউক, পরিণতির নাটকীয়তা দর্শকমনের উদ্বেগতার সহিত সমান্তরাল না হওয়ায় রসহানি ঘটিয়াছে। ইহা 'বিজয়া' নাটকে বিজয়া-নরেনের মিলন, 'রমা' নাটকে রমা-রমেশের বিচ্ছেদ এবং 'ষোড়শী' নাটকে জীবানন্দের মৃত্যুতে ষোড়শীর গভীর শূন্যতাবোধ,—তিনটি পরিণাম সম্বন্ধেই বলা চলে।

মৌলিক নাটক না লিখিলেও এবং নিজের লেখা উপন্যাসের বেশি নাট্য-রূপ না দিলেও শরৎচন্দ্র নাট্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গল্প, চরিত্র এবং সংলাপ আধুনিক সমস্যাবহুল সামাজিক নাটকের হিসাবে উচ্চশ্রেণীর না

হইলেও জনপ্রিয় নাটক সৃষ্টির যে অনুকূল ছিল, তাহা তাঁহার নিজের দেওয়া নাট্যরূপগুলি ছাড়াও তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নাট্যরূপ দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করিয়া দৃশ্য ও ভাষা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হইতে অবাধে নাট্যরূপে গৃহীত হইতে দেখা যায়। অন্য কেহ বাঙ্গালীর রসসিক্ত মনের সুযোগ লইয়া বা নিজেদের প্রতিভা কিছুটা কাজে লাগাইয়া শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার যে উৎসাহই দেখান, শরৎচন্দ্র নিজে সম্ভবতঃ তাঁহার নাটক রচনার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাছাড়া গল্প-উপন্যাস লেখার চাপ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্মবাহুল্য এবং নিজের স্বাস্থ্যের ক্রম-অবনতিও তাঁহার অধিক সংখ্যায় নাটক না লেখার কারণ হইতে পারে। শরৎচন্দ্র যে তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছেন, তন্মধ্যে 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রাথমিক একটি খসড়া:তিনি অন্যলোকের নিকট হইতে পাইয়া সেই নাট্যরূপে না সন্তুষ্ট হইয়া নিজে নাট্যরূপ দেন বলিয়া শোনা যায়।* অবশ্য শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' ও 'নববিধান' উপন্যাসের নাট্যরূপেও হাত দিয়াছিলেন কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। (অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী', পৃষ্ঠা ১৯২ দ্রষ্টব্য।)

শরৎচন্দ্র কেন অধিক সংখ্যায় নাটক লেখেন নাই এ সম্পর্কে অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন। তাঁহার নাট্যানুরাগের এবং নাটক রচনার ইচ্ছার কথা অনেকেরই জানা ছিল।** এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা তাঁহার একখানি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝা যাইবে :—

*অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী'র (১ম সংস্করণ) ১৮২ পৃষ্ঠায় 'খেয়ালী' পত্রিকার পরিচালক অক্ষয়কুমার সরকারকে লেখা (৭ই মাঘ, ১৩৩৪) শরৎচন্দ্রের এক পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে আছে : "আমি 'দত্তা' বইটার একখানা নাটক অপরের কাছে পেয়েছি, নিজেই কিছু কিছু অদল বদল কোরে বিজয়া নাম দিয়ে Star theatre-কে দোবো মতলব করেছি।"

**রেঙ্গুনে থাকিতেই বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে (৮ই এপ্রিল, ১৯১৩) শরৎচন্দ্র লেখেন : "প্রমথ, আমি একটা নাটক লিখব ব'লে ঠিক

"তোমার প্রশ্ন আমি নাটক লিখিনা কেন? তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখিনা তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয় এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি তা হলেও আমার মজুরি পোষাবে না।...উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক তা আগ্রহে নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিসারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক। রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটায় অ্যাকৃশান (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, তা তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনেওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ নাটকের যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছায় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল আমি জানিনে তা নয়। তাছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি।.. নাটক যে লিখব তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বুঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছা করে না।" —(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৭।)

শরৎচন্দ্র নিজের যে তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছেন, তন্মধ্যে

করেছি। যদি ভাল হয় (হবেই।) কোনো theatreএ প্লে করিয়ে দিতে পার?"—(অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮২।)

উপন্যাসের রূপের সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' নাটকে। উপন্যাসখানি ষোড়শী-জীবানন্দের পুনর্মিলনে শেষ হইয়াছে, ষোড়শী পুলিশের হাত হইতে জীবানন্দকে বাঁচাইবার জন্য শৈবাল দীঘি হইতে চণ্ডীগড়ে আসিয়া জীবানন্দকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইতেছে; নাটকে ষোড়শী শৈবালদীঘি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, তবে সে একেবারে জীবানন্দের মুমূর্ষু অবস্থায়, তাহার আসিবার কিছুক্ষণ পরেই জীবানন্দ মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের ত্রুটি নাটক সামলাইয়াছে বলা চলে, ষোড়শীর মত মহীয়সী নারী প্রজাদের ভাসাইয়া দিয়া জীবানন্দকে লইয়া পলাইতে এবং সেই সঙ্গে হৈমর অনুরোধ রক্ষা করিয়া দুষ্কৃতকারী জনার্দন রায়কে নিশ্চিত শাস্তি হইতে বাঁচাইতে চণ্ডীগডে আসিয়াছে, উপন্যাসের এই কাহিনী ষোড়শী চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, নাটকে জীবানন্দের মৃত্যুশয্যায় ব্যাকুলা ষোড়শীর আগমন অনেক স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য হৈমর সাজানো সংসারের রূপ ষোডশীর মধ্যে অলকার জাগরণে যে সাহায্য করিয়াছে তাহার ঋণ পরিশোধে কোন কিছু না ভাবিয়াই ষোড়শী হৈমের অনুরোধ রক্ষা করিতে চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, উপন্যাসে এই যৌক্তিকতার কিছুটা মূল্য যে নাই এমন নয়। এই প্রসঙ্গে আবার উল্লেখযোগ্য যে উপন্যাসের উপসংহারে ষোড়শী-জীবানন্দের কথোপকথনে সংযমের যে পরিচয় ছিল, নাটকের উপসংহারে মৃত্যু-দৃশ্যে আবেগের আতিশয্যে তাহা অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছে।*

*'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের শেষ এইরূপ: "প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ শুধু একটুখানি হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এমন করে আমার সমস্ত ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিও না অলকা—আমাকে দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেখো কখখনো ঠকবে না।

কথা শুনিয়া অলকার দু চক্ষু সহসা ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে, তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া লইয়া হাতের উপর একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, চলত এখন। নৌকাতে বসে

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের হিসাবে 'ষোড়শী' নাট্যরূপে আর এক জায়গায় শিল্পকলার নিম্নমান উল্লেখযোগ্য। ষোড়শী যখন শেষরাত্রে চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘি যাত্রা করে, তখন তাহার গরুর গাড়ী ছাড়িয়া দিলে জীবানন্দ গাড়ীর পাশে চলিতে চলিতে ষোড়শীর কানের পাশে মুখ লইয়া গিয়া বলিয়াছে: "অলকা, একদিন তোমার মা আমার হাতে তোমাকে দিয়েছিলেন; তবু তোমাকে পেলাম না; কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে

তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না।

সেই ভালো। বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।"

নাটকের শেষ নিম্নরূপ: —

"(ষোড়শী জীবানন্দের বুকের উপরে মাথা রাখিতে তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার অক্ষম হাতখানি ষোড়শীর মাথার উপরে রাখিলেন)

জীবানন্দ—অভিমান ছিল বই কি একটু। তবু যাবার আগে এই ত তোমাকে পেলাম। এর অধিক পাওয়া সংসারের নিত্য কাজে হয়ত বা কখনো ক্ষুণ্ণ কখনো বা ম্লান হ'তো, কিন্তু সে ভয় আর রইল না। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নেই, অলকা এই ভালো। এই ভালো।

[ষোড়শী কথা কহিতে পারিল না, দুঃসহ রোদনের বেগে তাহার সমস্ত বক্ষ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।]

জীবানন্দ। উঃ! পৃথিবীতে কি আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। কষ্ট কি খুব বেশী হচ্ছে দাদা? ডাক্তারকে কি একবার ডাকব?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার-বদ্যি নয় প্রফুল্ল, শুধু তুমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার! সূর্য কি অস্ত গেল ভাই?

প্রফুল্ল। এই মাত্র গেল দাদা।

জীবানন্দ। ভাই। হাওয়া নেই, আলো নেই; বিশ্বদেব! এ জীবনের শেষ দান কি তবে নিঃশেষ করেই নিলে! উঃ—

ষোড়শী। স্বামী!

প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে কি আজ সত্যিই ছুটি দিলে দাদা!"

এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।" বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি কল্পনা করিলে জীবানন্দের হৃদয়-নিঙড়ানো এই কথাগুলি পাঠককে অভিভূত করিবেই। নাটকে বোধহয় গরুর গাড়ী দেখাইবার অসুবিধার জন্যই ষোড়শী বিদায় লইবার পর জীবানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে দেওয়া হয় নাই (এই সময় অন্ততঃ কিছুদূর ষোড়শীর সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দের যাওয়ার হৃদয়-ধর্মগত এবং শিল্পকলাগত মূল্য আলোচনা নিষ্প্রয়োজন) এবং জীবানন্দ ষোড়শীর প্রস্থানের পর একাকী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া উপরোক্ত কথাগুলি স্বগতোক্তি হিসাবে উচ্চারণ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাহির হইতে গরুর গাড়ী চালানোর শব্দ শুনা গিয়াছে। ইহার পরই তৃতীয় অঙ্কের শেষে বিরতি হইয়াছে।

উপন্যাসে পার্শ্বচরিত্র হিসাবে ফকির সাহেব যথেষ্ট গুরুত্ব পাইয়াছেন, বলিতে গেলে সে তুলনায় নির্মলের উপর ততটা জোর পড়ে নাই। শুধুমাত্র ষোড়শীর হৃদয়-কেন্দ্রানুগ আখ্যানভাগ রচনা না করিয়া বৃহৎ বাহিরের সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়াই উপন্যাসে ফকির সাহেবকে এতখানি স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে ফকির সাহেব আদর্শ চরিত্র, তিনি ষোড়শীর গৌরবাত্মক চরিত্রের পরিপূরণ করিয়াছেন। নাটকে হৃদয়প্রধান কাহিনী বোনা হইয়াছে, এখানে ফকির সাহেব নিতান্তই পার্শ্বচরিত্র, তিনি আদর্শের কথা বলিয়াছেন তবে হাল্‌কা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ষোড়শী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নির্মলকে ফকির সাহেব হালকাভাবে তাহার 'এখনি একবার যাওয়া চাই' বলার পর বলিয়াছেন: "চলুন। (হাসিয়া) কিন্তু বেলা পড়ে এল, আবার না তাঁকে হাত ধরে রেখে যেতে হয়।" বলা বাহুল্য, উপন্যাসের ফকির সাহেব এরূপ ঠাট্টা বা হালকা কথা উচ্চারণ করিতেন না।

নাটকে নির্মল পাইয়াছে প্রতি-নায়কের স্থান। নির্মল চরিত্রের গুরুত্ব বাড়াইয়া নাটকে সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য উপন্যাসে আগে হৈমর ছেলের কল্যাণে পূজা এবং তারপরে এক ঝড়ের সন্ধ্যায় ষোড়শীকে নির্মলকে আঁধার পথে চলিতে হাত ধরিয়া সাহায্যের কথা থাকিলেও নির্মলের চরিত্রে গুরুত্ব আনিতে নাটকে প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে নির্মল-হৈমর কথোপকথনে ষোড়শীর নির্মলকে সাহায্যের কথা দর্শককে শুনাইয়া

পরবর্তী দৃশ্যে হৈমর ছেলের কল্যাণে পূজা উপলক্ষে ষোড়শীর বিরুদ্ধে জনার্দন শিরোমণির চক্রান্তকে রাখা হইয়াছে, উপকৃত নির্মল যাহাতে অসহায় ষোড়শীর প্রতি অবিচারে স্বাভাবিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা বোধ করে। উপন্যাসের বিংশ পরিচ্ছেদে ষোড়শীর প্রতি নির্মলের দুর্বলতা আভাসে ইঙ্গিতে রাখা হইয়াছে, ষোড়শী চরিত্র সেখানে কথাবার্তায়, আচারে আচরণে ততটা লঘু-চপল নয়, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে প্রেমকাহিনী রূপে ষোড়শীর জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া সংঘাত বাড়াইয়া ষোড়শীকে জীবন্ত করিতে তাহার মুখে লঘু-চপল কথাবার্তা প্রচুর পরিমাণে বসান হইয়াছে। তাহার প্রতি দুর্বলতার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যখন নির্মল করিয়াছে সঙ্গে সঙ্গেই জীবানন্দ ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় ষোড়শী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, নির্মল সঙ্কোচে ও বিরক্তিতে মনে ধাক্কা খাইয়াছে এবং জীবানন্দ ঈর্ষাকাতর হইয়াছে।*

*ষোড়শী—মোকদ্দমার ভার যেন নিলেন, কিন্তু যদি হারি তখন ভার নেবে কে? তখন পেছোবেন না ত?

নির্মল—না, তখনও না।

ষোড়শী—ইস্। পরোপকারের কি ঘটা! (হাসিয়া) আমি কিন্তু হৈম হলে এই-সব পরোপকার-বৃত্তি ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালোমানুষ নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না। রাত্রিদিন চোখে চোখে রেখে দিতাম।

নির্মল—(বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে) চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে শুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায় না, এ-কথা কি আজও জানতে পারনি তুমি!

ষোড়শী—পেরেছি বইকি। (হাসিল; বাহিরে শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া চাহিয়া) এই যে ইনি এসেচেন।

নির্মল—কে? ফকির সাহেব?

ষোড়শী—না, জমিদারবাবু। বলেছিলুম সভা ভাঙলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধহয় আসচেন।

নির্মল—(বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া) তাহলে আপনি আমাকে এ-কথা বলেননি কেন?

ষোড়শী—বেশ! একবার 'তুমি' একবার 'আপনি'! (হাসিয়া) ভয়

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে ষোড়শী-জীবানন্দের প্রেমের কাহিনী ছাড়াও জমিদার-প্রজার সম্পর্ক ও মহাজন-খাতকের সম্পর্কের এবং দেব-সম্পদ রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার নিজস্ব একটা স্থান আছে। শেষোক্ত সমস্যাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া এবং আপন গুরুত্বে স্থান লাভের অধিকারচ্যুত হইয়া ষোড়শী-জীবানন্দের হৃদয়-কাহিনীর সহায়তার জন্যই নাটকে কিছুটা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু নাটকে প্রেম-কাহিনীর অধিকতর গুরুত্ব হইয়াও ষোড়শী-জীবানন্দের প্রেমের একটি চমৎকার দৃশ্য উপন্যাসে বিধৃত হইয়াও নাটকে বাদ পড়িয়াছে। উপন্যাসের পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদে ষোড়শী যে রাত্রে চণ্ডীগড় হইতে শৈবালদীঘি চলিয়া গেল, তাহার যাত্রার কিছু পূর্বে জীবানন্দ তাহার ঘরে আসিয়াছিল এবং সে জীবানন্দকে নিজের ভাতগুলি খাওয়াইয়া (যাত্রার জন্য গামছা পুঁটলিতে বাঁধা হইয়া যাওয়ায়) নিজের কাপড়ের আঁচলটি জীবানন্দের হাত মুছিবার জন্য তুলিয়া দিয়াছিল, 'জীবানন্দ হাত মুছিয়া হঠাৎ বলিল, এ কিন্তু তুমি আর কাউকে দিতে পারতে না অলকা।'—এই সুন্দর দৃশ্যটি নাটকে দেখান হয় নাই, নাটকে তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নাটমন্দিরে ষোড়শীর বিদায়-ক্ষণে জীবানন্দ আসিয়াছে, সেখানে খাওয়ানোর কথাই উঠে না।

'ষোড়শী' নাটক পাঠ করিয়া ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ফাল্গুন শরৎচন্দ্রকে লেখা যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী' নাটকটিকে অবাস্তব বলিয়াছিলেন, সেই চিঠির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ভৈরবী ষোড়শীর এই রূপ কবিগুরুর মতে বাংলা দেশের ভৈরবী-রূপের সঙ্গে মেলে না। উপন্যাসে ষোড়শীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর, সে হিসাবে উপন্যাসের ষোড়শী চরিত্রটির আরও সমালোচিত হওয়ার কথা।

ষোড়শীর নাট্যরূপের একটি লক্ষণীয় দিক, উপন্যাসের হিসাবে ইহার ভাষার স্বাভাবিকতা সম্পাদনের চেষ্টা। উপন্যাসের হৃদয়স্পর্শী ভাষা যতটা

নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক; লড়াই করেন না। তা ছাড়া আপনাদের পরিচয় নেই;—সেটাও আমার লাভ। (দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন।

জীবানন্দ—(প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া) ইনি? নির্মলবাবু বোধ হয়?

সম্ভব রাখিয়াই নাটকে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন চরিত্রানুগ ভাষা সংস্থানের চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপন্যাসে শিরোমণি মহাশয় ও জনার্দন রায় একই রূপ ভাষাতেই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নাটকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শিরোমণি মহাশয়ের ভাষার সহিত বিষয়ী গৃহস্থ জনার্দন রায়ের ভাষার তফাৎ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের নিম্নের উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে :—

জনার্দন। আজ এই নিয়ে নির্মলকে দুটো তিরস্কার করতে হ'লো, শিরোমণিমশাই, মনটা তেমন ভাল নেই।

শিরোমণি। না থাকবারই কথা। কিন্তু এ একপ্রকার ভালই হ'লো ভায়া। এখন বাবাজীর চৈতন্যোদয় হবে যে, শ্বশুর এবং পিতৃব্য স্থানীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রত্যবায় আছে। আর এ যে হতেই হবে। সর্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীমাতার ইচ্ছা কি না।”

'দেনা পাওনা' উপন্যাসের হিসাবে 'ষোড়শী' নাটকের মত, 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের হিসাবে 'রমা' নাটকেও বিষয়বস্তুর পরিধি সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। 'পল্লীসমাজ' ও 'রমা' এই দুই নামকরণের মধ্যেই অবশ্য এই সঙ্কোচনের ইঙ্গিত আছে, উপন্যাসে পল্লীসমাজের সমস্যা-কণ্টকিত রূপের একধরণের প্রাধান্যের স্থলে 'রমা' নাটকে স্বভাবতই রমার চরিত্র এবং তাহার ব্যক্তিগত প্রেমরূপের প্রাধান্য হইবে, এইরূপই আশা করা যায় এবং প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে রমা-রমেশের প্রেমকাহিনী, বিশেষ করিয়া রমার প্রেম-বেদনা যে গুরুত্ব পাইয়াছে, নাটকে তাহার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উপন্যাসে পল্লীসমস্যার যে নিজস্ব ভূমিকা আছে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া নাটকে রমা-রমেশের হৃদয়কাহিনীর গতি-প্রকৃতিতে সে সমস্যা মোটের উপর সহায়ক ভূমিকা লইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপন্যাসে রমেশ জেল হইতে ফিরিবার পর কৈলাস নাপিত ও শেখ মতিলাল তাহাদের গৃহসংলগ্ন একটি নালা সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে আদালত হইতে স্বেচ্ছায় ফিরিয়া আসিয়া রমেশের সালিসী মানিয়াছে, 'পল্লীসমাজ'-এর সমস্যা দূরীকরণের বা রমেশের গ্রামসেবার হিসাবে এ সাফল্য ঐতিহাসিক। এই ঘটনায় রমেশ নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে, এইখানে রমেশের মনের

অবস্থা বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন : "যদিও বেশি কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা, কিন্তু এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি না করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোন হিসাব-নিকাশ, কূল-কিনারা রহিল না।" এ অবস্থায় রমার শত্রুতার অভিমানও রমেশ ভুলিয়া গেল। "মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে (রমাকে) উদ্দেশ করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।" (১৯তম পরিচ্ছেদ) এই পরিচ্ছেদে রমার সহিত রমেশের যে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে তাহাতে হৃদয়ের আলোড়ন দৃশ্য থাকিলেও রমেশের সমাজসেবার সাফল্যের দীপ্তিতে দৃশ্যটি উজ্জ্বল। 'রমা' নাটকে কিন্তু রমার দৃষ্টির অন্তরালে রমেশের ব্যক্তি-হৃদয়প্লাবী এই ঘটনা তাহাদের প্রেম কাহিনীকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিবে না মনে করিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্র নাটক হইতে ঘটনাটি বাদ দিয়াছেন। ইহার বিপরীতে রমা-রমেশের প্রেম-কাহিনী জোরালো হয় এমন ভাবেই উপন্যাসের পরিণতিটি নাটকে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে। রমা 'রমেশকে সম্মুখে রাখিয়া উপন্যাস শেষ হয় নাই, উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে আগের রাত্রিতে রমার সহিত কথা বলিবার পর পরদিন প্রভাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে রমেশ কথা বলিতে বলিতে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, বিশ্বেশ্বরী রমার হৃদয়-ঐশ্বর্য বর্ণনা করিয়া রমাকে ভুল না বুঝিবার জন্য রমেশকে উপদেশ দিয়েছেন এবং রমেশ তাঁহার কথা মানিয়া লইয়া বলিয়াছে : "তাকে বোলো জ্যাঠাইমা, তাই হবে।" নাটকে রমা-রমেশের সম্পর্কের গভীরতা ও ট্র্যাজেডির নিবিড়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে রমা রমেশের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াছে এবং রমেশ তাহাকে 'রমা' বলিয়া ডাকায় 'রমা' আবেগোচ্ছল কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে : "এখনো রমা—?" —অর্থাৎ বিদায় বেলায় রমা রমেশের মুখে 'রাণী' ডাকটি শুনিতে চায়। অতঃপর রমেশকে রমার প্রণামের পর নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে। নাটকে রমা-রমেশের প্রেম-কাহিনীর আপেক্ষিক গুরুত্বের নিদর্শন রমেশের 'রমা'কে 'রাণী' নামে বার বার ডাকিবার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে তারকেশ্বরে রমা রমেশকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবার পর পরিতৃপ্ত রমেশকে "দেশে

গিয়ে যে নিন্দে করবেন না, এই আমার ভাগ্য" বলায় রমেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছে: "না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা সুখ্যাতির বাইরে।" (১০ম পরিচ্ছেদ) নাটকে এই দৃশ্যে (২য় অঙ্ক, ১য় দৃশ্য) রমেশ একই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, কিন্তু রমাকে "রমা" না বলিয়া "রাণী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। উপন্যাসে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রমেশের বাড়ীতে রমা আসিয়াছে এমন সময় পুলিশ রাধানগরে ডাকাতির সংশ্রবে রমেশের ভৃত্য ভজুয়াকে ধরিতে সে বাড়ীতে ঢুকিল। রমা পুলিসের নিকট রমেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল, সেই অনুশোচনায় সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল সে সেখান হইতে যাইবে না। উদ্বিগ্ন রমেশ বিস্ময়ে অবাক হইলেও রমাকে জোর করিয়া চলিয়া যাইতে বলিল: "ছি—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগগির বেরিয়ে যাও।" ইহার পর সে যতীনের হাত ধরিয়া ভাই বোনকে বাহিরে লইয়া গেল। নাটকে এই মনোরম দৃশ্যটিতে (২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) একই অবস্থায় আছে:

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে—আমি কিছুতেই যাব না রমেশদা।

রমেশ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ছি, ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী?"

—রমেশ এই বলিয়া রমার দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল।

উপন্যাসে ১১শ পরিচ্ছেদে রমার বাড়ী হইতে রমেশের লাঠির ঘায়ে আহত আকবর চলিয়া গেলে রমার উৎসাহহীন ভাব দেখিয়া বেণী ক্রুদ্ধ হইয়া নৈরাশ্য দেখাইয়াছে, মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিয়াছে, কিন্তু রমার বিরুদ্ধে রমেশ প্রসঙ্গে কোন বক্রোক্তি করে নাই। ঘটনাটিতে রমার বুকের উপর হইতে যেন একটা গুরুভার পাষাণ নামিয়া গিয়াছে, তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে তারকেশ্বরে রমেশকে 'সুমুখে বসিয়া' খাওয়াইবার ছবি। রমেশের সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজের পরিচয়ে সে অভিভূত হইয়াছে। নাটকে এই দৃশ্যটিকে (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) রমার দিক হইতে একইরূপ রাখা হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষোভের মুখে বেণীর স্বমূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সে রমেশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া রমাকে

আঘাত করিতে চাহিয়াছে। বেণীর উক্তিতে স্বভাবতঃই নাটকে সংঘর্ষ ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

'রমা' নাটকে উপন্যাসের হিসাবে আরও সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। ইহাতে অবশ্য নাটকের কাহিনীর সহিত উপন্যাসের কাহিনীর বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। উপন্যাসে সুকুমারীর অপমানের ঘটনাটি রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে ঘটিয়াছে, নাটকে ঘটিয়াছে শ্রাদ্ধের দুইদিন পূর্বে। পল্লীসমাজের রূপ-সম্পর্কিত ঘটনাটি উপন্যাসে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, নাটকে শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সংঘর্ষমাণ করিয়া না দেখাইয়া শরৎচন্দ্র নাটকে ইহার উপর ততটা গুরুত্ব দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ভৈরব আচার্যের নিমকহারামির শাস্তি দানের জন্য রমেশের ভৈরবের বাড়ীতে উপস্থিতি উপন্যাসে ঘটিয়াছে ভৈরবের নাতির অন্নপ্রাশনের পরদিন সন্ধ্যায়, সেইদিনই মোকদ্দমায় ভৈরবের বেইমানী প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্বদিন উৎসবে রমেশ অনিমন্ত্রিত থাকিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যে দীনু ভট্টাচার্য উপস্থিত নাই, গোলমালে গ্রামের লোকের সঙ্গে রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নাটকে উৎসবের দিনই রমেশ উপস্থিত হইয়াছে। রমেশ ব্যতীত সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া ভৈরবের বাড়ীতে আসিয়াছে। এইভাবে নাটকে উৎসবের দিন অবহেলিত রমেশের ভৈরবের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধতা বৃদ্ধি অধিকতর শিল্পসম্মত হইয়াছে। তাছাড়া কাজের বাড়ীতে রমার রমেশ-প্রসঙ্গে হৃদয়ভাব প্রকাশের নাটকীয়তা এবং সংঘর্ষ বৃদ্ধির সুযোগও নাট্যরূপদাতা গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসে রমেশ

* (আকবর ছেলেদের লইয়া চলিয়া যাইতেছিল—)

বেণী। বারণ কর না রমা, এমন সুযোগ ফসকালে যে আর কখনো মিলবে না!

(রমা অধোমুখে নির্বাক হইয়া রহিল; আকবর ও তাহার দুই পুত্র লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে বাহির হইয়া গেল।)

বেণী। ও—বোঝা গেছে সমস্ত।

গোবিন্দ। হুঁ, যা শোনা গেল তা মিথ্যে নয় দেখচি।

(উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান)

রমা। রমেশদা, এ যে তুমি পারো, এত শক্তি যে তোমার ছিল একথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

কর্তৃক ভৈরবের নির্যাতনের দৃশ্যে ভৈরবের কন্যা লক্ষ্মীর কটূক্তি হইতে রমাকে রক্ষা করিতে ভৈরব আচার্যের গৃহিণী আগাইয়া আসিয়াছেন, নাটকে রমার চরিত্রদীপ্তি ফুটাইবার আবশ্যকতায় সঙ্গতভাবেই আচার্য-গৃহিণীকে উপস্থিত করা হয় নাই। উপন্যাসে এবং নাটকে উভয় জায়গাতেই রমা বেণীকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছে: "তুমি নিশ্চয় জেনো,—আমি রমা। যদি মরি তোমাকেও জ্যান্ত রেখে মরব না।"—কিন্তু এই উক্তি রমার চরিত্র বিকাশে তথা নাটকের অগ্রগতিতে অধিকতর সাহায্য করিয়াছে, কারণ সেখানে ইহার পরই উপন্যাসের আচার্য-গৃহিণীর রমার চরিত্র-প্রশস্তিতে রমার দৃঢ়তার ফলে সৃষ্ট উত্তাপের মাত্রা নামাইয়া দেয় নাই। নাটকে রমা 'উপরোক্ত' উক্তির পরই দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে।* (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

'পল্লীসমাজ'-এর মত 'রমা' নাটকেও তারকেশ্বরে রমা-রমেশের দেখা হইয়াছে, পথে এই সাক্ষাতের দৃশ্যটি দৃশ্যগঠনের হিসাবে খুব ছোট বলিয়া এবং এই সুযোগে সংঘর্ষমূলক ভারি নাটকে দর্শককে হালকা নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিতে তারকেশ্বরের মন্দির-কর্মচারী, যাত্রী, ভিখারী, নাপিত প্রভৃতির সমাবেশ ঘটাইয়া পুণ্যার্থী যাত্রীদের উপর জুলুমের চিত্র বিস্তারিত ভাবেই দেখানো হইয়াছে। তবে শরৎচন্দ্র সমাজ-কল্যাণকামী লেখক বলিয়া বোধ হয় তারকেশ্বরের মন্দিরে ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের উপর এই অত্যাচারের বাস্তব ছবি ফুটাইয়া তীর্থস্থানে অন্যায় জুলুমের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রাখিয়াছেন এবং এই গুরুতর সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উপন্যাসে

* উপন্যাসের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের রমেশকে ফাঁকি দিয়া বেণী ও রমার মাছ ভাগ করিয়া লইবার দৃশ্যটি নাটকে অন্তরালে ঘটিয়াছে। উপন্যাসে রমা মাছ ভাগ হইয়া যাইবার পর রমেশের জন্য ভজুয়া যাওয়ায় লোকের সামনে আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য ভজুয়াকে "তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই" বলিয়াছে এবং তাহার মুখ দিয়া মিথ্যা বাহির হইবে না,—রমেশের এই প্রত্যয় ভজুয়ার মুখে শুনিয়া বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে বর্ণনাটি চমৎকার। নাটকে দৃশ্যটি নাই, প্রথমত লোকজনের সম্মুখে বিধবা রমার কঠিন মনস্তত্ত্বমূলক ভাব প্রকাশের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত ব্যাপারটি আর যাই হোক চুরি বা প্রতারণার, রমা প্রত্যক্ষভাবে এ কাজ করিলে দর্শকদের চোখে সে ছোট হইয়া যাইবে এবং ফলে নাটকের গতি আহত হইবে,—হয়ত লেখকের এ আশঙ্কা ছিল।

রমেশের জেলের পর ক্ষিপ্ত প্রজার হাতে বেণীর মার খাওয়ার ঘটনাটি অন্তরালে ঘটিয়া গিয়াছে, নাটকে ৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্যে ঘটনাটি মঞ্চে দেখানো হইয়াছে এবং এই উপলক্ষে আঘাতকারী জগন্নাথ সঙ্গী নরোত্তমকে যেসব কথা বলিয়াছে তাহা শুধু রমেশের গুণমুগ্ধ অশিক্ষিত প্রজার ক্রোধোক্তিমাত্র নয়, সমাজতন্ত্রের আভাসবাহী-শ্রেণী-সংগ্রামের আবেগও কিছুটা ইহাতে স্পন্দিত হইয়াছে। নাটকে এইখানে আছে :

জগন্নাথ। সাহস হবে না কি রে! শাস্তি নিতে রাজী হয়েই ত শাস্তি দিতে দাঁড়িয়েছি। অনেক দুঃখু দিয়েছে। মা দুর্গা! শুধু এই কোরো আজ যেন একটা কাজের মত কাজ করে যেতে পারি। যেন হাত না কাঁপে।

নরোত্তম। হাত কাঁপবে কি রে?

জগন্নাথ। তা পারে। বাপ্-পিতামোর কাল থেকে মার খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে আছে কি না! তাই শেষ পর্যন্ত হাত যদি না ওঠে ত জানবি হাতের দোষ, আমার নয়।*

'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া'। উপন্যাসে বিজয়া-নরেনের প্রেম-কাহিনী চমৎকার ফুটিয়াছে, সুন্দর প্রীতিপ্রদ গল্প, আখ্যান-বিন্যাস, সংলাপ। কিন্তু নাটকে উপন্যাসের মাধুর্য যেন ঠিক ধরা পড়ে নাই। উপন্যাসের দীর্ঘায়তন প্রেম-কাহিনী পাঠক যেমন ধীরে সুস্থে উপভোগ করে, নাটকে সে কাহিনী সংহতির অসুবিধায় ভাল জমে নাই। উপন্যাসের

*এইখানেই গান্ধীজীর কর্মনিষ্ঠ অহিংস সংগ্রামী নীতিতে শরৎচন্দ্রের কিরূপ আস্থা ছিল তাহা জগন্নাথের তাহার শ্রদ্ধেয় ছোটবাবু রমেশ প্রসঙ্গে কথা কয়টিতে বুঝা যায়। নরোত্তম জগন্নাথকে যখন বলিল : "তবে লাঠি গাছটা আমার হাতে দিয়ে তুই সরে দাঁড়া। দেখি আমি কি করতে পারি।" জগন্নাথ বলিয়াছে : "অমন কথা তুই বলিসনে নরু। তোর ছেলে-পুলে আছে, কিন্তু আমার নেই। এই আমার সময়। ছোটবাবু ফিরে এলে আর হবে না, তিনি হাত চেপে ধরবেন। তাই তাঁর জেল থেকে বেরোবার আগেই তার শোধ নিয়ে আমি জেলে গিয়ে ঢুকব।"

আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রশস্ত পটভূমিতে যেমন একরূপ মানাইয়া গিয়াছে, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাহা অনেক সময় রসহানি ঘটাইয়াছে। উপন্যাসের বিস্তৃত অবকাশে রাসবিহারীর কুটিলতার বর্ণনা সত্ত্বেও নরেন-বিজয়ার প্রেম যে প্রাধান্য পাইয়াছে, নাটকে রাসবিহারীর পরিসর সঙ্কুচিত না হইবার জন্য তাহার চরিত্রটি বড় হইয়া উঠায় মূল কাহিনী বা প্রেম-কাহিনী কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাছাড়া সমগ্রভাবে এমনই নাটকে প্রেম-কাহিনী উপন্যাসের মত অতখানি মনোহারী হয় নাই। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নাটকে অন্ততঃ একটি দৃশ্য উপন্যাসের চেয়ে এ হিসাবে বেশি উতরাইয়া গিয়াছে, সেটি হইল নরেনের বিজয়াকে মাইক্রসকোপ বুঝাইবার দৃশ্য (উপন্যাসে ১১শ পরিচ্ছেদ, নাটকে ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। মঞ্চকলার সহায়তায় দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করিয়া দর্শক-সাধারণ পুলকিত হয়।*

আগেই বলা হইয়াছে উপন্যাসের তুলনায় নাটক স্বল্পায়তন হওয়ার জন্যই বোধহয় রাসবিহারী প্রসঙ্গ নাটকে ভাল করিয়া ফুটায় বিজয়ার হৃদয়াবেগ প্রকাশ সত্ত্বেও তাহার উপর রাসবিহারীর কর্মতৎপরতার চাপ পড়িয়া তাহা একটু অস্পষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেনই পূর্ণবাবুর ভাগিনেয়

*এই মাইক্রসকোপ সংক্রান্ত একটি দৃশ্যেই কিন্তু উপন্যাসের একটি চমৎকার আবেগপ্রবণ মুহূর্ত নাটকে বাস্তবতা-হানির আশঙ্কাতেই বোধহয় শরৎচন্দ্র বর্জন করিয়াছেন। উপন্যাসে নরেন বিলাসবিহারী ও রাসবিহারী কর্তৃক মাইক্রসকোপ বিক্রয়ের ব্যাপারে অপমানিত হইবার পর বিজয়াকে কাঁদিতে দেখিয়া হঠাৎ তাহার চিবুক ধরিয়া বলিয়া উঠিয়াছে: "একি আপনি কাঁদছেন!" নরেনের যে সারল্য বিজয়ার চোখে তাহার অন্যান্য গুণালঙ্কারের উপর মাণিক্যখচিত রূপারোপ করিয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়। নাটকে অনাত্মীয় যুবক নরেন এভাবে অনাত্মীয়া যুবতী বিজয়ার চিবুক স্পর্শ করিলে বিলাত-ফেরৎ ডাক্তারের সারল্য দর্শক হয়ত ঠিক গ্রহণ করিতে পারিবে না, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কাতেই এই চিবুক স্পর্শ বাদ দিয়া শরৎচন্দ্র নরেনকে অশ্রুমুখী বিজয়াকে শুধু মাইক্রসকোপটি ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করাইয়াছেন, ইহা কলিকাতায় অনায়াসে বিক্রয় হইয়া যাইবে, বিজয়া কিন্তু প্রাণের আবেগে ইহা দিতে অস্বীকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাইক্রসকোপটির উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছে। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।)

এ সংবাদ বিজয়া যখন জানিল তখন বক্তব্য-সংক্ষেপে বিজয়ার মনের বিপ্লব নাটকের চেয়ে উপন্যাসেই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। উপন্যাসে ৯ম পরিচ্ছেদের শেষে বিলাস যখন বিজয়াকে শ্লেষভরে বলিল: "পূর্ণবাবুর ভাগ্‌নে ব'লে পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্যন্ত অপমান ক'রে গিয়েছিল, সে কে? তখন যে তাকে ভারি প্রশ্রয় দিলে। সে-ই নরেনবাবু। তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস করত, তবেই বল্‌তে পারতুম, সে পুরুষমানুষ। ভণ্ড কোথাকার!"—এবং এই কথা বলিয়াই বিলাসবিহারী ও রাসবিহারী "সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ মুহূর্তের মধ্যে বেদনায় একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।" এইখানেই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

নাটকে কিন্তু এই সংযত প্রকাশের অভাবে বিজয়ার হৃদয় প্রস্ফুটনে দৈন্য ঘটিয়াছে। (১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) শিল্পকলা বা আর্টের হিসাবে ইহা ত্রুটি বলা চলে। বিলাসবিহারী যখন বিজয়াকে নরেনের প্রকৃত পরিচয় দিয়া তাহাকে ভণ্ড বলিল বিজয়া অবাক হইয়া বলিয়াছে: "তিনিই নরেনবাবু! দারোয়ান দিয়ে তাঁকেই বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন? আমারই নাম করে? আমারই দেনার দায়ে?"—ইহার পর ক্রোধে ও ক্ষোভে বিজয়া একরূপ ছুটিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এখানে দৃশ্য শেষ হইলে বিজয়ার হৃদয়-বেদনা পাঠকের মনে একভাবে সঞ্চারিত হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া শরৎচন্দ্র ইহার পরও লিখিয়াছেন:

রাসবিহারী। (হতবুদ্ধি ভাবে) এ আবার কি?

বিলাসবিহারী। আমি তার কি জানি!

রাসবিহারী। যদি জানো না তো অত কথা দম্ভ করে বলতেই বা গেলে কেন? গোড়া থেকে শুনছ জগদীশের ছেলের ওপর ও জোর-জবরদস্তি চায় না, তবুও—

বিলাসবিহারী। অত ভণ্ডামি আমি পারিনে। আমি সোজাপথে চলতে ভালবাসি।

রাসবিহারী। তাই বেসো। সোজা পথ ওই একদিন তোমাকে আশ মিটিয়ে দেখিয়ে দেবে'খন। সোজা পথ! সোজা পথ!"

—ইহার পরই রাসবিহারীর দ্রুতপদে নিষ্ক্রমণ।

উপন্যাসে দয়ালের গৃহিণীকে নেপথ্যে রাখা হইয়াছে, নাটকে তাঁহাকে মঞ্চে আনিয়া তাঁহাকে দিয়া ভালমানুষ দয়ালকে বিজয়া-নরেনের বিবাহ

ঘটাইবার মত দুঃসাহসিক কাজে যে ভাবে শরৎচন্দ্র উৎসাহিত করাইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। উপন্যাসে বিজয়ার পিতা বনমালীর নরেনের পিতা জগদীশকে লেখা নরেনের সহিত বিজয়ার বিবাহ দিবার ইচ্ছা-জ্ঞাপক পত্র দুইখানি নরেন বিজয়ার কাছে তাহার পিতার পত্রের কথা উল্লেখের সময় সঙ্গে করিয়া আনে নাই, নাটকে এই চিঠি দুটি সংবাদ জ্ঞাপনের দৃশ্যেই বিজয়ার হস্তগত হওয়ায় বিজয়ার মনের আলোড়ন বাড়িয়াছে। শিল্পকলার দিক হইতে ইহাতে নাটকীয় গতি ত্বরান্বিত হওয়ার কথা। তবে এই দৃশ্যে (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) দৃশ্যাবসানের আবেগ সৃষ্টি করিতেই বোধহয় বিজয়া যে ভাবে নরেনের দেওয়া চিঠির বাণ্ডিল হইতে চিঠি দুইখানি খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধান পাইয়াই "এই তো বাবার হাতের লেখা। বাবা! বাবা!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে খুব ভাল অভিনয় না করিতে পারিলে অতিনাটকীয়তায় এমন জমাট দৃশ্যে শিল্প-রসহানির সম্ভাবনা আছে।

'দত্তা' উপন্যাসের শেষ দৃশ্যের মত 'বিজয়া' নাটকের শেষ দৃশ্যেও নরেন-বিজয়ার বিবাহ, মিলনান্ত কাহিনীরূপ। দৃশ্যটি আপাত-দৃষ্টিতে খুবই তৃপ্তি-দায়ক। কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা উপন্যাসে যতখানি প্রশ্নের বিষয় ছিল, নাটকে যেন তাহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়া অপরাহ্নে দয়ালের বাড়ীতে গিয়াছে, বহির্বাটী মাঙ্গলিক সজ্জায় নানাভাবে সাজানো। সন্ধ্যায় তাহার হিন্দুমতে বিবাহ। রাসবিহারীও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, অবশ্য তাঁহাকে সন্ধ্যায় আসিতে বলা হইয়াছে। নাটকে বিধিব্যবস্থা উপন্যাসের সঙ্গে একই রূপ, শুধু জাঁকজমক উপন্যাসের চেয়ে বেশি, এখানে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিয়া গিয়াছেন, 'গ্রামের চাষাভূষা নানা লোক নানা কাজে আসা যাওয়া করিতেছে এবং ভিতর হইতে কলরব শুনা যাইতেছে।' এই উৎসব আয়োজনের কথা, বিশেষ করিয়া জমিদার কন্যা ও ব্রাহ্ম মেয়ের সহিত হিন্দু নরেনের বিবাহের কথা প্রচারিত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রামের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বিলাসের প্রসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এই বিবাহকে সোচ্চার সমর্থন করিয়াছেন এবং বরবধূকে আশীর্বাদ জানাইয়াছেন। রাসবিহারী অধিক দূরে থাকেন না, তাছাড়া তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি ফাঁকি দেওয়া এমনিই কঠিন, বিবাহের আগের মুহূর্তেও তিনি এত হৈ চৈ'র মধ্যে ঘটনাটি জানিতে পারিলে নিজ স্বার্থে যে বাধার সৃষ্টি করিবেন তাহার পরিমাপ এবং ভয়ঙ্করত্ব অনুমান করা কাহারও পক্ষেই কঠিন নহে।

এই দিক হইতে বাস্তব চিন্তা করিয়া বিবাহ ব্যবস্থার পূর্বে দয়ালের, তথা লেখক শরৎচন্দ্রের, বিবাহটি চুপি চুপি সারিবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। শরৎচন্দ্র নিছক হৃদয়াবেগের বশেই উপন্যাসে এইরূপ আয়োজন করিয়া বিবাহের কথা লিখিয়াছেন, নাটকে হৃদয়াবেগ বশেই খেয়াল করেন নাই যে, বিবাহ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপার, তাহার পূর্বেই এত আড়ম্বরে খবর প্রচারিত হইয়া রাসবিহারীর কানে পৌঁছাইতেও পারে। বিজয়ার সম্মতি অনিশ্চিত ছিল, কারণ, প্রথমতঃ সে বিলাসের সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মমতে সে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম বলিয়া তাহার পিতার সহিত গ্রামের লোক যে ভাল ব্যবহার করে নাই একথা তাহারও জানা ছিল, এই জন্য বিজয়াকে না জানাইয়া দয়াল কাজটি সমাধায় উৎসুক হন। কাজেই রাসবিহারীর দিক হইতে বাধা আসিলে অবস্থা সঙ্গীন হইতে বাধ্য। অবশ্য ঘটনাটি এমন প্রীতিপ্রদ যে, লেখক যেমন, পাঠক ও দর্শক তদ্রূপ, প্রসন্নচিত্তে বিজয়ার বিবাহ-দৃশ্যটি উপভোগ করিয়াছে, শুভ্র প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতি হওয়ায় পুলকিত সকলেই ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া মাথা ঘামাইতে বিশেষ উৎসাহ পায় না। নাটকের শেষে বরবধূকে কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চে রাখিয়া মাইক্রসকোপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই হাল্কা আনন্দরসের দিকেই জোর দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পকলার হিসাবে শরৎচন্দ্র খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। তবে বর্তমান গ্রন্থের পাঠক সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা করা যায় যে, যদিও শরৎচন্দ্রের ঝোঁক হৃদয়ভাব প্রস্ফুটনের দিকেই অধিক ছিল এবং কেতাবী অর্থে শিল্পকলার জন্য তিনি ততটা মাথা ঘামান নাই, তবু শিল্পকলার দিক হইতেও শরৎচন্দ্রের শক্তি উপেক্ষণীয় নয়। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের কাহিনী এত পরিচিত ও চিত্তাকর্ষক, আখ্যানভাগ এত সুবিন্যস্ত, বক্তব্য এত সহৃদয়তা-বিজড়িত এবং ভাবদৃষ্টি এরূপ সমৃদ্ধ যে সাধারণ হইতে অত্যন্ত সংস্কৃতিমান,—সকলেই তাঁহার লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হন। উপন্যাসের আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে সমালোচক পার্সি লুবক যে বলিয়াছেন, ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট মায়ালোকে পাঠক নিজেকে

হারাইয়া ফেলে,—একথা শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্ণে বর্ণে সত্য।* এইভাবে পাঠককে মুগ্ধ করিয়া শরৎচন্দ্র তাহাদের হৃদয়ে আসন পাইয়াছেন। ইতি-পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্রের সহিত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের মিল আছে। শিল্পকলাগত দোষত্রুটি সত্ত্বেও ডিকেন্স ইংরেজজীবন সহজভাবে ও আকর্ষণীয়ভাবে ফুটাইয়া অসংখ্য পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছেন, পাঠক শিল্পকলাগত দোষগুণ না ভাবিয়াই ডিকেন্সের গল্প, আখ্যান, চরিত্র বিমোহিত হইয়া উপভোগ করে। পাঠকসমাজের কাছে শরৎচন্দ্রের স্থানও অনুরূপ।** দৃষ্টান্ত হিসাবে পুনরুল্লেখ করা যায় যে 'দত্তা' উপন্যাসের (বা বিজয়া নাটকের) শেষে বিজয়ার বিবাহ-দৃশ্যের সাড়ম্বর রূপ শিল্পকলাসম্মত নহে, কিন্তু এই পরিণতি এমন মনোহারী যে আনন্দ-আপ্লুত পাঠক (বা দর্শক) শিল্পকলার কথা ভাবিবারই যেন অবকাশ পায় না। শিল্পকলার দিক হইতে শরৎচন্দ্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এবার নিম্নে এই ত্রুটি-বিচ্যুতির কতকগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ হইল। শরৎ-চেতনার সম্যক মূল্যায়নে এগুলি নিঃসন্দেহে সাহায্য করিবে। তবে এক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শরৎসাহিত্যে ত্রুটির সন্ধান যতই মিলুক, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভারের সামগ্রিক গৌরব এজন্য ম্লান হইবার নয়।

*"A novel, as we say, opens a new world 'which creates an "illusion'—so pleasant that we are content to be lost in it". (Percy Lubbock, 'The Craft of Fiction', 1935, P. 6)

**প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের ভক্ত ছিলেন এবং ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি খুব পড়িতেন। এই ডিকেন্স-প্রীতির ফলে তাঁহার রচনায় ডিকেন্সের কিছুটা প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুহৃদ বিভূতিভূষণ ভট্ট ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎ-চন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন: "বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্স বোধহয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিলেন।"

যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭) শরৎচন্দ্রের ডিকেন্স-প্রীতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "পারণত বয়সেও তিনি ডিকেন্সের ভক্ত ছিলেন।"

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে হৃদয়াবেগ যেমন সম্পদ ইহা তেমনি তাঁহার একটি বড় দুর্বলতা। এই হৃদয়াবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য শরৎচন্দ্র পাঠক-হৃদয় অভিভূত করেন, আবার রসিক পাঠক ইহার জন্যই অনেক সময় ক্লান্তি অনুভব করে। সামাজিক কথাসাহিত্য-স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের লেখা মোটা-মুটি বাস্তবাশ্রিত ও যুক্তি-নির্ভর বলিয়া ভাবোচ্ছ্বাস কোন কোন সময় সত্যই ইহার মান নামাইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে 'দেবদাস' উপন্যাসের শেষে শরৎচন্দ্র যেভাবে পাঠকের সহানুভূতিসূচক অশ্রুজল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা দেবদাসের কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার পর, বিশেষ করিয়া পার্বতীর মান-মর্যাদা ভুলিয়া উন্মাদিনীর মত স্বামি-পুত্র-পরিজনের সম্মুখ দিয়া দেবদাসকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য বাড়ীর বাহিরে ছুটিয়া যাইবার ব্যাকুল প্রয়াসের পর বাহুল্যের গুরুভারই সৃষ্টি করিয়াছে, শিল্পকলাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে নাই। 'আঁধারে আলো' গল্পের উপসংহারে বিজলীকে যেভাবে সত্যেন্দ্রের বাড়ীতে আনা ও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শিল্পকলার চেয়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায় সস্তা ভাবাবেগেরই অধিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (শরৎসাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।) 'বড়দিদির' উপসংহার সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যায়। 'বিলাসী' গল্পের শেষে বিবাহের ও প্রেমের সমস্যা লইয়া দীর্ঘ প্রবন্ধসুলভ আলোচনা গল্পটির শিল্প-কলাগত মান নিঃসন্দেহে নামাইয়া দিয়াছে। 'পরেশ' গল্পে গুরুচরণকে শেষ পর্যন্ত খেমটার আসরে বসাইয়া যেভাবে সেখান হইতে ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশ কর্তৃক তাহাকে উদ্ধার করানো হইয়াছে তাহাও সস্তা ভাবাবেগের পরিচায়ক বলা চলে। 'দেনা-পাওনা' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ইহার রচনা-রীতিও কৃতিত্বের পরিচায়ক। ষোড়শীর জীবানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শৈবালদীঘি যাত্রা পর্যন্ত উপন্যাসটি চমৎকার লেখা, কিন্তু তাহার পরেই রচনার উৎকর্ষ রক্ষিত হয় নাই। 'দেনা-পাওনা'র শেষাংশে মিলনান্ত পরিণতি-কামী পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হইলেও শিল্পকলার দিক হইতে এ অংশ দুর্বল। 'ষোড়শী' নাটকে জীবানন্দের মৃত্যুশয্যায় ষোড়শী ফিরিয়া আসিয়াছে, এই পরিণতি তবু অনেকটা শিল্পসম্মত। শরৎচন্দ্র রোমান্স-লেখক নন, বাস্তব-জীবন-শিল্পী। কিন্তু 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীকে যেভাবে তিনি দেশে দেশে ঘুরাইয়াছেন এবং "পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা জানি"—এই বড় কথাটি সব্যসাচীর নিজমুখে বসাইয়া যে ভাবে মন্ত্রসিদ্ধের মত তাঁহাকে হঠাৎ হঠাৎ আনা হইয়াছে,

তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সধর্মী উপন্যাসকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের উপর লেখা বলিষ্ঠ এই রাজনৈতিক উপন্যাসের পটভূমি ভারতের বাহিরে সংস্থান করা হইয়াছে দুর্বল যুক্তিতে (শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ব্রহ্ম-ভারতকে ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন এবং পরাধীন ব্রহ্মবাসীরও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল), অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রহ্মদেশীয় পটভূমিতে ব্রহ্মবাসীর নিজস্ব জীবনযাত্রার, ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের, এমনকি ব্রহ্মদেশীয় জনতার দেখা উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায় না। আগেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মবাসীরা 'পথের দাবী'তে যেটুকু উপস্থিত হইয়াছে (যেমন ভামো'তে ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকের চারি জামাতার কাহিনীতে, সব্যসাচীর ইরাবতী তীরে গুপ্ত আস্তানায়, ইত্যাদি), তাহা সমগ্র উপন্যাসের হিসাবে নগণ্য। 'চরিত্রহীন'-এ আরাকান এবং 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুন উপন্যাসের একাংশের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মদেশের অথবা ব্রহ্মবাসীদের বাস্তবরূপ সেখানে অতি সামান্যই চিত্রিত হইয়াছে। 'দত্তা' উপন্যাসের শেষে বিজয়ার হিন্দুমতে বিবাহ যতই পাঠকের প্রীতিপদ হউক, বাস্তবে এইভাবে বিবাহ সম্পাদন খুবই অস্বস্তিকর এবং রাস-বিহারীর বাধা দানের সম্ভাবনা থাকায় ইহার বাস্তব-সম্ভাবনা আরও কমিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল অত্যুজ্জ্বল চরিত্র, কিন্তু কমলের মত সক্রিয় ভাঙনধর্মী মতবাদের চরিত্র কি বাঙালী মেয়েদের মধ্যে হইতে পারে? 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী শরৎচন্দ্রের যত প্রিয় চরিত্রই হউক, এইরূপ মেসের ঝি কি কোথাও আছে? বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য "সাবিত্রী কি কমলে সত্যের সে আওয়াজ নেই; যা আছে রেঙ্গুনের বাড়িউলিতে কি গোবিন্দ গাঙ্গুলিতে"—('হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪৮) সত্যই উড়াইয়া দিবার মত নয়। শরৎচন্দ্রের পতিতা-পল্লী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল একথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে পতিতাদের বা পতিতালয়ের ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বাস্তব গ্লানিময় রূপ কোথায়? শরৎচন্দ্রের পতিতাদের আচার-আচরণ এবং সংস্কার তো মধ্যবিত্ত মেয়েদেরই মত। প্রকৃতপক্ষে এই পতিতাদের চেয়ে 'পথের দাবী'র শ্রমিক বস্তির নৈতিকতা-বোধহীন নরনারীর অথবা 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের সতীশ ভরদ্বাজের কাহিনী সংশ্লিষ্ট কুলি পুরুষ-রমণীর ছবি ক্লেদ-পঙ্কিলতার হিসাবে অধিক বাস্তব বলা যায়। শরৎচন্দ্র ১৩ বছরের পার্বতী (দেবদাস) বা হেমকে (পথ

নির্দেশ) নায়িকারূপ দিয়াছেন, সেই ভূমিকা তাহাদের পক্ষে গুরুভার সন্দেহ নাই, সে হিসাবে বরং 'পরিণীতা'র ত্রয়োদশী ললিতার শান্ত নায়িকারূপটি তবু কিছুটা মানাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হেম যখন তাহার বিবাহ না হইলে জাতি যাইবে,—মায়ের এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে: "আমাদের জাত থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? পৃথিবীতে আরও অনেক জাত আছে মেয়ের বিয়ে না দিলে যাদের জাত যায় না,"—গুণীনের প্রতি অনুরক্তা অবিবাহিতা কন্যার এই উক্তি শুধু মাত্র তাহার বালিকা বয়সের পরিচিতির জন্যই পাঠকের কাছে পাকামি বলিয়া মনে হয় এবং চমৎকার কথাগুলির আবেদন যেন মাঠে মারা যায়।

শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র খুবই উজ্জ্বল এবং সক্রিয়তা, দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদা-বোধের জন্য শরৎচন্দ্রের কোন কোন নায়িকা বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের 'সমাজ-চেতনা' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, সাধারণভাবে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ভূমিকা স্বামী অথবা প্রেমিকের বিপরীতে প্রায়ই সেবিকার এবং সম-মর্যাদার দাবী তাহারা নিজেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে নারী চরিত্রের স্নিগ্ধ-সুষমা যতই থাক, চরিত্রের বলিষ্ঠতা এজন্য কোথাও কোথাও ম্লান হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। 'শুভদা' উপন্যাসে দুশ্চরিত্র স্বামী হারাণের ক্ষেত্রে শুভদার মত সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র এই স্নিগ্ধ সাধ্বীত্বের সীমার মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন; ইবসেনের 'ঘোস্ট্' নাটকে মিসেস এ্যালভিং চরিত্রহীন স্বামী সম্পর্কে আত্মিক-শক্তিসমৃদ্ধ যে দৃঢ় মনোভাব দেখাইয়াছে, অনুরূপ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের নায়িকার কাছে তাহা প্রত্যাশার অতীত। শরৎচন্দ্র প্রেমের যে মহিমান্বিত রূপটিকে সযত্নে তাঁহার নায়িকা চরিত্রগুলির মাধ্যমে লালন করিয়াছেন, বিশ্লেষণের ফলে আধুনিক বহু লেখকের কাছে সেই প্রেম প্রশ্নের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎচন্দ্রের এই প্রেম-চিত্রগুলি তাঁহার কল্পনার ফসল, বাস্তব জীবনের সহিত তাহাদের যোগ অনিবার্য ও সুগভীর নয়, এমন অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায়। জৈব-প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতা এ প্রেমে সমহারে কদাচিৎ স্বীকৃত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র হৃদয়গ্রাহী গল্প বলিতে পারিতেন, কিন্তু আখ্যান-বিন্যাসে তিনি মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটাইয়াছেন, যাহাতে গল্পের গতি পরিণতিতে প্রভূত সুবিধা হইলেও ঠিক কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ উপন্যাসে

এরূপ সুবিধা অনুযায়ী ঘটনা সংস্থান যে তিনি পছন্দ করিতেন না তাহা শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অরক্ষণীয়া'য় জ্ঞানদার মায়ের মৃত্যুর পূর্বে অতুল যদি ট্রেন ফেল না করিত, 'ছবি' গল্পে বা-থিন দেনা শোধের ঠিক পূর্ববর্তী সপ্তাহে পীড়িত হইয়া না পড়িত, 'চন্দ্রনাথ'-এ স্বামী-পরিত্যক্তা সরযূ যখন হরিদয়ালের বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইতেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কৈলাস যদি সেখানে উপস্থিত না হইতেন, 'চরিত্রহীন'-এ দেওঘরে সরোজিনী যদি গাড়ী ভাঙিয়া ঠিক সতীশের বাসার সম্মুখে অসহায় হইয়া না পড়িত, 'গৃহদাহ'-এ মহিম যদি ডিহিরিতে গৃহশিক্ষকরূপে রামবাবুর বাড়ীতে গিয়া অচলার সম্মুখে ওইভাবে না আসিত, 'দর্পচূর্ণ'-এ ইন্দু ও বিমলা উভয়ের অনুপস্থিতিতে না হইয়া তাহাদের উপস্থিতিতে বা অন্ততঃ একজনের উপস্থিতিতে শম্ভুবাবু কর্তৃক নরেনকে জেলে দিবার ব্যবস্থা হইত, 'দেবদাস'-এ অসুস্থ দেবদাস যদি ঠিক পার্বতীর শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্বেই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার মধ্যে মারা যাইত অথবা সেখানে উপস্থিত হইয়াও জীবিত থাকিত, 'শ্রীকান্ত'তে রাজলক্ষ্মীকে যদি শ্রীকান্তর বারবার অসুস্থতার সুযোগে সেবা করিবার, তথা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ না দিয়া শ্রীকান্তকে স্বাভাবিক সুস্থ রাখা হইত,—শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলির বিন্যাস বা পরিণতি সেক্ষেত্রে বর্তমানের মত যে প্রায় ক্ষেত্রেই হইত না তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে শরৎসাহিত্যে এইরূপ ঘটনা অনেক এবং ইহাদের অনেকগুলিকে শিল্পকলার মুন্সীয়ানার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত 'সুলভ উপায়' বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের জীবনায়ন প্রায়ই বাস্তবতা-নির্ভর, তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই সুন্দর, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের 'অর্থনৈতিক চেতনা' অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, যে অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের মন ও সামাজিক সম্পর্ক বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, শরৎচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে সেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হইয়া লেখনী চালনা করেন নাই। দারিদ্র্য কত কঠিন, তাহার পীড়ন কিরূপ দুঃসহ, 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি কয়েকটি রচনা বাদে শরৎচন্দ্রের অনেক লেখা হইতেই তাহা বুঝা যায় না। বাস্তবিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে কমল, মহিম, শ্রীকান্ত প্রভৃতি প্রধান চরিত্রের জীবনরূপে কেমন যেন একটা ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আপন উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে শরৎচন্দ্র যেখানে কাহিনীতে বা চরিত্রে

নিজের সুবিধামত জোড়াতালি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে শিল্পকলার দিক হইতে কিছুটা ত্রুটি ঘটা স্বাভাবিক। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রীকে সতীশের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা যায়। উপন্যাসে সতীশকে সাবিত্রীময় করিয়া দেখানো হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে সাবিত্রীকে স্মরণ করিয়া অশান্ত সতীশের মন শান্ত হইয়াছে। সেই সাবিত্রী চলিয়া গেল এবং সাবিত্রীর স্মৃতি-বিমথিত সতীশ কি করিয়া সরোজিনীকে সুখী করিবার বা নিজে সুখী হইবার মত করিয়া সরোজিনীকে গ্রহণ করিল? 'দত্তা' উপন্যাসে ইতিপূর্বে আলোচিত বিজয়ার বিবাহ প্রসঙ্গও এই সুবিধাবাদের দৃষ্টান্ত। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে 'অচলা' চরিত্রের বিপরীতে মৃণাল চরিত্রের চিত্রণে এই সুবিধাবোধ সুস্পষ্ট। যে কারণেই হউক 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমলকে জিতাইয়া দিবার জন্যই হয়তো শরৎচন্দ্র তাহার উদ্ভট তাত্ত্বিক রূপের বিপরীতে সত্যকার বলিষ্ঠ চরিত্র উপস্থাপিত করেন নাই, অক্ষম অক্ষয়ের দ্বারাই কাজ চালাইয়া লইয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার চরিত্র-চিত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিবার জন্যই বোধহয় রোহিণীবাবুকে ঐরূপ শান্ত করিয়া গড়া হইয়াছে এবং রেঙ্গুনে তাহাকে একা ফেলিয়া অভয়া প্রোমে স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবার পরও শরৎচন্দ্র রোহিণীবাবুকে যেন অভয়ার অনিবার্য প্রত্যাবর্তনের নোঙররূপে হাতের কাছে ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র 'নিষ্কৃতি' গল্পে উদার হৃদয়বোধের জয়গান করিতে গিরিশ চরিত্রটি আঁকিয়াছেন, এই গিরিশ ও তাহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর মহত্ত্ব ফুটাইয়া তিনি যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থার অনুকূলে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় রাখিয়াছেন* কিন্তু

*'রসচক্র' নামে একখানি বারোয়ারী উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, বাকী পরিচ্ছেদগুলি লেখেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ। শরৎচন্দ্র যে অংশটুকু লেখেন তাহা প্রথমে কথাসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাশী হইতে প্রকাশিত 'প্রবাস জ্যোতিঃ' পত্রিকায় 'বাড়ীর কর্ত্তা' নাম দিয়া উপন্যাস হিসাবে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, গৃহকর্তার পরিবারের বন্ধন বা মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব পালনের চিত্রই যে ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নামকরণ হইতেই অনুমান করা যায়। এই অংশে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের অনুরাগ বা মমতা স্পষ্ট ফুটিয়াছে। ইহাতে গৃহকর্তা শিবরতন কলিকাতার

গিরিশকে যেভাবে তিনি নির্বুদ্ধির প্রতিমূর্তি করিয়া আঁকিয়াছেন, যেভাবে গিরিশ অভিজ্ঞতাশূন্য রমেশকে ব্যবসায়ে ৩ হাজার টাকা নষ্ট হইবার পর আবার নূতন খড়ের ব্যবসায়ে ৮ হাজার টাকা একরূপ জলে দিবার জন্যই দিতে চাহিয়াছেন, তাহা লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের পক্ষে দূরে থাক, সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষেও বাস্তবসম্মত বলিয়া মনে হয় না। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্র সৃষ্টির জন্য এবং রমাকে উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্তা বিশেশ্বরীকে যেরূপ মহীয়সী করিয়া আঁকিয়াছেন, বিশেশ্বরীর সম্মুখে পল্লীসমাজের কঠিন বাধাসমূহ স্বরূপে উপস্থাপিত না হওয়ায় চরিত্রটি সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হইতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্র বাংলার পল্লীগ্রামকে অনেক গল্প-উপন্যাসের পটভূমি করিয়াছেন, পল্লী-প্রকৃতি না ফুটাইবার জন্য তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের ভূমি-নির্ভর অর্থনীতি ও জমিদার-প্রাধান্য-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার উপর তিনি যতখানি দৃষ্টি দিয়াছেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশি জোর পড়িয়াছে ব্যক্তি-চরিত্র বা ব্যক্তি-হৃদয় পরিস্ফুটনের উপর। অবশ্য হৃদয়বাদী ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইহা বিশেষ ত্রুটির কথা নয়, কিন্তু সমাজ-কল্যাণকামী রাজনৈতিক কর্মী কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কাছে এ হিসাবে পাঠকের কিছুটা প্রত্যাশা স্বাভাবিক। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে যখন উপন্যাস-শিল্প কাঁচা, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের

চাকুরীরত ভাই বিভূতিরতনের উপার্জনের সমস্ত টাকা মণি অর্ডারের মাশুল দিয়া যেভাবে কলিকাতা হইতে রাজসাহীর বিরাজপুর গ্রামে আনাইতেন এবং পুনরায় বিভূতিরতনের সংসার খরচের টাকা মণি অর্ডারের মাশুল দিয়া পাঠাইয়া দিতেন, তাহার নীতিগত গৌরবের উপরই শরৎচন্দ্র জোর দিয়াছেন, কষ্টার্জিত উপার্জনের একাংশ মাশুল বাবদ বৃথা লোকসান গ্রাহ্য করেন নাই। তাছাড়া শিবরতন ক্রুদ্ধা জননীকে তুষ্ট করিতে যৌথ পরিবারের কর্তা হিসাবে অশেষ স্নেহের পাত্রী বিভূতিরতনের স্ত্রী নবৌমার মাথায় সামান্য ভুলের শাস্তি হিসাবে জুতা তুলিয়া দিতে যেভাবে বিভূতিভূষণকে আদেশ দিলেন, যে জুতা মাথায় করিয়া হতভাগিনী উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে,—তাহাও যৌথ পারিবারিকতার আদর্শবোধের আবেগজাত, বাস্তবে ইহা নিষ্ঠুরতা তো বটেই, ন্যায়সঙ্গতও নয়।

মধ্যে রস-চেতনার সহিত নৈয়ায়িক নিষ্ঠার যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মধ্যে তাহার কেমন যেন অভাব ছিল। এই সমন্বয়ের আলো শিল্পসম্মতভাবে শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হইলে তাহা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর হইত।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি সাধারণত যেরূপ মার্জিত ভাষায় কথা বলিয়াছে, সেরূপ মার্জিত স্তরের মানুষ তাহারা সবক্ষেত্রে নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সর্বশ্রেণীর চরিত্রে মার্জিত ভাষা আরোপের প্রবণতা শরৎচন্দ্রেও বর্তাইয়াছিল এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির অনেকেই সমাজের উপরের স্তরের নহে বলিয়া এই মার্জিত ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের রচনা সমগ্রভাবে বাণীবহুল, চরিত্রগুলি অনেক সময় একটু বেশি কথা বলে, শিল্পকলা এক্ষেত্রে যে সংযম দাবী করে তাহা তাহারা কোন কোন সময় দেখায় না,—এরূপ অভিযোগ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এইসঙ্গে কেহ কেহ বলেন যে, শরৎচন্দ্র কোথাও কোথাও পাত্র-পাত্রীকে যেরূপ মুখর, এমন কি বাচাল করিয়াছেন, পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি সমানুপাতিক উৎসাহ দেখান নাই।* শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ কথাসাহিত্যে কাব্য করা পছন্দ করিতেন না, বাস্তব জীবনরূপ ফুটাইবার দিকেই তাঁহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসাবে যেমন তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতে ভালবাসিতেন,** সাহিত্যেও তেমনি মাঝে মাঝে এমনভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বিস্তারিত, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার আশ্চর্য সুন্দর গল্পের গতি সে সব

* "শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বচনের কার্পণ্য নেই, কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টিতে অনেক কার্পণ্য দেখা যায়।"—(কালিদাস রায়, শরৎসাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৯)

** "শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যে বাসায় থাকিতেন তার চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল চমৎকার। খোলা জানলার বাইরের দৃশ্যগুলি শরৎচন্দ্র হুবহু তাঁর ক্যানভাসে তুলে নিলেন। এমনি করে সকাল সন্ধ্যে একের পর এক ছবি সৃষ্টি করে চললেন। তাঁর প্রথম ছবিটির নাম 'রাবণ মন্দোদরী', পরের ছবিটির নাম দিয়েছিলেন 'মহাশ্বেতা'। এই 'মহাশ্বেতা'ই শরৎচন্দ্রের শিল্পীজীবনের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।"—(মণীন্দ্র চক্রবর্তী, দরদী শরৎচন্দ্র, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৩)

জায়গায় নিঃসন্দেহে ব্যাহত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র মোটের উপর নরম হৃদয়াবেগ-সম্পন্ন লেখক, কঠোর চরিত্র অথবা কঠিন, রুক্ষ পটভূমি অঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতা সমমানের ছিল না, 'পথের দাবী'র 'সব্যসাচী'কে স্মরণ রাখিয়াও একথা বলা চলে। বীরভূমের পটভূমিতে শরৎচন্দ্রও লিখিয়াছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন, কিন্তু বীরভূমের রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ তারা-শঙ্করে যতখানি জীবন্ত ও স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্রে ঠিক ততখানি নয়।

* * * *

গুণ এবং দোষ মিলাইয়া শরৎচন্দ্রের শিল্পচেতনা সমগ্রভাবে আলোচনা করা হইল। এই আলোচনা হইতে একথা বোধ হয় বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, লেখায় শিল্পকলাগত কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও হৃদয়গ্রাহী কথাসাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে শরৎচন্দ্র সঙ্গত কারণেই জনচিত্ত জয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রপ্রভাবে ম্লান হইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম কৃতিত্বের কথা। ইংরাজিতে যাহাকে 'Life Pattern' বলে, জীবনের সেই রসরূপ প্রস্ফুটনে মানবদরদী শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিক প্রভূত সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জীবনে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য কম, এই বাঙ্গালীর জীবনরূপই তাঁহার অবলম্বন, শরৎচন্দ্রের লেখায় বিষয়বস্তুর প্রসারের বা বৈচিত্র্যের অভাবের ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু যে জীবন তিনি ফুটাইয়াছেন, সেই জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়া আপন অভিজ্ঞতার আলোকে ও সহানুভূতির রসসিঞ্চনে তিনি তাহা অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। গঠন-কৌশল বা রচনারীতির কেতাবী জ্ঞান অথবা সে সম্পর্কে সচেতন সাবধানতা,—কোনটাই শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু সমগ্রভাবে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি এক অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। তাঁহার ছোটগল্প অবশ্য শিল্পকলার হিসাবে তাঁহার উপন্যাসের সমপর্যায়ভুক্তি দাবী করিতে পারে না, তবু বিষয়বস্তুর মনোহারিত্বে, বর্ণনা-লালিত্যে এবং বক্তব্য উপস্থাপনের নিপুণতায় সেগুলিও রসিক পাঠক-সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যে সুস্থ সুন্দর জীবনধর্মের জন্য যে বিপ্লবাত্মক আবেগ দেখা যায় সেই মহান্ অবদান বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে শরৎচন্দ্রকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পরিশিষ্ট

সংক্ষেপে শরৎচন্দ্রের জীবনকথা এবং রচনাবলীর তালিকা।

১৮৭৬—১৫ই সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র, ১২৮৩) হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতা—ভুবনমোহিনী দেবী।

[শরৎচন্দ্রের পিতৃপুরুষের গ্রাম ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে মামুদপুর। দেবানন্দপুরে (তাঁহার পিতার মাতুলদের গ্রাম) মতিলালের একখানি ছোট বাড়ী ছিল।]

১৮৮৬—পিতার ডিহিরি অন্ শোনের চাকুরী যাওয়ায় পিতামাতার সহিত ডিহিরির বাস তুলিয়া ভাগলপুরে মাতুলালয়ে গমন।

১৮৮৭—ভাগলপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯১—পিতামাতার সহিত দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াশুনা।

১৮৯৩—সাহিত্যচর্চা সুরু। 'ছবি' (তখনকার নাম 'কোরেল গ্রাম') ও 'কাশীনাথ' গল্প এই সময় প্রথম লিখিত হয়। 'কাক বাসা' ও 'পাষাণ' নামে দুটি গল্পও এই সময়কার লেখা।

১৮৯৪—পিতামাতার সহিত পুনরায় ভাগলপুরে গমন। তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯৫—তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি। মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু।

১৮৯৬—এফ্.-এর টেষ্ট পরীক্ষায় আটকাইয়া যাওয়ায় কলেজের সহিত সম্পর্ক শেষ।

১৮৯৪-১৯০১—ভাগলপুরে সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যসভা গঠন ও তাহাতে সভাপতিত্ব। এই সাহিত্যসভার হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া' পরিচালনা। গল্প-উপন্যাস রচনা। বোঝা, অনুপমার প্রেম সুকুমারের বাল্যকথা, 'বড়দিদি', 'হরিচরণ, 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা' এই সময়কার সাহিত্য প্রয়াস। 'দেবদাস'ও এই সময় প্রথম রচিত হয়। অভিনয়ে ও গানবাজনায় উৎসাহ। মাতার মৃত্যুতে মাতুলালয়ে থাকার অসুবিধার জন্য পিতার সহিত

ভাগলপুরেই খঞ্জরপুর মহল্লায় বাসা বাড়ীতে অবস্থান। পিতা মতিলালের দারুণ অর্থাভাব, দেবানন্দপুরের বাড়ীখানি বিক্রয় (নভেম্বর, ১৮৯৬)। বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য ও সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। গোড্ডায় রাজবনেলী এষ্টেটে চাকুরী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ (১৯০০)।

১৯০১-১৯০২—সন্ন্যাসী হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ।

১৯০২—নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মজঃফরপুরে গমন। অনুরূপা দেবীর সঙ্গে পরিচয়। 'ব্রহ্মদৈত্য' উপন্যাস রচনা। (ইহার পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়।) পিতৃবিয়োগ। ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন।

১৯০৩—জীবিকার্জনের আশায় রেঙ্গুন যাত্রা। সম্পর্কিত মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আশ্রয় লাভ। সম্পর্কিত মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনামীতে প্রেরিত 'মন্দির' গল্পের কুন্তলীন পুরস্কার (১৩০৯) লাভ।

১৯০৫—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের স্বাধীনভাবে বাস। অবিন্যস্ত জীবন। মদ্যাসক্তি। রেঙ্গুনের চাকুরীতে ইস্তফা। পেগুতে অস্থায়ী চাকুরীলাভ।

১৯০৬-১৯১৬—রেঙ্গুনে চাকুরী। সাহিত্যচর্চা, পড়াশুনা ও মাঝে মাঝে ছবি আঁকা। ডেপুটি এক্‌জামিনার অফ্‌ এ্যাকাউণ্টস্‌ সাহিত্যরসিক গুণগ্রাহী মণীন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট হইতে চাকুরীর ব্যাপারে, পড়াশুনায় এবং সাহিত্য-চর্চায় নানাভাবে সাহায্য লাভ। মণীন্দ্রনাথের বাড়ীতে কিছুকাল বাস।

১৯০৭—চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন (নভেম্বর, ১৯০৭)। 'ভারতী' পত্রিকার 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশ (বৈশাখ—আষাঢ় সংখ্যায়, দুই সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই)। ইহা শরৎচন্দ্রের মাসিক পত্রিকায় স্বনামে প্রথম মুদ্রিত রচনা।

১৯১২—অক্টোবর, কলিকাতায় এক মাসের জন্য আগমন। 'যমুনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। 'যমুনা'য় নিয়মিত লেখার প্রতিশ্রুতি। 'কাশীনাথ' ও 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'হরিচরণ' প্রভৃতি ভাগলপুরে থাকার সময় লেখা গল্পগুলি 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৯১৩—রেঙ্গুনে রচিত 'রামের সুমতি' 'যমুনা'য় (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১৯) প্রকাশিত। 'বড়দিদি' উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ১৯১৩)

"বিরাজ বৌ' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ আরম্ভ (পৌষ, ১৩২০ সংখ্যা হইতে)।

[শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনাগুলি 'যমুনা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয় :—'ক্ষুদ্রের গৌরব', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'পরিণীতা', 'চন্দ্রনাথ,, 'নিষ্কৃতি'র প্রথমাংশ ('ঘর ভাঙা' নামে), 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'চরিত্রহীন' (আংশিক), 'নারীর লেখা' ও 'নারীর মূল্য' (দিদি অনিলা দেবীর বেনামীতে), 'কানকাটা' এবং 'গুরু-শিষ্য সম্বাদ'।

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের অধিকসংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষ' শরৎচন্দ্রের লেখার জন্যই দ্রুত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা :—'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিত মশাই', 'সমাজ ধর্মের মূল্য', 'আসার আশায়', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'একাদশী বৈরাগী', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব', 'দেনা-পাওনা', 'নববিধান', 'শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব', (আংশিক) 'শেষপ্রশ্ন', 'অনুরাধা', 'দেওঘরের স্মৃতি' এবং 'শেষের পরিচয়' (১-১৫ পরিচ্ছেদ)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' ও 'বিলাসী' 'ভারতী'-তে; 'ছবি' পূজাবার্ষিকী 'আগমনী'তে; 'কাশীনাথ', 'বাল্যস্মৃতি', 'অনুরাধার প্রেম', 'হরিচরণ', 'সাহিত্য'-তে; 'মহেশ', 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'পথের দাবী', 'সতী', এবং 'সাহিত্য ও নীতি' (প্রবন্ধ) 'বঙ্গবাণী'তে; 'স্বামী', 'সত্য ও মিথ্যা' (প্রবন্ধ) 'বাংলার কথা'; (প্রবন্ধ) 'নারায়ণ'-এ; 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (প্রবন্ধ), 'শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব', 'আগামী কাল' (অসমাপ্ত উপন্যাস), 'সাহিত্য সম্মিলনের রূপ' (প্রবন্ধ) ও 'বিপ্রদাস' 'বিচিত্রা'য়; 'বামুনের মেয়ে' শিশির উপন্যাস সিরিজে; 'পরেশ' পূজাবার্ষিকী 'শরতের ফুলে' 'স্বরাজ সাধনায় নারী' এবং 'শিক্ষার বিরোধ' (প্রবন্ধ) সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা'য়; 'সত্যাশ্রয়ী' (প্রবন্ধ) পূজাসংখ্যা 'বাংলার রূপ'এ, 'সাহিত্যের মাত্রা' পূজাসংখ্যা 'স্বদেশ'-এ; 'বাংলা নাটক' (প্রবন্ধ) 'নাচঘর'-এ; 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' (প্রবন্ধ) পূজাসংখ্যা 'নাগরিক'-এ; 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা', 'ভাগ্য বিড়ম্বিত লেখক সম্প্রদায়', 'মুসলমান সাহিত্য' (প্রবন্ধ) 'বাতায়ন'-এ; 'মহাত্মার পদত্যাগ' (প্রবন্ধ) 'কিশলয়'-এ; 'আমার কথা' (প্রবন্ধ), 'চন্দননগরের

আলাপ সভায়' (আলোচনা) 'প্রবর্তক'-এ, 'রস সেবায়েৎ', 'আত্মশক্তি'তে; 'স্মৃতিকথা' (দেশবন্ধু স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ); 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' (প্রবন্ধ), 'জাগরণ' (অসমাপ্ত উপন্যাস)' 'মাসিক বসুমতী'তে; 'মামলার ফল'; বার্ষিকী 'পার্বণী'তে; 'কবি অতুলপ্রসাদ' আনন্দবাজার পত্রিকায় এবং 'বিপ্রদাস' (আংশিক) ও 'যুবসঙ্ঘ' 'বেণু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]

১৯১৪—পুস্তকাকারে 'বিরাজ বৌ' (মে—১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' (জুলাই, ১৯১৪। গল্পগ্রন্থ। গল্প: 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', ও 'পথ-নির্দেশ'), 'পরিণীতা' (আগষ্ট, ১৯১৪) এবং 'পণ্ডিত মশাই' (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) প্রকাশিত। ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'যমুনা'য় 'যমুনা'র অন্যতম সম্পাদকরূপে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয়। ছয় মাসের জন্য কলিকাতায় আগমন (জুন হইতে ডিসেম্বর, ১৯১৪)।

১৯১৫—'যমুনা' পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা ত্যাগ। 'মেজদিদি' (গল্পগ্রন্থ, ডিসেম্বর, ১৯১৫। গল্প: 'মেজদিদি'; 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো'। 'দেওঘরের স্মৃতি' পরে সংযোজিত।) প্রকাশিত।

১৯১৬—১১ই এপ্রিল, চিরকালের জন্য রেঙ্গুন হইতে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাসা সংগ্রহ। পুস্তকাকারে 'পল্লীসমাজ' (জানুয়ারী, ১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (মার্চ, ১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (জুন, ১৯১৬) ও 'অরক্ষণীয়া' (নভেম্বর, ১৯১৬) প্রকাশিত।

১৯১৭—'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭), 'দেবদাস' (জুন, ১৯১৭), 'নিষ্কৃতি' (জুলাই, ১৯১৭। প্রথমে 'নিষ্কৃতি'র গোড়ার অংশ 'ঘর ভাঙা' শিরোনামায় 'যমুনা' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।), 'কাশীনাথ' (সেপ্টেম্বর, ১৯১৭। গল্পগ্রন্থ। সাতটি গল্প:—'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্য স্মৃতি', ও 'হরিচরণ'।) এবং 'চরিত্রহীন' (নভেম্বর, ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯১৮—'স্বামী' (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮। গল্পগ্রন্থ। দুটি গল্প:—'স্বামী' ও 'একাদশী বৈরাগী'), 'দত্তা' (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮), 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্ব (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯১৯—'বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক সুলভ মূল্যে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভ (প্রথম খণ্ড—অক্টোবর, ১৯১৯। ১৯১৯-১৯৩৫ এই কয় বৎসরে মোট ৭ খণ্ড গ্রন্থাবলী বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পানিত্রাস, সামতাবেড়ে দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীর কাছে রূপনারায়ণের তীরে বাড়ী তৈয়ারীর জন্য জমি ক্রয়।

১৯২০—'ছবি' (জানুয়ারী, ১৯২০। গল্প গ্রন্থ। গল্প: 'ছবি', 'বিলাসী'; 'মামলার ফল'।), 'গৃহদাহ' (মার্চ, ১৯২০) ও 'বামুনের মেয়ে' (অক্টোবর, ১৯২০) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯২১—হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। 'বারোয়ারী উপন্যাস' (বারোয়ারী উপন্যাস, শরৎচন্দ্র ইহার একাংশ লেখেন) প্রকাশিত।

১৯২২—অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসে মুদ্রিত কে. সি. সেন ও টি. টমসন অনূদিত এবং ই. জে. টমসনের ভূমিকা সম্বলিত শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ইংরেজী অনুবাদ 'Srikanta' প্রকাশিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তিতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দন পত্র রচনা (জুন, ১৯২২)। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গয়া অধিবেশনে যোগদান। বরিশাল রাজনৈতিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গী। মতান্তরের ফলে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব ত্যাগ (১৪ই জুলাই, ১৯২২)।*

১৯২৩—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ। 'নারীর মূল্য' (প্রবন্ধ) ও 'দেনা-পাওনা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'বঙ্গবাণী'তে 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ আরম্ভ (ফাল্গুন, ১৩২৯, সংখ্যা হইতে)।

১৯২৪—অক্টোবর, 'রূপ ও রঙ্গ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহিত যুগ্ম-সম্পাদক। 'নববিধান' পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯২৫—পানিত্রাস, সামতাবেড়ে গৃহনির্মাণ। ঢাকা মুন্সীগঞ্জে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এ সাহিত্য শাখার সভাপতি (১০ই ও ১১ই এপ্রিল, ১৯২৫)।

১৯২৬—'হরিলক্ষ্মী' (মার্চ, ১৯২৬। গল্প গ্রন্থ। গল্প:—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ) এবং 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'পথের দাবী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯২৭—'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' মঞ্চস্থ। শ্রীকান্ত, ১ম পর্বের ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ রোমাঁ রোলাঁয়ার শরৎচন্দ্রকে

*অবশ্য ইহার পরও শরৎচন্দ্র আবার অনেকদিন হাওড়া জেলার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃতি দান। 'শ্রীকান্ত', ৩য় পর্ব, ও 'ষোড়শী' ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ), পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯২৮—৫৩তম জন্মদিন (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫) উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্স্টিটিউটে দেশবাসীর অভিনন্দন। 'রমা' ('পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯২৯—১৫ই ফেব্রুয়ারী, বিক্রমপুরে ঢাকা জেলার যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব (মালিকান্দা অভয় আশ্রমে)। মার্চ, ১৯২৯—রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব। এই সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণই 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ। 'তরুণের বিদ্রোহ' ও 'বাংলার কথা' প্রবন্ধ লইয়া 'তরুণের বিদ্রোহ' গ্রন্থ ১৯২৯, এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩২, আগস্ট মাসে 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধ এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে যুক্ত হয়।

১৯৩১—মে, 'শেষপ্রশ্ন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত। কুমিল্লা যুব সম্মিলনে সভাপতিত্ব (বৈশাখ, ১৩৩৮)।

১৯৩২—'স্বদেশ ও সাহিত্য' (আগস্ট, ১৯৩২। প্রবন্ধ সমষ্টি।) 'স্বদেশ অংশে:—'আমার কথা' (১৪ই জুলাই, ১৯২২ হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ ত্যাগ প্রসঙ্গে), 'স্বরাজ সাধনায় নারী', 'শিক্ষার বিরোধ', 'স্মৃতি কথা' (দেশবন্ধুর স্মৃতিতে), 'অভিনন্দন' (১৯২০, জুন মাসে দেশবন্ধুর কারামুক্তিতে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সম্বর্ধনা সভায় জনসাধারণের পক্ষ হইতে লিখিত); (২) সাহিত্য অংশে:—'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য', 'গুরু শিষ্য সম্বাদ', 'সাহিত্য ও নীতি', 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' (মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ), 'ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত'; 'আধুনিক সাহিত্যের রীতি ও নীতি', অভিভাষণ (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসীর অভিনন্দনের প্রতিভাষণ); অভিভাষণ (প্রেসিডেন্সী কলেজে ৫৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর), যতীন্দ্র সম্বর্ধনা, 'শেষপ্রশ্ন' ('শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে একখানি পত্র), রবীন্দ্রনাথ ('রবীন্দ্র জয়ন্তী, ১৩৩৮' উপলক্ষে)।

কলিকাতা টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকদের শরৎচন্দ্রের ৫৬তম জন্মোৎসবে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) অভিনন্দন। নির্ধারিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ

উপস্থিত না হইতে পারায় যে লিখিত আশীর্বাণী পাঠান তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, কবিগুরু শরৎচন্দ্রকে তাঁহার 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি উৎসর্গ করিয়াছেন।

১৯৩৩—'শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব' পুস্তকাকারে প্রকাশিত (মার্চ, ১৯৩৩।)

১৯৩৪—'অনুরাধা-সতী ও পরেশ' (মার্চ, ১৯৩৪। গল্পগ্রন্থ। গল্প: 'অনুরাধা', 'সতী' এবং 'পরেশ') ও 'বিজয়া' (আগস্ট, ১৯৩৪। 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এ 'বিশিষ্ট সদস্য' পদলাভ। কলিকাতায়, অশ্বিনী দত্ত রোড, বালীগঞ্জে গৃহনির্মাণ।

১৯৩৫—'বিপ্রদাস' (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯৩৬—১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কলিকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার উদ্বোধন এবং কয়েকদিন পরে কলিকাতার এ্যালবার্ট হলে একই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব (জুলাই, ১৯৩৬)। ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে 'রবিবাসর' আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি লাভ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব (শ্রাবণ, ১৩৪৩)। 'রসচক্র' (বারোয়ারী উপন্যাস, শরৎচন্দ্র ইহার একাংশ লেখেন) প্রকাশিত।

১৯৩৮—৬২ বৎসর বয়সে ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ কলিকাতার পার্ক নারসিং হোমে অন্ত্রের ব্যাধিতে মৃত্যু।

'শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ' (বিভিন্ন কলেজে ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের ভাষণের সঙ্কলন) প্রকাশিত (চৈত্র, ১৩৪৪)।

'ছেলেবেলার গল্প' [এপ্রিল, ১৯৩৮। ছেলেদের গল্প সমষ্টি। গল্প: 'লালু' শিরোনামায় তিনটি গল্প, 'ছেলেধরা', 'কোলকাতার নতুন দা' (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব হইতে), 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী', 'দেওঘরের' স্মৃতি।] প্রকাশিত।

'শুভদা' (জুন, ১৯৩৮) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

১৯৩৯—'শেষের পরিচয়' (জুন, ১৯৩৯। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের ১-১৫

পরিচ্ছেদ লিখিয়া যান, শেষটুকু লেখেন কবি রাধারাণী দেবী।) পুস্তকাকারে প্রকাশিত।*

---

*এছাড়া 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', 'শরৎ-সাহিত্য সম্ভার', 'শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র 'জাগরণ' নামে একখানি উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী'তে (কার্তিক-পৌষ, ১৩৩০ ; বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ, ১৩৩১ ; বৈশাখ, ১৩৩২) লিখিতেছিলেন। এই উপন্যাসখানি সমাপ্ত হয় নাই। শরৎচন্দ্র ১৩৪৪, ১৫ই আশ্বিন সংখ্যা 'বাতায়ন' পত্রিকায় 'ভালোমন্দ' নামে একখানি বারোয়ারী উপন্যাসের প্রথমাংশ লিখিয়াছিলেন।

শরৎ-সাহিত্যের নির্ঘণ্ট

চিঠি :